আয়ুর্বেদাচার্য

কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ গোস্বামীর

(বি-এ, এল, এম, এস, বিদ্যাবিনোদ)

ও

শ্রীনাম বিজ্ঞানাচার্য
শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামীর
সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য

রচয়িতা

১। শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী

২। শ্রীমৎ রমানাথ গোস্বামী

৩। শ্রীকিশোর রায় গোস্বামী

৪। শ্রীগৌররায় গোস্বামী (সম্পাদক)

12

[illegible]

মহিমময় শ্রীসুরেন্দ্র নাথ গোস্বামীর

(বি. এল্, এম্. এ. [illegible])

ও

[illegible]

শ্রীমৎ [illegible] গোস্বামীর

[illegible]

[illegible]

[illegible]

আয়ুর্বেদাচার্য
কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ গোস্বামীর
(বি-এ, এল, এম, এস, বিদ্যাবিনোদ)

ও

শ্রীনাম বিজ্ঞানাচার্য
শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামীর
সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য

রচয়িতা

১। শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী
২। শ্রীমৎ রমানাথ গোস্বামী
৩। শ্রীকিশোর রায় গোস্বামী
৪। শ্রীগৌররায় গোস্বামী (সম্পাদক)

 [মূল্য ৫০ টাকা]

সম্পাদক ও প্রকাশক ঃ
শ্রীগৌররায় গোস্বামী
শ্রীশ্রীগৌররায় সেবাকুঞ্জ
প্রাচীন মায়াপুর দক্ষিণ
নবদ্বীপ ৭৪১৩০২
জিলা—নদীয়া (পঃ বঙ্গ)

—ঃ গ্রন্থ-প্রাপ্তিস্থান ঃ—

১। শ্রীকিশোর রায় গোস্বামী
শ্রীশ্রীগৌরকিশোর শান্তিকুঞ্জ
প্রাচীন মায়াপুর (দক্ষিণ)
পোঃ নবদ্বীপ, নদীয়া।
পিন—৭৪১৩০২

২। ডঃ পার্থ মজুমদার
বি.সি. ১৩৪ সল্টলেক সিটি
সেক্টর—১
কলিকাতা—৭০০ ০৬৪

৩। শ্রীঅচ্যুতানন্দ দাস
১১১ ব্রহ্মকুণ্ড
মদনমোহন ঘোর,
বৃন্দাবন—২৮১১২১
জিলা—মথুরা (ইউ. পি.)

৪। ঢাকা ষ্টোরস্
রাজার বাজার
নবদ্বীপ-৭৪১৩০২
নদীয়া, (পঃ বঙ্গ)

৫। স্বাগতম
মহাপ্রভু পাড়া
নবদ্বীপ—৭৪১৩০২
নদীয়া (পঃ বঙ্গ)

৬। শ্রীশ্যামরায় গোস্বামী
৩ বি, গাঙ্গুলীপাড়া লেন
পাইকপাড়া-কলিকাতা
পিন—৭০০০০২

৭। মহেশ লাইব্রেরী
২/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রিট
(কলেজ স্কোয়ার)
কলিকাতা-৭০০০৭৩

৮। প্রাচীন মায়াপুর শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ
জন্মস্থান মন্দির
নবদ্বীপ—৭৪১৩০২
নদীয়া, (পঃ বঙ্গ)

মুদ্রক ঃ শ্রীমায়াপুরচন্দ্র প্রেস, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

-ঃ শ্রীহরি ঃ-

উৎসর্গ-পত্র

মদীয় গৃহদেবতা ও সর্বকালীন অভিভাবক
শ্রীশ্রীগৌররায়হরির শ্রীচরণ সরোজে,
তদীয় ভক্তের এই জীবনীগ্রন্থ নৈবেদ্য স্বরূপ
নিবেদনপূর্বক এই নৈরাশ্য প্রপীড়িত জগতের যথার্থ
মঙ্গলকামী ভক্তবৃন্দের আস্বাদন ও
অবলম্বনের নিমিত্ত উৎসর্গীকৃত হইল

ইতি
ভক্তকৃপালব প্রার্থী
সম্পাদক

সূচীপত্র

শ্রীনামবিজ্ঞানাচার্য প্রভুপাদ
শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামীর জীবনালেখ্য



শ্রীশ্রীগৌররায় জীউ

শ্রীল রায় রামানন্দের দর্শনে
শ্রীশ্রীগৌর গোবিন্দ

তবে হাসি দেখাইলা আপন স্বরূপ ।
রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ ॥

অষ্টোত্তর শত শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী প্রভুপাদেভ্যঃ

বন্দনাষ্টকম্

শ্রীমৎ কানুপ্রিয়ং বন্দে
নামাচার্য্যং মহদ্‌গুরুম্ ।
প্রেরিতং কৃষ্ণদেবেন
জগতো হিতকাম্যয়া ॥ ১ ॥

আবির্ভূয় ধরাধাম্নি
গৌড়দেশে সতাং গৃহে ।
জন্মনঃ প্রভৃতি স্তক্তঃ
সংসার-ব্যবহারতঃ ॥ ২ ॥

হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রং
কলিকালে বিশেষতঃ ।
সাধনমুত্তমং প্রভুঃ
আচার্য্যঃ প্রদদাতি চ ॥ ৩ ॥

নাম্নঃ পরতরং নাস্তি
বিশেষতঃ কলৌযুগে ।
অতোঽসৌ নাম-যাজনে
নিরলসো ভবেন্মুদা ॥ ৪ ॥

নাম্নো ভিয়া কলেশ্চরাঃ
প্রভুং হস্তুং পুনঃ পুনঃ ।
চেষ্টন্তে বহুশো বজ্রৈঃ
বিফলাঃ স্যুঃ প্রতিক্ষণম্ ॥ ৫ ॥

ভক্তিশাস্ত্র-প্রচারেণ
বিরুদ্ধ-মত-খণ্ডনে ।
প্রতিজ্ঞা যাদৃশী প্রভোঃ
সহসা নৈব দৃশ্যতে ॥ ৬ ॥

কৃষ্ণস্য দয়িতো যতঃ
"কানুপ্রিয়ঃ" স্বনামতঃ ।
আকার-সদৃশঃ প্রাজ্ঞঃ
জনৈর্দৃষ্টঃ স্বরূপতঃ ॥ ৭ ॥

নামবিজ্ঞান-বৈচিত্রী-
বিচারাচার্য্য-বিগ্রহম্ ।
গোস্বামি-প্রবরং বন্দে
শ্রীমৎ কানুপ্রিয় প্রভুম্ ॥ ৮ ॥

গোবিন্দং মধুসূদনং স্মরতি যো ভক্তাগ্রগণ্যঃ প্রধীঃ,
ভক্তিপ্রেম বিলেখনে সুকুশলৌ যস্য প্রকৃষ্টৌ করৌ ।
কৈশোরঃ সময়াৎ পরং লিখতি যো সিদ্ধান্ত শাস্ত্রং সুধীঃ,
পাতুং ত্রাতুং চ মাং নরাধম পরং কানুপ্রিয়ঃ শ্রীপ্রভুঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীগুরুবৈষ্ণবদাসানুদাসেন রাধাকৃষ্ণ দেবশর্ম্মণা নিবেদিতম্ ।
অধ্যাপকঃ নবদ্বীপস্থ রাজকীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়স্য ॥

বন্দনাষ্টকের অনুবাদ

শ্রীনামাচার্য মহদ্‌গুরু শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামি প্রভুকে বন্দনা করি। যিনি জগতের মঙ্গলের জন্য শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন ॥ ১ ॥

যিনি এই ধরাধামে গৌড়দেশে সদ্‌গৃহে আবির্ভূত হইয়া আজন্ম সংসার ও ব্যবহারিক জগৎত্যাগ করিয়াছেন ॥ ২ ॥

এই বিশেষ কলিযুগে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রই উত্তম সাধন ইহা স্বয়ং আচরণ করিয়া আচার্য প্রভু প্রদান করিতেছেন ॥ ৩ ॥

শ্রীনামভজন হইতে শ্রেষ্ঠতম আর কোন সাধন নাই বিশেষতঃ এই কলিযুগে, অতএব ইনি শ্রীনাম-ভজনে নিরলস হইয়া সানন্দে উপদেশ দান করিতেন ॥ ৪ ॥

শ্রীনামপ্রচারের ভয়ে ভীত হইয়া কলির চরসমূহ পুনঃ পুনঃ বজ্রপাত দ্বারা প্রভুকে হত্যা করিবার জন্য চেষ্টান্বিত হইয়া প্রতিক্ষণে বিফলমনোরথ হইয়াছে ॥ ৫ ॥

ভক্তিশাস্ত্র প্রচার দ্বারা ভক্তিবিরোধী মত খণ্ডনে প্রভুপাদের যেরূপ চেষ্টা ও প্রতিজ্ঞা তাহা আর সহসা দৃষ্ট হয় না ॥ ৬ ॥

যেহেতু ইনি শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়, সেহেতু ইঁহার নাম "কানুপ্রিয়"। ইঁহার শ্রীবিগ্রহের আকৃতি দর্শন করিয়া জনগণ সহজেই ইনি যে "প্রকৃষ্ট সর্বজ্ঞ কল্প" তাহা জানিতে পারিতেন ॥ ৭ ॥

শ্রীনামবিজ্ঞানের সূক্ষ্মতত্ত্ব বিচার, আচার ও প্রচারকারী গোস্বামীপ্রবর শ্রীমৎ কানুপ্রিয় প্রভুকে বন্দনা করি ॥ ৮ ॥

শ্রীব্রজবিলাসী শ্রীগোবিন্দের লীলাস্মরণ মননকারী ভক্তাগ্রগণ্য প্রাজ্ঞ, ভক্তিরহস্য কণিকা, রাগভক্তিরহস্যদীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থ লিখনে যাঁহার করযুগল সর্বদা সুকৌশলী যিনি কৈশোর কাল হইতে চুরাশী বৎসর কাল পর্যন্ত ভক্তিসিদ্ধান্ত শাস্ত্র প্রকাশ করিয়া জগতের মঙ্গল করিয়াছেন, সেই শ্রীকানুপ্রিয় প্রভু আমার ন্যায় ক্ষুদ্র জীবাধমকে ভক্তিপথে পালন ও ভজন বিঘ্ন হইতে রক্ষা করুন ॥ ৯ ॥

শ্রীগুরুবৈষ্ণব দাসানুদাস

শ্রীরাধাকৃষ্ণ দেবশর্মা অধ্যাপক কর্তৃক এই বন্দনাষ্টক
শ্রীপ্রভুর চরণে নিবেদিত হইল।

— জয়শ্রীশ্রীগৌররায়হরি —

সম্পাদকের নিবেদন

আমাদের গৃহদেবতা শ্রীশ্রীগৌররায়হরির অবিচিন্ত্য কৃপাসাপেক্ষে বহুবিধ প্রতিবন্ধকতা প্রতিকূলতার মধ্যেও শ্রীশ্রীনামবিজ্ঞানাচার্য প্রভুপাদ শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামীর জীবনালেখ্য অবশেষে প্রকাশিত হ'লো।

প্রভুপাদ তদীয় প্রকটকালে সর্বতোভাবে প্রচার বিমুখ হ'লেও তদীয় প্রাণপতি শ্রীশ্রীগৌররায়জীউর কৃপা প্রেরণায় লোকচক্ষুর অন্তরালে তাঁর সাধন জীবনের ও ব্যক্তি জীবনের কাহিনী জনসমক্ষে তুলে ধরার কারণ এই আদর্শ জীবনের দর্শন থেকে বিশেষ করে ভক্তিজগতের অনেকেই হয়তো অনুপ্রেরণা ও লক্ষ্য খুঁজে পেতে পারেন। সত্য, চিরন্তন। কাল ও সমাজ নিরপেক্ষ—এ কারণে আমাদের ক্ষুদ্র সামর্থ্য ও প্রচেষ্টায় বিলম্ব হলেও হয়তো এই প্রকাশনা একেবারে ব্যর্থ হবেনা।

সংকলনের মধ্যে আমার লেখায় এই যৌথ প্রয়োজনার কারণ ব্যাখ্যাত হয়েছে। সুতরাং এখানে তার দ্বিরুক্তি করা হ'ল না।

কেবল যার উৎসাহ আনুকূল্য ও সহযোগিতা ছাড়া এতদিন পর এইটুকুও করা সম্ভব হ'তনা আমেরিকা প্রবাসী সেই ডঃ পার্থ মজুমদারের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ব্যতিরেকে সম্পাদকীয় নিবেদন অসম্পূর্ণই থেকে যাবে। সে আমাদের আত্মীয় হলেও এই গ্রন্থ ও সাধুসেবার মহৎ প্রয়াসের জন্য শ্রীশ্রীগৌররায়জীউর শ্রীচরণ যুগলে তার সর্বাঙ্গীন কুশল ও ভজনানুকূল্য প্রার্থনা করি।

শ্রীমান যুগলচরণ গুহ এর প্রতিও ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি—কারণ এই গ্রন্থের সমুদয় পাণ্ডুলিপি অতিযত্নে তৈরী করে দেওয়ার ফলে আমার উপর ন্যস্ত গুরুভার বহুলাংশে লাঘব হয়েছে। তার প্রতি রইল আমার পারমার্থিক শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ। শ্রীশ্রীগৌররায়জীউর শ্রীচরণযুগলে তার ভজনানুকূল্য ও সর্বাঙ্গীন কুশল প্রার্থনা করি। নিখিল ভক্তবৃন্দের প্রতিও অনুরোধ তাঁরা এঁদের প্রতি কৃপাসঞ্চার করুন।

গ্রন্থে সংযোজিত প্রভুপাদদের বিভিন্ন সময়ের আলেখ্য গুলির সংযোজনা, গ্রন্থের সৌকার্য বৃদ্ধির সহায়ক হবে এই বিশ্বাস।

আমাদের সর্বসময়ের সর্বকার্যের সহায়ক ও সুহৃৎ যাঁরা, তাঁদের আন্তরিক

সহযোগিতা, সহৃদয় সমর্থন; সদৈন্য আনুকূল্য ও তত্ত্বাবধান ব্যতিরেকে, এই গ্রন্থ প্রকাশনা একরূপ অসম্ভব ছিল— সেই পারমার্থিক সুহৃৎগণের মধ্যে—পণ্ডিতজী শ্রীকানাইলাল অধিকারী (পঞ্চতীর্থ) প্রাক্তন অধ্যক্ষ গভঃ সংস্কৃত কলেজ নবদ্বীপ; শ্রীগোরাচাঁদ শাস্ত্রী, কাব্যব্যাকরণ পুরাণ বৈষ্ণবদর্শন তীর্থ (ত্রিবেণী); ডাঃ মণীন্দ্র কুমার সিনহা এম.বি.; শ্রীপ্রশান্ত রায় বি.ই. (যাদবপুর) এম.এস. (যুক্তরাষ্ট্র); শ্রীকল্যাণরায় এম.টেক. (কলিকাতা) পি.এইচ.ডি (যুক্তরাষ্ট্র); শ্রীযুক্ত শঙ্কর লাল গাঙ্গুলী, চাটার্ড সেক্রেটারী কষ্ট এ্যাকাউন্টট্যান্ট, এম.কম.এল.বি; ডঃ শক্তিপ্রসাদ ঘোষাল, অ্যাসিঃ প্রফেসর, দুর্গাপুর আর.ই.(কলেজ); মহদাশয় শ্রীযুক্ত গিরিধারী মল্লিক, শ্রীবিনোদ বিহারী দেবনাথ, এ্যাডিঃ ও.সি. (কলিকাতা পুলিস); শ্রীমান মধুসূদন দাস, এম.টেক (কলিকাতা); শ্রীশ্যামরায় গোস্বামী, শ্রীমনোরঞ্জন গোস্বামী (রামপুর, ইউ.পি.); শ্রীবলরাম সাহা, শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র সাহা, শ্রীনকুলচন্দ্র সাহা, শ্রীমনোরঞ্জন মণ্ডল, শ্রীসূর্যকান্তদাস, শ্রীরবীন দাস শ্রীসুন্দর গোপাল মহাপাত্র, শ্রীব্রজ গোপাল বিশ্বাস, শ্রীবরুণ প্রধান, শ্রীগৌরচন্দ্র ঘোষ; প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ অমিত ঘোষ প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

শ্রীশ্রীগৌররায়জীউ ইহাদের সকলের সর্বাঙ্গীন কুশল ও ভজনানুকূল্য বিধান করুন এই প্রার্থনা। পরিশেষে সব বৈষ্ণব চরণে নিবেদন এই যে, জীবন সায়াহ্নে উপনীত এই দীনজনের প্রতি তাঁরা এই কৃপাশক্তি বিস্তার করুন যাতে জীবনের বাকি দিন গুলিতে নিরপরাধে শ্রীনামাশ্রয়ে থেকে নিজ অভীষ্ট ভজনে সংরত থাকতে পারি।

ইতি— ভক্তকৃপালব প্রার্থী দীনাতিদীন

শ্রীশ্রীগৌরপূর্ণিমা জয়ন্তী গৌররায় গোস্বামী

১৭ই, ফাল্গুন ১৪০৫ সাল সম্পাদক ও প্রকাশক

শ্রীধাম নবদ্বীপ



আয়ুর্বেদাচার্য কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ গোস্বামী

১। আয়ুর্বেদাচার্য কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর স্মরণে

শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী

যে সকল সুসন্তানকে অঙ্কে ধারণ করিয়া জননী জন্মভূমির পবিত্র মুখ সমুজ্জ্বল হয়, সেই সকল ধর্ম ও কর্মবীরগণের আদর্শ চরিত্র আলোচনায় যে জনসমাজের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে, একথা আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। এই উদ্দেশ্যে আজ আমরা আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় ও অকৃত্রিম বন্ধু পরলোকগত আয়ুর্বেদাচার্য কবিরাজ সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বিদ্যাবিনোদ মহোদয়ের পবিত্র জীবনী নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি। যাঁহারা গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথের সহিত সুপরিচিত, তাঁহাদিগকে তাঁহার পবিত্র জীবনী সম্বন্ধে কোন কথা নূতন করিয়া আর বলিবার প্রয়োজন নাই। কারণ তাঁহারা সকলই বিদিত; কিন্তু যাঁহারা গোস্বামী মহাশয়ের জীবনের বিশেষ কোনও সংবাদ অবগত নহেন, তাঁহাদিগের জন্যই এই বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা—আমাদের বিশ্বাস ইহা সংক্ষেপে লিখিত হইলেও ইহার দ্বারা উক্ত মহানুভব ব্যক্তির উন্নত চরিত্র ও আদর্শজীবনের কথঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়া পাঠকমাত্রেই উপকৃত হইবেন।

গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথ ইং ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে নদীয়া জেলার অন্তর্গত ভজনঘাট নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পতিত পাবনাবতার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর কয়েকজন নিত্যসিদ্ধ প্রিয় পরিবার এই গোস্বামী বংশের পূর্বপুরুষরূপে অবতীর্ণ হইয়া ইহাকে পবিত্র ও বৈষ্ণব-জগতে সম্মানিত করিয়াছিলেন। এই সুপবিত্র বৈষ্ণব পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহারই প্রভাবে সুরেন্দ্রনাথের হৃদয় অতি শৈশব হইতেই বৈষ্ণব জনোচিত স্নিগ্ধ সৌন্দর্য—সরলতায় ও কোমলতায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার শৈশব-লালিত্যে এমন সকল স্নিগ্ধ ভাবমাধুরীমা ফুটিয়া উঠিত যাহা সন্দর্শন করিয়া গ্রামস্থ ব্যক্তিমাত্রেই তাঁহার প্রতি অত্যধিক স্নেহ প্রদর্শন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগপূর্বক; প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনের অঙ্গনে সমুপস্থিত হইয়া তিনি সুমধুর স্বরে "শ্রীকৃষ্ণের শতনাম" আবৃত্তি করিতেন। প্রত্যুষে

এই সরলমতি সুন্দর বালকের মুখোদ্গীরিত ভুবনমঙ্গল 'কৃষ্ণনাম' শ্রবণে প্রফুল্লিত প্রতিবাসী, আন্তরিক আশীর্বাদের সহিত স্নেহভরে তাঁহার হস্তে খাদ্যসামগ্রী অর্পণ করিতেন। গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথের পিতৃদেব মনোহর গোস্বামী মহাশয় অতিশয় সরল প্রকৃতির লোকছিলেন। বিশেষত, পরোপকার ধর্মভীরুতা ও সৎসাহস প্রভৃতি গুণের জন্য তিনি গ্রামস্থ সকলেরই প্রীতি ভাজন হইয়াছিলেন। শিষ্যদিগের নিকট হইতে গুরু প্রণামী স্বরূপ যাহা কিছু অর্থাদি প্রাপ্ত হইতেন তাহাতেই তাঁহার পরিবারবর্গের ভরণপোষণ কোনও প্রকারে সঙ্কুলান হইয়া যাইত; ইহার অধিক তাঁহার আর কোন আয়ের উপায় ছিলনা। সুতরাং সুরেন্দ্র নাথের বাল্যজীবন যে অতিশয় অস্বচ্ছ-লতা ও দরিদ্রতার ভিতর দিয়া অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল, ইহা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। শৈশব হইতেই দরিদ্রতার সহিত তাঁহাকে যে কঠোর সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল; তাঁহার ভাবী জীবনের প্রগাঢ় ঈশ্বর বিশ্বাস ও ধর্মভাব সেই সংগ্রামেরই অমৃতময় ফল। সন্ধ্যা সমাগত হইলে বালক সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার পিতৃব্যের নিকট বসিয়া প্রত্যহ তাঁহার নিকট হইতে শ্রীভগবৎলীলা গুণাদিসূচক নানা প্রকার সুমধুর কাহিনী শ্রবণ করিতেন। সেই অমৃতময় শ্রীভগবৎ কথা শুনিতে শুনিতে একদিকে বালক যেমন আত্মহারা হইয়া যাইতেন, সেইরূপ অপর দিকে বৃদ্ধও সেই পবিত্র কাহিনী বলিতে বলিতে অশ্রুজলে পরিসিক্ত হইতেন। দরিদ্র কুটিরের অভ্যন্তরে—সেই দীনজন প্রতিপালকের দয়া ও লীলাকথামৃতে নিমজ্জিত, সেই বালক ও বৃদ্ধের পবিত্র সম্মিলনে যে বিমল আনন্দের উৎস জুটিত, তাহার তুলনা এজগতে অতীব বিরল। এই আনন্দ-প্রবাহ গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সজীব ছিল। তাঁহাকে অনেক সময় বলিতে শুনিয়াছি—সেই ভগবৎ করুণার সুশীতল ছায়ায় প্রতিষ্ঠিত—ভগ্ন কুটিরের ভিতর বসিয়া, পেটে ক্ষুধা ও মুখে হরিনাম যেমন মধুর বলিয়া বোধ হইত—তাহার পরত জীবনের কতদিন কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু সেরূপ মিষ্টতা—সেরূপ আনন্দ আর কোথাও পাই নাই।"

তিনি তাঁহাদের গ্রাম্যদেবতা—শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ জীউকে তাঁহাদের দীন-পরিবারবর্গের একমাত্র আশ্রয়স্থল ও প্রধানতম অভিভাবক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সরল শৈশব হৃদয়ে এই বিশ্বাস—পরম সত্যরূপেই অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। কোনও আনন্দের সংবাদ থাকিলে অমনি বালক ছুটিয়া গিয়া সর্বাগ্রে রাধাবল্লভকেই জানাইতেন,—কোনও দুঃখ উপস্থিত হইলে তাঁহারই প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া নীরবে অশ্রুমোচন করিতেন। ভক্তবৎসল শ্রীভগবানও এই সরল বালকের সরল বিশ্বাস উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত করিয়া দিতে কোনও দিন উপেক্ষা করেন নাই। সুরেন্দ্রনাথের বাল্য জীবনে এমন শত শত অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটিয়াছিল। যাহাকে আমরা তাঁহার

ভাবী জীবনের প্রগাঢ় ধর্মভাব ও ঈশ্বর বিশ্বাসের মূল ভিত্তিরূপে উল্লেখ করিতে পারি। সংক্ষেপে কেবল এইরূপ দুই একটি ঘটনামাত্র আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথ শৈশবে গ্রামস্থ বিদ্যালয়ে প্রবেশলাভ করিয়া একান্ত আগ্রহ ও যত্নের সহিত বিদ্যাভ্যাস করিতে থাকেন। অতি অল্প বয়স হইতেই তাঁহার অসাধারণ মেধা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া শিক্ষকগণ তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। তিনি বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রায় প্রতিবারেই প্রথম স্থান অধিকার করিতেন। অর্থাভাব বশতঃ পাঠ্যপুস্তকের সকল গুলি তাঁহার ক্রয় করা হইয়া উঠিত না। এই জন্য তিনি অনেক সময় বিদ্যালয়ে গমন পূর্বক সকলের শেষে যাইয়া বসিতেন। প্রথম বালক হইতে তাঁহার পূর্বেকার সহাধ্যায়ী পর্যন্ত একে একে পাঠ আবৃত্তি করিতে করিতেই তিনি তাহা শ্রবণ করিয়া, যথা সময়ে শিক্ষক মহাশয় জিজ্ঞাসা করিবা মাত্রেই আবৃত্তি করিতেন। এক দিবস সন্ধ্যার পর কোনও সহাধ্যায়ীকে পরদিবসের নির্দিষ্ট পাঠ অভ্যাস করিতে শুনিয়া, সুরেন্দ্রনাথ নীরবে তাঁহার পাঠাগারের বাহিরে বাতায়ন পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া, সেই বালকের উচ্চারিত পাঠ শ্রবণপূর্বক কণ্ঠস্থ করিয়া লইতেছিলেন। শিক্ষকগণ কর্তৃক সুরেন্দ্রনাথকে নিয়ত আদৃত হইতে দেখিয়া— উক্ত সহাধ্যায়ী তাঁহার প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিল। সুতরাং তাঁহাকে স্বীয় বাতায়ন পার্শ্বে অবস্থিত জানিতে পারিয়া সহাধ্যায়ী তৎক্ষণাৎ অধ্যয়ন স্থগিত রাখিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিল। সুরেন্দ্রনাথের সেই দিনকার পাঠ আয়ত্ত হইল না। পরদিবস বিদ্যালয়ে গমন করিলে; ঘটনাক্রমে শিক্ষক মহাশয় সেদিন সর্বপ্রথমেই সুরেন্দ্রনাথকে পাঠ আবৃত্তি করিতে আদেশ করিলেন ও তাঁহাকে অকৃতকার্য হইতে দেখিয়া ও বিশেষ অনুসন্ধানে তাঁহার এযাবৎ পাঠ্যপুস্তক গুলির সমস্ত ক্রয় করা হয় নাই জানিয়া, কিঞ্চিৎ তিরস্কার করিলেন। এই প্রকার অপ্রত্যাশিত ঘটনায় তিনি বিশেষ মর্মাহত হইলেন। ইহার ফলে পরক্ষণেই কিঞ্চিৎ দুঃখ ও অভিমান তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। বলা বাহুল্য, এই দুঃখ ও অভিমান তাঁহার চিরারাধ্য দেবতা শ্রীরাধাবল্লভ ব্যতীত অপর কাহারও উপর নহে। সেইদিন বিদ্যালয়ের ছুটির পর সর্বপ্রথমেই ভগবৎ শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হইয়া বালক অভিমান জড়িত স্বরে বলিলেন, ঠাকুর! যদি আজ আমায় বইখানি না দাও, তবে কাল থেকে আর বিদ্যালয়ে যাব না। এই সরল শৈশব হৃদয়ের কাতর নিবেদন জানি না শ্রীশ্রীরাধাবল্লভের দারুময়ী মূর্তি শ্রবণ করিলেন কি না? কিন্তু তিনি গৃহে উপস্থিত হইলেই, তাঁহার পিতৃদেব ব্যগ্রভাবে তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, —অমুক লোক কতকগুলি পুরাতন বই পাঠাইয়া দিয়াছে, তার ছেলে উঁচু ক্লাসে উঠিয়াছে, তাই এগুলো তার আর কাজে লাগিবে না। দেখ্ দেখি। যদি কোন বই তোর পড়ায় লাগে?" পুস্তকের কথা শুনিয়াই আবার উৎফুল্ল

বালক দ্রুতপদে গৃহে প্রবেশ করিয়াই দেখিতে পাইলেন, কতকগুলি তাঁহার নিষ্প্রয়োজনীয় পুস্তকরাশির উপর প্রথম পুস্তকখানিই সেই গ্রন্থ—যাহার জন্য তিনি আজ বিদ্যালয়ে তিরস্কৃত হইবার পর পুস্তকের অভাব, এইমাত্র তাঁহার দয়াময় শ্রীরাধাবল্লভের নিকট বলিয়া আসিয়াছেন। সাধারণতঃ আমরা এই ঘটনাকে কাকতালিয় ন্যায়ে পরিদর্শন করিতে পারি। কিন্তু গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথ এরূপ ঘটনায়—তাঁহার দয়াময়ের অনন্ত দয়া বলিয়াই বুঝিয়াছিলেন। ভগবৎ করুণার অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ তিনি যে কেবল অভাবের মধ্যেই অনুভব করিতেন, তাহা নহে,—সম্পদে-বিপদে, আশায় নিরাশায়, সুখে দুঃখে—অথবা মৃত্যুর ভৈরবী ছায়ার মধ্যেও সেই দীনজন প্রতিপালকের দয়ার মুরতি—তাঁহার হৃদয় ক্ষেত্রে জাগিয়া উঠিত। আমরা তাঁহার জীবনের এইরূপ দুই একটি ঘটনামাত্র নিম্নে উল্লেখ করিব।

ভজনঘাট গ্রামের উত্তর প্রান্তে ২/৩ ক্রোশ দীর্ঘ ও বহু বিস্তৃত একটি বিল বা জলাশয় আছে। একদিবস সুরেন্দ্রনাথের কোনও বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয় ভ্রাতা। তাঁহাকে সন্তরণ শিক্ষাদিবার অভিপ্রায়ে উক্ত জলাশয়ে লইয়া যান। তখন বর্ষার অবিশ্রান্ত বারিধারায় বিলটি পরিপূর্ণ ও দিগন্ত বিস্তৃত প্রায় হইয়া, অতিশয় ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল। উক্ত আত্মীয় নিজে বিলক্ষণ সন্তরণ পটু ছিলেন। তিনি সন্তরণ বিদ্যায় অনভিজ্ঞ বালক সুরেন্দ্র নাথকে সন্তরণে সাহায্য করিয়া অল্পে অল্পে যখন প্রায় বিলের মধ্যস্থলে সমুপস্থিত। ঠিক সেই সময়ে তাঁহার অপর কতিপয় সন্তরণপটু বন্ধুকে বিশেষ উৎসাহের সহিত উক্ত জলাশয় পারাপার হইতে দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য সেই দিকে দ্রুত প্রস্থান করিলেন। সন্তরণে অত্যন্ত উল্লাস বশতই হউক বা তাঁহার ভ্রাতা সন্তরণ শিক্ষার্থীটি স্বসামর্থে তীরে উত্তীর্ণ হইতে সক্ষম হইবে এইরূপ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়াই হউক, তিনি আর একবারও সুরেন্দ্রনাথের প্রতি ফিরিয়াও চাহিলেন না। বা তাঁহার অবস্থার কথা ভাবিলেন না। নিমজ্জনাশঙ্কায় আকুলিত বালকের কাতর অনুনয় তাঁহার কর্ণে পৌঁছিবার পূর্বেই, তিনি অনেক দূর ব্যবধানে চলিয়া গিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথ এই সময়ে যে পরিমাণ সন্তরণ শিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি অপরের সাহায্য ব্যতীত কোন প্রকারে ১০/১২ হাত যাইতে পারেন মাত্র। কিন্তু এই বর্তমান জীবন-সঙ্কটে উদ্ধার লাভ করিতে হইলে তাঁহাকে ন্যূনপক্ষে শতহস্ত বিস্তৃত জলরাশি অতিক্রম করিতে হইবে। সুতরাং তাঁহার এই বিপদের গভীরতা পাঠক, একটু চিন্তা করিলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবেন। প্রাণরক্ষার জন্য সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার শেষ সামর্থ্য প্রয়োগ করিয়া ১৫/১৬ হস্ত পরিমিত জলরাশি অতিক্রম করিয়া আসিলেন। কিন্তু আর শক্তিতে কুলাইতেছে না। তাঁহার শেষ শক্তি যাহা তাহার বিশ্রান্তি স্থলে তিনি

উপস্থিত হইয়াছেন। চক্ষুর সম্মুখে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল দেহ সম্পূর্ণ অবসন্ন হইয়া পড়িল! নিমজ্জমান বালক কেবল শেষ একবার তাঁহার দয়াময় 'রাধাবল্লভ' নাম উচ্চারণ করিয়া সলিল গর্ভে অদৃশ্য হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভগবৎ করুণার স্নিগ্ধজ্যোতি নিরাশ্রয় বালকের জীবনরক্ষার্থ সলিল গর্ভে প্রতিবিম্বিত হইল। নিমজ্জনের সঙ্গে সঙ্গেই একখানি প্রোথিত দীর্ঘ বংশদণ্ড তাঁহার দেহ স্পর্শ করায়, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা অবলম্বন করিয়া ভাসিয়া উঠিলেন। বর্ষা আগমনের পূর্বে ধীবরেরা কোনও প্রয়োজন বশতঃ এই দীর্ঘ বংশদণ্ডখানি মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়াছিল। বর্ষা সমাগমে বিলের জল অতিশয় বৃদ্ধি হওয়ায়, তাহা সলিল গর্ভে সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হইয়া যায়। বিস্তৃত জলরাশির মধ্যে এই বংশদণ্ডটি যে কোথায় আছে, তাহা নিরূপিত করা সম্পূর্ণ অসাধ্য ছিল। সুতরাং সুরেন্দ্রনাথের পক্ষে এই অপ্রত্যাশিত আশ্রয় যষ্ঠি লাভ করা যে একমাত্র তাঁহার দয়াময়ের অনন্ত দয়ার পরিচয়, তাহা ভগবৎ বিশ্বাসী ব্যক্তিমাত্রেই সহজে বুঝিতে পারিবেন।

বাল্যকাল হইতেই গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথের ধৈর্য ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। একদা একখানি জীর্ণ নৌকারোহণে তিনি তাঁহার পিতৃদেবের সহিত নদী উত্তীর্ণ হইতেছিলেন। পিতা ও পুত্র ব্যতীত নৌকায় অপর আরোহী কেহই ছিল না। তরণীখানি নদীর মধ্যস্থলে যাইতে না যাইতেই, তলদেশ বিদীর্ণ হইয়া ভীষণ বেগে জল উঠিতে থাকে। নিমজ্জনের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা দেখিয়া, তাঁহার পিতৃদেব অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে তিনি সাঁতার জানেন কিনা, জিজ্ঞাসা করায় সুরেন্দ্রনাথ কিঞ্চিৎমাত্রও ভীত বা বিচলিত না হইয়া তৎক্ষণাৎ জনকের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ জানাইলেন যে, তিনি উত্তম সন্তরণ পটু; এমন কী দুইবার অক্লেশে পারাপার হইতে পারেন। পুত্রের কথায় আশ্বস্ত হইয়া পিতার হৃদয়ে পুনরায় বল ও উৎসাহ আসিল। তিনি দ্বিগুণ শক্তিতে তরণী বাহিতে লাগিলেন, ইহাতে নৌকাখানি তীরের প্রায় সন্নিকটবর্তী হইয়া জলমগ্ন হইল। বলা বাহুল্য, সুরেন্দ্রনাথ তখন কিঞ্চিৎমাত্রও সন্তরণ জানিতেন না। তিনি সেই দিন এইভাবে ধৈর্যাবলম্বন না করিয়া, সন্তরণ সম্বন্ধে নিজ যথার্থ পরিচয় জ্ঞাপন করিলে, হয়তো অশেষ বিপদে উভয়কে পতিত হইতে হইত।

এইরূপে অনেক বিপদ ও অভাবের মধ্য দিয়া ও শ্রীভগবৎ করুণার স্নিগ্ধরশ্মি বক্ষে ধারণ করিয়া গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথ ত্রয়োদশবর্ষ বয়সে গ্রামস্থ বিদ্যালয় হইতে মাইনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি এই পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কেবল মাত্র দুই নম্বর কমের জন্য প্রথম স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই। পরে বারাসতের গভর্ণমেন্টের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রবেশ লাভ

করিলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মাইনর পরীক্ষায় যে বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা তাঁহার শিক্ষাদির ব্যয় নির্বাহ হইতে লাগিল। বারাসতে আসিয়া গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথ, তাঁহার শিক্ষাদি বিষয়ে তৎকালীন Director of Public Instruction এর ভূতপূর্ব সহকারী শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসু মহাশয়ের বিশেষ সাহায্য পাইয়াছিলেন। তিনি সুরেন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, উন্নত চরিত্র প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকল লক্ষ্য করিয়া, সেই সময় হইতেই তাঁহাকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন। উভয়ের মধ্যে একটা গাঢ়তর আন্তরিকতা বরাবর সজীব ছিল।

এই বারাসত ইংরাজী স্কুল হইতেই গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথ এন্ট্রাস পরীক্ষায় যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। গুস্তিয়া নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার ৺ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ের বৃত্তি পাইয়া তিনি কলিকাতার মেট্রোপোলিটন কলেজে প্রবেশ লাভ করেন। উক্ত বৃত্তি হইতে তাঁহার শিক্ষাদির সমুদয় ব্যয় নির্বাহ না হওয়ায় প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে শিক্ষকতা করিয়া নিজ ব্যয় নির্বাহ করিতেন। দরিদ্রতার মধ্য দিয়া তাঁহার জীবনস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। তাই তিনি দরিদ্রের দুঃখ চিরদিন মর্মে মর্মে অনুভব করিতেন। সেই জন্য সেই সময় হইতেই ছাত্রাদি পড়াইয়া যে অর্থ পাইতেন, তাহা হইতেই ২/৫ টাকা তাঁহার ন্যায় অভাবগ্রস্থ ছাত্রদিগকে সাহায্য করিতেন।

গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথ মেট্রোপলিটন কলেজ হইতে যথাসময়ে এফ.এ. ও তৎপরে বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার্থে কলিকাতা মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হইলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ এই সময়ে তাঁহার পিতৃদেবের শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়ায় অর্থাভাবে তাঁহার সংসার প্রায় অচল হইয়া উঠিল। সুতরাং অধ্যয়ন স্থগিত রাখিয়া সুরেন্দ্রনাথকে অর্থোপার্জনের চেষ্টা দেখিতে হইল। কিছুদিন অবিশ্রান্তভাবে চেষ্টা করিয়াও যখন সুবিধাজনক কোনও কার্যের সংস্থান করিতে পারিলেন না, তখন তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথের একটি বিশেষ গুণ এই ছিল যে, যখন বিপদের অন্ধকার মাথার উপর ঘনাইয়া আসিত, যখন নিরাশার গাঢ়মেঘ হৃদয়ে সঞ্চিত হইত, তিনি সেই সময়ে অত্যন্ত বিশ্বাসের সহিত শ্রীভগবানের মঙ্গলময় নাম সর্বদা গ্রহণ করিতেন ও তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতেন। ইহার ফল প্রায়ই সঙ্গে সঙ্গে ফলিত। এই সময়েও ঠিক তাহাই হইল। একদিন কোনও নির্জন স্থানে বসিয়া, শ্রীভগবানের নিকট ঐকান্তিক ভাবে প্রার্থনা করিবার পরেই তাঁহার নিরাশ হৃদয়ে হঠাৎ যেন একটা আশার আলোক ফুটিয়া উঠিল। তিনি বাসায় ফিরিয়াই শয্যার উপর একখানি পত্র পাইলেন। উৎসাহ ভরে পত্রখানি উন্মুক্ত করিয়াই দেখিতে পাইলেন, জয়পুর হইতে তাঁহার জনৈক

বন্ধু তাঁহার জন্য একটি চাকরী স্থির করিয়া শীঘ্রই তথায় তাঁহাকে যাইতে লিখিয়াছেন। তাঁহাকে Thakur Saheb of Bagru-র পুত্রের শিক্ষকতা করিতে হইবে। ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া তিনি অবিলম্বে জয়পুরে গমন করিলেন। এই স্থানে আসিয়া বিশ্বাস ও ভক্তির এক প্রবল বন্যা উচ্ছ্বসিত হইয়া তাঁহার পবিত্র হৃদয়-তট পূর্ণ করিয়াছিল। তাঁহার "পরিচয়" নামক পুস্তকের পাঠক মাত্রেই এই কথার সত্যতা উপলব্ধি করিবেন। আজমীঢ়ের সুপ্রসিদ্ধ Mayo College য়ে অবস্থানকালে তত্রস্ত রাজপুত্রগণের মধ্যে অনেকেই তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র ও অপরাপর গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়া গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন।

গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথের জয়পুর আগমনের পর হইতেই তাঁহার পিতৃদেবের সাংসারিক অবস্থা অনেক পরিমাণে স্বচ্ছল হইয়াছিল। পিতার সমুদয় ঋণভার অতি অল্প দিনের মধ্যেই তিনি পরিশোধ করিতে সক্ষম হইয়া নিজেকে ভাগ্যবান মনে করিয়াছিলেন। অনেক দুঃখ কষ্টের পর সময়ে তাঁহাদের সংসারে একটু সুখের আলোক পরিদৃষ্ট হইতে থাকিলেও সে সুখ বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। অতি অল্পদিনের মধ্যেই সুরেন্দ্রনাথের পিতৃবিয়োগ ঘটে। এই বিষাদময় ঘটনা তিনি স্বপ্নযোগে জানিতে পারিয়া শীঘ্রই দেশে প্রত্যাগমন করেন। স্বপ্ন বৃত্তান্ত সত্যে পরিণত দেখিয়া সুরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত মর্মাহত হইয়াছিলেন।

এই সময়ে তিনি পুনরায় মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। স্বীয় অধ্যয়নের ও সাংসারিক ব্যয় নির্বাহের জন্য এই সময়ে গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতা হিন্দু হোস্টেলের সহকারী সুপারিন্টেন্ডেন্টের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে মেডিকেল কলেজ হইতে ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুদিন পরেই নদীয়া জেলার অন্তঃপাতি কুমারখালি নামক স্থানে অবস্থান পূর্বক ডাক্তারী চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হয়েন। কুমারখালি আগমনের পর হইতেই গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথের জীবনেতিহাসের এক নূতন পরিচ্ছেদ আরম্ভ হইয়াছিল। যে চরিত্রকে তিনি এতদিন প্রবল পরীক্ষার ভিতর দিয়া আদর্শ ও পবিত্ররূপে বিকসিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। কর্তব্যের কঠিন ক্ষেত্রের সহিত এই সময় হইতেই প্রকৃষ্টরূপে তাহার সংযোগ আরম্ভ হয়।

কয়েক বৎসরের মধ্যেই কুমারখালির চতুঃপার্শ্বস্থ ৫০/৬০ মাইল স্থানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবস্থাপক চিকিৎসকরূপে পরিণত হইয়াছিলেন। সেই সকল স্থানের পর্ণকুটীরবাসী দরিদ্র কৃষক হইতে সৌধনিবাসী ক্রোড়পতি পর্যন্ত সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন লোক অতি বিরল ছিল যাহারা ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথের নাম শ্রদ্ধার সহিত

উচ্চারণ না করিত। তাঁহার চিকিৎসা ব্যবসায়ের এইরূপ অসামান্য উন্নতি কেবল যে তাঁহার সুচিকিৎসার ফলেই হইয়াছিল এমন নহে, তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র তাঁহার অসামান্য বিনয়, সরলতা ও স্বার্থ ত্যাগ, তাঁহার অসীম দয়া ও ঈশ্বর বিশ্বাস প্রভৃতি গুণাবলিও এই উন্নতির পথে বিশেষরূপে সহায়তা করিয়া ছিল। তিনি যখন কোনও রোগীর চিকিৎসাভার গ্রহণ করিতেন, তখন ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে তাহার আরোগ্যের জন্য ঐকান্তিক যত্ন ও পরিশ্রম করিতে কোনও দিন উপেক্ষা করিতেন না।

একদা কুমারখালি হইতে ১২ মাইল দূরবর্তী স্থানের কোন ধনীগৃহে চিকিৎসার্থ আহুত হইয়া, গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথ তথায় গমন করেন। তৎকালে জনৈক দরিদ্র কৃষক উৎকট ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া, তাঁহার চিকিৎসাধীন ছিল। কৃষক তাহার বৃদ্ধা জননীর একমাত্র সন্তান ও তাহাদিগের দরিদ্র পরিবারবর্গের একমাত্র অভিভাবক। সুতরাং ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ, এই দরিদ্র কৃষকের চিকিৎসার যে দায়ীত্বভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা মনে করিয়া সেই রাত্রিতেই ফিরিয়া আসিবেন। এই শর্তে উক্ত ধনবান্ ব্যক্তির গৃহে গমন করেন। তাঁহার ব্যবস্থাপিত ঔষধ সেবনের পর হইতেই সেই রোগী অনেক পরিমাণে সুস্থ বোধ করে ও সম্পূর্ণ নিরাপদ বলিয়া বিবেচিত হয়। তখন গোস্বামী মহাশয় উক্ত বিপন্ন কৃষকের বৃত্তান্ত জানাইয়া সেই রাত্রিতেই প্রত্যাবর্তনের বাসনা জ্ঞাপন করিলে, উক্তধনীব্যক্তি সে প্রস্তাবে বিশেষভাবে আপত্তি করেন ও প্রত্যহ পঞ্চশত মুদ্রা হিসাবে ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথকে প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া তাঁহাকে আরও ২/৩ দিন তথায় অবস্থান করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু সেই ভগ্ন কুটীরশায়ী দীন আতুরের প্রতি তাঁহার সুমহান দায়ীত্ব চিন্তা করিয়া তিনি সেই প্রস্তাব উপেক্ষা পূর্বক তৎক্ষণাৎ রেলওয়ে স্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার স্টেশনে উপস্থিত হইবার অল্প কিছুক্ষণ পূর্বেই, রাত্রির শেষ গাড়ী স্টেশন পরিত্যাগ করায় তিনি বিশেষ অসুবিধায় পতিত হয়েন। স্টেশন মাস্টার তাঁহাকে সেই রাত্রির জন্য স্টেশনে অবস্থান করিতে অনুরোধ করিলেও, তাঁহার কর্তব্যজ্ঞান এমন প্রবলভাবে, তাঁহার হৃদয়ে আঘাত করিতে থাকে যে, তিনি আর কোনরূপ চিন্তা না করিয়া, তখনই রেলওয়ে লাইনের ধার দিয়া একাকী সেই অন্ধকার রাত্রি মধ্যে অবিশ্রান্ত ভাবে সুদীর্ঘ ১০/১২ মাইল পথ অতিক্রম পূর্বক অতি প্রত্যুষেই দরিদ্র আতুরের পর্ণ কুটীর দ্বারে সমুপস্থিত হইয়াছিলেন। এইরূপ অনেক অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার ও কর্তব্যনিষ্ঠাগুণে তিনি স্থানীয় হিন্দু মুসলমান ধনী দরিদ্র সকলেরই আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অনেক মুসলমান পরিবারে তিনি কেবল দয়াল হাকীম নামেই পরিচিত ছিলেন। তাহারা তাঁহার নাম বা অপর পরিচয় সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিত না।

বৈষ্ণব বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ও বৈষ্ণব পরিবারের সংস্পর্শে থাকিয়া গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথ বৈষ্ণবজনোচিত অনেক গুণে বিভূষিত ছিলেন। তন্মধ্যে শ্রীভগবন্নামে দৃঢ় বিশ্বাস ও জীবে দয়া—এই সাধনদ্বয়কে তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্যন্ত হৃদয়ের সহিত গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। একদিন গৃহের বাহির হইয়া দেখিতে পাইলেন, একটি অপরিচিত ব্যাধিগ্রস্থ পথিক সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় ও বিপন্ন হইয়া একটি বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া আছে। তাহার সর্ব শরীর ক্ষতময় ও কীটে সমাচ্ছন্ন। হতভাগ্য ব্যাধির যন্ত্রণায় মধ্যে মধ্যে আর্তনাদ করিতেছে ও এক একবার হরিনাম উচ্চারণ করিয়া পরিতাপের অশ্রুধারায় নিজ কলুষরাশি বিধৌত করিবার প্রয়াস পাইতেছে। হরিনাম শ্রবণ করিবামাত্র গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথের দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট যাইয়া তাঁহার অবস্থান বিদিত হইলেন ও তাহাকে আশ্বস্ত করিলেন। পরোপকার প্রিয় কতিপয় ব্যক্তির সাহায্যে তাহাকে উঠাইয়া লইয়া নিজবাটীর সন্নিকটস্থ অপর একটি গৃহে স্থান দান করিলেন। জনৈক পরিচিত ব্যক্তি তাঁহার এইরূপ কার্য দর্শনে বিস্ময় প্রকাশ করিলে, তিনি তাঁহাকে বিনীত ভাবে বলিয়াছিলেন। ইহাতে বিস্ময় প্রকাশ করিবার কিছুই নাই। বিপন্ন জীবের সাহায্য করা মানুষ মাত্রেরই অবশ্য কর্তব্য। যাহা কর্তব্য তাহার অনুষ্ঠান দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত বা গৌরবান্বিত হইবার কিছুই নাই। বিশেষতঃ মহাপ্রভুর উপদেশ 'যাহার মুখে অন্ততঃ একবার হরিনাম শ্রবণ করা যায়, তাহাকেই বৈষ্ণব বলিয়া জানিবে।' সুতরাং এই ব্যক্তির সেবায় বৈষ্ণব সেবাও লাভ করিতে পারিব। প্রত্যহ রোগী দেখিতে যাইবার পূর্বে তিনি সহস্তে এই রোগীর দুর্গন্ধ ক্ষতময় দেহ ধৌত করিয়া দিয়া যথাযথ ঔষধাদি প্রয়োগ করিয়া যাইতেন। ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথের আন্তরিক চেষ্টা ও যত্ন সত্ত্বেও লোকটি কয়েক দিবস পরেই মৃত্যুর শীতল অঙ্কে শয়ন করে। এই সম্পূর্ণ অজ্ঞাতকুল শীলজনের গলিত মৃত দেহের সৎকার কার্যে কেহই স্বেচ্ছায় অগ্রসর হইল না দেখিয়া ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ অপর কাহাকেও এ সম্বন্ধে অনুরোধ না করিয়া স্বয়ংই কতিপয় আত্মীয়ের সাহায্যে এই কার্যে অগ্রসর হইলেন। তাঁহাকে এই কার্যে ব্রতী দেখিয়া দেখিতে দেখিতে অনেক লোক সেখানে উপস্থিত হইল। তাঁহার মহৎ দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণীত হইয়া স্থানীয় কতিপয় প্রসিদ্ধ ধনী ব্যক্তি ও সম্ভ্রান্ত লোক সানন্দচিত্তে এই সেবা কার্যে গোস্বামী মহাশয়ের সহিত যোগ দিলেন। পাপ নিক্ষিপ্ত নগণ্য দরিদ্রের মৃতদেহ, স্বেচ্ছায় সানন্দে কত লক্ষপতি মিলিয়া বহন করিয়া চলিলেন। সেদিনকার সেই দৃশ্য দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। অনেকে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই। এইরূপে ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথের সুমধুর চরিত্রের সান্নিধ্যে আসিয়া অনেক বিলাস পরায়ন উৎচ্ছৃঙ্খলমতি ধনীসন্তান জীবনস্রোতের

পরিবর্তন করিয়া পারিবারিক ও সামাজিক সুখ-শান্তি বিধানে সক্ষম হইয়াছিলেন। দান সম্বন্ধে গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথ আজীবন মুক্তহস্ত ছিলেন। অর্থসঞ্চয়ের স্পৃহা তাঁহার জীবনে কোন দিন স্থান পায় নাই। তিনি সারা জীবনে যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিলেও এই অর্থ সঞ্চয়ে নিস্পৃহতা ও দানশীলতাই তাঁহাকে ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসাদ লাভ হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছিল। তিনি বলিতেন, 'আমরা যে পরিমাণে ভগবানের কার্যে নিযুক্ত থাকিব, তিনিও সেই পরিমাণে আমাদের ভার গ্রহণ করিবেন। ভগবান সুবিচারক সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ। সুতরাং তাঁহার উপর নির্ভর করিলে আমাদের হিতাহিত নির্বাচন করিয়া প্রয়োজন অপ্রয়োজন বুঝিয়া যথা সময়ে তাহার সুব্যবস্থা করিতে তিনি যেমন সমর্থ এমন আর কাহার দ্বারা হইতে পারে? সুতরাং নিজের সুখ স্বচ্ছন্দের ব্যবস্থায় নিজেকে নিযুক্ত রাখা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন।" বাস্তবিক বলিতে কি, একটু নিবিষ্টচিত্তে তাঁহার দৈনন্দিন লিপি (Diary) পর্যবেক্ষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় আশ্রিত বৎসল শ্রীভগবানের অসীম করুণার স্নিগ্ধ ধারায় ইহার প্রতি পত্র সুরসিত হইয়া রহিয়াছে। শরণাগত প্রতিপালক শ্রীভগবানের আশ্রিত রক্ষার্থে যেন একটা আসা যাওয়ার চরণ ধ্বনি, ইহা পাঠে সহৃদয় ভাবুক ব্যক্তিমাত্রেরই উপলব্ধি হইবে।

গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথের জ্ঞান পিপাসা অত্যন্ত বলবতী ছিল। গ্রন্থ অধ্যয়নে তিনি যেরূপ আনন্দ পাইতেন, এমন আর কিছুতেই নহে। দিবসের অধিকাংশ সময় নিজ ব্যবসায় ব্যস্ত থাকায় তিনি রজনীতে নিশ্চিন্ত মনে প্রায় ৬ ঘটিকা পর্যন্ত অধ্যয়ন করিতেন। রাত্রিতে কেবল ২/৩ ঘণ্টা মাত্র নিদ্রা যাইলেই তিনি যথেষ্ট মনে করিতেন। তাঁহার সুগভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ সুপ্রসিদ্ধ দর্শন, বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থসকল এই অসীম পরিশ্রমের ফল। যখন তিনি কোনও প্রকার শারীরিক ব্যাধি বা মানসিক চিন্তায় আক্রান্ত হইতেন, তখন অনেক সময় একখানি ধর্ম বা দার্শনিক গ্রন্থ কিছুক্ষণ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেই তাঁহাকে সেই রোগ যন্ত্রণা বা চিন্তার কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইতে দেখা যাইত।

এই সময় হইতে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। আমাদের আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান যে বিদেশীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞান হইতে কোনও অংশে ন্যূন নহে বরং অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। এই সত্য আবিষ্কার করিতে তিনি অক্লান্ত ভাবে পরিশ্রম করেন। এই পরিশ্রম ও অসীম অধ্যবসায়ের প্রথম রত্নকণিকা তাঁহার 'আর্য ধাত্রীবিদ্যা'। ইহা ইংরেজী ১৯০০ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। গভীর গবেষণাপূর্ণ এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ্ সুধীমাত্রেই স্বীকার করিয়াছেন। ইহা বাস্তবিকই আয়ুর্বেদের গৌরব স্বরূপ। ইহার পরবর্তী বৎসর

তাঁহার সুবিখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধে দ্বিতীয় পুস্তক "Punsavana or the causing the Birth of a Male child" মুদ্রিত হয়। এই পুস্তক প্রণয়নকালে তিনি একদিন কলিকাতায় আসিয়া পরমশ্রদ্ধাস্পদ জগৎবিখ্যাত পণ্ডিত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলেন, "Caesarean section" (বিপন্ন গর্ভিনীর উদর কাটিয়া সন্তান বহিঃস্করণ যাহা য়ুরোপীয় বিজ্ঞানবিদ চিকিৎসকগণ এক আশ্চর্য অভিনব অস্ত্রচিকিৎসা বলিয়া পরিঘোষণা করেন) আমাদের আয়ুর্বেদ শাস্ত্রেও তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

ডাক্তার সরকার মহাশয় তখন রোগী দেখিবার জন্য বাহির হইতেছিলেন। তিনি কিছু বিরক্তিভাবে বলিলেন, "এখন আমি কিছু শুনিতে পারিব না অন্য সময়ে আসিবেন।" ডাক্তার সরকার মহাশয় সম্বন্ধে গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথ পূর্বে কিছু কিছু অবগত ছিলেন। তিনি জানিতেন, লোকে বাহিরের ব্যবহারে মনে করে, তিনি কিঞ্চিৎ রূঢ়ভাষী, কিন্তু যিনি একবার তাঁহার স্নেহের গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, তিনিই দেখিবেন যেন একটি সরল শিশু, বিজ্ঞানের মুকুট মাথায় দিয়া বসিয়া আছেন। তাই তিনি ডাক্তার সরকার মহাশয়ের রুক্ষভাষা শ্রবণে একটুও ক্ষুণ্ণ না হইয়া, নম্রভাবে বলিলেন, 'আমি আপনার আদেশমত অন্য সময়েই আসিব। কিন্তু উপস্থিত আপনাকে এবিষয়ে একটি মাত্র কথা শুনিতে হইবে।" ইহা শ্রবণে ডাক্তার সরকার পুনরায় কিঞ্চিৎ উগ্রভাবে বলিলেন, "বল-কি বলিবে বল, শুনি।" তখন গোস্বামী মহাশয় সেই বিষয়ে শাস্ত্রোদ্ধৃত একটি সূত্র পাঠ করিয়া তাঁহাকে বুঝাইলেন, ইহা বর্তমান Caesarean section এরই সমানার্থ বোধক সূত্র। বিজ্ঞান বীরের চিন্তাস্রোত তদ্দণ্ডেই অন্য পথে প্রধাবিত হইল। তিনি সেই মুহুর্ত্তেই গোস্বামী মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া তাঁহার সুবৃহৎ লাইব্রেরী গৃহে প্রবেশ করিলেন। সে বেলা আর রোগী দেখিতে যাওয়া হইল না। তিন ঘণ্টা গ্রন্থের পর গ্রন্থ মিলাইয়া যখন গোস্বামী মহাশয়ের কথার সত্যতা উপলব্ধি করিলেন, তখন স্নেহ সূচক স্বরে বলিলেন, "তুমি বাস্তবিকই একটি মহৎ জিনিষ আবিষ্কার করিয়াছ। তোমার পুস্তক বর্তমান মাস হইতেই আমার পত্রিকায় (The Calcutta Journal of Me dicine) প্রকাশিত হইবে। এবং আমি মনে করি, ইহার প্রত্যেক লাইন আমেরিকা ও য়ুরোপের বিজ্ঞানবিদগণ মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন। তুমি কলকাতায় আসিয়া আয়ুর্বেদের প্রকৃত উন্নতির জন্য যত্নবান হও। আমি সাধ্যমত তোমাকে এ বিষয়ে সাহায্য করিব। ডাক্তার সরকারের কথা সত্যে পরিণত হইয়াছিল। গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথের "Punsavana" সম্বন্ধে আমেরিকা ও জার্ম্মান দেশীয় মাসিক পত্রিকায় অতি উচ্চভাবে প্রশংসিত হইয়াছিল। আমাদের দেশীয় সুধিবৃন্দের

মধ্যেও অনেকেই ইহাকে অতি উচ্চে স্থান দান করিয়াছেন। ইদানিন্তন অনেক গ্রন্থকার এই সম্বন্ধে গোস্বামী মহাশয়ের "Punsavana" কে প্রমাণ গ্রন্থ স্বরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। ডাক্তার সরকার মহাশয় এই পুস্তকখানির প্রথম সংস্করণ নিজ ব্যায়ে ছাপাইয়া দেন। তাঁহার আদেশ মত গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথ কুমারখালি পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আগমন করেন। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের বৈজ্ঞানিকতা উপলব্ধি করিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসাতেও অত্যন্ত শ্রদ্ধান্বিত হইয়াছিলেন। এইজন্য কলিকাতা আগমনের ৩/৪ বৎসর পূর্ব হইতেই ডাক্তারী চিকিৎসার পরিবর্তে আয়ুর্বেদীয় মতে চিকিৎসা করিতে থাকেন। সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে কবিরাজ সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীই মেডিকেল কলেজের গ্রাজুয়েটরূপে সর্ব প্রথমে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক ছিলেন। আজকাল আমাদের দেশে পাশ্চাত্য ও প্রতীচ্য উভয়বিধ চিকিৎসা বিজ্ঞান সুদক্ষ কবিরাজ বৃন্দের সম্মান বৃদ্ধি যথেষ্ট পরিসরতা লাভ করিলেও, গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথ এই পথের প্রথম পথিক বলিয়া তাঁহাকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করিয়া, এই পথে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিবেন। এসম্বন্ধে তৎকালে বসুমতী পত্রিকায় সুপ্রসিদ্ধ 'ভারতবর্ষের' বর্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে ইহা সম্যগ্ বোধগম্য হইবে।" "চিকিৎসা কার্যে দীর্ঘকাল ব্যাপী অভিজ্ঞতা ও সুযশের সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারী ও কবিরাজী শাস্ত্রে প্রকৃত ভূয়োদর্শন যদি বাস্তবিকই বর্তমান সময়ের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু হয়, তাহা হইলে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকরূপে কবিরাজ সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীই এদেশে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান সহানুভূতি পাইবার যোগ্য।" —বসুমতী।

অতঃপর কবিরাজ সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতায় আগমন করিয়া আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা ও তাহার উন্নতির জন্য প্রবৃত্ত হয়েন। তিনি ডাক্তার সরকারের সহিত মিলিত হইয়া আয়ুর্বেদ সম্বন্ধে গভীর গবেষণা আরম্ভ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, ৩/৪ বৎসরের মধ্যেই এই বিজ্ঞানভাষ্কর অস্তমিত হয়েন। সেইজন্য কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় তাঁহার সহিত বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বেশী দিন অতিবাহিত করিবার অবসর প্রাপ্ত হয়েন নাই। গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথের প্রতি তাঁহার এতদূর বিশ্বাস হইয়াছিল যে, স্বর্গারোহণের একদিন পূর্বেও আয়ুর্বেদ মতে তাঁহার চিকিৎসা করিবার জন্য কবিরাজ সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী মহাশয়কে আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎকালে নিজের অত্যন্ত অসুস্থতা বশতঃ তিনি উপস্থিত হইতে পারেন নাই। ইহার পর কবিরাজ সুরেন্দ্রনাথ একে একে তাঁহার ত্রিধাতু বা বাতপিত্ত কফ তত্ত্ব (১৯০১), "বস্তিগত বিকার" (১৯১৬) Problem of life here and here after

or the science of Ether প্রভৃতি চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও দার্শনিক গবেষণাপূর্ণ মৌলিক পুস্তক সকল প্রকাশিত করেন। তাঁহার ত্রিধাতু নামক পুস্তক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আয়ুর্বেদের সর্বপ্রধান জ্ঞাতব্য বিষয় বায়ু, পিত্ত ও কফ সম্বন্ধে এযাবৎ যে ভ্রান্তিপূর্ণ ধারণা সাধারণ্যে প্রচলিত ছিল, তাহা অপনোদন করিয়া কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়ই সর্বপ্রথম তাহার বিজ্ঞান সম্মত যথার্থ অর্থ প্রতিপন্ন করেন। বর্তমানে আয়ুর্বেদীয় বিষয়ক ইংরাজী বা অপর ভাষায় যে সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে, তাহার অধিকাংশ পুস্তকেই বাত, পিত্ত, কফ বিষয়ের বর্ণনা কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়ের উক্তিরই প্রতিধ্বনি মাত্র। অনেক গ্রন্থকার এ বিষয়টি যে কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়ের পুস্তক হইতে গৃহীত, ইহা অনেক স্থলে তাঁহাদের গ্রন্থে স্পষ্টই উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত Science of Ether পাঠ করিয়া স্বদেশের ও বিদেশের অনেক স্বনামধন্য পণ্ডিত মণ্ডলী ইহাকে একখানি অতি উচ্চ বিজ্ঞান ও দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্র যে কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিল কবিরাজ সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার এই গ্রন্থে তাহা সম্যকরূপে দেখাইতে সক্ষম হইয়াছেন। বহু সমালোচনার মধ্যে কেবল মাত্র লণ্ডনের সুপ্রসিদ্ধ Royal colonial Institute Journal South Africa স্থ Grey Institute এর সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক Bryant সাহেব প্রভৃতির ২/১ টি সমালোচনা মাত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি, যাহা হইতে কবিরাজ সুরেন্দ্রনাথের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের যৎকিঞ্চিত পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে।

"It shows the author to be a man of wide reading of both Eastern and western philosophy and science and he shows clearly enough that many of the fundamental doctrines of the modern science, evolution, conservation of matter and force, atomic theory, have been shadowed forth more or less clearly by the profound thinkers of India. Their purely deductive reasoning has deductive in many cases led to precisely similar conclusions as the in inductive system of European ...

আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ উন্নতি বিধান করিতে হইলে আয়ুর্বেদীয় কলেজ ও হসপিট্যালের পরিস্থাপনা বিশেষ প্রয়োজন চিন্তা করিয়া কবিরাজ সুরেন্দ্রনাথ ১৯০৫ সালে স্বীয় উদ্যম চেষ্টা ও অর্থব্যয়ে কলিকাতা শহরে "The calcutta Ayurvedic Institution and Pharmacy" নামে একটি বিদ্যালয় ও ঔষধালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়টি যাহাতে সর্বসাধারণের সম্পত্তিরূপে গণ্য হইয়া দিন দিন উন্নতি লাভ করে, তাহার জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন।

এই বিদ্যালয়ে কলিকাতার তৎসময়ের প্রায় সমস্ত কবিরাজ মণ্ডলী কয়েকটি সভায় একত্রিত হইয়া যাহাতে বিদ্যালয় ও ঔষধালয়টি চিরস্থায়ী ও সাধারণের ব্যয়ে পরিচালিত হয়, তদ্বিষয়ে মতামত স্থির করেন। তাঁহারা এবিষয়ে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর মতভেদ হওয়ায়, তাঁহারা নিরস্ত হয়েন। তখন পুনরায় কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় পূর্ব্ববৎ এই বিদ্যালয়টির সমগ্র ব্যয় ভার গ্রহণ করিয়া নিজ সাধ্যমত ৪/৫ বৎসর যাবৎ পরিচালিত করিয়াছিলেন। এইরূপ একটি বৃহৎ কার্যে দশজনের মিলিত সাহায্য ব্যতীত কখনও পরিচালিত হইতে পারে না। ইহারও অবস্থা তাহাই ঘটিয়াছিল। কিন্তু ইহার ফলে গোস্বামী মহাশয়কে ঋণগ্রস্থ হইতে ও বহু ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল। ইহার পর হইতেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া যায়। তিনি ডায়াবিটিস্ রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। ইহারই ফলে তিনি দিন দিন দুর্বল ও শয্যাগত হইয়া পড়েন। কিন্তু আয়ুর্বেদের সেবাকার্যে তিনি কোন দিনের জন্যও বিরত হইতে পারেন নাই। তিনি বলিতেন, "স্বদেশের দরিদ্র সন্তান যাহারা—তাহাদের পক্ষে পুস্তকের দ্বারা দেশের সেবাকার্য যেমন সম্ভব, এমন আর কিছুতেই নহে।" অসুখের জন্য তিনি বলিতেন, "ইহা শ্রীভগবানেরই শুভ ইচ্ছা। আমি সুস্থদেহে থাকিলে অন্যান্য কার্যে ঘুরিয়া বেড়াইতাম—লেখাপড়া করিবার অবসর পাইতাম না—কিন্তু এখন তাহার সুন্দর অবসর পাইয়াছি। ভগবানের ইচ্ছা, আমি এইরূপ ভাবেই দেশের ও আয়ুর্বেদের সেবা করি।" তিনি আয়ুর্বেদের উন্নতির জন্য যে পরিমাণে ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন—আমাদের বিশ্বাস চিরদিন সমগ্র আয়ুর্বেদ সম্প্রদায়ের সহৃদয় উদারচেতা ব্যক্তিমাত্রেই তাহার জন্য কবিরাজ সুরেন্দ্রনাথের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে বিরত থাকিবেন না।

আয়ুর্বেদ ও বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ ব্যতীত তিনি অনেকগুলি সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে তাঁহার "স্নেহময়ী", "উন্মাদিনী", "স্বদেশ ও সরমা" মারবার প্রসুন, রূপ সনাতন, প্রেমাশ্রু, প্রেমাঞ্জলি, পরিচয়, পুষ্পাঞ্জলি আশা ও আলো প্রভৃতি পুস্তক বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথ যাহা যখন লিখিতেন তখন মনে করিতেন, ইহার দ্বারা তিনি বঙ্গ সাহিত্য জননীর পবিত্র অঙ্গ শোভিত করিতেছেন। তাই তাঁহার লেখার অক্ষরে অক্ষরে পবিত্রতা সংলিপ্ত দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার লিখিত গ্রন্থ সকলের মধ্যে এমন পৃষ্ঠা একখানিও পাওয়া যায় না, যাহা পাঠে শ্রীভগবানের কথা স্মরণ করাইয়া না দেয়। তাঁহার পুস্তক সম্বন্ধে আমরা নিজের কথা বিশেষ কিছু না বলিয়া সাধারণের অবগতির জন্য কেবলমাত্র কয়েকটি অভিমত নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। —রায় বাহাদুর ঁকালিপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়

লিখিয়াছিলেন, "আপনার লেখা গঙ্গাজলের ন্যায় পবিত্র ইহাও আজিকার বঙ্গসাহিত্যে একটি অসামান্য সম্পদ।" তাঁহার প্রেমাশ্রু প্রভৃতি কবিতাগ্রন্থ পাঠ করিয়া "বসুমতী" লিখিয়াছিলেন,—"এমন প্রাণস্পর্শী—এমন সরল সুন্দর—গঙ্গাজলের ন্যায় এমন পবিত্র কবিতা, বাঙ্গলা সাহিত্যে বড় বেশী বাহির হয় না। বাহির হইলে পাপ তাপক্লিষ্ট নরনারী অনেক সান্ত্বনা লাভ করিত।"

কাশী হইতে জনৈক সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব মহাত্মা কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়ের "প্রেমাশ্রু" ও "প্রেমাঞ্জলি" পাঠ করিয়া কতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি কেবলমাত্র গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্যে কাশী হইতে কুমারখালী আগমন করেন। গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথ তৎকালে কিছুদিনের জন্য চিকিৎসার অনুরোধে মফঃস্বলে গিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার সহিত দেখা হয় নাই। উক্ত সাধু মহাত্মা যে পত্র রাখিয়া গিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল;—

"বাবা আমি অপরিচিত ফকীর বাঙ্গালী, আজ ৫৭ বৎসর হইল সংসারত্যাগী। কাশীতে আসিয়া তোমার লিখিত "প্রেমাঞ্জলি" ও "প্রেমাশ্রু" পড়িয়া অশ্রুত্যাগ করি। বাঙ্গালী যে আবার অশ্রু মোচন করিবে, একীভূত হইবে, সে আমি, না আমি সে বুঝিবে—তাহা ভাবি নাই। যে পারিয়াছে, সে বড় কম পদার্থ নহে। তাই একবার তাহার দৃষ্টিলাভ ও সঙ্গলাভ করিতে বাবার নাম করিয়া, রাধারাণীর রজঃ মাখিয়া, জয় সচ্চিদানন্দ ফুৎকার করিয়া দৌড়িলাম। কিন্তু বাবা তোমার দর্শন না পাইয়া সে আশা ফলবতী হইল না।"

সিরাজদৌল্লা প্রণেতা শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় লিখিয়াছিলেন, "প্রেমাশ্রু" পড়িলাম। ইহার প্রতি অশ্রুকণা মুক্তা ফলের ন্যায় স্নিগ্ধ সৌন্দর্যে আত্মমহিমায় আপনি উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে। গোস্বামী মহাশয়ের "স্নেহময়ী" সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় "বসুমতী" পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন,—"যিনি sensational কিছু চাহেন তিনি স্নেহময়ী পড়িবেন না। যিনি শান্তি লাভ করিতে চান প্রকৃত শিক্ষালাভ করিতে চান, মনুষ্যত্বের অধিকারী হইতে চান তিনিই এই পুস্তকখানি পাঠ করিবেন। আমরা উচ্চহৃদয় প্রগাঢ় ধর্মভাব অকৃত্রিম দেশহিতৈষণার শতমুখে প্রশংসা করি। "স্নেহময়ী" প্রত্যেক স্নেহময়ী মাতা, ভগ্নী, কন্যা, সহধর্মিণীর দৈনিক পাঠ্য হওয়া উচিৎ।" দেশপূজ্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় তাঁহার 'সঞ্জীবনীতে" লিখিয়াছেন, 'স্নেহময়ী" একখানি উপন্যাস। এমন উপন্যাস বাঙ্গলা ভাষায় আর কমই প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিতে করিতে আমাদের রোমাঞ্চ হইয়াছিল। শ্রীশচন্দ্রের চরিত্র কি সুন্দর। তাঁহার পরসেবা ও সেবকদল গঠনের কথা পাঠ করিয়া ভাবিয়াছি, 'হায় আমরা কেন তাঁহার মত হইলাম না। তাই বঙ্গবাসি

এই সময়ে এই গ্রন্থখানি পাঠকর, আর "শরচ্চন্দ্র" ও "সুধা" হইয়া স্বদেশের সেবা কর।" গোস্বামী মহাশয়ের অন্যান্য পুস্তক সম্বন্ধেও এই প্রকার অভিমত। আমরা বাহুল্যভয়ে আর বেশী উদ্ধৃত করিলাম না। কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছিলেন ও বুঝিয়াছিলেন—

"সাহিত্যের গঙ্গাজলে, প্রেমভক্তি শতদলে
পূজে যেই জননীর পবিত্র চরণ।
তারই কীর্ত্তি তারই যশঃ, তাহারি কাব্যের রস,
মৃতপ্রাণে ঢেলে দেয় অমৃতের প্রস্রবণ ॥"

আমাদেরও বিশ্বাস—তাঁহার এ উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। তাঁহার রচিত গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্য ভাণ্ডারের বহুমূল্য রত্নস্বরূপ চিরদিন বিদ্যমান থাকিবে।

সুসিদ্ধান্তপূর্ণ আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থ প্রচার দ্বারা আয়ুর্বেদের গৌরববৃদ্ধি ও শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রবর্তিত বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার ও সাধনা এই দুইটিই গোস্বামী মহাশয়ের জীবনের প্রধান লক্ষ্যছিল। তিনি বহু চেষ্টা, পরিশ্রমও অর্থব্যয়ে শ্রীমদবৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিরচিত ও এযাবৎ অপ্রকাশিত—'শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয়' নামক গ্রন্থ, প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি হইতে সংগ্রহ করিয়া ১৯১৬ সালে সর্বপ্রথম মুদ্রিত করেন 'গোস্বামী মহাশয়ের লিখিত এই পুস্তকের সুদীর্ঘ ভূমিকা পাঠ করিলে—বৈষ্ণবজনমাত্রেই অতীব প্রীত হইবেন সন্দেহ নাই। এতদ্ব্যতীত শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক প্রভৃতি কয়েকখানি অমূল্য গ্রন্থ তিনি পদ্যানুবাদ ও টীকাদি সহ প্রকাশিত করেন।

অথর্ববেদ, আয়ুর্বেদের মূল। আয়ুর্বেদের সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে অথর্ববেদের অধ্যয়ন করা বিশেষ প্রয়োজন। ইহা চিন্তা করিয়া কবিরাজ সুরেন্দ্রনাথ অসুস্থতা সত্বেও পাঁচ ছয় বৎসর অহর্নিশ অক্লান্ত ভাবে পরিশ্রম করিয়া সমগ্র অথর্ববেদ ও তৎসহ ঋগ্বেদ অধ্যয়ন করেন। কেবল অধ্যয়ন করিয়াই তিনি সন্তোষ লাভ করিতে পারেন নাই। তাই উক্ত বেদদ্বয়ের টীকা সহ অনুবাদ ও মুদ্রণ কার্যে প্রবৃত্ত হয়েন। এইকার্য অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ বিধায়—এই অনুবাদ কেবল আংশিক মুদ্রিত হইয়াছিল মাত্র। তাঁহার বৈদিক সংস্কৃতাভিজ্ঞতা ও বিশুদ্ধ অনুবাদ পরিদর্শন করিয়া মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম.এ; সি.আই.ই; মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ ও মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শিবচন্দ্র সার্বভৌম প্রভৃতি বঙ্গের স্বনাম ধন্য পণ্ডিতগণ যে সকল অভিমত পত্র প্রদান করেন, তাহা পাঠ করিলে গোস্বামী মহাশয়ের বেদজ্ঞতা বিষয়ে কথঞ্চিৎ পরিচয়

পাওয়া যায়। আমরা নিম্নে এইরূপ কয়েকখানি পত্রের সারাংশ মাত্র সংক্ষেপে উল্লেখ করিলাম।

বর্তমানে অনেক অনুবাদকের আবির্ভাব হইয়াছে। সেই সকল অনুবাদকের প্রণীত অনুবাদ, অনেকস্থলে শব্দানুবাদ মাত্র—অর্থের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু গোস্বামী মহোদয় প্রণীত অনুবাদ শব্দানুবাদ নহে। সম্পূর্ণ অর্থানুবাদ। এই অনুবাদ দ্বারা বেদের অর্থ সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে।......শ্রীকামাখ্যা নাথ তর্কবাগীশ। ....গোস্বামী মহাশয় কৃত বঙ্গানুবাদ বিশুদ্ধ ও অতি সরল। পাঠ করিলে উক্ত বেদের মর্ম্মার্থের সহজেই বোধ হইতে পারে। আমি বঙ্গানুবাদকারীর পরিশ্রম অধ্যবসায় নৈপুণ্যের ও বৈদিক সংস্কৃতাভিজ্ঞতা দেখিয়া বিশেষ সন্তোষ লাভ করিলাম।"......—শ্রীশিবচন্দ্র সার্বভৌম।

গোস্বামী মহাশয় তাঁহার বেদের অনুবাদ সম্বন্ধে এই প্রকার অনেক অভিমত পত্র পাইয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে—তাঁহার পাণ্ডিত্যে অতীব প্রীত হইয়া উক্ত পণ্ডিত মণ্ডলী কবিরাজ সুরেন্দ্রনাথকে 'আয়ুর্বেদ বিদ্যাতীর্থ' ও "বিদ্যাবিনোদ" উপাধি প্রদান করেন। ইহার পর ১৯১৬ সালে ভারত ধর্ম্মমহামণ্ডল হইতে গোস্বামী মহাশয়কে "আয়ুর্বেদাচার্য" উপাধি প্রদান করা হয়। তিনি নিজে কখনও স্বীয় গৌরব বর্দ্ধনার্থে উপাধি প্রভৃতির জন্য কোনদিন চেষ্টা করেন নাই। স্বইচ্ছায় প্রণোদিত হইয়া কেহ কোনও অভিমত পত্র বা উপাধি প্রভৃতি প্রদান করিলে তিনি বিনীতভাবে গ্রহণ করিতেন মাত্র। ১৯১৮ সাল হইতে তাঁহার স্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে ভগ্ন হইয়া যায়। তিনি নিজেই বেশ বুঝিয়া ছিলেন—তাঁহার ভগ্ন দেহের দ্বারা তাঁহার নীরব কর্ম্মের আর সুবিধা হইবে না। সে দেহের জীর্ণসংস্কারের জন্য অতি শীঘ্রই তাঁহাকে প্রস্থান করিতে হইবে। আয়ুর্বেদের সম্বন্ধে আরও অনেক তত্ত্বগ্রন্থ প্রচার করিবার উদ্দেশ্য থাকায় এই দারুণ অসুস্থতার মধ্যেও তিনি অহর্নিশ পরিশ্রম করিয়া—এক সঙ্গে কতকগুলি পুস্তক রচিত ও প্রকাশিত করিবার চেষ্টা করেন। বিলম্ব হইলে আর সেগুলি সমাপ্ত হইবে না। এইরূপ ধারণার বশবর্তী হইয়া এক সময়ে একখানি পুস্তকের পরিবর্তে তিনি একযোগেই নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশের চেষ্টা করেন। সুতরাং কোন পুস্তকের পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ ভাবে লেখা হয় নাই। সেইজন্য নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির কতকাংশ মুদ্রিত বা অমুদ্রিত ভাবেই রহিয়া গিয়াছে,—যথা—"The Biology of the Hindus" "বিজ্ঞান প্রবন্ধ", "প্রাণবিদ্যা ও আয়ুর্বেদ", "অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদের ইতিহাস", "মসূরিকাধিকার", "যক্ষ্মাধিকার", "কুমারতন্ত্র", "ঋগ্বেদানুবাদ" ও "অথর্ববেদানুবাদ" প্রভৃতি আরও কতকগুলি গ্রন্থ।

দিন দিন গোস্বামী মহাশয় ক্রমেই অধিকতর পীড়িত হইয়া পড়েন, তিনি বাটি

হইতে আর বেশী বাহিরে যাইতে পারিতেন না। কিন্তু এই অবস্থায় তাঁহার অধ্যয়ন স্পৃহা একটুও কমে নাই। শয্যার চতুঃপার্শ্বে পুস্তকের স্তূপ সাজাইয়া তিনি শয়ন বা সেই শয্যায় কখন উপবেশন করিয়া থাকিতেন। যখনই কেহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিত—তখন প্রায় কখনও কখনও এক খানি গ্রন্থ বা লেখনীর সহিত তাঁহার হস্তকে কেহ নির্লিপ্ত থাকিতে দেখে নাই। তাঁহাকে দেখিলে সাধারণতঃ লোকে সুস্থ বলিয়াই মনে করিত। এই সময়ে তাঁহার চিকিৎসা ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্থ সকল ভারতের নানাস্থানে সুধীবৃন্দের নিকট বিশেষ আদৃত হইতে থাকে। অনেকেই গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। দেশপূজ্য মাননীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদন মোহন মালব্য মহোদয়—এই সময় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ুর্বেদ বিভাগের সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানের ভার কবিরাজ সুরেন্দ্রনাথকে গ্রহণ করিবার জন্য বলিতে আসেন। কিন্তু মালব্য মহোদয়—গোস্বামী মহাশয়ের শারীরিক অবস্থার বিষয় দর্শন ও শ্রবণ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলেন ও তাঁহার আরোগ্যের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ইহার কয়েকমাস পরেই লাহোর শহরের নিখিল ভারতবর্ষীয় বৈদ্য সম্মেলনী হইতে গোস্বামী মহাশয়কে সভাপতিত্ব গ্রহণ করিবার জন্য তার প্রেরিত হয়। কিন্তু সে সময়ে তিনি প্রায় শয্যাগত থাকায় উক্ত পদ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। কেবল "আয়ুর্বেদে ম্যালেরিয়া তত্ত্ব" নামে একটি ইংরাজী ভাষায় লিখিত সারগর্ভ উৎকৃষ্ট প্রবন্ধমাত্র সেই রুগ্নাবস্থাতেই লিখিয়া সম্মেলনীতে পঠিত হইবার জন্য প্রেরণ করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে অসুস্থতার মধ্য দিয়া তাঁহার শেষ জীবনটির প্রায় সমুদয় অংশই অতিবাহিত হওয়ায় বর্তমান আয়ুর্বেদের পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

১৯১৯ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি সাংঘাতিকরূপে পীড়িত হইয়া পড়েন। এই অবস্থায় তিনি কিঞ্চিদধিক একমাস কাল জীবিত ছিলেন। এই সময়ে সাংসারিক বা অন্য বিষয়ক যাবতীয় চিন্তা সম্পূর্ণ পরিহার করিয়া কেবল একমাত্র শ্রীভগবদচরণারবিন্দে চিত্তকে আকৃষ্ট করেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রেমময় নাম ও লীলাদি শ্রবণ ব্যতীত আর কিছুই পছন্দ করিতেন না। 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত', 'ভক্তমাল' প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার নিকট পাঠ করিতে বলিতেন ও তাহা শ্রবণ করিয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতেন। ব্যাধির যন্ত্রণা অসহ্য হইলেও তিনি অত্যন্ত ধৈর্যাবলম্বন করিয়া প্রশান্ত মনে তাহা সহ্য করিতেন। সময় সময়ে দেহ গেহাদির জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যাইত ও সেই সময়ে শ্রীবৃন্দাবন ধামে শ্রীভগবৎ লীলাদির কথা যেন স্বপ্নঘোরে বলিতেন; ১৩ ই ফেব্রয়ারীর প্রাতে, তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত সুস্থ বলিয়া বোধ হয়।

কিন্তু তিনি কেবল সেই দিনই জানাইলেন—আজ তাঁহার মহাপ্রস্থানের দিন। বেলা সাড়ে পাঁচটার সময় কিঞ্চিৎ ব্যস্তভাবে উঠিয়া শয্যার উপর যোগাসনের ন্যায় বসিলেন ও একখানি শ্লেটে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গোবিন্দ গোপাল হরে এই নাম কয়েকটি লিখিয়া কয়েক মিনিট পরেই দুই একবার কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিয়া সেইরূপ উপবিষ্ট ভাবেই দেহত্যাগ করিলেন—মৃত্যুর পরে তাঁহার বদন মণ্ডলে স্নিগ্ধ শান্ত ও একটি পবিত্রভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস শ্রীভগবৎ করুণার স্নিগ্ধালোকে নিজ জীবন বিকশিত করিয়া—নিষ্কলঙ্ক ও আদর্শ চরিত্রের যথার্থ পরিচয় প্রদান করিয়া, ধর্ম ও কর্ম যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া, ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার দয়াময়ের অনন্ত দয়ার রাজ্যে প্রস্থান করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার অকৃত্রিম ভক্তকে নিজ শ্রীচরণতলে আশ্রয় প্রদান করুন। আমরা তাঁহার পবিত্র স্মৃতি স্মরণ করিয়া আজ দুই বিন্দু বিষাদের অশ্রুর সহিত এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

ফুটনোট ঃ ইতিপূর্বে—এডুকেশন গেজেট ও জন্মভূমি পত্রিকায় প্রকাশিত। ১৩২৮ সাল—২৭ বর্ষ ৭/৮ সংখ্যা (কার্তিক/অগ্রহায়ণ সংখ্যা)

২। অনুজের অনুভবে অগ্রজ

শ্রীরমানাথ গোস্বামী

শ্রীমান কিশোররায় গোস্বামীর (দেবুর) আগ্রহাতিশয্যে পরমপূজনীয় নিত্যধামগত মদীয় ইষ্টদেব ও অগ্রজ প্রভুপাদ শ্রীল কানুপ্রিয় গোস্বামী প্রভুর সান্নিধ্যে শিশুকাল হইতে তাঁহার শ্রীধাম নবদ্বীপ আসিয়া শ্রীশ্রীগৌরকিশোর শান্তিকুঞ্জ আশ্রমে ভজনে নিবিষ্ট হইবার পূর্ব পর্যন্ত পরমসৌভাগ্য বশতঃ যে সময় অতিবাহিত হইয়াছিল—স্মৃতিচারণ করিয়া তাহার কিঞ্চিৎ মাত্র লিখিত হইতেছে। বর্তমানে আমার স্মরণশক্তি অতিশয় নিস্তেজ—সুতরাং অনেক স্থলে অনেক ভুল হইবার সম্ভাবনা—তাছাড়া সন ও তারিখ প্রায় সমস্তই স্মরণ হইতেছে না। এই অবস্থায় কিছু লিপিবদ্ধ করা অনুচিত—তথাপি দেবুর আগ্রহে যাহা যাহা স্মরণে আসিতেছে তাহা লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছি। শ্রীশ্রীগৌররায় হরির ও শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপা ভরসা করিয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিব, ভুল ও দোষ যেন ক্ষমা করা হয়।

প্রথম পর্ব

জ্ঞানলাভ করে যে সব ঘটনা আমার মা ও দাদার (শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী) কাছ থেকে শুনেছিলাম, তার কিছু, আগে লেখা দরকার মনে করে এখানে লিখছি—যাতে আমাদের সাংসারিক জীবনের একটা ছবি ফুটে উঠতে পারে। কারণ আমার মৃত্যুর পর ঐ বিষয় কিছু জানা আর কারুর দ্বারা সম্ভব পর নয়। আমার সেজদাদা অবশ্য অনেক কিছু আমার চেয়ে জানেন। কিন্তু একটা সুদীর্ঘকাল দাদার সান্নিধ্যে আমি যখন কাটাই তখন তিনি অন্যত্র থাকায় সে সময়ের অনেক কিছু জানেন না—যেমন, দাদার নবদ্বীপে আসার পর আমি কর্মস্থলে থাকায় অনেক কিছুই জানিনা যা সেজদাদা ও পরে দেবু জানে। আমার পিতাঠাকুর নিত্যধামগত প্রভুপাদ শ্রীল সুরেন্দ্র নাথ গোস্বামী প্রভুর জন্মস্থান নদীয়া জেলার ভাজনঘাট গ্রামে ছিল। তিনি শৈশবে খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ভাজনঘাট স্কুল থেকে প্রাইমারী পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করে তিনি বারাসত গর্ভণমেন্ট স্কুলে তাঁহার শিক্ষা আরম্ভ করেন। Entrance (এন্ট্রান্স, অর্থাৎ এখনকার মাধ্যমিক) পাশ করে তিনি বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে B.A. (বি.এ.) পাশ করে কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ডাক্তারী শিক্ষালাভ করেন ও ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (B.A.L.M.S.) হয়ে ডাক্তারী চিকিৎসা আরম্ভ



নামবিজ্ঞানাচার্য প্রভুপাদ কানুপ্রিয়
গোস্বামী (কৈশোরে)

করেন—তখন অবিভক্ত বাংলাদেশের নদীয়া জেলার কুষ্ঠিয়া সাবডিভিশনের কুমারখালী গ্রামে। এইখানে তাঁর Extensive Practice (প্রচুর রোগী) হয়। এই সময় আমার দাদার বয়স প্রায় পাঁচ বৎসর। পিতাঠাকুর কয়েকবৎসর আয়ুর্বেদ নিজে নিজে অধ্যয়ন করেন ও ঐ শাস্ত্রে খুব জ্ঞানলাভ করেন। পরে ঘটনাচক্রে তিনি বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ের সংস্পর্শে আসেন ও তাঁহার অত্যন্ত আগ্রহাতিশয্যে কুমারখালীর বাস উঠিয়ে কলকাতায় এসে বাস করেন। সম্ভবতঃ দমদমে বাসা নিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ডাঃ সরকারের হঠাৎ মৃত্যুতে তাঁর সাহায্যে (চিকিৎসা বিষয়) হতে বঞ্চিত হন। তিনি নিজের চেষ্টায় চিকিৎসা ক্ষেত্রে শীঘ্রই বেশ সুনাম অর্জন করেন এবং ডাক্তারীর সঙ্গে সঙ্গে আয়ুর্বেদ চিকিৎসাও আরম্ভ করেন। তাঁর মেডিকেল কলেজের সহপাঠী ছিলেন ডাঃ স্যার কেদারনাথ দাস, ডাঃ সুরেশ সর্বাধিকারী (বিখ্যাত শল্য চিকিৎসক), ডাঃ সুরেশ ভট্টাচার্য। ডাঃ সুন্দরী মোহন দাস ও ডাঃ স্যার নীলরতন সরকার (ইনি দুইবৎসরের জুনিয়র ছিলেন) ও আরও অনেকে। পিতাঠাকুর সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বপ্রথম ডাক্তারী পাশ করে কবিরাজ হয়েছিলেন। তিনি বিখ্যাত কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন মহাশয়ের সঙ্গে সর্বপ্রথম আয়ুর্বেদ কলেজ কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করেন। এই কলেজে আমার দাদা (শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী) আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করে পরে কবিরাজী চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করেন। প্রথমে পিতাঠাকুরের সঙ্গে পরে পিতাঠাকুরের পরলোকগমনের পর নিজে। ঐ সময়ে আমাদের একমাত্র আয়ের পথ ছিল তাঁহার কবিরাজী। পিতৃদেব দমদম নাগের বাজার থেকে বাগবাজার গঙ্গার ধারে, তারপর গ্রে ষ্ট্রীট ও কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের জংশনে একটি বাড়ীতে ও পরে ২৮ নং মানিকতলা ষ্ট্রীটে—বর্তমানে ছাতুবাবুর বাজারের কাছে যে বসা মাকালীর মন্দির বর্তমান আছে—তার উল্টো দিকে ঐ বাড়ী ছিল—বর্তমানে সেখানে এক বিরাট বাড়ী হয়েছে। এর কিছুপূর্বে আমার জন্ম হয়—আমার মাতুলালয়ে। আমার দাদা মহাশয় কলিকাতার একজন বিখ্যাত কবিরাজ ছিলেন। ৺কবিরাজ গোপীমোহন রায় মহাশয়ই আমার দাদামহাশয়—সিমলা কাঁসারী পাড়ায় তাঁহার প্রকাণ্ড তিনমহলা বাড়ী ছিল। পরে ঐ বাড়ির সামনের দুইমহলা ভেঙে নয়ারাস্তা বর্তমান উত্তর কলকাতার বিবেকানন্দ রোড তৈরী হয়। পিছনের অংশের আস্তাবলের কিয়দংশ এখনও বর্তমান আছে। ঐ মাতুলালয়ে আমাদের সকলেরই জন্ম হয়েছিল। মাতুলালয়ে দুর্গাপূজা, কালীপূজা, দোল প্রভৃতি উৎসব হোতো। ঐ সময় ও বিবাহাদিতে বাড়ীতে লোক ধরতোনা। আমার মা আমাকে ও আমার ছোট ভগ্নীকে নিয়ে পালকী করে মামার বাড়ীতে যেতেন। তখন কলকাতায় Taxi (ট্যাক্সি),

Bus (বাস), Rickshaw (রিক্‌শা) হয়নি। পূর্বে ঘোড়ায় টানা ট্রাম চলতো। ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া পাওয়া যেতো। তবে অল্পদূরত্বের জন্য পালকী সকলে ব্যবহার করত। মধ্যে মধ্যে দাদা মহাশয়ের গাড়ীও আমাদের নিয়ে যেতো। দাদা মামার বাড়ীতে সকলেরই খুব প্রিয় ছিলেন। আমার মাসীমারা সকলেই সপরিবারে উৎসবে আসতেন। তখন সমবয়সী ছেলেমেয়েদের খুব আনন্দ হোতো—মিলে মিশে খেলাধুলা করতো—যদিও আমার বয়স তখন ৪/৫ বৎসর। আমার মা বেশীদিন মামার বাড়ীতে অন্যান্য ভগ্নীদের মত থাকতেন না—অবশ্য আমাদের ঐ মানিকতলার বাড়ী মামার বাড়ীর কাছাকাছি ছিল। দাদার একটা বিশেষত্ব ছিল; তিনি অন্য সমবয়সীদের মত হৈ-চৈ পছন্দ করতেন না—একটু দূরত্ব বজায় রেখে চলতেন, কিন্তু সমবয়সীরা সকলে দাদাকে খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখতো—আর মামার বাড়ীর বড়রা তাঁকে খুব স্নেহ করতেন—প্রথমে তাঁর সুন্দর চেহারার জন্য ও তাঁর ঐ স্বতন্ত্রতার জন্য। এসব আমি আমার মার কাছে শুনেছি ও পরে জ্ঞান হলে নিজেও লক্ষ্য করেছি। দাদা শৈশবকাল থেকে আবার বাবার খুব কাছে কাছে থাকতেন ও তাঁকে সব বিষয়ে সাহায্য করতেন। এজন্য আমার পিতাঠাকুর তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। সংসারে কর্তব্যবোধ এত অল্পবয়স থেকে খুব কদাচিৎ দেখা যায়। শৈশবকাল থেকে তিনি আমাদের সকলকে খুব স্নেহের চোখে দেখতেন। আমার দাদার কাছ থেকে দুষ্টুমী করার জন্য কখনও মার খাওয়ার কথা মনে পড়েনা। তবে অন্যায় করলে তিনি খুব ভর্ৎসনা করতেন। সেইজন্য আমার বৃদ্ধবয়সেও আমি খুব সাবধানে চলতাম যাতে তাঁর বিরাগভাজন না হই। ২৮ নং মানিকতলা ষ্ট্রীটের (বর্তমান রামদুলাল সরকার ষ্ট্রীট) বাড়ী অল্প পরিসর হওয়ায় আমরা ৫২ নং বিডন ষ্ট্রীটের নূতন বাড়ী ভাড়া নিয়ে উঠে আসি। বর্তমানে সাধনা ঔষধালয় যে বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত ঐ বাড়ী। তবে তখন ঐ বাড়ীর ছাদে একটি রান্নাঘর ছিল। বর্তমানে করপোরেশন সেটা ভেঙ্গে দিয়েছে। ২৮ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীটের বাড়ীতে বাবা একটা Press (প্রেস) কিনেছিলেন—তাঁর বই ছাপাবার জন্য। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় ২৫/৩০ খানা বই লিখেছিলেন। দাদা ঐ প্রেসে Compose (কম্পোজ) করা থেকে প্রেসের সবরকম কাজ খুব ভাল করে শিখেছিলেন। তাঁর জীবিতকালে তাঁর যেসব গ্রন্থ ছাপা হয়েছে—তাতে তাঁর ছাপার বিষয় প্রখর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক প্রেসের কর্তৃপক্ষ তার জ্ঞানের উচ্চ প্রশংসা করতেন। এই বাড়ীতে বাবা তাঁর আয়ুর্বেদ কলেজের ছাত্রদের Anatomy (অ্যানাটমি বা শরীরতত্ত্ব বিজ্ঞান) পড়াবার সুবিধের জন্য একটা মরা মানুষের সম্পূর্ণ শরীর Skeleton (কঙ্কাল) কিনে কলেজ উঠে গেলে সেই কঙ্কালটা প্রেসের ঘরে টাঙ্গিয়ে

রেখে দিয়েছিলেন। প্রথম প্রথম আমাদের ঐ ঘরে যেতে খুব ভয় করত—পরে আর ভয় হোতোনা। যখন বাড়ী বদল করে ৫২ নং বিডন ষ্ট্রীটের বাড়ীতে আমরা যাই তখন দাদা ঐ কঙ্কালটি (Skeleton) আমার মামাতো ভাই কেষ্টদাদার এক ডাক্তার বন্ধুকে (বিবেকানন্দ রোডের মিত্র বাড়ীর ছেলে) বিনামূল্যে দিয়ে দেন। ঐ বাড়ীতে থাকতে বাবা একটা ঘোড়ার গাড়ী কেনেন—তাঁর রোগী দেখতে যাওয়ার সুবিধের জন্য। দাদার পছন্দ মত একটা সুন্দর কালো ঘোড়া কেনা হয়। খুব ভাল ও তেজী ঘোড়া—অসম্ভব জোরে ছুটতে পারতো। আমরা মধ্যে মধ্যে বাবার সঙ্গে ঐ গাড়ীতে করে রোগীদের বাড়ীতে যেতাম। দাদা সেটা পছন্দ করতেন না—কিন্তু বাবা বলতেন ওরা শিশু, বাড়ীতে সবসময় থাকে মাঝে মাঝে বাইরে বেড়িয়ে আসা ভাল। সুতরাং দাদা আর কিছু বলতেন না। তবে আমরা কখনও রোগীদের বাড়ীতে ঢুকিনি। অনেকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করতেন। বাবার রাত্রি জেগে পুস্তক পড়া ও লেখার জন্য শরীর খারাপ হয়। ডায়াবেটিস আক্রমণ করে। তাই তাঁর বন্ধু ডাক্তারদের পরামর্শে বাবা একটা ভাল বজরা (House Boat) চাচলের রাজার থেকে কিনেছিলেন। সেটা আমাদের দেশ ভাজনঘাটের ইচ্ছামতী নদীতে—ভাজনঘাট থেকে কিছু তফাতে টুঙ্গী নামে গ্রামের কাছে নোঙ্গর করে রাখা ছিল। বাবা, মা, সেজদাদা আমি ও আমার ছোট বোন মধ্যে মধ্যে সেখানে গিয়ে ২/১ মাস করে থাকতাম। নদীর ধারে অনেক গ্রামের রোগী বাবার কাছে আসতো-সেইজন্য পারের ওপর একটা পাতার ছাউনী দেওয়া বড় ঘর করা হয়েছিল—বাবা ঐখানে বসে রোগী দেখতেন ও ঔষধ দিতেন। রোগীর খুব ভীড় হতো। রাত্রে ঐ ঘাটে জেলেদের বড় বড় নৌকা থাকতো—কিন্তু লোক থাকতোনা—তারা গ্রামে গিয়ে থাকতো আবার বেশী রাত্রে ও সকালে মাছ ধরতে আসতো। আমরা নদীর ধারে চাষের জমিতে ও কাছেই একটা খুব বড় বিল ছিল সেখানে খেলা করে বেড়াতাম। চাষীরা আমাদের খুব ভালবাসতো ও অনেক তরিতরকারী দিত। বাবার সঙ্গে কলকাতায় ফিরে এলে দাদা সপ্তাহে একবার করে ২/৩ দিনের জন্য ঐ বজরায় গিয়ে থাকতেন ও রোগীদের চিকিৎসা করতেন। একবার দাদার সঙ্গে আমি গিয়েছিলাম। ২৮ নং মাণিকতলায় থাকার সময় কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে ২৭ নং বাড়ীর নীচে একটা বড় ঘর ভাড়া নিয়ে আমাদের একটা বড় কবিরাজী ঔষধের দোকান খোলা হয়—খুব up to date (জাকজমক) সাজানো গোছানো। একজন চাকর ও একজন Compounder (কম্পাউন্ডার) ছিল। যতীন ভূঁইঞা নামে একজন কম্পাউন্ডার ছিলেন খুব ভাল লোক ও আমাকে খুব ভাল বাসতেন। কয়েকটি কারণে ঐ Dispensary (ডিসপেনসারী ও ঔষধের দোকান) তুলে নিয়ে

গিয়ে ৫২ নং বিডন ষ্ট্রীটের বাড়ীর বর্তমানে যেখানে সাধনা ঔষধালয় আছে ঐ ঘরে করা হয়। বাড়ী ও ডিসপেনসারী একত্র হওয়ায় দেখাশোনার সুবিধা ছিল। ঐ ডিসপেনসারীর নাম ছিল 'ধন্বন্তরী ভৈষজ্য রত্নাগার'। বাবার কয়েকটি পেটেন্ট ঔষধ ছিল—তার খুব Sale (বিক্রয়) ছিল—বিশেষ করে মাদ্রাজের দিকে। বহুদিন পরেও ঐ ঔষধের Order (অর্ডার) এলে আমি ঐ ঔষধ পাঠাতাম। আমার পিসিমার ছেলেরা সকলে আমাদের সঙ্গে থাকতেন—বাবা তাঁদের ছোটবেলা থেকে মানুষ করেন—কারণ অল্প বয়সে আমার পিসেমশাই মারা যান। পিসিমা আমাদের বাড়ীতেই বেশী থাকতেন। ৫২ নং বিডন ষ্ট্রীটের বাড়ীতে প্রেস, গরু, গাড়ীঘোড়া ও কয়েকজন আত্মীয় ও পিসতুতো ভাইরা সমেত আমরা উঠে আসি। মাত্র কয়েক বৎসর যেতে না যেতেই বাবার খুব অসুখ করে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। কলে (কল অর্থাৎ রোগী বাড়ী থেকে ডাক্তারের ডাক আসা) যেতে পারতেন না। বাড়ীতেই রোগী দেখতেন। ১৯১৯ সালে বাবা পরলোকগমন করেন প্রায় ৫৫ বৎসর বয়সে। তখন আমার বয়স ৯/১০ বৎসর। বাবা আমায় Scottish Church Collegiate School (স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুল)'-এ ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন ঐ বাড়ীতে এসে। তার পূর্বে বাড়ীতে মাষ্টারের কাছে পড়তাম।

দ্বিতীয় পর্ব

বাবা যখন হঠাৎ মারা যান তখন দাদার বয়স বোধ হয় ২৬/২৭ বৎসর। ঐ বিরাট সংসারের সমস্ত ভার দাদার ওপর পড়ে। বাবা কিছু সঞ্চয় করে যাননি। এমন কি তাঁর পারলৌকিক কাজ দাদাকে ঋণ করে করতে হয়েছিল। তবে শ্রীশ্রীগৌররায়জীর কৃপায় সমস্ত ঋণই অচিরে শোধ হয়ে যায়। এই নূতন বাড়ীতে প্রথমে বাবা পরে দাদা শ্রীশ্রীগৌররায়জীর সেবা বিশেষ ভাবে আরম্ভ করেন। তাঁর আগে সেবা কিভাবে হোতো আমার কোন জ্ঞান নেই। একটা ঘটনা আমি মার কাছে পরে পিসিমা বা এরকম কারুর কাছে শুনেছিলাম। দাদাকে শৈশব কালে দেখতে খুব ভাল ছিল—এই জন্য মামার বাড়ীতে দাদার খুব আদর ছিল—অন্য সব নাতি-নাতনীদের চেয়ে। দাদামশাই ও দিদিমা তাঁকে খুব ভালবাসতেন। বাবার চতুর্দিকে খুব নাম ডাক হয়েছিল—তাই বৈদ্যবংশের বিখ্যাত ডি. গুপ্তদের বাড়ীর একজন বৃদ্ধা তাঁদের বাড়ীর একটি মেয়ের বিবাহের জন্য, দাদার সঙ্গে, বাবার কাছে এসেছিলেন—মাণিকতলার বাড়ীতে। বাবার সঙ্গে আলাপ করার পর—তিনি ছেলে কোথায় জিজ্ঞাসা করায় বাবা পাশের ঘর দেখিয়ে দেন। দাদা সব শুনেছিলেন—তাড়াতাড়ি জামাকাপড় পরে বেরুচ্ছিলেন—সেই সময় সেই বৃদ্ধা ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা

করেন—হ্যাঁ বাবা তুমিই কি ডাক্তার বাবুর ছেলে? দাদা সঙ্গে সঙ্গে বলেন—না, এইমাত্র ছেলে বেরিয়ে গেল। তখন বৃদ্ধা ভিতরে গিয়ে মা ও ঠাকুমার সঙ্গে দেখা করলেন দাদা ইত্যবসরে বেরিয়ে যান। পরে মা তাঁকে সঙ্গে করে ঐ ঘরে এসে দেখেন দাদা নেই। মা সব বুঝতে পারলেন। দাদার যে বিবাহে একদম ইচ্ছা নেই তিনি তা আগেই জানতেন। বৃদ্ধাকে বিবাহ প্রসঙ্গে পরে জানাবেন ছেলের মত নিয়ে বলে বিদায় করেন। ঐ মাণিকতলার বাড়ীতে অনেক আত্মীয় স্বজন থাকাতে বাড়ীতে পাচক ব্রাহ্মণ ছিল, মা ও পিসিমা সব যোগাড় দিতেন—ব্রাহ্মণ রান্না করতো। দাদার খাওয়ার বিষয় খুব খুঁতখুঁতে ভাব ছিল। ব্রাহ্মণের হাতে খেতে—তাই তাঁর ভাল করে খাওয়া হোতো না। এই কথা শুনে বাবা মাকে আলাদা তোলা উনুনে দাদার জন্য আলাদা রান্না করে দিতে বলেছিলেন। তখন থেকে দাদা তৃপ্তি করে খেতেন। ৫২ নং বিডন ষ্ট্রীটের বাড়ীতে বাবার খুব অসুখ বেড়ে স্নান, পূজা, খাওয়া বন্ধ হয়ে যেত। মা জোর করে নিয়ে গিয়ে খাওয়াতেন। আমি তখন স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুলে পড়ি। বিডন ষ্ট্রীটের রাস্তা পাথরের ও খোয়ার ছিল। ঐ রাস্তাটা পীচ দিয়ে তৈয়ারী করা যেদিন শেষ হোলো—সেই দিন সন্ধ্যার সময় বাবা সজ্ঞানে দেহরক্ষা করেন। এরপর দাদাকে খুব আর্থিক কষ্টের মধ্যে পড়তে হয়। খরচ কমাবার জন্য প্রেস বিক্রি করতে হয়। গাড়ী ও ঘোড়াও হাতছাড়া হয়। ঘোড়া ডাঃ অমিয় মাধব মল্লিক বিশিষ্ট হোমিও চিকিৎসক নিয়ে যান কিন্তু মূল্য দেননি। দাদাও মূল্যের বিষয় বলতে পারেননি। আত্মীয়রা সকলে চলে যান। ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস (যাঁর নামে সুন্দরী মোহন এভিনিউ) বাবার বন্ধু গাড়ীখানি ক্রয় করেন। জ্যেঠামহাশয়েরা আমাদের বাড়ীতে থাকতেন। হরিজীবনদা বার্ম্মা থেকে বদলী হয়ে এলে তাঁরা এখানে উঠেন ও পরে বাবার অসুখ যখন খুব বাড়াবাড়ি তখন জ্যেঠামহাশয় হরিঘোষ ষ্ট্রীটে একটি বাড়ী ভাড়া করে চলে যান। বাবার মৃত্যুর সময় তিনি আসেন নি। হরিজীবনদা তখন শিলচর শহরে বদলী হয়েছিলেন। এরপর মাকে আমার মেজদাদা (শ্রীদাম) ও বুড়ীকে বলাইদাদা বলাগড়ে নিয়ে যান। সেজদাদা মাজদীয়াতে কবিরাজী ব্যবসা আরম্ভ করেন মদনরায়ের সঙ্গে। পরে তিনি নিজেই করতেন। দাদা বাড়ীর একতলাটা রেখে বাড়ী ভাড়া দিয়ে (জ্যোতির্ম্ময় গোস্বামী) দেন। প্রথমে চারুজ্যেঠামহাশয় (চারু গোস্বামী) থুকুদার বাবা শিলং থেকে বদলী হয়ে এসে ঐ ভাড়া নেন। তবে তাদের বড় সংসার হওয়ায় তারা ডালিমতলা লেন বাড়ীভাড়া করে চলে যান। কিছুকাল নাগপুরে থেকে সুরেশরায় মহাশয়রা—তাঁর ভাইপো অতুলরায় ও তাঁর Family (পরিবার) সব ঐ বাড়ীতে উঠেন। অতুলরায় মশায়ের মেয়ের বিবাহের

জন্য। পরে তাঁরা চলে গেলে দাদা একজন মাড়োয়ারী ভদ্রলোক "আগরওলা" নামে একজনকে ভাড়া দেন। দাদা, আমি ও ভজা বলে একজন চাকর ছিল—আমরা নীচের তলায় থাকতাম ও উঠানে একটা হোগলা দেওয়া ঘরে—যেখানে প্রেস ছিল সেই ঘরে রান্না করে খেতাম। সকালে স্কুলে যাবার আগে ভজা উনুন ধরিয়ে দিলে আমি নিজের মত রান্না করে নিতাম। ভাতের মধ্যে আলুভাতে দিতাম আর ভাজা মুগ ডাল ন্যাকড়ায় করে বেঁধে ভাতে দিতাম। পরে নামিয়ে আলু খুন্তি দিয়ে কেটে আধখানা করে খোসা ছাড়িয়ে একটা প্যানেতে মাখন দিয়ে ও জিরা ফোড়ন ও লঙ্কা দিয়ে ভেজে তাতে খানিকটা দৈ দিয়ে নেড়ে জল দিয়ে ফুটিয়ে নিতাম ও পরে ডাল ঐ ভাবে সাঁতলে নিয়ে খেয়ে নিতাম। খুব ভাল লাগতো ও অল্প সময়ে হয়ে যেতো। তখন আমার বয়স ১২/১৩ বছর মনে হয়। আমি খাওয়া দাওয়া করে স্কুলে চলে গেলে দাদা ঐ উনুনে রান্না করতেন। আমার জন্য সব আলাদা করে রেখে দিতেন। আমি স্কুল থেকে ফিরে ঐসব খেয়ে মাণিকতলা খালধরে আমাদের স্কুলের মাঠে বিকেলে খেলতে যেতাম। দাদা ডিস্পেন্সারীর ঘরের মধ্যে আলমারী দিয়ে একটা পার্টিশন করে নিয়েছিলেন, সেইখানে ঠাকুর পূজো করতেন—আমরা রাত্রে শুতাম। মাঠ থেকে ফিরে আমি পড়াশোনা করতাম দাদা রান্না করতেন পরে দুজনে খেয়ে শুতাম। ভজা খাওয়া দাওয়া করে বাসন মেজে ঐ ঘরের একপাশে শুতো। বাড়ীতে একতলায়, দোতলায় ও তেতলায় একটা করে পায়খানা ও জলের কল ছিল। একতলায় অন্য কেউ আসতো না। জল তেতলায় উঠত। আগে ছাদে রান্নাঘরে রান্না হোতো বামুন ছিল কারণ তখন অনেক লোক। সেইখানে সব খাওয়া দাওয়া হোতো—বাবার ও দাদার খাবার দোতলায় ঠাকুর দিয়ে যেতো। মা সকলের শেষে বামুন চলে গেলে খেতেন। মা আমার জন্য সব রেখে দিতেন, আমি স্কুল থেকে এসে খেয়ে খেলা করতে যেতাম। ঐ দোতলায় দুটো ঘর একটা খুব বড় ও তার পাশে একটা কিছু ছোট। আমরা বাবার সঙ্গে ঐ বড় ঘরে শুতাম। দাদারা নীচে Dispensary (ডিস্পেন্সারী) ঘরে শুতেন। বলাইদাদারা সব তেতলায় শুতেন। দোতলায় ঘরের সামনে একটা বড় গাড়ী বারান্দা ছিল। ঐখান থেকে আমরা পরেশনাথের মিছিল, দুর্গা ও অন্যান্য ঠাকুর ভাসান দেখতাম। খুব হাওয়া। উল্টো দিকে বেথুন কলেজের মেয়েদের Hostel (হোস্টেল), দুটো বাড়ীর পর Tram (ট্রাম) রাস্তা ও তার ধারে "হেদো" বা বর্তমান নাম 'আজাদ হিন্দ বাগ'। ঐখানে প্রত্যুষে রোদ উঠবার আগে আমি ও পাশের গলিতে থাকতো আমার দুই বন্ধু "বাঁটলা" ও "বোম্বাই" হেদুয়াতে গিয়ে দৌড়াতাম। এখন প্রত্যুষে মেয়েরা যায় বলে পুরুষদের

যেতে দেয় না। ২৮ নং মাণিকতলার বাড়ীতে থাকতো লালমাছ, পাখি, খরগোস গিনিপিগ, সাদা ইঁদুর ছিল। দাদা একটি ভাল বিলাতী কুকুর পুষেছিলেন। দুঃখের বিষয় গাড়ী চাপা পড়ে তার একটা পা ভেঙ্গে যায়। সেটাকে ভেটিন্যারী হাসপাতালে (পশু চিকিৎসালয়) দেওয়া হয়। পরে তার কি হয়েছিল জানিনা। একদিন হঠাৎ একটা পায়রা এসে ছাদে বসে আমি সেটাকে ধরি ও একটি ঝুড়ি চাপা দিয়ে রাখি। সেজদাদা আমায় শিখিয়ে দেয়, বাবাকে বলে ওর একটা জোড়া কিনে দিতে। আমি বাবাকে বলতে বাবা খুব রাগ করেন—বলেন, পড়াশোনা কিছু করবে না আবার পায়রা পোষা। কিন্তু পরে তিনি সেজদাদাকে আর একটা পায়রা কিনে আনতে বলেন। যখন আমরা বিডন ষ্ট্রীটের বাড়ীতে যাই তখন ঐ পায়রা দুটো নিয়ে যাই আর ওর থেকে ৫০/৬০ টা ভাল ভাল পায়রা হয়েছিল—সেজদাদা ও আমি ঐ পায়রা দেখাশুনা করতাম। ছাদে তেলের কাঠের বাক্সে ও টিনের ঘর করে রাখা হয়েছিল। দাদা প্রথমে খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন—পরে আমায় ঠিকমত পড়াশোনা করতে দেখে ও স্কুলে পরীক্ষায় ভাল ফল করতে দেখে আর কিছু বলতেন না। এই সময় অর্থাভাবে দাদা মাঝে মাঝে ঐ পায়রার ঘরে লুকিয়ে থাকতেন—যখন ডালওলা তাগাদায় আসতো—সে ওপরেও আসতো।

সুরেশ রায় মহাশয়রা আমাদের পুত্রের মত স্নেহ করতেন। তিনি নিরামিষ আহার করতেন ও দাদাকে ও আমাকে তাঁদের সঙ্গে আহারের ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি দাদাকে নিয়ে খেতে বসতেন। পরে ঐ বাড়ীর অংশ দাদা একজন ধনী মাড়োয়ারীকে ভাড়া দেন, মিঃ আগরওলার বাড়ীর ভাড়া কয়েকমাস বাকী পড়ায় Dr. J. N. Majumdar (ডা. জে. এন. মজুমদার) বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে তাঁর নিজের বাড়ী, ডাঃ প্রতাপ মজুমদারের পুত্র. ঐ বাড়ী বিক্রয় করার ইচ্ছা করায় আমাদের ঐ বাড়ী ছেড়ে দিতে হয়। মা আমার মেজদাদা শ্রীদাম, বুড়িরা তখন বলাইদাদাদের বলাগড়ের বাড়ীতে থাকতেন ও পরে সেখান থেকে ভাজনঘাটে আমাদের বাড়ীতে গিয়ে থাকতেন।

তৃতীয় পর্ব

বাড়ীর চেষ্টা করে ৪০ নং সিমলা ষ্ট্রীটে যতীন গুপ্ত মহাশয়দের বাড়ীর একটা বাইরের ঘর ভাড়া পাওয়া যায়, ঐ ঘরে ডিস্পেন্সারী উঠিয়ে এনে ও আলমারী দিয়ে একটু পার্টিশন করে ভিতরে শ্রীশ্রীগৌররায়জীউকে একটা তাকের উপর রাখা হয়। বাইরের চৌকিতে ফরাস করা থাকত, রোগীরা বসতো। আর রাত্রে আমরা শুতাম। ৫২ নং বিডন ষ্ট্রীটের বাড়ীতে অনেক ফার্ণিচার ও বাবার লেখা অনেক

বই পত্র ছিল। ডিস্‌পেনসারীর অনেক শিশি বোতল ছিল। ঐসব বাবার কবিরাজীর ছাত্র বসন্তকুমার পাল তাঁর হাওড়া জেলার বেগড়ী গ্রামের বাটীতে গরুর গাড়ী করে নিয়ে গিয়ে রাখেন। শুধু ২ টা আলমারী একটা টেবিল ও দুটো তক্তপোষ নিয়ে ৪০ নং সিমলাষ্ট্রীট বাড়ীতে আমি ও দাদা আসি। বসন্ত দাদা আমাদের খুব আপনজন ছিলেন—আমরা দাদা বলতাম, অবশ্য দাদা তাঁকে নাম ধরেই ডাকতেন। তিনিও কবিরাজী করতেন এবং খাঁটি ঔষধ তৈয়ারী করতেন ও আমাদের দিতেন। দাদা এইখানে কবিরাজী করতেন। দাদার চিকিৎসার খুব যশ ছিল। বাঙ্গালী খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের অনেক লোক তাঁর কাছে চিকিৎসা করাতে আসতেন। ৪০ নং একটি ঘর ছাড়া আর কোন স্থান না থাকায়—আমি ও দাদা কিছুদিন নির্মলদার বাড়ীতে (৪ নং ভীমঘোষলেন) (নির্মলচন্দ্র গোস্বামী) আহার করতাম সকালে। রাত্রে রুটি পরোটা ও মুড়ি প্রভৃতি খাওয়া হোতো (দোকান থেকে আনিয়ে)। যেসব বই ও ফার্ণিচার বসন্তদাদা নিয়ে গিয়েছিলেন—সেসব তাঁর ভায়েরা নিয়ে নেয় ও কিছু তাঁর কাছে থাকে। বাবার সমস্ত ছাপানো বই না দেখায় উইয়ে খেয়ে ফেলে—এমন কি একখানি বইও পাওয়া যায়নি—তাঁর লেখা বাণ্ডিল বাণ্ডিল বই নানা বিষয়ে রচিত মাটি হয়ে যায়। বসন্তদাদা পরে মারা যান। কিছু কবিরাজী মূল্যবান পুঁথি শেষ পর্য্যন্ত ছিল—সেগুলো দাদার অনুমতি নিয়ে গর্ভণমেন্ট সংস্কৃত কলেজের পুঁথি শালায় আমি দিয়েছিলাম। বাবার নামে রাখবার কথা ছিল কিন্তু কিভাবে আছে জানি না। এই বাড়ীতে দাদার কাছে বিকালে অনেক ভক্ত আসতেন হরিকথা আলোচনা হোতো প্রত্যহই। ঐ সময় আমার পড়াশোনার কিছু অসুবিধা হোতো বলে দাদা আমায় রাত্রি চারটের সময় উঠে পড়তে বলেছিলেন—আমি তাই করতাম। এই সময় ঁপঞ্চানন ঘোষ নামে এক ভদ্রলোক দাদার কাছে আসতেন। তিনি ধনী ছিলেন—হেদোর ধারে (বর্তমান আজাদ হিন্দ বাগ) তিনি একটা বড় বাড়ী ভাড়া নিয়ে সেখানে একটা Mess (মেস্) ভাড়া দিয়েছিলেন—আর নীচের দুটো ঘরে দেবকীনন্দন প্রেস নামে তাঁর একটা বড় পুস্তকের দোকান ছিল। ঁনিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সব পুস্তক তিনি কিনে নিয়ে বিক্রয় করতেন। তিনি পরে দাদার একান্ত অনুগত হন ও তাঁর পুস্তকালয়ে আমাদের খাবার জায়গা করে দেন—এইখানে মেসবাড়ীর কলও পায়খানায় Line (লাইন) দিয়ে আমরা ব্যবহার করতাম ও একটা ঘরে রান্না করতাম— Spirit Stove'এ (স্পিরিট স্টোভ)। ছেলেদের দুধগরম করার যে Spirit Stove (স্পিরিট স্টোভ) তাতে 'ভাতে ভাতে ভাত' কোনও রকমে রান্না করে আমিও দাদা খেতাম—পরে ভাজন ঘাটের রাম মজুমদার আমাদের সঙ্গী হন অনেকদিন। তিনি রেলে কাজ করতেন। রাত্রে পূর্ব্ববৎ রুটি পরোটা বা মুড়ি

দোকান থেকে কিনে খাওয়া হোতো। সিমলা ষ্ট্রীটে একটা উড়িয়াদের নিরামিষ ঐ রুটির দোকান ছিল ঐখান হতে। কোনও কোনও দিন মুড়ি ও বরফি খাওয়া হোতো। এই সময় অনেক ভক্ত সমাগম হোতো ডিস্পেন্সারী ঘরে। দাদাকেও কয়েকটা হরিসভায় বক্তৃতা দিতে যেতে হোতো। একদিন সন্ধ্যার সময় নিত্যানন্দ বংশীয় প্রভুপাদ শ্রীমৎ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় রাস্তায় জানালার কাছে এসে দাদাকে ডাকেন। দাদা নেমে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করেন। পরে দাদার অনুরোধে তিনি ঘরে এসে চেয়ারে বসেন। আমিও তাঁকে প্রণাম করি। দাদার সঙ্গে তাঁর অল্প পরিচয় ছিল পূর্ব থেকে—কথায় মনে হোলো। প্রভুপাদ দাদাকে বললেন,—চাল্‌তা বাগানে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীতে তাঁকে বক্তৃতা দেবার কথা। দাদা খুব বিনয় সহকারে নিজ অযোগ্যতার কথা তাঁকে বললেন—কিন্তু প্রভুপাদ শুনলেন না বললেন সামনের রবিবার তিনি নিজে এসে দাদাকে নিয়ে যাবেন সন্ধ্যার সময় সম্মিলনীতে। পরে প্রভুপাদ চলে গেলেন—দাদাও একটু চিন্তায় পড়লেন কারণ এর আগে তিনি বড় হরিসভায় বলেননি। সুঁড়িপাড়ায় কালোওয়ার পট্টির ভেতর চালতা বাগান সেকেন্ড লেন (সরুগলি)। সেই গলির মধ্যে একটা পুরাতন দোতলা বাড়ীতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী অবস্থিত। নীচের একটা বড় লম্বা হল ঘরে—আর ওপরে কয়েক টা ছোট ঘর—এই ঘরে বৈষ্ণব লাইব্রেরী। নীচের ঘরে সভা হোতো। রবিবার দাদার সঙ্গে আমি ও আর ২/৪ জন লোক সম্মিলনীতে গেলাম। সভায় অনেক ধনী ও প্রসিদ্ধ লোক উপস্থিত ছিলেন। পরে জেনে ছিলাম—কলুটোলার কুমার কার্তিক মল্লিক, হরিদাস নন্দী, মণিমল্লিক (প্রসিদ্ধ গায়ক পঙ্কজ মল্লিকের বাবা) এই রকম কয়েক জন ছাড়াও অনেক ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। তবে হলঘর ভর্তি হয়নি। সভা আরম্ভ হবার পর প্রভুপাদ (সভাপতি) দাদার পরিচয় করিয়ে—তাঁকে বলবার জন্য অনুরোধ করলেন। দাদা তখন একটা খদ্দরের পাঞ্জাবী ও থানধুতি পরেছিলেন। চাদর ছিলনা। প্রথমে স্তব করে তাঁর স্বভাবসুলভ বিনয়ের সঙ্গে ভক্তদের কৃপাপ্রার্থনা করে—বক্তৃতা আরম্ভ করলেন। আমার ঠিক মনে নেই তবে বোধ হয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্মের বৈশিষ্ট্যতা সম্বন্ধে বলেন। কথা ছিল আধঘণ্টা বলবেন—কারণ আরও বক্তা ছিল। হরিদাস নন্দী মহাশয় ঐ সম্মেলনের সেক্রেটারী ও প্রভুপাদ সভাপতি। তাঁর বক্তৃতা এত আবেগময়ী ও শাস্ত্র সম্মত ছিল যে শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে শুনছিলেন। দাদা আধঘণ্টা হলে বক্তৃতা বন্ধ করতে চাইলে শ্রোতারা সকলে আরও বলতে বলেন। প্রায় একঘণ্টা বলার পর দাদা শেষ করলেন। সকলে ফিস্‌ফিস্‌ করে দাদার বিষয় পরস্পরে আলোচনা করতে লাগলেন। পরে সেই সভায় ঠিক হোলো প্রতি রবিবার দাদাকে বলতে হবে—

কুমার কার্তিক মল্লিক মহাশয় সভায় এই প্রস্তাব করেন। পরবর্তী রবিবার দাদার বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়েছিল—ঘরে তিল ধারণের স্থান ছিলনা—আর দাদা প্রায় ২ ঘণ্টা বলেন। চতুর্দিকে তাঁর বক্তৃতার সুখ্যাতি পাণ্ডিত্য ও বলার ভঙ্গিমার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনলাম। আমাকেও অনেকে বাড়ীর ঠিকানা দাদা বিবাহিত কিনা এইসব জিজ্ঞেস করেছিলেন। এইভাবে কয়েক রবিবার চলার পর জানিনা কি কারণে দাদার বক্তৃতা বন্ধ হয়ে যায়। পরে আবার আরম্ভ হয় শ্রোতাদের আগ্রহে ও দাবীতে। শুনেছিলাম—আমরা বৈদ্য বলে ব্রাহ্মণরা দাদার প্রাধান্য খর্ব করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন—কিন্তু মহাপ্রভুর ইচ্ছায় সেটা নস্যাৎ হয়ে যায়—তার প্রধান কারণ কুমার কার্তিক মল্লিক মহাশয় দাদার বক্তৃতা বন্ধ করার ঘোর আপত্তি করেন। তিনি অনেক টাকা সম্মিলনীতে দান করেছিলেন—তাঁর খুব প্রতাপ ছিল—এবং তিনি দাদার খুব গুণমুগ্ধ হন। পরে বৈষ্ণব সম্মিলনীর সামনের জমি কিনে একটা বড় বক্তৃতার হল তৈয়ারী হয়—উপরে মহিলাদের বসবার স্থান করা হয়। একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা হয় শ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীশ্রীনিতাইগৌর বিগ্রহ স্থাপিত হয়। দাদা আগে দাঁড়িয়ে বলতেন—পরে নূতনবাড়ীতে ব্যাসাসনে বসে বলতেন—তাঁর বক্তৃতার দিন লোক ধরতোনা। পরে সম্মিলনী কর্মপরিষদের সভ্য নির্বাচিত হন ও পরে সহসভাপতি পদলাভ করেন। দাদাকে সভাপতি করার জন্য প্রস্তাব হয়েছিল কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ না করে শ্রীবাস অঙ্গনের প্রভুপাদ চৈতন্যচাঁদ গোস্বামীকে সভাপতি করেন ও নিজে সহসভাপতি হন। তখন কর্মসমিতির অধিকাংশ সভ্যই দাদার পক্ষে ছিলেন। মধ্যে মধ্যে সম্মিলনীতে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বক্তারা একত্রে বক্তৃতা করতেন—যেমন মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ, প্রভুপাদ প্রাণগোপাল গোস্বামী, প্রভুপাদ রাধাবিনোদ গোস্বামী, প্রভুপাদ সত্যানন্দ গোস্বামী, মহামহোপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন তর্কতীর্থ, প্রভুপাদ প্রাণকিশোর গোস্বামী প্রভৃতি। মহামহোপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন তর্কতীর্থ গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন—তিনি দাদাকে আদ্য ও মধ্য পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত করে এক পত্র দেন। দাদাতো অবাক। পরে তিনি অধ্যক্ষ মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়ে উহা গ্রহণে অসম্মতি জানান। এই ৪০ নং থেকেই দাদার বৈষ্ণবজগতে এতো নাম হয় যে তাঁকে প্রায়ই কোন না কোন হরিসভায় বক্তৃতা দিতে যেতে হোতো। দুইবার দিল্লীতে হরিসভাতে, বৃন্দাবনে কাঁথিতে, ঢাকাতে হরিসভার বিরাট আয়োজন হোতো। ঢাকাতে একটা বিরাট পার্কে বিরাট প্যাণ্ডেল করে প্রায় সাতদিন ধরে বৈষ্ণব সভা হোতো প্রতি বৎসর। দাদা তিনবার গিয়েছিলেন। একবার (শেষবার) দাদার সঙ্গে আমিও গিয়েছিলাম। আর সঙ্গে ছিলেন জ্ঞানবাবু। তারা সব খরচ দিত। বুড়িগঙ্গার উপর একটি ঠাকুর বাড়ীতে

আমরা থাকতাম—আর একজন গোস্বামী ব্রাহ্মণ আমাদের আহারের ব্যবস্থা করে (রান্না) দিতেন। কি চমৎকার রান্না। সভা সন্ধ্যার সময় আরম্ভ হোতো—তিনদিন দাদার একলা বক্তৃতা হোতো। প্রায় কম করে ৮/১০ হাজার লোক। তখন Mike (মাইক) এর প্রচলন হয়নি—দাদা খুব জোরে বলতে পারতেন। আর তিনি যখন বলতেন একটি টু শব্দও হোতোনা। আর সকলেই উচ্চ প্রশংসা করতেন। স্থানীয় একজন ধনী সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত North British Insurance Company (নর্থ ব্রিটিশ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী) এর Agent (এজেন্ট) দাদাকে খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর মোটরে আমাদের শহর দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমি যেবার গিয়েছিলাম তখন ঢাকার রমনা শহর তৈরী হচ্ছে। আমরা সব দর্শনীয় স্থান দেখলাম। ঐ সময় আমি টেলিগ্রাফ অফিসে কাজ করি। ঢাকা টেলিগ্রাফ অফিস তখন বুড়িগঙ্গার ধারে ছিল। সেখানে অনেক পুরাতন বন্ধুদের সাথে দেখা হয়। সমর চ্যাটার্জী, যিনি পরে আমাদের কলিকাতা অফিসের চীফ সুপারিন্টেন্ডেন্ট হয়েছিলেন, দেখা হয়েছিল। তাঁর বাবা দাদার খুব অনুগত হয়েছিলেন। আমরা গোয়ালন্দ মেলে গোয়ালন্দ ঘাটে ভোর বেলায় পৌঁছাই, পরে মেল স্টীমারে উঠি—প্রকাণ্ড জাহাজের মত বড় সেখান থেকে রওনা হয়ে মৈমনসিংহ দুপুরে পৌঁছাই। মৈমনসিংহ থেকে ছোট ট্রেনে (Metre Gauge) এ ঢাকা যেতে হয়। আমরা ঘোড়ার গাড়ীতে যাই। পরে ঐভাবে কলকাতায় ফিরি। অনেক লোক মৈমনসিং হ স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন দাদার সঙ্গে দেখা করতে। এরপর দাদা পাক্‌শী, পাবনা এইরকম অনেকস্থানে গিয়েছিলেন। পাবনায় প্রভুপাদ রাধাবিনোদ গোস্বামীদের বাড়ীতে উৎসব হোতো বিরাট আকারে। প্রভুপাদের ভাই নদীয়া বিনোদ গোস্বামী এর অনুষ্ঠাতা। রাধাবিনোদ প্রভু একদিন ডিস্পেন্সারীতে এসে দাদাকে যাবার জন্য বিশেষ করে বলেন। দাদা দুদিনের জন্য গিয়েছিলেন ও খুব প্রশংসা লাভ করেন। এখন ঐগুলি বাংলাদেশের অন্তর্গত। এই সময় দাদাকে বেহালায় হরিসভায় কয়েকবার বক্তৃতা করতে যেতে হয়েছিল। প্রায় একশত বৎসরে প্রাচীন হরিসভা ও ব্রাহ্মণ প্রধান স্থান। দাদার বক্তৃতা ও পাণ্ডিত্য দেখে সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। আমি দাদার সঙ্গে দু'বার গিয়েছিলাম। সেন্ট জেমস্ হরিসভা বহুবাজারে দাদা তাদের আজীবন সভাপতি ছিলেন। তাঁর পরলোক গমনের পর তাঁরা দাদার স্থানে অন্যলোককে সভাপতি করেন ও দাদার তিরোধানের পর তাঁর স্মরণে খুব বড় উৎসব করেন। এ'ছাড়া কলিকাতা হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা (বঁলাইশীল মহাশয়ের ভবনে) অনঙ্গমোহন হরিসভা (দাদা এই সভার প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন) চেৎলা হরিসভা, বেগুরী হরিসভা, কোন্নগর, ও রিষড়া, শ্রীরামপুর

প্রভৃতি স্থানে মধ্যে মধ্যে যেতেন। মীরাটে বা ঐরূপ কোনও স্থানে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে দাদাকে দর্শন শাখার সভাপতি করে পত্র এসেছিল। কিন্তু বিদেশে তাঁর থাকা খাওয়ার অসুবিধা হতে পারে মনে করে তিনি ঐ পদ গ্রহণ করেননি। যেমন দাদার শ্রীমন্মহাপ্রভুর নামমহিমা প্রচারে চতুর্দিকে খ্যাতি ও প্রশংসা ছড়াচ্ছিল, সে'রকম অনেক ধনী ও ভক্ত তাঁর শ্রীচরণ আশ্রয়ের জন্য তাঁর কাছে আসেন কিন্তু তিনি মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া কাহাকেও দীক্ষা দেননি। তিনি শিষ্য করলে বহু শিষ্য করতে পারতেন। সে সময় শ্রীশ্রীগৌররায়জীউর কৃপায় বৈষ্ণব জগতে তিনি একজন আচার্যস্থানীয় হয়েছিলেন। বহু সিদ্ধ মহাত্মা তাঁর কাছে মধ্যে মধ্যে কৃপা করে আসতেন। এ ছাড়া মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন মহাশয় (স্বপ্নসিদ্ধ-কবিরাজ) তাঁর খুব গুণমুগ্ধ হয়েছিলেন। দাদার কাছে আসতেন ও তাঁর কল্পতরু প্যালেসের বাড়ীতে তাঁকে নিয়ে গিয়ে ধর্ম বিষয় আলোচনা করতেন। কয়েকজন প্রসিদ্ধ ধনীর বাড়ীতে শ্রাদ্ধে অধ্যাপক বিদায়ে প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, প্রভুপাদ প্রাণগোপাল গোস্বামী ও অনেক বিখ্যাত পণ্ডিতজনের সঙ্গে দাদাকে নিমন্ত্রণ করা হোতো। তিনি প্রথমে ২/৪ টি স্থানে গিয়েছিলেন—কিন্তু অধ্যাপক বিদায়ের ঘড়া, কলসী ও গিনি প্রভৃতি কিছুই গ্রহণ করেননি। পরে তিনি আর যেতেন না। এই সময় দাদা তাঁর "জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম" গ্রন্থ লিখতে আরম্ভ করেন। দেবকীনন্দন প্রেসের বাড়ীতে আমাদের স্থায়ীভাবে বেশীদিনের জন্য কোন ঘর ছিল না।

পঞ্চাননবাবু ঘর ভাড়া পেলে আমাদের ঘর ভাড়া দিয়ে দিতেন ও বিকল্প তাঁর ঘরের পাশে কোন রোয়াকে বা আলমারীর মাঝে রান্নার কথা বলতেন। আমরা তাঁর বইয়ের ঘরে কাপড় রেখে লাইন দিয়ে পায়খানা যাওয়া ও স্নান করতাম। একবার বাইরের উঠোনে কলতলার কাছে একটা বড় শিউলীফুলের গাছের নীচে একটা ছোট খোলার চালের ঘরে; একজনের একটা মাটির উনুনে আমরা রান্না করতাম। ঐটের সামনে টিনের কয়েকটা ঘর ছিল—তাতে একটা প্রেস ও একটা সাবানের কারখানা ছিল—তারা ঐ উনুনে প্রেসের রোলার তৈয়ারীর জন্য শিরিষ গালাতো—মধ্যে মধ্যে রান্না করত। পরে ঐ প্রেস উঠে গেলে ঐ ঘরটা পড়ে ছিল। দু'জন মানুষ কোনও রকমে বসতে পারতো। একটা ঝাঁপ ছিল। কিছুদিন ঐ ঘরে আমরা (আমি, দাদা ও রামদা) রান্না করে খেতাম। উনুনটায় ভাল করে গোবর দিয়ে নেওয়া হয়েছিল। সকালে একপাকে সিদ্ধপক্ক ও রাত্রে একপাকে খিচুরী খাওয়া হোতো। অ্যালুমিনিয়ামের একটা বড় হাড়ি ছিল সেটা মেজে রেখে দেওয়া হোতো পঞ্চানন বাবুর ঘরের চৌকীর তলায় আর একটা বালতি ছিল জল রাখার জন্য। প্রধানতঃ শালপাতায় খাওয়া হোতো—ক্বচিৎ কলা পাতায়। কাছেই ময়লা

ফেলার জায়গায় পাতা ফেলা হতো। ঝাঁপটা দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হোতো যখন আমরা চলে আসতাম। অনেকদিন আমাকে সন্ধ্যাবেলায়—চার পাঁচ পয়সার কয়লা (খবরের কাগজে করে) আনতে হোতো। একটা এক আউন্স শিশিতে ২ পয়সার সর্ষের তেল এনে রান্না হোতো। কেরোসিন একটা বোতলে কেনা থাকতো আর কয়লার সঙ্গে চার পয়সার কাঠ আনতাম। কোন কোনদিন জল না পাওয়া গেলে ঐ বাড়ীর সামনেহেদোর ধারে একটা রাস্তার কল ছিল—আমি বালতি করে জল আনতাম। পরে দাদা ও রামদা এসে রান্না করতেন। সকালবেলা রামদা সিদ্ধ করার মত তরকারী ও দুবেলার মত চাল ও ভাজা মুগডাল (চার আনা সের) কিনে নিয়ে এসে স্নান-টান সেরে উনুনে আগুন দিয়ে সব ঠিক করে রাখতেন, দাদা এসে রান্না করতেন। তারপর দাদা পূজা সেরে সকলে ঐ অল্প স্থানে কোনও রকমে ঝাঁপ একটু বন্ধ করে খেতাম। কারণ ঐ ঘরটা বাড়ীর সদরের ওপর ছিল—ও লোকজন যাওয়া আসা করতো। পরে সাবানের কারখানা উঠে গেলে পঞ্চাননবাবু ঐ টিনের একটা ঘর আমাদের দেন। তিনি ভাড়া নিতেন না—তবে তার অর্থ পিপাসা খুব ছিল। দাদাকে খুব ভক্তি করতেন বলে চক্ষু লজ্জায় ভাড়া নিতেন না। ঐ টিনের ঘরে অসুবিধা, উনুন ছিলনা, সেইজন্য এখানে আমাদের স্পিরিট স্টোভে রান্না করতে হোতো—বাইরের চালাঘরটা ভেঙ্গে ফেলা হয়েছিল—ওখানে ঘর হবে বলে। ছোট স্পিরিট স্টোভটা ছেলেদের দুধগরম হয় যাতে, সেইরকম ছোট। তাতে একবার পুরো ও দ্বিতীয়বার অর্ধেক স্পিরিট ঢেলে দিয়ে খুব সাবধানে হাঁড়ি বসাতে হোতো। নড়াচড়া করলেই উল্টে পড়বার সম্ভাবনা। কেবল সিদ্ধ পক্ক দুবেলা-শালপাতায় আহার।

প্রায় বৎসর খানেক পরে—পঞ্চানন বাবু আমাদের তাঁর বইয়ের ঘরের সামনে একটা ঢাকা বারান্দা মত ছিল সেইখানে দুটো আলমারী সরিয়ে একটু স্থান করে দেন ও সেখানে রান্নার ব্যবস্থা করতে বলেন—তিনি ঐ ঘরটা ভাড়া দেন। এই সময় চোরবাগান লেনে—নলিনীগুপ্ত (আমার বন্ধু ভুতোর বাবা) একটা বাড়ী ভাড়া দেন—রামদা (রাম মজুমদার) তাঁর পরিবারের সকলকে এনে ঐ বাড়ীতে উঠেন। দোতলায় তাঁরা থাকতেন। একতলাটা খালি ছিল। আমরা যখন আলমারীর পাশে রান্না করতাম তখন বলাইদা (বলাই গোস্বামী) এসে আমার ও দাদার সঙ্গে কিছুদিন ছিল। তখন Pump Stove (পাম্প স্টোভ)'এ রান্না হোতো। ভাত, ডাল তরকারী কোন রকমে হোতো। এরপর নলিনীদা দাদাকে তাঁর বাড়ীর নীচের দুটো ঘর ভাড়া দিতে চাইলেন—তখন আমি ও দাদা চোরবাগান লেনের বাড়ীর একতলায় গিয়ে উঠলাম। ঐখানে আমি ও দাদা খাওয়া দাওয়া করতাম একটা ঘরে—আর একটা

ঘরে শুতাম। ৭ টার সময় ডিস্‌পেন্সারী বন্ধ করে আসা হোতো। মধ্যে চরণ রায় মহাশয় (C. D. Rai) তাঁর একজন চাকর ভুবন বলে সঙ্গে নিয়ে কিছুদিন আমাদের সঙ্গে থাকতেন। পরে চলে যান। প্রায় ৭/৮ মাস এইভাবে থাকার পর নলিনীবাবু বাড়ীভাড়া বাকী ফেলায় বাড়ী ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। তখন আমরা মুস্কিলে পড়ি। সেই সময় কিছুদিনের জন্য হাতীবাগান বাজারের দক্ষিণ দিকে গ্রে ষ্ট্রীটে সুরেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের ভাইঝি জামাই কবিরাজ মনোরঞ্জন রায় মহাশয়ের বাড়ীতে একটা ঘরে ৫/৬ মাস ছিলাম। দাদা রান্না করতেন। এইখানে আমার Para-Typhoid (প্যারা-টাইফয়েড) হয়। দাদার চিকিৎসায় সুস্থ হই। এরপর আমরা শ্যামবাজার কাঁটাপুকুর লেনে কুমারখালী জানকী নাথ পাল মহাশয়দের বাড়ীতে কিছুদিন ছিলাম। নটুদারা সপরিবারে প্রায় একবৎসরের জন্যে কুমারখালী গিয়েছিলেন—তখন বাড়ীতে কয়েকজন পুরুষ মানুষ মাত্র থাকতেন। বড় বাড়ী—ননীদা, অটলদা গৌর ও নিতাইদারা-তাঁরা দাদাকে বলে তাঁদের ঐ বাড়ীতে নিয়ে আসেন। নীচের দালানে তোলা উনুনে দাদা রান্না করতেন—সেই সময় বজরা থেকে আমাদের চাকর বিশু চলে আসে—বজরা দাদা শেরপুরের জমিদারদের কাছে বিক্রি করেছেন কারণ আমরা কেউ বজরায় যেতাম না—আর বজরার অনেক কিছু চুরি হয়ে যায়। বিশু বিকালে টাকা নিয়ে বাজার করে কাঁটা পুকুরের বাড়ীতে গিয়ে সময় মত উনুন ধরাতো—আমরা ৭টায় ডিস্‌পেন্সারী বন্ধ করে দাদা ও আমি হেঁটে ঐ বাড়ীতে প্রত্যহ যেতাম। আমি স্কুল থেকে ফিরে—স্কুলের মাঠে খেলা করতে যেতাম উল্টাডাঙ্গা খালের ধারে পুলের কাছে—খেলার মাঠ। সন্ধ্যার সময় ফিরে এসে প্রায় ৭/৭-৩০ সময় ডিস্পেন্সারী বন্ধ করে দাদা ও আমি কাঁটা পুকুরের বাড়ীতে যেতাম—সঙ্গে পড়ার বই নিয়ে যেতাম প্রত্যহ হেঁটে যেতে হোতো। সেখানে প্রায় ১/২ ঘণ্টা পর পৌছে—আমি হাত পা ধুয়ে উপরের ঘরে পড়তে যেতাম। আর দাদা কাপড় ছেড়ে রান্না করতে বসতেন—বিশে চাকর সব ঠিক করে রাখতো। ভাল ভাল পদ ও অন্ন হোতো। রান্না শেষ হলে দাদা ঠাকুর পূজো করে এসে খাবার দিতেন, তারপর আমি আসতাম। খাওয়া দাওয়া সেরে ঐ ঘরে শুতে যেতাম—বিশে নীচে থাকতো। ঐ ঘরটা রাস্তার দিকে সামনে একটা বড় বাড়ী ছিল—Dr. D.N. De (ডাঃ ডি. এন. দে) বড় হোমিওপ্যাথ ডাক্তার যাঁর নামে D.N.De Homeo College Circular Rd (ডি. এন. দে হোমিও কলেজ সার্কুলার রোড) আছে। তাঁর ছোট ছেলে শচীন দে আমার সঙ্গে একই Class 'এ (ক্লাস'এ) স্কটিশে পড়তো। পরে পুশা এগ্রিক্যালচারাল কলেজ থেকে পাশ করে I.C.I (আই. সি. আই) এর Branch Manager (ব্রাঞ্চ ম্যানেজার)

হয়েছিল। B.T. Road (বি. টি. রোড) এর কাছে অশোকগড়ে বড় বাড়ী করেছে। এর এক বৎসর পর নটুদাদাদের সব Family (পরিবার) কুমার খালী থেকে আসছে শুনে আমরা ঐ বাড়ী থেকে চলে এলাম। সিমলা ষ্ট্রীটে মামার বাড়ী ছিল (ভাড়া বাড়ী)। দাদামশাই সিমলা ষ্ট্রীট ও বিবেকানন্দ রোডের জংশনের কাছে তিনমহলা বাড়ী করেছিলেন। বর্তমানে মধুরায়ের লেনে মিত্রদের বাড়ী আছে তার পাশ থেকে Ivy C0 (আইভি কোং) বাড়ীর আগে পর্যন্ত দাদা মশাইয়ের বাড়ী ছিল। বর্তমানে মিত্তিরদের বাড়ীর পাশে যে ছোট বাড়ী আছে সেই বাড়ীর উপরে দাদা মশাইয়ের শোবার ঘর ছিল—আর নীচেতে ছিল আস্তাবল, ঘোড়া গাড়ী থাকতো। দাদামশাই তখন কলিকাতার খুব সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ ছিলেন। তাঁর দারুণ Practice (পসার) ছিল। তিন মহলা বাড়ীর প্রথম মহলে তাঁর রোগী দেখার ঘর ও ডিসপেন্সারী ছিল—আর তাঁর দেশের অনেক লোক অন্য ঘরে থাকতো। ঐ বাড়ীর পাশে চাকরদের জন্য ২/৩ টা ঘর ছিল, চাকররা থাকতো। প্রথম মহলের উপরে একদিকে যোগেন মামারা থাকতেন। দাদা মশাইয়ের খুড়তুতো ভাইপো। হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়ায় দাদা মশাইদের আদি বাড়ী ছিল। এখন সেখানে যোগেন মামার ছেলে ফটিকদারা থাকেন। দ্বিতীয় মহলে রান্নার বাড়ী—আর উপরে মামা-মামীমারা থাকতেন—অন্য ঘরে মাসীরা থাকতো। প্রথম মহলের উপরে দোতলায় ছোটমামা থাকতেন—তাঁর মাথা খারাপ ছিল। তার পাশে আঁতুর ঘর ছিল। ঐ ঘরে বাড়ীর সব ছেলে মেয়েরা জন্মগ্রহণ করে। দাদা ও আমরা সকলে ঐ ঘরে জন্মেছিলাম। সব মামীদেরও ঐখানে সন্তান হয়। মাহিনা করা ভাল ধাত্রী ছিল। তখন হাসপাতালের রেওয়াজ বিশেষ ছিল না। মামার বাড়ী দোল, দুর্গোৎসব, কালীপূজো প্রভৃতি সব অনুষ্ঠান খুব জাঁকজমক করে হোতো। আমার অল্প অল্প মনে পড়ে। আর বিয়ে খাওয়ার তো কথাই নেই—বিয়েতে যে কত লোক আসতো তা ধারণা করা যেতোনা—গ্রামের সব আসতো, এমন কি অনেক ব্রাহ্মণও আসতেন। আমি মার সঙ্গে পালকী চড়ে বিয়েতে গিয়েছি মনে আছে। তখন আমরা ২৮ নং মাণিকতলায় থাকতাম। এত ছেলেপিলের মধ্যে দাদাকে সকলে সব চেয়ে বেশী ভালবাসতো। দাদাকে দেখতেও খুব সুন্দর ছিল—দাদামশাই ও দিদিমা তাঁকে খুব স্নেহ করতেন—ঐজন্যে বাড়ীর মধ্যে দাদার খুব খাতির ছিল। ছোটমামা অসময়ে মারা যান। বর্তমানে মহেশভট্টাচার্যের ছেলে শ্রীহেরম্ব ভট্টাচার্য বিবেকানন্দ রোড ও বারাণসী ঘোষ লেনের উপর যে বাড়ী করেছেন—ঐখানে ছোটমামার নিজস্ব একটা বাড়ী ছিল। বিবেকানন্দ রোড তৈয়ারী করার সময় মামাদের সমস্ত বাড়ী ভেঙ্গে ঐ রাস্তা তার উপর দিয়ে হয়েছে আমাদের চোখের সামনে। তখন একদিকে

সিমলাষ্ট্রীট আর অন্যদিকে মধুরায় লেন রাস্তা ছিল। দাদা মশাইয়ের বাড়ী মধুরায় লেন দিয়ে গাড়ী করে যেতে হোতো—আর সিমলা ষ্ট্রীট দিয়ে একটা সরু গলির ভেতর দিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকতে হোতো। এখন দাদামশায়ের শোবার ঘরটি ছাড়া আর কোন স্মৃতিই নেই—তার ওপর দিয়ে গিয়েছে "বিবেকানন্দ রোড"। মামার অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায়—অত টাকা কিভাবে চলে গেল কেউ জানে না। খুব দরিদ্র অবস্থায় পড়ে তিনি একটা বাড়ী ভাড়া করে থাকতেন সিমলা ষ্ট্রীটে—শান্তি পালেদের বাড়ীর পাশের গলিতে। পরে মামা অসুস্থ হয়ে গুপ্তিপাড়ার বাড়ীতে চলে যান কিছুদিনের জন্য ও মামা আমাদের ঐ বাড়ীতে থাকতে বলেন তাঁর চাকর বাকর ও কিছু লোক থাকতো। কিন্তু ওখানে রান্নার সুবিধা না থাকায়, কারণ অন্য লোক থাকতো—তাই আমি ও দাদা কাঁটা পুকুর লেনের বাড়ী থেকে চলে এসে ডিস্পেন্সারীতে থাকতাম আর স্নান পায়খানা মামার বাড়ীতে করতাম। ডিসপেন্সারী ঘরটায় দুটো আলমারীতে ঔষধ ও দাদার বই থাকতো। ঐ আলমারী দুটো—একটু এগিয়ে এনে ভেতরে খানিকটা স্থান করা হয়েছিল—তাতে একটা Secretariate Table (বড় লেখার টেবিল) ও একটা Revolving Chair (ঘূর্ণনশীল চেয়ার বা চক্রচেয়ার) ছিল। আর একটা তাকে ঠাকুরকে রাখা হয়েছিল। ঘরটায় ২ টা দরজা ছিল। যেটা Partition (পার্টিশন বা বিভাগ) এর দিকে ছিল সেইটে খুলে বাড়ীর ভেতরে দালানে একটা কল ছিল—সেখান থেকে জল আনা হোতো। পায়খানা ভেতরের অংশে থাকায় আমাদের ব্যবহারের সুবিধা ছিল না। ঐ সময় ঐ ঘরে ১৪ দিন Pump Stove 'এ "জয়পুরী পরোটা" ও আলু চচ্চরী করে নিতাম রাত্রি ৮/৮-৩০ টার পর দরজা বন্ধ করে। ঐটা দু'ভাগ করে একভাগ সকালের জন্য—আর অন্য ভাগ দাদা ও আমি খেতাম। সকালে ঐটে থেকে আমার অংশ খেয়ে আমি স্কুলে যেতাম—দাদা বেলায় পূজো সেরে খেতেন। ঠাকুরকে ১টা করে সন্দেশ ভোগ দেওয়া হোতো। প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা মাণিকতলা ষ্ট্রীটে (বর্তমানে রামদুলাল সরকার ষ্ট্রীটে) একটা বড় সন্দেশের দোকান থেকে রোজ আমি দু'আনার "মনোরঞ্জন" সন্দেশ আনতাম—এক আনা করে প্রতিটি। দোকানদারের সঙ্গে আমার খুব পরিচয় হয়েছিল। তারা দু'ভাই বসে সন্দেশ তৈয়ারী করতো—ভিতরে সন্দেশ বড় বড় কড়াই করে তৈয়ারী হয়ে তাদের কাছে বড় বারকোশে ঢেলে দিত তাঁরা নানারকম ছাঁচে ফেলে নানা রকমারী সন্দেশ করতো। আমি গেলে আমায় ইশারায় দাঁড়াতে বলতো—খুব ভীড় হোতো—খুব নামকরা দোকান—পরে ভায়ে ভায়ে ঝগড়া হয়ে দোকান উঠে যায় শুনেছি—অবশ্য সেই কর্তারা মারা যাবার পর। গরম সন্দেশ এলে তা থেকে একটু বড় করে দুটো

"মনোরঞ্জন" সন্দেশ গড়িয়ে একটা শালপাতার ঠোঙ্গায় করে আমায় দিত। তারা জানতো এটা ঠাকুরের জন্য তাই টাটকা সন্দেশ করে দিত। ঐ ১৪ দিন আমরা হেমদাদার বাড়ীতে হরিঘোষ ষ্ট্রীটে দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট ছাড়িয়ে হাতিবাগানের দিকে গেলে একটা বাঁদিকে Blind Lane (ব্লাইণ্ড লেন বা অন্ধগলি) এর মধ্যে হেমদা বাসা করে থাকতেন। তখন তিনি বাড়ীতে একা থাকতেন—তাই আমি ও দাদা সকালে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে পায়খানা ও স্নান সেরে ডিস্‌পেন্সারীতে চলে আসতাম—পরে সেই পরোটা খেয়ে আমি স্কুলে যেতাম। এখানে হেমদাদার একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। কারণ তাঁর কাছে আমরা অনেক বিষয়ে খুব উপকৃত। তিনি ব্রাহ্মণ সন্তান নাম শ্রী হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় বর্ধমান জেলায় বাড়ী। বাবা যে বজরা কিনেছিলেন সেটা হেমদাদা চাঁচলের বাজার বাড়ীতে যখন কাজ করতেন—বাবাকে কিনে দিয়েছিলেন। সেই সময় তাঁর সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়। পরে তিনি কিছুদিনের জন্য ভাজনঘাটে শ্রীরাধাবল্লভজীউর পূজারী ব্রাহ্মণ হয়ে আসেন। তিনি বেশ শিক্ষিত ছিলেন—পরে বাবা যখন দমদমায় বাড়ী ভাড়া নেন তখন হেমদাদা আমাদের বাড়ীতে চলে আসেন। বাবা একটা গরুর দুধের Dairy Firm (দুগ্ধ খামার) খোলেন ঐ বাড়ীতে। ঐ বাড়ীটা একটা বাগান বাড়ী—২/৩ টে পুকুর ছিল—শুনেছি। তখন আমার জন্ম হয়নি—সেজদাদা শিশু। ঐ বাড়ী ছেড়ে চলে গেলে হেমদাদা অন্যত্র চাকরী করতেন। পরে একজনের সঙ্গে Share (অংশীদার) একটা Advertising Agency (বিজ্ঞাপনী সংস্থা) খোলেন—তার নাম Expert Advertising Agency (এক্সপার্ট বিজ্ঞাপনী সংস্থা)। তখন ঐ রকম সংস্থা খুব কম ছিল-তাই তাঁর বেশ আয় হোতো। হেমদাদার বাড়ীতে স্নান করতে যাওয়ার কারণ—আমরা মামার বাড়ীতে স্নান পায়খানা করতাম—একদিন মামার এক কর্মচারী দাদার গায়ে পানের পিচ্ ফেলে দেয়। অবশ্য কতকটা অনিচ্ছা সত্ত্বে, কিন্তু দাদার ধারণা হয় ও ইচ্ছাকৃত ভাবেই করেছে—তাই আমরা ওখানে আর যেতাম না। হেমদাদা মধ্যে মধ্যে আমাদের কাছে আসতেন ও তাঁর বাড়ীতে থাকতে বলতেন—কিন্তু আমরা যাইনি। এরপর থেকে আমরা সেখানে স্নানাদি করতাম। এ সময় অর্থাৎ ৪০ নং সিমলা ষ্ট্রীটে বাড়ীতে থাকার সময় কয়েকটি ঠাকুরের অপূর্ব কৃপার ঘটনা ঘটে। দাদা এখন পুস্তক লেখা ও হরিসভায় প্রচারের কাজে যত নিযুক্ত হচ্ছিলেন—তাঁর চিকিৎসা ব্যবসাও কমে আসছিল। অর্থাভাব ঘটতে লাগল। কিন্তু তিনি সে' বিষয়ে খুব চিন্তা করতেন না ধর্ম বিষয়েই মন নিয়োজিত রাখতেন। একদিন কোনও রোগী এলোনা—বিশে চাকর বাজার আনতে যাবার জন্য (কাঁটা পুকুরের বাড়ীতে) তাগাদা দিচ্ছে আমি বসে আছি—

দাদা বিশেকে বললেন, "তুমি একটু ঘুরে এসো এখন হাতে কোন পয়সা নেই। শুনে বিশে চলে গেল। দাদা তখন "জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম" লিখছেন—বললেন আজতো কিছু পেলামনা—বিশেও ব্যস্ত হয়ে উঠেছে—কি করা যায়। দেখি ঠাকুর কি ব্যবস্থা করেন। বলে শ্রীমদ্ভাগবত খুলে দেখতে লাগলেন আমি চেয়ারে বসে আছি। একটু পরে দাদা হাসতে লাগলেন ও আমায় ডাকলেন, এই দেখ্ আয় দেখ্, ঠাকুরের কি কৃপা। বলে আমায় একটা পাঁচটাকার নোট দেখালেন। আমিতো অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি টাকা এলো কোথা থেকে। দাদা বললেন, শ্রীমদ্ভাগবত পড়ছিলাম জীবের স্বরূপে একটা reference (সূত্র) এর জন্য—হঠাৎ পাতা উল্টাতে দেখি এই ৫ টাকার note (নোট) বইয়ের মধ্যে রয়েছে। ঠাকুর যেন সাক্ষাৎ ঐ টাকাটা বইয়ের মধ্যে রেখে আমায় দিলেন। আমার চোখে জল এলো। আমায় note টা দিয়ে বললেন, রেখে দে—বিশে এলে এ থেকে বাজার করতে বলিস। একটু পরেই বিশে এলে note টা তাকে দিয়ে বললাম্ দুদিনের বাজার করে নিও। আমাদের প্রত্যহই চাল থেকে সব কিছুই কিনতে হোতো নগদ। কেবল কয়লা ও কেরোসিন কেনা থাকতো। আমি তখন 2nd Class' এ (সেকেণ্ড ক্লাস) পড়ি (এখন Class 9 বা নবম শ্রেণী)। আর একদিনের ঘটনা—সেদিন কোনও রোগী আসেনি। দাদা বই লিখছেন—আমি বসে আছি। একবার বললেন সন্ধ্যে হতে চল্লো কেউতো এলোনা—ঠাকুর কি করেন দেখি! সন্ধ্যার একটু পরে হঠাৎ এক ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে বললেন—আপনাদের ভাল মকরধ্বজ আছে? দাদা বললেন, "আছে"। তিনি বললেন—'শক্তি ঔযধালয়ে গিয়ে কিনবো মনে করে যাচ্ছিলাম—এখানে পেলে আর সেখানে যাবনা। দাদা বললেন, 'কতটা দরকার?' তিনি বললেন, 'এক সপ্তাহের মত।' দাদা বললেন, 'এক সপ্তাহের দাম তিন টাকা।' তিনি তিন টাকা দিলেন—দাদা এক সপ্তাহের মকরধ্ব দিলেন। লোকটি চলে গেলো। দাদা খানিকক্ষণ তাকিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে থেকে বললেন—দেখলি ঠাকুরের কি দয়া! লোকটা শক্তি ঔষধালয়ে ঔষধ কিনতে যাচ্ছিল—কি মনে করে আমার কাছ থেকে ওষুধটা কিনলো—ওকে কখনও দেখিনি। ঠাকুর ওকে প্রেরণা দিয়ে কেনালেন—তা না হলে আমাদের আজ খাওয়া হোতো না। মধ্যে অর্থের অভাবে খবরের কাগজ বিক্রি করে চালাতে হোতো। দাদা প্রত্যহই সংবাদপত্র নিতেন ও পড়তেন। আর একদিনও কিছু পাওয়া গেলো না। Madan Theatre (ম্যাডান থিয়েটার) এর J.F. Madan (জে.এফ. ম্যাডান) পার্শি ভদ্রলোক, বিরাট ধনী ব্যক্তি। বাবার কাছে চিকিৎসা করাতেন—বিডন ষ্ট্রীটের বাড়ীতে থাকতে। বাবা তাঁকে সুস্থ করে দিলে—তিনি দাদাকে একটি বার্মার টাট্টু ঘোড়া উপহার দেবেন বলেন। বাবা বলেন,

'কলকাতায় টাট্টু ঘোড়া চড়া বিপদজনক—ওসব দেবেন না। তখন তিনি দাদাকে একটা সুন্দর নানা রকম নকসা ও কারুকার্য করা একটা Burma Teak Wood (বর্মী সেগুন কাঠের) এর বাক্স উপহার দেন। সেই বাক্সটিতে দুটো লুকানো খোপ ছিল—ওপর থেকে বোঝা যেতোনা। দাদা সেই খোপের ভেতর অনেক প্রাচীন মুদ্রা সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। যখন কিছুই পাওয়া গেলনা তখন অন্ততঃ ঠাকুরের ভোগের জন্য পয়সা দরকার—দাদা ঐ পুরাতন মুদ্রাগুলো বার করে—একটা আমাদের দেশের তামার Double (ডবল) পয়সার মত পয়সা পেলেন—(তখন ডবল পয়সা, আধ পয়সা ও সিকি পয়সার প্রচলন ছিল) ও আমায় বললেন, এইটে দিয়ে একটা বরফী নিয়ে আয়। আমি ঐ পয়সা দিয়ে একটা বরফি দু'পয়সা দাম দিয়ে নিয়ে এলাম। দাদা ঠাকুরকে নিবেদন করে সেটা আমায় দিলেন ও বললেন, 'আজ এটা খেয়ে শুয়ে পড়—আরতো কিছু জুটলো না। আমি বললাম, "আমি ওটা খাব তুমি কি খাবে?" দাদা হেসে বললেন—জল খেয়ে শুয়ে পড়ব। খেয়ে নে।' আমি সেটা খেয়ে শুয়ে পড়লাম। দাদাও খানিক পরে শু'লেন। ঘরে আমাদের ইলেকট্রিক আলো ছিল। আর এক দিনের ঘটনা লিখছি। সেদিনও ঐ অবস্থায় রোগী এলোনা। দাদা নিশ্চিন্তে বই লিখছেন। হঠাৎ এক ব্যক্তি খুব তাড়াতাড়ি ঘরে এসে বললেন,—'আপনাদের শোণিত সুধা' আছে? বাবার কয়েকটি Patent (নিজাবিস্কৃত) ঔষধ ছিল যেমন চন্দনাদি মিশ্র (জ্বরের) শোনিত সুধা (সালসা) অশোকারিষ্ঠ (স্ত্রীরোগের) পূর্বে ঐসব ঔষধ খুব বিক্রি হোতো মাদ্রাজের দিকে। এখানেও হোতো। কিন্তু আস্তে আস্তে বিজ্ঞাপনের অভাবে বিক্রয় বড় একটা হোতোনা। তবে যাঁরা পূর্বে একবার ঐসব ঔষধ ব্যবহার করেছিলেন—তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ মাঝে মাঝে ঐ ঔষধ কিনতে আসতেন। ঐ ঔষধগুলি ২/৩ টি ঔষধের সংমিশ্রণে তৈরী হোতো। দাদা তাঁকে বললেন, ঔষধ পাওয়া যাবে তবে কাল কারণ এখানে সেটা এখন নেই। ভদ্রলোক বললেন, 'অনেক খোঁজ করে আপনাদের এই ঠিকানা যোগাড় করে এসেছি ভবানীপুর থেকে—ঔষধটার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কাল অবশ্য অবশ্য ২ শিশি ঠিক করে রাখবেন—আমি এসে নিয়ে যাব—বলে ভদ্রলোক চলে গেলেন। দাদা বললেন, টাকা থাকলে ঔষধটা আনিয়ে দিতে পারতাম। হাতে একটি পয়সাও নেই। কালকেই বা কি করে করবো যদি পয়সা না পাই। আজও টাকার দরকার। যাক্ ঠাকুরের যা ইচ্ছা তাই হবে। প্রায় ১০ মিনিট পরে সেই ভদ্রলোক আবার ফিরে এলেন বললেন ওর দাম কত করে। দাদা বললেন ২ আউন্স শিশি ২ টাকা করে। তখন ভদ্রলোক চারটে টাকা নিয়ে দাদাকে দিলেন ও বললেন, 'দামটা নিয়ে রাখুন কাল এসে ঔষধ

নিয়ে যাবো। রাস্তায় খানিকটা গিয়ে মনে হোলো দামটা দিয়ে যাই, আমি তাই আবার এলাম।" দাদা বললেন, "ওর জন্য কেন ব্যস্ত হলেন—আমি ঔষধ কাল ঠিক করে রেখে দেব।' যা হোক, ভদ্রলোক টাকা দিয়ে চলে গেলেন। দাদা হাসলেন ও বললেন দেখলি ঠাকুরের কি দয়া—আজ আহারের টাকা নেই তাই লোকটা ফিরে গিয়েও—আবার এসে টাকা দিয়ে গেলো, এ ঠাকুরের প্রেরণায় হোলো। ঐ টাকা দিয়ে আমি একটা ঔষধ কিনে এনে দিলাম—দাদা অপর ঔষধের সঙ্গে মিশিয়ে দু'শিশি ঔষধ করে রাখলেন। বাকী টাকায় আহারের ব্যবস্থা হোলো। এই সময় রাত্রে আমি ও দাদা প্রায় মুড়ি ও ১ টা করে বরফি খেয়ে থাকতাম ঐ ঘরে। এই রকম কত যে আশ্চর্য আশ্চর্য ঠাকুরের কৃপার নিদর্শন দেখেছি তা বলবার নয়—আর অনেক ভুলেও গিয়েছি। দাদা প্রত্যহ Diary (ডাইরী) লিখতেন দৈনন্দিন ঘটনা দিয়ে। বারাণসী ঘোষ লেনে সেই সব Diary (ডাইরী) বাইরের ঘরের তাকে রাখা হয়েছিল—উই পোকায় সব কেটে নষ্ট করে দিয়েছে। নিমাই (আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র) বলছিল একটি Diary (ডাইরী) সে তার কাছে রেখেছে কিছু ভাল ছিল। ঐ Diary (ডাইরী) পড়তে পড়তে আমার দু চোখ জলে ভিজে যেতো। আমাদের অভিভাবক শ্রীশ্রীগৌররায়জীউর অচিন্ত্য কৃপার কত নিদর্শন যে ঐ ডায়রী গুলিতে লেখা ছিল তা বলা যায়না—আর সব ঘটনা আমার জানা বা মনে নেই। এই সময় দাদার অনুগত ভক্তদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন তাঁদের কয়েকজনের নাম আমি লিখছি যেমন—শ্যামাপদ সিংহ (ইনিই কেবল পরে দাদার কাছে দীক্ষা পেয়েছিলেন) B.L. হরিমোহন বাবু (হরিমোহন শীল) মার্চেন্ট অফিসে ভাল কাজ করতেন। নিরঞ্জন বাবু গর্ভণমেণ্ট অফিসে কাজ করতেন। রাধাশ্যামবাবু এটর্নী ক্ষীরোদ প্রসাদ গাঙ্গুলী ঢাকায় বাড়ী। পঞ্চানন ঘোষ দেবকীনন্দন ধর্মপুস্তকালয়ের মালিক, এ ছাড়া ঢাকা ষ্টোর্সের মালিক যোগেশ দে, তার দাদা সুরেশ দে (যুগলের বাবা এই রকম আরো অনেকে। কিন্তু তখন আমাদের পরম সুহৃদ, হিতকারী ভক্তপ্রবর জ্ঞানবাবুর (জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, প্রসিদ্ধ মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী দ্বারিক ঘোষ মহাশয়ের বড় ছেলে) সঙ্গে দাদার তখনও আলাপ হয়নি। এ ছাড়া বহু ভক্ত সমাগম হোতো প্রত্যহ ঐ ডিস্পেন্সারীতে দাদার প্রথম শিষ্য ছিল যশোহরের মদনমোহন সাহা—আমাদের বংশে তাদের বাড়ীর সকলে শিষ্য ছিল—আমার ছোটকাকার কাছ থেকে তাদের বাড়ীর অনেকে দীক্ষা নিয়েছিল। দাদার কাছে কত লোক যে দীক্ষার জন্য আসতেন তা বলা যায়না—কিন্তু তিনি কাউকে দীক্ষা দিতেননা। ধর্ম সম্বন্ধীয় পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশ হোতো—তাতে চতুর্দিকে তাঁর পাণ্ডিত্য ও সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। সপ্তাহে কম করে ২/৩ স্থানে তাঁর বক্তৃতা

হোতো। দাদা পাঠ করা পছন্দ করতেন না—যদিও তিনি তা ইচ্ছা করলে করতে পারতেন, তিনি বলতেন বক্তৃতা দ্বারা বেশী প্রচারের সুবিধা হয় ও শ্রোতারা ভাল বুঝতে পারে। ৪০ নং সিমলা স্ট্রীটে যে ঘরে আমরা থাকতাম—বাড়ীওয়ালাদের বাড়ী ভাগ হয়ে যাওয়ায়—আমরা সিমলা স্ট্রীটের ওপর আর একখানি ঘরে উঠে গেলাম—এটা যতীনবাবুর ভাইপো চারুবাবুর অংশে, উনি বড় এর্টনী ছিলেন ও দাদাকে সকলে খুব ভক্তি করতেন। ঠিক এই ঘরের পরই বিবেকানন্দ রোড তৈয়ারী হয়—আমাদের চোখের সামনে। তখন আমি 1st Class 'এ পড়ি। এই ঘরে আমার Para typhoid (প্যারা-টাইফয়েড) হয়—দাদাকে সব কিছু করতে হোতো। আরতো কেউ ছিল না। এই অসুখের পর দাদা নির্মলদাদাদের বাড়ীর উপরে একটা ঘর ভাড়া নেন ও মাদের ভাজনঘাট থেকে নিয়ে আসেন। নীচের ঘরে রান্না হোতো। সে সময় বুড়ি ও মা এসেছিলেন—সেজদাদা শ্যামকুড়ে কবিরাজী করতেন। আমার মেজদাদা অল্পবয়সে ভাজন ঘাটে মারা যান। ৪ নং ভীমঘোষ বাই লেনে ঐ বাড়ী। ঐখান থেকে আমি Matric (ম্যাট্রিক) পাশ করি—নির্মলদার ছোট ভাই নন্দ আমার সমবয়সী ছিল—সে কমলা হাইস্কুলে পড়তো। একই সঙ্গে পড়তাম তবে সে পাশ করতে পারেনি। ঐ বাড়ীতে Matric (ম্যাট্রিক) দেবার পর দাদা আমার পৈতে দেন—নন্দর ও একই সঙ্গে পৈতে হয়। কোনও ঘটা হয়নি—কেবল নিয়ম মত পৈতে হয়েছিল—গ্রামে আমাদের পুরোহিত এসে পৈতে দিয়েছিলেন। দাদার প্রথম বই "জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম" ছাপা হয়েছিল। দাদা তখন শ্রীনামচিন্তামণি লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। বক্তৃতাসূত্রে দাদার চিকিৎসা ব্যবসার কিছু উন্নতি হয় এই সময়—আর আমাদের "যাযাবর" বৃত্তিও বন্ধ হয়। পাশ করার পর দাদা আমাকে সিটি কলেজে I.Sc Class'এ (উচ্চ মাধ্যমিক ভর্তি করে দেন—স্বনামধন্য অধ্যক্ষ হেরম্ব মৈত্র মহাশয়কে বলে। তিনি আমার পিতা ঠাকুরের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন ও আমায় Free Studentship (বিনামাহিনার ছাত্র) দিয়েছিলেন। এই সময় দাদার অর্থাভাব চলছিল। আমার জেঠামহাশয়ের ছেলে হরিজীবনদা তখন গৌহাটি টেলিগ্রাফ অফিসে কাজ করতেন—তিনি দাদাকে লিখে আমায় Govt Telegraph Office (সরকারী টেলিগ্রাফ অফিস)' এ ঢুকিয়ে দেবার জন্য বলেন। আমার ইচ্ছা পড়াশোনা করা—আমার সহাধ্যায়ী (কেশব চ্যাটার্জী এইবার Matric (মাধ্যমিক) পরীক্ষায় 1st হয়েছিল—সে আমার খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। আমার সহাধ্যায়ীদের প্রায় সকলেই কলেজে ভর্তি হয়েছিল। সেইজন্য আমারও কলেজে পড়ার খুব ইচ্ছা কিন্তু দাদার আর্থিক অনটন তাঁকে সংসার চালাতে খুব অসুবিধায় ফেলেছিল—তিনি আমায় টেলিগ্রাফ অফিসে ঢোকবার জন্য re-

cruitment (ভর্ত্তির হওয়ার) পরীক্ষা দেবার জন্য বিশেষ করে বুঝিয়ে বলেন। তখন P & T Department (পি এণ্ড টি বিভাগ)'এ Telegraphist recruitment মাত্র দুটো College (কলেজে) হোতো। একটা Scottish Church College 'এ (স্কটিশ চার্চ কলেজ) আর একটা South Subarban College 'এ (সাউথ সুবারবন কলেজ, বর্তমানে আশুতোষ কলেজ ভবানীপুর)। ১ বৎসর অন্তর Competitive (প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা করে ১৫ জন করে ছাত্র নেওয়া হোতো, প্রতি কলেজে—সঙ্গে I.Sc (উচ্চমাধ্যমিক বা আই. এসসি) পড়ার ব্যবস্থা ছিল। Scottish Church College 'এ (স্কটিশ চার্চ কলেজ) Telegraph Training Class (টেলিগ্রাফ প্রশিক্ষণ শ্রেণী) ছিল School (স্কুল) এর একটি ঘরে। প্রত্যহ কলেজ সেরে এসে এই Training (প্রশিক্ষণ নিতে হোতো। Instructor (প্রশিক্ষক) Telegraph Office টেলিগ্রাফ অফিস) থেকে আসতো। আমি ঐ পরীক্ষা দেবার জন্য দরখাস্ত করলাম—এদিকে City College (সিটি কলেজ)' এও পড়তে লাগলাম। আমার সঙ্গে প্রসিদ্ধ ক্রিকেটার কার্তিক বোসও পড়তো। অবশ্য আমার সঙ্গে তার আলাপ হয়নি—কারণ আমি ২ মাস পরে Transfer (বদলী) নিয়ে চলে এসে Scottish'এ Telegraph Training (টেলিগ্রাফ প্রশিক্ষণ)'এ join (যোগদান) করি। ঐ recruitment (ভর্ত্তির) পরীক্ষায় প্রায় ২৫০ জন ছাত্র appear (বাছাই) হয়েছিল। আমি তখন যিনি আমাদের Headmaster (প্রধান শিক্ষক) ছিলেন Mr. P.C. Kar (মিঃ পি.সি. কর) তাঁকে ঐ পরীক্ষা দেবার কথা বলি ও আমাদের বর্তমান আর্থিক অবস্থার কথাও জানাই। তিনি আমায় খুব স্নেহ করতেন। তিনি আমাদের ইংরাজীর Class Teacher ও (শ্রেণী শিক্ষক) ছিলেন। তিনি খুব উৎসাহ দেন ও বলেন "তোর আর্থিক অবস্থা আমি আগে থেকেই জানতাম কারণ প্রায় প্রতিমাসে তোকে চার আনা Fine (জরিমানা) দিয়ে মাহিনা দিতে হোতো। স্কুলে ক্লাস Class 10Th থেকে 1st Class (১ম থেকে ১০ম)'এ ৪ টাকা করে মাহিনা ছিল। আমি অধিকাংশ মাসে ১৫ তারিখের মধ্যে মাহিনা দিতে পারতাম না। প্রায় মাসের শেষাশেষি চার আনা Fine (জরিমানা) দিয়ে মাহিনা দিতাম। একবার Class (শ্রেণী) পরীক্ষায় 1st (প্রথম) হওয়ায় আমি 8 টাকা Scholarship (ছাত্রবৃত্তি) পেয়েছিলাম, সেইবার একবৎসর মাহিনা দিতে হয়নি। হেমদাদার কথা আগে লিখেছি তিনি আমায় খুব স্নেহ করতেন—আর মধ্যে মধ্যে আমার School Fee (স্কুল মাহিনা) ও দিয়ে দিতেন। City কলেজে ভর্তি হলে তিনি আমায় আর্থিক বিষয় অনেক সাহায্য করেছিলেন—আর আমাদের দেশে মণি সেন মহাশয় (Prof M. Sen—অধ্যাপক

এম. সেন) আমাকে সব পুস্তক বিনামূল্যে দিয়েছিলেন। যাহা হোক Telegraph recruitment পরীক্ষা দিলাম। এবং শ্রীশ্রীগৌররায়জীর কৃপায় আমি 14Th Stand (চতুর্দশ স্থান অধিকার) করলাম প্রথম ১৫ জনের মধ্যে। কিন্তু একটা বাধা এলো হঠাৎ P.M.G (পি.এম.জি) জানালেন Dictation'এ (লিখিত পরীক্ষা) যারা 50% number (৫০% নম্বর) পেয়েছে তাঁদের নিতে হবে। এর পূর্বে নিয়ম ছিল Dictation 'এ (লিখিত পরীক্ষা) 40% number (৪০% নম্বর) থাকলেই নেওয়া হবে, তবে, Compete (প্রতিযোগিতা) করা চাই। আমার 45% number (৪৫% নম্বর) ছিল সুতরাং আমার হবেনা জান্‌লাম—যদিও 14Th Place (চতুর্দশ স্থান) পেয়েছি। কিন্তু Head master (হেড মাষ্টার) মহাশয়—Principal Dr, Watt (অধ্যক্ষ ডঃ ওয়াট্) সাহেবকে হঠাৎ এই পরিবর্তনের কথা জানালে Watt (ওয়াট্) সাহেব P.M.G (পি.এম.জি) কে phone (ফোন) করে Protest (আপত্তি) করেন, পরীক্ষার পূর্বে এ কথা না জানানোর জন্য। তাঁর স্কুলের মধ্যে আমিই একমাত্র ছাত্র যে Compete (প্রতিযোগিতা) করেছিলাম। যাহা হোক P.M.G (পি.এম.জি) শেষ পর্যন্ত রাজী হন কিন্তু Watt (ওয়াট্) সাহেব ঐ Training Class (প্রশিক্ষণ শ্রেণী) ভবিষ্যতে তাঁর স্কুলে রাখতে বারণ করেন। সুতরাং আমাকে Training Class (প্রশিক্ষণ শ্রেণী)'তে join (যোগদান) করবার জন্য পত্র এলো। Principal (অধ্যক্ষ) এর সঙ্গে সকালে Interview (সাক্ষাৎকার) করার জন্য ডাকা হোলো। দুঃখের বিষয় ঐ চিঠি বিলম্বে পাওয়ায় আমি Interview (সাক্ষাৎকার) এর দিন হাজির হতে পারলাম না—অন্য সকলের Interview (সাক্ষাৎকার) হয়ে গেলো। কি ব্যাপার বুঝতে না পেরে হেডমাষ্টার মহাশয় সন্ধ্যের সময়ে স্কুলের একজন বেয়াড়াকে আমাদের ৪০% নং সিমলা ষ্ট্রীটের দোকানে পাঠালেন। তার কাছে জানতে পেরে পরের দিন তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম ও পত্র না পাওয়ার কথা জানালাম। তখন তিনি তার পরের দিন ১২ টার সময় স্কুলে যেতে বললেন—Dr. Watt (ডঃ ওয়াট্) নাকি আমি হাজির না হওয়াতে খুব দুঃখ করেছিলেন—ঐদিন তিনি আবার আসবেন ও আমার Interview (সাক্ষাৎকার) নেবেন। আমি ঐ সময় হাজির হলাম। আমার Twill Shirt (টুইল-শার্ট)'এ Color (কলার) টা উল্টে ছিল। Principal Dr. Watt (প্রিন্সিপাল ডঃ ওয়াট্) উঠে এসে আমার Color (কলার) টা ঠিক করে দিয়ে বললেন "Be Smart" (চটপটে হও)। ও কতকগুলি প্রশ্ন করে আমায় বললেন, 'তুমি আমাদের স্কুলের একজন ভাল ছাত্র তোমার হেডমাষ্টার মহাশয়ের কাছে শুনেছি—তাই তোমার জন্য আমি P.M.G (পি.এম.জি) এর সঙ্গে ঝগড়াও করেছি। যাহা হোক "Wish you

Good luck" (তোমার সৌভাগ্য কামনা করি) বলে বিদায় দিলেন। এবার আমার Health Examination (স্বাস্থ্য পরীক্ষা) হবে। তার পূর্বে আমাদের সকলের P.M.G (পি.এম.জি) এর সঙ্গে Interview (সাক্ষাৎকার) হয়ে গেল। একজন নূতন মাষ্টার মহাশয় আমাদের সকলকে নিয়ে P.M.G Office (পি.এম.জি অফিস)'এ গিয়েছিলেন। তিনি Lower Class (নীচুশ্রেণী) তে পড়াতেন, আমার সঙ্গে পরিচয় ছিলনা। P.M.G তাঁকে আমার কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন এ আমাদের স্কুলের "One of the Best boy" (সবচেয়ে ভাল ছাত্রদের অন্যতম) যদিও আমার বিষয়ে তিনি বেশী কিছু জানতেন না। P.M.G (পি.এম.জি) আর আমায় কিছু জিজ্ঞাসা না করে পাঠিয়ে দিলেন। দাদার মনে মনে খুব আনন্দ হোলো ঠাকুর কৃপা করে আমার একটা ব্যবস্থা করে দিলেন তাঁর আর্থিক সাহয্যের জন্য। যদিও আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেলো Higher Education (উচ্চতর শিক্ষা) টা বন্ধ হয়ে যাওয়ায়। পরম শ্রদ্ধেয় হেরম্ব মৈত্র মহাশয়কে দাদা গিয়ে সব বলায় তিনি Transfer Certificate (ট্রান্সফার সার্টিফিকেট) দিতে বললেন। এ'দিকে Medical College (মেডিকেল কলেজ)'এ গিয়ে Health (স্বাস্থ্য) পরীক্ষায় পাশ করতে হবে তবে Training Class (প্রশিক্ষণ শ্রেণী) তে যোগদান করা যাবে। প্রথম Batch (ব্যাচ)'এ ৮ জনকে পাঠালে—Prof of Surgery (শল্য বিভাগের অধ্যাপক) সাহেব দুজনকে ফেল করে দেন। দ্বিতীয় Batch (ব্যাচ) আমাদের যাবার কথা কিন্তু দুজন ফেল হওয়ায় আমার ভয় হোলো কারণ তখন আমি খুব রোগা (Sickly) ছিলাম। দাদাও চিন্তিত হোলেন এ'সময় ঠাকুরের কৃপায় দাদার অনুগত নিরঞ্জনবাবু এলেন ও সব শুনে বল্লেন ভয়ের কিছু নেই—Medical College এর Principal ও Supdt Dr. Mukherjee'র সঙ্গে আমার পরিচয় আছে তাঁর কাছ থেকে Medical Fit Cartificate পাইয়ে দেব তিনিও I.M.S (আই.এম.এস.) সুতরাং Medical আইনে তাঁর Certificate Valid (সার্টিফিকেট বৈধ) হবেই। তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করে পরের দিন আমাকে তাঁর বাড়ীতে Hospital এর পাশেই আমাকে সন্ধ্যার সময় নিয়ে গেলেন আমার সঙ্গে দুজন বন্ধুও গেলো। ১৬৲ করে Fee (ফি) দিলাম তিনি বিশেষ কিছু পরীক্ষা করলেন না, বললেন কাল দশটার সময় College এ (কলেজ) গিয়ে Office (অফিস) থেকে Certificate (সার্টিফিকেট) নিয়ে Training Class (প্রশিক্ষণ ক্লাস) এর Instructor (প্রশিক্ষক) কে দিলে তিনি join (যোগদান) করতে বললেন। সঙ্গে সঙ্গে Scottish Church College (স্কটিশ চার্চ কলেজ) এ ভর্তি করে নিলেন। College (কলেজ) এর Fee (মাহিনা) মাসে ৮৲ টাকা করে। তা দেবার আমার

ক্ষমতা নেই—হেডমাষ্টার মহাশয়কে (Mr. P.C. kar) বললাম তিনি সঙ্গে সঙ্গে আমাকে Free (মাহিনা মকুব) করে দিলেন ও বললেন তুই স্কুলে অনেক টাকা Fine (জরিমানা) দিয়েছিস—তোকে Free (বিনা মাহিনা) করে দিলাম। তবে তোরা Pass (পাশ) করলে Govt (সরকার) থেকে ৭৫্ করে দেবে সেটা থেকে স্কুলের Fee (মাহিনা) হিসাবে আমাদের দিবি। আমিও সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলাম। তাঁর উপকার জীবনে ভুলবার নয়। ইচ্ছে ছিল একটু ভাল বেতন হলে তাঁর বাড়ী গিয়ে কিছু Present (উপহার) করব। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি তার আগেই মারা গিয়েছেন। এখানে আমার নিজের বিষয়ে ২/১টি ঘটনা আমি লিখছি—সেটাতে শ্রীশ্রীগৌররায়জীর কৃপার নিদর্শন পাওয়া যায় আর পরোক্ষভাবে দাদারও সম্বন্ধ এতে আছে। ছাত্রাবস্থায় বাবা মারা যাবার পর দাদার আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ হওয়ায়—আমার কোন মাষ্টার পড়ায় সাহায্য করার ব্যপারে ছিলনা। প্রথমে কিছু সময় পশুপতি রায় বলে এক ভদ্রলোককে আমাদের বিডন ষ্ট্রীটের বাড়ীতে থাকতে দেওয়া হয়েছিল—তিনি বসন্তদাদার পরিচিত ছিলেন—পোষ্ট অফিসে কাজ করতেন। আমাদের বাড়ী থাকতেন আর খেতেন হোটেলে। তিনি কিছুদিন আমায় পড়ান ঐ Free থাকার দৌলতে। পরে তিনি রামকৃষ্ণপুর হাওড়ায় বদলী হয়ে যান। তখন থেকে আমাকে নিজেই পড়াশোনা করতে হোতো। যখন 2nd Class এ উঠলাম তখন Additional Mathematics (অতিরিক্ত অংক) ও সংস্কৃত নিতে হোলো। সেই সময়ও আমার কোন মাষ্টার নেই বা সাহায্য করবার মত কেউ বাড়ীতে ছিল না। আমি নিজের চেষ্টায় পড়তাম ও ঠাকুরের কৃপায় পরীক্ষায় ভাল ফলই হোতো। প্রতি বৎসর কোন না কোনও বিষয় আমি Prize (পুরস্কার) পেতাম দাদা আমার Prize (পুরস্কার) এর সময় গিয়ে দেখতেন অনেক বার। Prize (পুরস্কার) Scottish College (স্কটিশ কলেজ') এ হোতো। 2nd Class'এ আমাদের অঙ্কের একজন খুব বিচক্ষণ মাষ্টার মহাশয় ছিলেন তাঁর নাম শ্রীসুরেন্দ্র নাথ মিত্র। অন্য স্কুলেও তাঁর অঙ্ক বিষয়ে খুব সুখ্যাতি ছিল। একদিন তিনি আমায় ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন যে আমায় বাড়ীতে কে পড়ায়? আমার আর্থিক অবস্থার কথা শুনে ও আমার কোন মাষ্টার নেই জেনে তিনি আমায় বললেন,—শ্যামবাজারে আমার একটি Coaching আছে—অনেক ছেলে পড়ে, তুমি এখন থেকে সপ্তাহে তিনদিন গিয়ে আমার কাছে পড়বে, মাইনে দিতে হবে না। আমাদের স্কুলের অনেক ছেলে এমন কি Scholarship পাওয়া ছেলেরা সেখানে পড়তো। আমি হাতে স্বর্গ পেলাম—দাদা শুনে খুব আনন্দিত হলেন ও এটা যে ঠাকুরের কৃপায় হয়েছে তা আমায় বুঝিয়ে দিলেন। আমি সপ্তাহে তিনদিন

সন্ধ্যার সময় শ্যামবাজারে চৌধুরী লেনে তাঁর বাড়ীতে পড়তে যেতাম। আমি Additional অতিরিক্ত সংস্কৃত নিয়েছিলাম। আমাদের হেড পণ্ডিত মহাশয় শম্ভুনাথ কাব্য ব্যাকরণ তীর্থ মহাশয় তাঁর Class monitor (শ্রেণী পরিচালক) করে দিয়েছিলেন। আমাকে Class'এ সব ঠিক করতে হোতো Attendance (হাজিরা) খাতায় লিখতে হোতো ও খাতাপত্র সব ঠিক করে রাখতে হোতো। ফলাফল ভালই করছিলাম। ননীবাবু বলে আমাদের একজন Senior (সিনিয়র) মাষ্টার মশাই সাধারণ অংক করাতেন। যখন 1st Class 'এ উঠলাম—তখন কি একটা কারণে আমাদের Additional (অতিরিক্ত) অঙ্কের মাষ্টার মহাশয় সুরেনবাবুর সঙ্গে আমাদের পণ্ডিত মহাশয়ের ঝগড়া হয়—আর তার ফলে সুরেনবাবু আমাকে ডেকে বলেন তুমি Additional Sanskrit (অতিরিক্ত সংস্কৃত) ছেড়ে কাল থেকে mechanics (মেকানিক্স) নিয়ে পড়বে আমার কাছে। আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম সর্বনাশ। 2nd Class'এ mechanics (মেকানিক্স)'এ Statics (স্থিতিবিদ্যা) পড়ান হয় আর 1st Class 'এ Dynamics (গতিবিদ্যা) পড়ান হয়। আমি তো Statics পড়িনি আর 1st Class য়ে Dynamics পড়ার সঙ্গে Statics নূতন করে কোথায় পড়বো—সর্বনাশ। আমি মাষ্টার মহাশয়কে আমার অসুবিধার কথা বললাম। তিনি বললেন সে ভার আমার—যদি আমার Coaching Class (কোচিং ক্লাস)'এ পড়তে চাও তবে আমি যা বলছি করতে হবে—তা না হলে Coaching (কোচিং) ছেড়ে দাও। এর আগে মাষ্টার মহাশয় একজন ভাল শিক্ষক রেখে ইংরাজীটাও আমাকে Free পড়বার সুযোগ দিয়েছিলেন। শ্যামবাজার ষ্ট্রীটের ওপর একটা ভাল ঘর ভাড়া নিয়ে, তিনি Coaching Class (কোচিং ক্লাস) সেইখানে বাড়ী থেকে Shift (স্থানান্তর) করেছিলেন। আমি ভেবে বলবো বলে বাড়ী এসে দাদাকে সব বললাম। দাদা বললেন, 'আমি কি বলবো, বল—তুমি যেটা ভাল মনে কর, কর। আমাকে সংস্কৃত ছাড়তে হোলো—পণ্ডিত মশাই খুব দুঃখিত হলেন—গোঁসাই এর ছেলে সংস্কৃত ছেড়ে দিবি বল্লেন। কিন্তু Coaching (কোচিং) পড়ার advantage (লাভ) ছাড়তে পারলাম না বাধ্য হয়ে mechanics মেকানিক্স) নিলাম—কিন্তু এর ফলে আমার ফাইনাল পরীক্ষা ততটা ভাল হোলোনা কারণ সমস্ত পড়ার সঙ্গে দু'বৎসরের Course (কোর্স) একবৎসরে ও বাড়ীতে পড়া আমি সামলে উঠতে পারছিলাম না। সুরেন বাবু আমাকে Briggs & Bryant (ব্রিগম এণ্ড ব্রায়ান্ট) এর একটা নূতন বই দেন আর বলে দেন আমি যে Portion (অংশ) গুলো দাগ দিয়ে দিলাম—তুমি Statics এর সেই portion গুলো ভাল করে মুখস্থ কর—সব ঠিক হয়ে যাবে—ঘাবড়িয়োনা। সত্যি তাঁর অং

কশাস্ত্রে যে কি আসাধারণ জ্ঞান তাঁর কাছে না পড়লে বোঝা যায়না। তার ছাত্র কেউই ফেল করতো না। Matric (ম্যাট্রিক) এর Scholarship (ছাত্রবৃত্তি) পাওয়া ছেলেরাও অনেকে তাঁর ছাত্র ছিল। যাহা হোক Matric (ম্যাট্রিক) পরীক্ষায় আমি ভালভাবেই 1st Division'এ পাশ করেছিলাম। তবে এই গোলমালটা না হলে আমার ফল আরো ভাল নিশ্চয়ই হোতো। তিনি আমাকে খুব ভাল বাসতেন। তাঁর ঋণ শোধ করা কঠিন। জীবনে তাঁর সঙ্গে একদিন ট্রামে দেখা হয়েছিল—তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিলাম—তিনিও খুব আনন্দিত হয়েছিলেন আমায় দেখে। পরে তিনি Scottish ছেড়ে দিয়েছিলেন ও বাড়ীও বদল করে কোথায় চলে গিয়েছিলেন শুনেছিলাম। Telegraph Training Class (টেলিগ্রাফ ট্রেনিং ক্লাস)' এ দুবৎসরের Course (কোর্স) কারণ সঙ্গে I.Sc (আই.এসসি) পড়তে হোতো। পাশ করে Central Telegraph office (কেন্দ্রীয় টেলিগ্রাফ অফিস)' এ যোগ দিলাম as a Telegraphist (টেলিগ্রাফিস্ট) হয়ে। মাহিনা মাত্র ৮০্ টাকা শেষ ১৭০্ । তখন সব অফিসে মাহিনা ছিল ৩০/৪০্ মাত্র। Telegraph office'এ (টেলিগ্রাফ অফিসে) ছুটি কম ও night Duty (নৈশ কর্তব্য) ছিল বলে Starting pay (প্রারম্ভিক মাইনে) ৮০্। অন্য অফিসের লোকেরা অবাক হয়ে যেতো। Post office'এর (পোষ্ট অফিসের) মাহিনা ও কম ছিল। তাছাড়া আমাদের অফিসে anglo-Indian(ইঙ্গবঙ্গ) খুব বেশি ছিল সেজন্য British Govt Starting pay (ব্রিটিশ সরকার প্রারম্ভিক মাইনে) টা বেশী করেছিল। দ্বিতীয়বার অর্থাৎ Training Class থেকে পাশ করার পরই আবার আমায় Health Examination (স্বাস্থ্য পরীক্ষা) দিতে Medical College (মেডিকেল কলেজে)'এ Prof of Surgery Dr. Harnett (শল্য বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ হর্নেট্) এর কাছে যেতে হ'ল। তাঁর Asstt (সহকারী) ডাক্তার আমায় কতকটা unfit (অযোগ্য) করেছিল কিন্তু সাহেব ডাক্তার আমার পরীক্ষা করে fit (যোগ্য) করে দেন। বেলা দশটার সময় অফিসে গেলাম join (যোগদান) করতে। Join (যোগদান) করার পর কাজ শিখতে আমায় একজন ছেলের পাশে বসিয়ে দিলেন। "টরে টক্কা" শব্দ শুনে Telegram (টেলিগ্রাম) লেখা। ১০-৬টা Duty (কাজ)—প্রথম দিন চোখ ভেঙ্গে জল এলো। কোথায় বন্ধুরা College'এ সব B.Sc (বি.এসসি) পড়ছে—আর আমি কি অবস্থায় পড়লাম। তাদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। Training Class (প্রশিক্ষণ ক্লাস) থেকে পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে ৭৫্ টাকা আমার Allowance (ভাতা) এলো সেটা লিখে স্কুলকে দিয়ে দিলাম। হেডমাষ্টার মহাশয়কে নমস্কার করে তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে চলে এলাম। জীবনে আর ঐ স্কুলে ঢুকিনি।

আমার কর্মময় জীবন অন্য খাতে আরম্ভ হোলো। সবচেয়ে আনন্দের বিষয় হোলো যে দাদাকে এখন থেকে আমি সামান্য সাহায্য করতে পারব, যিনি তাঁর সমস্ত জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ আমাদের জন্য ত্যাগ করেছিলেন। কিসে আমাদের মঙ্গল হবে, কেবল এই চিন্তা তাঁর সর্বদাই ছিল। শ্রীশ্রীগৌররায়জী আমাকে এই কর্মস্থলে নিয়োজিত করে দাদাকে সংসারের হাত থেকে উদ্ধার করে—তাঁর নাম ও প্রেমধর্ম প্রচারের দ্বারা জগতের মঙ্গল সাধন করা ও তাঁর নিজভজনে একান্ত ভাবে নিযুক্ত করার ব্যবস্থা করে দিলেন। এজন্যে আমি সৌভাগ্যবান। পরে আর আমার কোন আক্ষেপ ছিলনা Higher Education (উচ্চতর শিক্ষা) এর জন্য।

চতুর্থ পর্ব

এর পূর্বে আমরা ৪ নং ভীমঘোষ বাইলেনে নির্মলদার (শ্রীনির্মল চন্দ্র গোস্বামী মিতুর বাবা) বাড়ীতে উপরে একটি শোবার ঘর ভাড়া নিয়েছিলাম—আর রান্নাঘরে Partition (বিভক্ত) করে ছোট অংশে আমরা রান্না করতাম। মা, বুড়ি ও আমি বাড়ীতে থাকতাম—দাদা ডিস্‌পেন্‌সারীতে থাকতেন—বাড়ী এসে খাওয়া দাওয়া করে যেতেন। এ' সময় আমাকে রোজকার বাজার-অর্থাৎ চাল, ডাল, তেল থেকে তরিতরকারী প্রত্যহ করতে হোতো নগদ দামে। এখান থেকে আমি Matric (ম্যাট্রিক) পাশ করে Training Complete (প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ) করে অফিসে Join (যোগদান) করি। পরে নির্মলদা Corporation'এ (কর্পোরেশনে) Officer (অফিসার) ছিলেন—বালীগঞ্জে নিজের বাড়ী করে চলে যান—আর আমরা ৪০ নং সিমলা ষ্ট্রীটের বাড়ীতে উপরে একটা ঘর নীচে রান্না ঘর ও Seperate (আলাদা) কল পায়খানা সমেত ভাড়া নিয়ে ওখানে উঠে যাই। নীচের ঘরে Dispensary ছিল। সভা সমিতি ও বৈষ্ণবজগতে দাদার খুব খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। আমি মাহিনা ৮০৲ টাকার সবটাই এনে দাদাকে দিতাম, দাদা সেখান থেকে আমাকে ১০৲ টাকা দিতেন Tram (ট্রাম) এর ভাড়া (পরে Monthly Ticket[মাসিক টিকিট] হয়েছিল) ও অফিসে Tiffin (টিফিন) এর জন্য। তখন সবই খুব সস্তা ছিল। দু'আনার জল খাবারে পেট ভরে যেতো। দাদার নিজের হাতের লেখা একটা হিসাবের খাতা আছে এখানে—তাতে তাঁর নিজের হাতে লেখা আছে দধির মাহিনার দরুন ৮০৲ জমা। এই ৮০৲ টাকা ছাড়া অন্য আর কোন Allowance (ভাতা) বা ঐরকম কিছু ছিলনা। তবে অন্য উপায়ে বেশ আয় ছিল (১) Over-time (ওভার টাইম) (২) pie-money (উপরি টাকা)। যারা ভাল Work (কাজ) করতো তার ঐ দুটোর সুযোগে অনেক টাকা উপরি রোজগার করত। আমি নূতন সুতরাং ঐ দুটোর

কোনটাই পেতাম না। অবশ্য কয়েক বৎসর পর আমি pie-money (উপরি টাকা) যাকে Score (অতিরিক্ত) করা বলতো, করে মাসে আরও ৩০/৪০ টাকা উপার্জন করতাম। এটা দাদা আমাকেই নিতে বলতেন। আমি দাদার উপদেশ ও নিরঞ্জন বাবুর চেষ্টায় Life-insurance (জীবন বীমা) করিয়েছিলাম Postal Life-insurance (ডাক সংক্রান্ত জীবন বীমা) আমার Pay (মাহিনা) থেকে কেটে নিত। বৎসরে ৫টাকা করে Increment (মাহিনা বৃদ্ধি) হোতো—তাও Signalling এ Test পরীক্ষায় পাশ করলে। এই সময় শ্রীশ্রীগৌররায়জীর অপার কৃপায় আমাদের পরম হিতৈষী ও পরমভক্ত জ্ঞানবাবুর সঙ্গে দাদার পরিচয় ঘটে। পানিহাটীতে দণ্ডমহোৎসবের এক উৎসবে আমি দাদার সঙ্গে—শ্যামাপদ বাবু, নিরঞ্জন বাবু হরিমোহন বাবুরাও গিয়েছিলেন, গিয়েছিলাম। গঙ্গার ধারে বটবৃক্ষ তলে—বৈষ্ণব প্রধান শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী মহশয়ের কীর্তন শুনতে। কীর্তন সমাপ্ত হলে আমরা গঙ্গার ঘাটে বসেছিলাম। শ্যামাপদ বাবু জ্ঞানবাবুকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন দাদার কাছে। শ্যামাপদ বাবুর সঙ্গে জ্ঞানবাবুর বেশ পরিচয় ছিল আগেই। জ্ঞানবাবু বিখ্যাত মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী দ্বারিক ঘোষের বড় ছেলে। তখন তাঁদের মিষ্টান্ন ব্যবসায় কলকাতায় সাড়া জাগিয়েছে—লক্ষ লক্ষ টাকা আয়। জ্ঞানবাবু একটা হাতকাটা ফতুয়া ও একটা ছোট বহরের ধুতি পরেছিলেন। দাদাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। দাদা তাঁকে কাছে বসিয়ে আলাপ করলেন। কি দৈনমূর্তি জ্ঞানবাবুর—অতবড় ধনী বুঝবার উপায় নেই। তিনি প্রথমে রামকৃষ্ণ মিশনে ছিলেন পরে ভাল না লাগায় অজিত গোস্বামী (শ্যামবাজার উত্তরা সিনেমার সামনে নলিনী সরকার ষ্ট্রীটে (?) তাঁর বাড়ী খুব সুন্দর চেহারা—উপাধি অজিত রায়—পরে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করে অজিত গোস্বামী নাম নেন—বহু শিষ্য। জ্ঞানবাবু তাঁদের বাড়ী যেতেন ও তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তিনি জ্ঞানবাবুকে তাঁর গুরুদেব বাঘনা পাড়ার গোস্বামী শ্রীমৎ গৌরগোবিন্দ গোস্বামীর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করান। পরে কেবল টাকা চাওয়ায় জ্ঞানবাবু অজিত গোস্বামীর উপর বিরক্ত হন—অন্যস্থানে সৎসঙ্গ পাবার জন্যে ঘোরাঘুরি করেন—শ্যামাপদ বাবুর সঙ্গে সেই সময় আলাপ হয় ও শ্যামাপদ বাবু তাঁকে দাদার সম্বন্ধে বলেন। কিন্তু জ্ঞানবাবু দাদার সঙ্গে আলাপ করতে সাহস করেন না। পরে গঙ্গার ঘাটে দেখা করেন। আমরা এক সঙ্গে নৌকা করে কলকাতায় আসি। এরপর থেকে জ্ঞানবাবু প্রত্যহ সকাল ৭/৩০ টার সময় গঙ্গায় স্নান সেরে আমাদের বাড়ি যেতেন। এই ৪০ নং সিমলা ষ্ট্রীটের বাড়ীতে বুড়ির বিয়ে হয়—ইসলামপুর (মুর্শীদাবাদ জেলায়)। পাত্র অবনী ভূষণ চৌধুরী স্কুল শিক্ষক ছিলেন। এই বিবাহে অনেক লোক নিমন্ত্রিত হয়েছিল। ইসলামপুরের

আমার কর্মময় জীবন অন্য খাতে আরম্ভ হোলো। সবচেয়ে আনন্দের বিষয় হোলো যে দাদাকে এখন থেকে আমি সামান্য সাহায্য করতে পারব, যিনি তাঁর সমস্ত জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ আমাদের জন্য ত্যাগ করেছিলেন। কিসে আমাদের মঙ্গল হবে, কেবল এই চিন্তা তাঁর সর্বদাই ছিল। শ্রীশ্রীগৌররায়জী আমাকে এই কর্মস্থলে নিয়োজিত করে দাদাকে সংসারের হাত থেকে উদ্ধার করে—তাঁর নাম ও প্রেমধর্ম প্রচারের দ্বারা জগতের মঙ্গল সাধন করা ও তাঁর নিজভজনে একান্ত ভাবে নিযুক্ত করার ব্যবস্থা করে দিলেন। এজন্যে আমি সৌভাগ্যবান। পরে আর আমার কোন আক্ষেপ ছিলনা Higher Education (উচ্চতর শিক্ষা) এর জন্য।

চতুর্থ পর্ব

এর পূর্বে আমরা ৪ নং ভীমঘোষ বাইলেনে নির্মলদার (শ্রীনির্মল চন্দ্র গোস্বামী মিতুর বাবা) বাড়ীতে উপরে একটি শোবার ঘর ভাড়া নিয়েছিলাম—আর রান্নাঘরে Partition (বিভক্ত) করে ছোট অংশে আমরা রান্না করতাম। মা, বুড়ি ও আমি বাড়ীতে থাকতাম—দাদা ডিস্‌পেন্‌সারীতে থাকতেন—বাড়ী এসে খাওয়া দাওয়া করে যেতেন। এ' সময় আমাকে রোজকার বাজার-অর্থাৎ চাল, ডাল, তেল থেকে তরিতরকারী প্রত্যহ করতে হোতো নগদ দামে। এখান থেকে আমি Matric (ম্যাট্রিক) পাশ করে Training Complete (প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ) করে অফিসে Join (যোগদান) করি। পরে নির্মলদা Corporation'এ (কর্পোরেশনে) Officer (অফিসার) ছিলেন—বালীগঞ্জে নিজের বাড়ী করে চলে যান—আর আমরা ৪০ নং সিমলা ষ্ট্রীটের বাড়ীতে উপরে একটা ঘর নীচে রান্না ঘর ও Seperate (আলাদা) কল পায়খানা সমেত ভাড়া নিয়ে ওখানে উঠে যাই। নীচের ঘরে Dispensary ছিল। সভা সমিতি ও বৈষ্ণবজগতে দাদার খুব খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। আমি মাহিনা ৮০৲ টাকার সবটাই এনে দাদাকে দিতাম, দাদা সেখান থেকে আমাকে ১০৲ টাকা দিতেন Tram (ট্রাম) এর ভাড়া (পরে Monthly Ticket[মাসিক টিকিট] হয়েছিল) ও অফিসে Tiffin (টিফিন) এর জন্য। তখন সবই খুব সস্তা ছিল। দু'আনার জল খাবাবে পেট ভরে যেতো। দাদার নিজের হাতের লেখা একটা হিসাবের খাতা আছে এখানে—তাতে তাঁর নিজের হাতে লেখা আছে দধির মাহিনার দরুন ৮০৲ জমা। এই ৮০৲ টাকা ছাড়া অন্য আর কোন Allowance (ভাতা) বা ঐরকম কিছু ছিলনা। তবে অন্য উপায়ে বেশ আয় ছিল (১) Over-time (ওভার টাইম) (২) pie-money (উপরি টাকা)। যারা ভাল Work (কাজ) করতো তার ঐ দুটোর সুযোগে অনেক টাকা উপরি রোজগার করত। আমি নূতন সুতরাং ঐ দুটোর

কোনটাই পেতাম না। অবশ্য কয়েক বৎসর পর আমি pie-money (উপরি টাকা) যাকে Score (অতিরিক্ত) করা বলতো, করে মাসে আরও ৩০/৪০ টাকা উপার্জন করতাম। এটা দাদা আমাকেই নিতে বলতেন। আমি দাদার উপদেশ ও নিরঞ্জন বাবুর চেষ্টায় Life-insurance (জীবন বীমা) করিয়েছিলাম Postal Life-insurance (ডাক সংক্রান্ত জীবন বীমা) আমার Pay (মাহিনা) থেকে কেটে নিত। বৎসরে ৫টাকা করে Increment (মাহিনা বৃদ্ধি) হোতো—তাও Signalling এ Test পরীক্ষায় পাশ করলে। এই সময় শ্রীশ্রীগৌররায়জীর অপার কৃপায় আমাদের পরম হিতৈষী ও পরমভক্ত জ্ঞানবাবুর সঙ্গে দাদার পরিচয় ঘটে। পানিহাটীতে দণ্ডমহোৎসবের এক উৎসবে আমি দাদার সঙ্গে—শ্যামাপদ বাবু, নিরঞ্জন বাবু হরিমোহন বাবুরাও গিয়েছিলেন, গিয়েছিলাম। গঙ্গার ধারে বটবৃক্ষ তলে—বৈষ্ণব প্রধান শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী মহশয়ের কীর্তন শুনতে। কীর্তন সমাপ্ত হলে আমরা গঙ্গার ঘাটে বসেছিলাম। শ্যামাপদ বাবু জ্ঞানবাবুকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন দাদার কাছে। শ্যামাপদ বাবুর সঙ্গে জ্ঞানবাবুর বেশ পরিচয় ছিল আগেই। জ্ঞানবাবু বিখ্যাত মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী দ্বারিক ঘোষের বড় ছেলে। তখন তাঁদের মিষ্টান্ন ব্যবসায় কলকাতায় সাড়া জাগিয়েছে—লক্ষ লক্ষ টাকা আয়। জ্ঞানবাবু একটা হাতকাটা ফতুয়া ও একটা ছোট বহরের ধুতি পরেছিলেন। দাদাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। দাদা তাঁকে কাছে বসিয়ে আলাপ করলেন। কি দৈনমূর্তি জ্ঞানবাবুর—অতবড় ধনী বুঝবার উপায় নেই। তিনি প্রথমে রামকৃষ্ণ মিশনে ছিলেন পরে ভাল না লাগায় অজিত গোস্বামী (শ্যামবাজার উত্তরা সিনেমার সামনে নলিনী সরকার ষ্ট্রীটে (?) তাঁর বাড়ী খুব সুন্দর চেহারা—উপাধি অজিত রায়—পরে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করে অজিত গোস্বামী নাম নেন—বহু শিষ্য। জ্ঞানবাবু তাঁদের বাড়ী যেতেন ও তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তিনি জ্ঞানবাবুকে তাঁর গুরুদেব বাঘনা পাড়ার গোস্বামী শ্রীমৎ গৌরগোবিন্দ গোস্বামীর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করান। পরে কেবল টাকা চাওয়ায় জ্ঞানবাবু অজিত গোস্বামীর উপর বিরক্ত হন—অন্যস্থানে সৎসঙ্গ পাবার জন্যে ঘোরাঘুরি করেন—শ্যামাপদ বাবুর সঙ্গে সেই সময় আলাপ হয় ও শ্যামাপদ বাবু তাঁকে দাদার সম্বন্ধে বলেন। কিন্তু জ্ঞানবাবু দাদার সঙ্গে আলাপ করতে সাহস করেন না। পরে গঙ্গার ঘাটে দেখা করেন। আমরা এক সঙ্গে নৌকা করে কলকাতায় আসি। এরপর থেকে জ্ঞানবাবু প্রত্যহ সকাল ৭/৩০ টার সময় গঙ্গায় স্নান সেরে আমাদের বাড়ি যেতেন। এই ৪০ নং সিমলা ষ্ট্রীটের বাড়ীতে বুড়ির বিয়ে হয়—ইসলামপুর (মুর্শীদাবাদ জেলায়)। পাত্র অবনী ভূষণ চৌধুরী স্কুল শিক্ষক ছিলেন। এই বিবাহে অনেক লোক নিমন্ত্রিত হয়েছিল। ইসলামপুরের

জমিদাররা পাত্রের আত্মীয় তাঁরাও অনেকে এসেছিলেন—জ্ঞানবাবু এত রকমারী মিষ্টি দিয়েছিলেন যে তাঁরা বলেছিলেন—এত রকম মিষ্টান্ন তাঁরা আগে কোন বিয়েতে খাননি। বলাই দাদা (আমার আপন পিসতুতো ভাই) এই সময় সুকিয়া ষ্ট্রীটে (বর্তমান কৈলাস বোস ষ্ট্রীটে) বাড়ী ভাড়া করে থাকতেন—তখন চণ্ডী তাঁর বড় ছেলে ও আমার মত টেলিগ্রাফ অফিসে ঢুকেছিল। ঐ বাড়ীতে তিনি নিউমোনিয়া রোগে মারা যান। চণ্ডীরা তার মামাদের সঙ্গে রামমোহন সাহা লেনে একটা বাড়ী ভাড়া করে উঠে যায়। বলাইদাদা আমায় খুব স্নেহ করতেন—আমি প্রায়ই বিকেলে তাঁর কাছে যেতাম। তিনি মারা যাবার সময় আমায় বলেছিলেন—কানাই ও তোরা আমার ছেলেদের দেখিস। একমাত্র চণ্ডী তখন কাজ করে আর সকলে ছোট পড়াশোনা করে। কয়েকমাস পর চণ্ডী একদিন দাদার কাছে এসে বলল—"বড়কাকা, বড় মুস্কিলে পড়েছি—মামারা—বাড়ী ছেড়ে দেশে চলে যাবে। আমাদের কি উপায় হবে?" তখন দাদা বললেন, "বলাইদা তো তোমাদের দেখবার জন্য আমাদের বলে গিয়েছেন—এখন একসঙ্গে একটা বাড়ীতে থাকাই দরকার। একটা বড় বাড়ী দেখা হোক—আমরা একত্রে সেখানে থাকবো। এরপর সেজদাদা মধুরায় লেনে একটা বাড়ী পান—আমাদের দুই সংসারের মত। সেই বাড়ী ভাড়া করে চণ্ডীরা (চণ্ডীর তখন বিবাহ হয়েছে) ও আমরা উঠে যাই—ঐ বাড়ীতে একত্রে থাকলেও—হেঁশেল আলাদা ছিল। দাদা সিমলা ষ্ট্রীটের ডিসপেনসারীতেই শুতেন। আমরা বাড়ীতে থাকতাম। দাদা বাড়ী এসে স্নানাদি করে দোকানে যেতেন। পরে বেলায় এসে ঠাকুর পূজা করে আহার করে আবার ডিস্‌পেন্সারীতে যেতেন। রাত্রে এসে ঠাকুর পূজা করে আহার সেরে ডিসপেন্সারীতে গিয়ে শুতেন। কয়েক বৎসর পর বাড়ীওয়ালা ঐ বাড়ী বিক্রয় করবে বলে জানায় ও আমাদের অন্য বাড়ীর চেষ্টা করতে বলে। ঐ বাড়ীর কাছেই—বারাণসী ঘোষ লেনে কালীসিংহ পার্কের (সিমলা ব্যায়াম সমিতি পার্ক) সামনে পূর্বদিকে এক ভদ্রলোকের একটাভাল বাড়ীতে আমরা উঠে যাই। তিনি, মনীন্দ্র নাথ রায় ও তাঁহার স্ত্রী খুব ভক্ত ছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীতে প্রত্যহ পাঠ কীর্তন শুনতে যেতেন ও দাদার বক্তৃতা শুনে তাঁর খুব ভক্ত হন। তিনি কর্পোরেশনে বড় কাজ করতেন। ৫/এ বারাণসী ঘোষ লেনে তিনি নিজ বাড়ী করেন ও তার গায়েও আর একটি বাড়ী করেন। তিনি তিন তলায় থাকতেন স্বতন্ত্রভাবে। আর বাড়ীর অন্যান্য অংশের সবটা আমাদের ৬৫ টাকায় ভাড়া দেন। উপরে একটা ঘরে তাঁর বিগ্রহ থাকতো আর অপর ঘরে তিনি ও তাঁর স্ত্রী থাকতেন। পাশের বাড়ীতে তাঁর একমাত্র কন্যা ও ঘর জামাই ছেলেমেয়েদের নিয়ে থাকতো। ঐ বাড়ীর সিঁড়ি দিয়ে তিনি উপরে আসতেন আর

আমাদের দিকটা চাবি দিয়ে বন্ধ করে রাখেন। যাতে আমাদের কোন অসুবিধা না হয়। অতি অমায়িক ও ভদ্রলোক ছিলেন। আর তাঁর স্ত্রীর তুলনা নেই। অমন ভক্তিমতী খুব কম মেলে। তাঁদের নিত্যসেবা ছিল—শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ বিগ্রহ ও ছোট রাধাকৃষ্ণ। স্ত্রীই পূজা করতেন। আমাদের খুব ভক্তি করতেন। বারাণসী ঘোষ লেনের ও মধুরায় লেনের বাড়ীতে আসার পূর্বে দাদা আমার বিবাহের ব্যবস্থা করেন—সিমলাষ্ট্রীটের বাড়ীতে থাকতে। ঐ বাড়ীতে উপরে আমাদের একটা বড় ঘর ও তার পাশে একটা ছোট ঘর ছিল। দাদা ডিস্‌পেনসারী ঘরে শুতেন। সেজদাদা মা বুড়ি ও আমি উপরে ঘরে থাকতাম। ছোট ঘরে জিনিসপত্র থাকতো। ঠাকুর বড় ঘরের একপাশে থাকতেন। আমার ঠিক মনে নেই সম্ভবত ১৯৩৪/১৯৩৫ সালে আমার বিবাহ হয়। পূর্বে অনেক স্থান থেকে বিবাহের সম্বন্ধ আসে—কিন্তু আমার বিবাহে মত ছিল না। প্রত্যহ রাত্রে আহারের পর আমি দাদা ও সেজদাদা বিবেকানন্দ রোডের ফুটপাতে বেড়াতাম প্রায় এক ঘণ্টা। ঐ সময় দাদা আমাকে বিবাহ করবার জন্য বোঝাতেন। কিন্তু আমি না করতাম। পরে মাকে দিয়ে দাদা বলাতে থাকেন। মার বয়সও হয়েছিল—শরীরও ভাল যাচ্ছিল না। এইসব কারণেও ভক্তরা সকলে অনুরোধ করতে থাকায় আমি সম্মতি দিলাম। যাতে খুব আড়ম্বরের সঙ্গে আমার বিবাহ হয় দাদা তার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। হেদোর ধারে রায় বাগান লেনে—একটা বড় বাড়ী ভাড়া নিয়ে আমার বিবাহ হয়। এই বিবাহে জ্ঞানবাবুই প্রধান উদ্যোগী হন। তাঁদের মোটর গাড়ীতে ফুল দিয়ে সাজিয়ে আমি কার্তিক বোস লেনে বিয়ে করতে যাই। বৌভাত খুবই ঘটা করে হয়েছিল ও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সহ বহু লোক নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। জ্ঞানবাবু নানা রকম মিষ্টান্ন দিয়েছিলেন। সকলেই খুব সুখ্যাতি করেছিলেন। বৌভাতের ২ দিন পরে দাদা কীর্তনের ব্যবস্থা করেন ঐ বাড়ীতে। তাঁর ভক্তরা ছাড়া ভক্তপ্রবর কিশোরী মোহন গুপ্ত কবিরাজ মহাশয় সহ বহু ভক্ত সমাগম হয় এবং সকলকে ঠাকুরের প্রসাদ বসিয়ে খাওয়ানো হয়। পাশের সব বাড়ীর লোকেরা সকলে অবাক হয়ে যায় বিয়েতে ঐ রকম কীর্তনের ব্যবস্থা দেখে। শ্রাদ্ধ বাড়ীতেই কীর্তন হয়ে থাকে। যাহা হোক পরে আমাদের ছোট ঘরটা দেওয়া হয়। কিছুদিন পরে আমাদের ঘরের পাশে কালোদের একটা বড় ঘর ভাড়া নিয়ে ছিলাম পরে মধুরায় লেনের বাড়ীতে উঠে যাই চণ্ডীদের সঙ্গে একত্রে থাকবার জন্য। জ্ঞানবাবু প্রত্যহ সকালে বারাণসী ঘোষ লেনে এসে দাদার সঙ্গে ধর্ম বিষয় আলোচনা করতেন। তিনি দাদাকে তাঁর গুরুদেবের চেয়ে ভক্তি করতেন—শিক্ষাগুরু হিসাবে। তাঁর গুরুদেব সংসারী ছিলেন—যদিও তিনি এমনি অনেক কিছু গুরুসেবায় দিতেন। এমন কি গুরুদেব

তিনি দাদার কাছে আসতেন জেনে অসন্তুষ্ট হতেন। জ্ঞানবাবুকে দাদা কিন্তু গুরুসেবা ভালভাবে করবার জন্যে উপদেশ দিতেন—এমন কি তাঁর কাছে বেশী না এলে গুরুদেব যদি সন্তুষ্ট হন—তাও করতে বলতেন। কিন্তু জ্ঞানবাবু বলতেন ঠিক পথ পাবার জন্য অনেক চেষ্টা এবং ঘোরাঘুরি করে—গিরিধারী আমায় কৃপা করে ঠিক পথে এনেছেন—এ আমি ছাড়তে পারবনা। গুরুদেব টাকাই চান আমি তাঁর ইচ্ছামত সবই দিয়ে থাকি। ঠাকুরের কি ইচ্ছা জানিনা—একদিন তাঁর গুরুদেব কোনও বাড়ী থেকে ভাগবত পাঠ করে ফিরবার সময় মোটর চাপা পড়ে আহত হয়ে হাসপাতালে যান। তাঁর বাড়ী না ফেরায় সকলে ব্যস্ত হয়ে উঠে জ্ঞানবাবুকে খবর দেয়। জ্ঞানবাবু দাদাকে জানান—দাদা তাঁকে সব হাসপাতালে খবর নিতে বলেন—পরে Medical College (মেডিকেল কলেজ) হাসপাতালে তাঁকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। জ্ঞানবাবু খুব ভালভাবে তাঁর পারলৌকিক কাজ সমাধান করেন। এরপর তাঁর দাদার কাছে আসবার আর কোন বাধা ছিলনা। টাকাকড়ি দাদাকে দিতে চাইতেন কিন্তু দাদা নিতেন না—তবে প্রায় প্রত্যহই গৌররায়জীর জন্য অনেক মিষ্টি পাঠাতেন। দাদা বলতেন জ্ঞানবাবু যত মিষ্টি দিয়েছেন তার সমস্ত দাম প্রায় একলক্ষ টাকা হবে। সত্যি তিনি কিভাবে সেবা করতেন তা ভাষায় বলা যায় না। মধুরায়ের লেনে বাড়ীতে থাকতে নিমাইয়ের জন্ম হয় তার মামার বাড়ী বেচু চ্যাটার্জী ষ্ট্রীটে। এ বাড়ীতে এলে দাদা তার নামকরণ করেন "নিমাই" ও ভাল নাম গৌররায় গোস্বামী। আমাদের ইষ্টদেব শ্রীগৌররায়জীউর নাম দিয়ে। তিনি নিমাইকে পুত্রের অধিক স্নেহ করতেন। দাদা ও সেজদাদারা তো বিবাহ করেননি। নিমাইয়ের অন্নপ্রাশনে বহুলোক নিমন্ত্রিত হয়েছিল মধুরায় লেনের বাড়ীতে। জ্ঞানবাবু বহু রকম মিষ্টান্ন—আইসক্রীম সন্দেশ রাবড়ী দিয়েছিলেন। আমাদের বাড়ীতে সব উৎসসবাদিতে সম্পূর্ণ নিরামিষ আহারের ব্যবস্থা হোতো—বাড়ীর সকলেই নিরামিষ ভোজী। চণ্ডীরা মাছ খেতো কিন্তু আমাদের সঙ্গে যখন একত্র ছিল তখন দাদা যতদিন বাড়ীতে ছিলেন ততদিন খেতো না। পরে বারাণসী ঘোষ লেনের বাড়ীতে আরম্ভ করেছিল—দাদা নবদ্বীপ চলে আসার অনেকদিন পর থেকে। পরে চণ্ডীরা সল্টলেকে বড় বাড়ী করে চলে যায়। একবার আমার খুব অসুখ হয়—দাদা অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েন—তখন কলকাতার নামকরা বড় ডাক্তার ইন্দুভূষণ বসু মহাশয়কে দাদা আনেন—অবশ্য ডাঃ বসু আমরা সিমলা ষ্ট্রীটে যে বাড়ীতে থাকতাম তিনি তার উল্টোদিকে একটা বড় ভাল বাড়ী করেছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে দাদার কাছে অবসর সময় আসতেন ও ধর্ম বিষয়ে অনেক কিছু জানতেন ও খাতায় note (লিপিবদ্ধ) করে নিতেন। পরে তিনি শ্রীসম্প্রদায়ে দীক্ষা নেন ও পরম ভক্ত হয়ে

সংসার ত্যাগ করে খড়দহে লক্ষ্মী নারায়ণজীর বিরাট মন্দির গঙ্গার ধারে করিয়ে সেইখানে থাকতেন। তিনি মাদ্রাজে গিয়ে তামিল ভাষা শিক্ষা করে শ্রীসম্প্রদায়ের অনেক গ্রন্থ বাংলায় সঙ্কলন করেন ও নিজেও লেখেন। দাদাকে কিন্তু তিনি খুব ভক্তি করতেন—আর আমাকেও খুব স্নেহ করতেন। তিনি আমার চিকিৎসার ভার নেন ও ডাঃ যুগল সাহা M.B (এম.বি) তাঁর Assistant (সহকারী) আমায় দেখাশুনা করতেন। পরে ডাঃ J.C. Saha (ডাঃ জে সি সাহা) M.D (এম.ডি) হয়েছিলেন—Medicine এর Professor (মেডিসিনের অধ্যাপক) হয়েছিলেন। পরে তিনি চিকিৎসা ব্যবসা প্রায় ত্যাগ করে নবদ্বীপে বাস করে ভজন করেছেন ও ধামেই তিনি প্রাপ্তি হন। এই সময় জ্ঞানবাবু লুকিয়ে লুকিয়ে দাদার বালিশের তলায় মধ্যে মধ্যে একশত করে টাকা রেখে দিতেন। অনেকবার এইভাবে তিনি টাকা দিয়েছেন। দাদা আপত্তি করা সত্ত্বেও দিতেন তবে না বলে বালিশের তলায় রেখে দিতেন। এরপর দাদা ৪০ নং সিমলা ষ্ট্রীটের ডিসপেন্সারী তুলে দেন। বলেন আর দেহের চিকিৎসা ব্যবসা করবো না। এখন থেকে পারলৌকিক চিকিৎসা করবো জীবের পারমার্থিক মঙ্গলের জন্য। তিনি বারাণসী ঘোষ লেনের নীচের একটা ঘরে থাকতেন। মধুরায় লেনের বাড়ীতে থাকতে দাদা শ্রীগৌররায়জীর অন্নভোগের প্রচলন করেন। নিজে বা সেজদাদা ভোগ রেধে ঠাকুরকে দিতেন। প্রত্যহ সন্ধ্যার পর থেকে প্রায় রাত্রি ৯ টা পর্য্যন্ত ঐ ঘরে অনেক ভক্ত সমাগম হোতো। দাদা সকলকে বলতেন "দেখুন, ঠাকুর কি করুণাময়—৫২নং বিডন ষ্ট্রীট বাড়ীর চারতলা থেকে আমরা ভাগ্য দোষে গাছতলায় নেমে ছিলাম (দেবকীনন্দন ধর্ম কার্যালয়ে গাছতলায় বসে আমরা আহার করতাম ও মেসবাড়ীর পায়খানায় Line (লাইন) করে যাওয়া ও Line (লাইন) করে কলে স্নান করা) থেকে তিনি আবার আমাদের চারতলা বাড়ীতে আশ্রয় দিয়েছেন।" চারতলা ছাদে আমাদের ঠাকুর ঘর ছিল। সত্যই ঠাকুর আমাদের কত পরীক্ষার মধ্য দিয়ে নিয়ে গিয়েছেন ও দাদা তাঁর ঠাকুরের প্রতি ভক্তি নিষ্ঠার প্রভাবে সেইসব পরীক্ষায় যেভাবে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন তা বর্ণনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে তীব্র পরীক্ষার মধ্যে দাদার যে ঠাকুরের প্রতি অটুট বিশ্বাস ও ভক্তি ও ধৈর্যধারণের ক্ষমতা আমার দেখবার পরম সৌভাগ্য হয়েছিল তারজন্য আমি নিজেকে মহাভাগ্য বান মনে করি। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁর নিষ্ঠা ও ভক্তি পরম উৎকর্ষতা লাভ করেছিল। আমাদের যদি তার এককণিকাও লাভ হোতো তবে এ জীবন সার্থক হয়ে যেতো—তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এই বারাণসী ঘোষ লেনের বাড়ীতে আমরা ৪০ বৎসরের ওপর এক নাগাড়ে বাস করেছিলাম—চণ্ডীদের সঙ্গে। এখানেও অনেক আশ্চর্য ঘটনা ঠাকুরের কৃপায়

ঘটতো। একদিন দাদা আমায় বললেন, আম উঠেছে দেখলাম ঠাকুরকে আম এনে দিও, দেব। তখন আমি বাজার করতাম। রাত্রে ভক্তরা এলেন যথারীতি হরিকথা শেষ করে সকলে চলে গেলেন দাদা ঠাকুর ঘরে যাবেন হঠাৎ দেখা গেলো দাদার চৌকীর তলায় একটা ঠোঙ্গা রয়েছে। সেটা বার করে দেখা গেলো কয়েকটা ভাল আম রয়েছে। ভক্তদের মধ্যে কেহ নিয়ে এসে আমাদের অজান্তে ঐখানে রেখে দিয়েছিলেন। আমাদের প্রতিমাসের চাল, ডাল, তেল, লবণ, মশলা ইত্যাদি একসঙ্গে ভক্তপ্রবর যোগেশ চন্দ্র দে'র "ঢাকা ষ্টোর্স" থেকে আসতো। তখন ঢাকা ষ্টোর্স মিরজাপুর ষ্ট্রীট ও আমর্হাষ্ট ষ্ট্রীটের জংশনের কাছে বর্তমান শ্রদ্ধানন্দ পার্কের পশ্চিমে ছিল। যোগেশ আমাদের বংশের শিষ্য ছিল ও দাদার খুব অনুগত ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সে আমার পরামর্শ নিয়ে ঐ দোকান তুলে দিয়ে নবদ্বীপে খুব বড় করে ঢাকা ষ্টোর্স করে। এখন ঢাকা ষ্টোর্সের খুব সুনাম। ঠাকুর সেবার সব দ্রব্যাদি বর্তমান মালিক পরমভক্ত শ্রীমান্ রাধারমণ দাস (যোগেশের ভাগ্নে) অতি অল্প মূল্যে দিয়ে থাকে। যোগেশ যখন আমার কাছে বারাণসী ঘোষ লেনে পরামর্শ নিতে আসে তখন আমাদের পরিবারের সকলে ও দাদা ও সেজদাদা ভাজনঘাটে গিয়েছিলেন বোমা পড়বার ভয়ে। আমাদের Essential Department ছুটি ছিলনা—তাই—বাড়ীতে আমি চণ্ডী ও আনু মাত্র এই তিনজন থাকতাম। এমন কি বাড়ীওয়ালারাও সকলে বাড়ীতে চাবি দিয়ে ও আমাদের দেখতে বলে কাশী চলে গিয়েছিলেন। রাস্তায় নিষ্প্রদীপ অন্ধকার। কলকাতার অন্ততঃ অর্ধেক লোক চলে গিয়েছিল। যোগেশ পূর্বে নবদ্বীপে দোকান করেছিল—আর কলকাতার দোকান কর্মচারীরা চালাতো। দাদা না থাকায় আমার পরামর্শ চায়। চালু দোকান তুলে দেওয়া ঠিক হবে কিনা জানতে চায়। আমি তাঁকে তুলে দিয়ে নবদ্বীপে বড় করে দোকান করার পরামর্শ দিই, যখন দোকান সে নিজে দেখতে পারবে না। তারপর দিন দোকান তুলে দিয়ে নৌকায় মাল পাঠিয়ে দেয় নবদ্বীপে। ঠাকুরের কৃপায় তার নবদ্বীপের দোকান খুব ভাল চলতে লাগালো ও যোগেশ তারজন্য আমাকে খুব ভালবাসতো, ভক্তি করতো। ঐ দোকান থেকে আমাদের মাসকাবারী দ্রব্যাদি ঘি থেকে সব কিছু আসতো—মাসিক খরচ হোতো ৩০্ টাকা মাত্র। চামরমণি চাল, আতপ চাল থেকে সব কিছু। যেবার আশ্বিনে ভীষণ ঝড় হয়—সেবার দাদা বক্তৃতা দিতে মেদিনীপুর জেলার কাঁথিতে গিয়েছিলেন—সেই ঝড়ে সমুদ্রের জলোচ্ছাস হয়ে কাঁথির একতলা বাড়ী সব ডুবে গিয়েছিল। বহু লোক হতাহত হয়েছিল। দাদাকে কাঁথিতে বহুলোক খুব সমাদর করেছিল তার বক্তৃতা শুনে। পরের বৎসর তাঁরা দাদাকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেন তবে যেতে পারেননি। জ্ঞানবাবুদের

দেশের বাড়ীতে হাওড়া জেলায় প্রতিবৎসর খুব বড় উৎসব হোতো প্রায় ৮/১০ দিন ধরে বহুলোক সমাগম হোতো—একবার আমি দাদার সঙ্গে গিয়েছিলাম হাওড়া ছোট রেলে। ২ দিন জ্ঞানবাবুদের বাড়ীতে আমরা ছিলাম। খুব খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা ছিল দাদার বক্তৃতা শুনে বহুলোক তাঁর অনুরাগী হয়। দাদা দুবার গিয়েছিলেন। দ্বিতীয়বার আমি গিয়েছিলাম। বসন্ত দাদাদের দেশে 'বেগড়ীতেও একবার দাদার সঙ্গে সেখানকার হরিসভায় গিয়েছিলাম—কলকাতা থেকে Taxi (ট্যাক্সি) করে যাওয়া ও আসা হয়। বারাণসী ঘোষ লেনের বাড়ীতে থাকতে দাদার "জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম" প্রথম গ্রন্থ প্রকাশ হয় বাণী প্রেস থেকে। এই গ্রন্থ প্রকাশের পর চতুর্দিকে দাদার বৈষ্ণব আচার্য বলে খ্যাতি হয়। এরপর শ্রীশ্রীনামচিন্তামণি প্রকাশিত হয়। এই সময় সব বৈষ্ণব পত্রিকাতেও দাদার ধর্ম বিষয় মৌলিক গবেষণা মূলক বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে। আর্থিক সমস্যার ঠাকুরের কৃপায় অনেক উন্নতি হয়। ঠাকুরের অন্নকূট মহোৎসব কয়েকবার খুব সমারোহের সঙ্গে সম্পন্ন হয়। বহু ভক্ত প্রসাদ লাভ করেন। সেজদাদা বড় বৌদিদির (বলাইদাদার বৌ) ও আরও কয়েক জনের সাহায্যে প্রায় ২৫/৩০ রকম পদ রান্না করতেন। ঠাকুরের অন্যান্য উৎসবে বেশী ঘটা হোতোনা তখন। নবদ্বীপে আসার পর অন্নকূট বন্ধ হয়ে যায়—তবে রাস, দোল ও জন্মাষ্টমীতে দাদা খুব ঘটা করে উৎসব আরম্ভ করেন—ভক্তদের সবাইকে লুচি, হালুয়া, ফল বিতরণ করার ব্যবস্থা করেন—ঐসব উৎসব ঠিকমত এখনও হয়ে থাকে। এই সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় জাপানীরাও ঐ যুদ্ধে জার্মানীর পক্ষাবলম্বন করে—নেতাজী সুভাষচন্দ্র ভারত থেকে পালিয়ে অনেক দেশ ঘুরে জাপানে উপস্থিত হন এবং সেখানে শ্রীরাসবিহারী ঘোষের সঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করে ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। এই সময় তিনি জাপানের সাহায্যে বার্মাদেশে উপস্থিত হন সেখান থেকে ভারতে মণিপুরে ইম্ফল পর্যন্ত আসেন। সেই সময় বোমা পড়ার ভয়ে কলকাতার প্রায় অর্ধেক লোক কলকাতা ত্যাগ করে বাইরে পালিয়ে যায়। আমাদের পরিবারের সকলকে নিয়ে দাদা ও সেজদাদা ভাজনঘাট চলে যান। চণ্ডীরা ও সকলকে তাঁদের মামার বাড়ী শান্তিপুরে পাঠিয়ে দেয়। বাড়ীতে কেবল আমি চণ্ডী ও আনু থাকতাম কয়েক মাস। আমরা একত্রে রান্না করে খেতাম। দাদা ভাজনঘাট গিয়ে দেশের বাড়ীর ভাল করে সংস্কার করেন। পাঁচিল দিয়ে বাড়ী ঘেরা হয়। পায়খানা বাথরুম, ইঁদারা সংস্কার করান। ঐ সময় আমি ছুটির দিন ও শনি-রবিবার সব দ্রব্যাদি নিয়ে ভাজনঘাট যেতাম ও সোমবার ভোরের গাড়ীতে ফিরে অফিস করতাম। চণ্ডীরাও মধ্যে মধ্যে যেতো। যখন আমি দাদার সঙ্গে ৪০ নং সিমলা

ষ্ট্রীটে বাড়ীর ডিসপেন্সারী থেকে অন্য সব বাড়ীতে ঘুরে ঘুরেই আহারাদি করতাম ও স্কুলে পড়তাম তখন স্কুলে গ্রীষ্মের ছুটিতে দু'মাস দাদা আমাকে ভাজনঘাট পাঠিয়ে দিতেন। —সেখানে মা বুড়ী ও সেজদাদা থাকতো আমি ঐ সময়টা ঐখানে আনন্দে বহু সমবয়সী বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধূলা করে সময় কাটাতাম। দাদাও কখন কখন ২/১ দিনের জন্য ঐ সময় ভাজন ঘাট যেতেন। সে সময় বাড়ীতে যে কত লোক তা বলা যায়না। প্রতি বাড়ীতেই তখন লোক থাকতো। তখন ইচ্ছামতী নদী খুব বড় ও ভীষণ ছিল, সাঁতার কেটে পার হওয়া বেশ কষ্টসাধ্য ছিল কারণ প্রচণ্ড স্রোত ছিল। সেই সময় আমি চরণদাদা (চরণ গোঁসাই) ও সেজদাদার কাছে সাঁতার শিখি। পরে হেদুয়াতে ন্যাশনাল সুইমিং ক্লাবে কিছুদিন সাঁতার শিখি। ভাজন ঘাটে যাবার সময় দাদা আমাকে তাঁর সাধ্যমত ২/৪ টাকা খরচের জন্য দিতেন। তাতেই আমি দুইমাস জল খাবার কিনে খেতাম। তখন সবই সস্তা গণ্ডার দিন। তাছাড়াও বন্ধুরাও অনেক সময় কালীতাঁতির দোকানে খাওয়াতো। তখন গ্রামে কালীতাঁতীর খাবারের মাত্র একটি দোকান ছিল—আর গ্রামে সব বাড়ীতেই লোকে—সে সময় খুব ভাল খাবার করতো। আমি শিশুকালেও তার কথা শুনেছি। শ্রীশ্রীরাধাবল্লভজীর মন্দিরের পাশে রাস্তার ওপরে খড়ের চালের একটা ঘর—সেটাতে সে খাবার করতো। মধ্যে মধ্যে গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি বড় সরকারী কর্মচারী রায়বাহাদুর মন্মথনাথ গুপ্ত (পঞ্চা সরকার) মহাশয় অতি সজ্জন ও আমুদে লোক ছিলেন। বিলের ধারে তাঁর বড় বাড়ীতে বয়স্ক লোকেদের সর্বদা ভীড় ছিল—গল্প গুজব ও পাশাখেলা হত। তিনি প্রত্যহই সকলকে চা ও কালীর দোকানের খাবার খাওয়াতেন আর মধ্যে মধ্যে সব ছেলেদের ডেকে এনে সন্দেশ, রসগোল্লা ও লেডিকেনি খাওয়াতেন আমারও মধ্যে মধ্যে ডাক পড়তো—তিনি চৌকিদার পাঠিয়ে আমাদের ডেকে পাঠাতেন। সেসব দিনের কথা স্মরণ হ'লে মনে কত আনন্দ হয়—কিন্তু হায় কাল সব ধ্বংস করে দিয়েছে—ভাজনঘাট এখন শ্মশানের রূপ নিয়েছে। কেবল আছেন গ্রামের ঠাকুর শ্রীশ্রীরাধাবল্লভজী শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রজী। আর বাৎসরিক পূজা মা জগদ্ধাত্রী দেবীর, এখনও কোন রকমে হয়। কয়েকমাস পর দাদা কলকাতায় ফিরে এলেন। তখন দাদা আমি আর পরে খুকুদা (জ্যোতির্ময় গোস্বামী) আমরা রান্না করে খেতাম। চণ্ডী তার স্ত্রীকে নিয়ে এসেছিল। যুদ্ধ তখন চলছে এর পরে দাদার পরামর্শে আমি নিমাইয়ের মাকে, নিমাই নেপু, ও খুকীকে নিয়ে কলকাতায় আসি। সেজদাদা মা ও বুড়ি তখন ভাজন ঘাটে থাকে। দেবু তখন হয়নি। এর মধ্যে কোন বোমা পড়েনি। কিন্তু যেদিন আমি নিমাইয়ের মাকে নিয়ে আসি ঠিক সেইদিন রাত্রে প্রায় ১-৩০/২ টার সময় জাপানীরা ডালহৌসী

স্কোয়ারের অফিসে ও গ্রে. ষ্ট্রীট হাতিবাগানে বাজারের কাছে বোমা ফেলে। বাড়ীর ক্ষতি হ'লেও হতাহত কেহ হয়নি। বাড়ীওয়ালারাও অনেক লোক ফিরে এসেছিল। আমাদের বাড়ীর সামনে পার্কে Trench (ট্রেঞ্চগর্ত) কেটে দিয়ে ছিল গভর্ণমেন্ট—Bombing এর সময় তার ভেতরে থাকবার জন্যে। বাড়ীওয়ালা বাইরের দুটো ঘরের সামনে Baffle Wall (পাঁচিল করে দিয়েছিলেন যাতে বোমার Splint (ফুলকী বা স্ফুলিঙ্গ) ঘরে না আসে। রাত্রে Siren (সাইরেন) বাজলে আমরা নীচের ঘরে এসে সকলে সব বন্ধ করে all Clear (সব পরিষ্কার) না হওয়া পর্যন্ত বসে থাকতাম—দাদা আমাদের সকলকে "নাম" করতে বলতেন। এভাবে জাপানের পরাজয়ের পর যুদ্ধ শেষ হলো। আমেরিকা হিরোসিমা ও নাগাসাকী শহরে Atom (পারমাণবিক) বোমা ফেলায় জাপান পরাজয় স্বীকার করে। এই বাড়ীতে বুড়ীর মেয়ে হাবলীর সঙ্গে ভাজনঘাটের বিজয় গোস্বামীর ছেলে শ্রীমান্ মনোরঞ্জনের বিবাহ হয়। দাদা বেশ খরচ করেই বিবাহ দিয়েছিলেন—তার ওপর ছিল জ্ঞানবাবুর মিষ্টি। মা ভাজন ঘাট থেকে আসতে না চাওয়ায় সেজদাদা, বুড়ী ও তার মেয়ে হাবলী ভাজন ঘাটে থাকে। এরপর মার খুব অসুখের সংবাদে দাদা কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থকে নিয়ে ভাজনঘাটে যান। পরে মা আমাদের ছেড়ে নাম করতে করতে নিত্যলীলায় চলে যান। আমার দুর্ভাগ্য মার অবস্থা খুব খারাপ দাদা আমায় বলেননি। হঠাৎ অফিসে টেলিগ্রাফ পেয়ে আমি মার শোকে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ি। অফিসে সকলে ছুটে আসে—আমার Officer (অফিসার) সাহেব আমার অবস্থা দেখে আমাকে সঙ্গে সঙ্গে ছুটি দিয়ে ও মন্মথদার (এম.এন. মজুমদার) সঙ্গে আমায় বাড়ী পাঠিয়ে দেন। এরপর দাদা সকলের সঙ্গে কলকাতায় চলে আসেন। পরে মার শ্রাদ্ধকার্যে শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ জীউর মন্দিরে ভোগারাধনা গ্রামশুদ্ধ লোককে প্রসাদ খাওয়ান হয়। এই সময় দাদার অনুগত ভক্তরা সকলে ও আমরা সকলে ভাজনঘাট যাই। খুকুদার বাড়ীর সকলেও। মহাত্মা শ্রীল রামদাস বাবাজী মহারাজ শ্রাদ্ধবাসরে কীর্তন করেন। এরপর কিছুদিন পরে দাদা আমাকে সংসারের সব ভার দিয়ে সেজদাদাকে নিয়ে নবদ্বীপে জ্ঞানবাবুর আশ্রম বাড়ীতে ভজন করবার জন্য চলে যান। দেবুর তখন ৭/৮ বৎসর। এর মধ্যে দেবু ভীষণ ভাবে Typhoid (টাইফয়েড) হয়ে বাঁচবার আশা প্রায় ছিলনা। ছোট বেলায় দেবুর অন্য ছেলেদের মত খেলাধুলা করতো না। সে সর্বদাই ঠাকুর নিয়ে খেলা করতো। এই সময় তার Typhoid (টাইফয়েড) হয়—দাদা চিকিৎসা করে ভাল করেন। সেই সময় ঠাকুরের জন্মাষ্টমীতে লুচি হালুয়া প্রভৃতি অনেক কিছু করে ঠাকুরের ভোগ দেওয়া হয়। দেবু আবদার করে তার ঠাকুরের জন্য কিছু খাবার নেয়। সেই খাবার ঠাকুরকে

দিয়ে সে সকলের অজান্তে নিজে খায় যার ফলে Typhoid relapse করে। Blood Test'এ (রক্তপরীক্ষায়) সব রকম দোষই পাওয়া যায়। দাদা যুগলবাবুকে Call (কল) দেন। ভীষণ ভুল বকা আর ১০৫°/১০৬° জ্বর। পেটের অবস্থা খুব খারাপ। সকলের ভয় হয়ে গেলো। যুগলবাবু একদিন বললেন পেটের যা অবস্থা যে কোনও সময় Stomach Puncture (পাকস্থলী ছিদ্র) করতে পারে। সেইদিন অবস্থা খুব খারাপ হওয়ায় দাদা শ্রীশ্রীগৌররায়জীকে জানিয়ে তাঁর শ্রীচরণতুলসী দেবুকে পরিয়ে দিতে বললেন, তারপরই দেবুর খুব পায়খানা হয়ে গিয়ে বিপদ কেটে যায় ও সে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠে। মধ্যে নিমাইয়ের মারও খুব অসুখ হয় প্রায় ছয় মাস মেডিকেল কলেজ হাস পাতালে থাকতে হয়েছিল। প্রসিদ্ধ শল্য চিকিৎসক পঞ্চানন চ্যাটার্জীর Ward 'এ (ওয়ার্ডে)। পরে সুস্থ হয়ে বাড়ী আসে—কিন্তু কিছু অনিয়ম করায় পুনরায় relapse করে। তখন ডাঃ হিমাংশু রায় এম.ডি কে দেখান হয়। কয়েকদিন পর আমি যখন evening duty তে (সান্ধ্য-কর্তব্য) তখন বাড়ীর লোক খবর দেয় নিমাইয়ের মার অবস্থা খুব খারাপ ডাক্তার জবাব দিয়ে গিয়েছে। শুনেই আমি বাড়ী এসে অবস্থা খুব খারাপ দেখে ডাক্তারের কাছে গেলাম কিন্তু ডাক্তারকে পেলামনা—বাড়ী এসে অবস্থা দেখে চোখে জল এসে গেল। শাশুড়ী ও অনেকে কাঁদছেন—রোগিনীর কোন জ্ঞান নেই। দাদা ঠাকুর ঘর থেকে নেমে আসছিলেন—আমাকে ঐরূপ দেখে বললেন কি হয়েছে—কাঁদছ কেন? আমি রোগিনীর অবস্থার কথা ও ডাক্তার জবাব দিয়ে গিয়েছে বললাম। তিনি আমায় ধমক দিয়ে বললেন—'ডাক্তারের ওপর ডাক্তার আছেন'—তাঁর ওপর বিশ্বাস নেই? বলেই তিনি পুনরায় ঠাকুর ঘরে চলে গেলেন—প্রায় ১৫/২০ মিনিট পরে নেবে এসে আমায় বললেন এই নাও এই চরণতুলসী এখুনি বাঁ হাতে মাদুলী করে পরিয়ে দাও বলে নীচে তাঁর ঘরে চলে গেলেন। আমি দোকান থেকে তামার মাদুলী এনে পরিয়ে দিলাম—তার একটু পর রোগিনী জল চাইল—জ্ঞান ফিরে এসেছে। এরপর পায়খানা করার পর—বেশ সুস্থ বোধ করতে লাগল। ঠাকুরের অচিন্ত্য কৃপায় নিমাইয়ের মা তারপর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছিল। ডাঃ হিমাংশু রায় রোগী বেঁচে গিয়েছে শুনে অবাক হয়েছিলেন এবং বলেছিলেন—আমি রোগিনীর যে অবস্থা দেখেছিলাম—তাতে তার বাঁচার কথা নয়। এই রকম ঠাকুরের কত আশ্চর্য কৃপা যে আমরা পেয়েছি তা বলা যায়না এবং দাদার আশীর্বাদ।

৩। কানুর প্রিয় কানুপ্রিয়

শ্রীকিশোর রায় গোস্বামী

ইংরেজী ১৯৬৩ সালে (বাংলা ১৩৭০) বিদ্যালয়ের বিদ্যা শেষ হয়ে যাবার পর যখন মন খুব উতলা হয়ে উঠেছে নবদ্বীপে আসার জন্য, তখন নবদ্বীপে শ্রীল প্রভুপাদের কাছে (বড় জ্যাঠামশাই) পত্র দিলাম, আমি নবদ্বীপে থাকতে চাই। এখানে আমার ভাল লাগছেনা ইত্যাদি জানিয়ে। তার উত্তরে তিনি আমাকে চিঠি দিলেন, পত্রে তিনটি পয়েন্ট ছিল, প্রথম পয়েন্ট তুমি ওখানে থেকে বাড়ীতে সংস্কৃত পড় ও ঠাকুর পূজো ভাল করে শেখো। অথবা দ্বিতীয় পয়েন্ট—যদি ইচ্ছে কর কোন আর্টস্কুলে ভর্তি হয়ে ভাল মতন আর্ট শেখ। তৃতীয় পয়েন্ট—তাও যদি না চাও তবে নবদ্বীপে আসতে পার। এখানে এলে প্রথম প্রথম খুব কষ্ট হবে, কারণ আমাদের প্রসাদ পেতে প্রায় ২-৩ টে হয়। আমি পত্র পেয়ে তৃতীয় পয়েন্টটাই অঙ্গীকার করলাম। বাড়ীতে জানালাম আমি নবদ্বীপ যাব। এতে সকলেই বিষন্ন, কিন্তু আমি কারো কথা শুনলামনা।

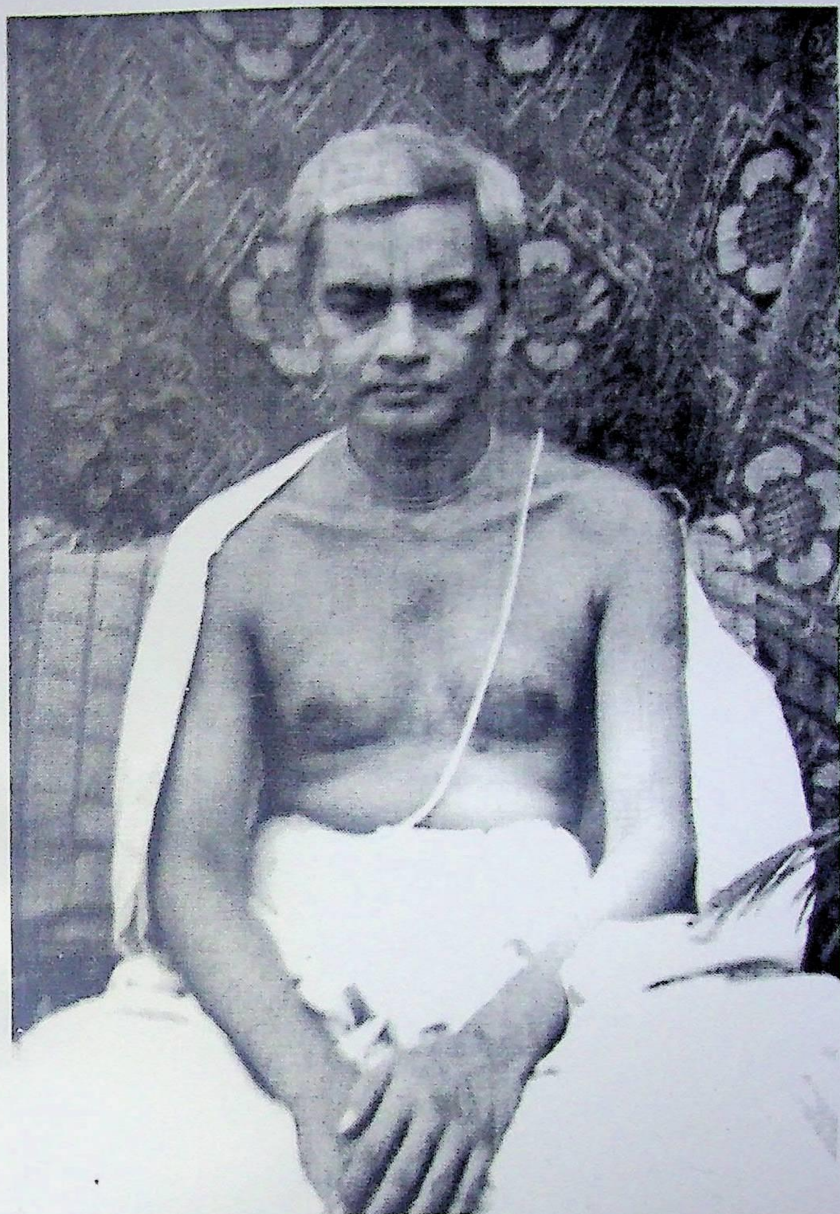
সেই বৎসর ফাল্গুণ মাসে দাদার বিবাহের পর দাদা ৪ঠা বৈশাখ ১৩৭১ (ইং ১৯৬৩) সালে নবদ্বীপে বড় জ্যেঠামশাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে এল, আমি দাদার সঙ্গে নবদ্বীপে এলাম, সঙ্গে নিয়ে এলাম আমার ঠাকুর শ্রীকিশোর গোপাল জীউকে। নবদ্বীপে গঙ্গার সন্নিকটে দ্বিতল আশ্রমবাড়ী। প্রভু উপরের তলায় থাকেন। আমাকে স্থান দিলেন প্রভুর পাশের ঘরে। এক পাশে থাকেন প্রভু আর এক পাশে শ্রীগৌররায়জী'র ঘর। আশ্রমের নীচের তলায় ছোট জ্যেঠামহাশয় আর পাশের টিনের ঘরে থাকেন রমেনভক্ত।

আমার শোবার ঘরের একপাশে একটা ছোট জলচৌকীর উপরে আমার ঠাকুরকে বসালাম। দাদা ২/৩ দিন থেকে কলকাতা ফিরে গেল, আর সেই থেকে নূতন পরিবেশে আমার জীবন আবার এক নূতন ভাবে গড়ে উঠতে লাগল। বাগানের ফুল তুলি, মালা গাঁথি, প্রভু ভক্তদের হরিকথা বলেন, শুনি। সে এক নূতন উদ্যম। বিকেলের দিকে সুধীরবাবু কালীবাবু আদি ভক্তরা কোন কোন দিন আসেন, আর প্রতি মঙ্গলবার ধারাবাহিক হরিকথা হয়, সেদিন বহু বহু ভক্তের সমাগম হয়। এইভাবে কয়েক সপ্তাহ যাবার পর প্রভু বললেন, "প্রত্যহই খুব চেঁচিয়ে শ্রীচৈতন্যভাগবত পড়বে।" প্রভু স্নানাদি সেরে যখন ওপরে আসতেন, তখন প্রায় দশটা-সাড়ে দশটা হবে। কাপড় ছেড়ে বারান্দায় চেয়ারে বসে মালা জপছেন, আর

আমি তাঁর কাছে বসে চিৎকার করে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করতে বসলাম। আমি পড়ি প্রভু মধ্যে মধ্যে বুঝিয়ে দেন। এইভাবে তিনবার চৈতন্যভাগবত পড়া শেষ হ'ল। তারপরে পর পর ধারাবাহিক আরম্ভ হ'ল শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, শ্রীভক্তমাল গ্রন্থ, শ্রীভক্তিরত্নাকর, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী, শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্, শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক শ্রীশ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, শ্রীগীতা, জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম, ইত্যাদি ভক্তিগ্রন্থ পাঠ শেষ করলাম কয়েক বৎসরের মধ্যে। দুপুরের প্রসাদ পাবার পর প্রভু বিশ্রামের পূর্বে কিছু সময়ে মালা নিয়ে বারান্দায় চেয়ারে বসতেন সে সময়ে মুখে মুখে তত্ত্ব বিষয় আমাকে শিক্ষা দিতেন, আর আমি খাতায় নোট করে নিতাম। দেখতে দেখতে ৫/৬ মাস কেটে গেল—দুর্গাপূজোর সময় এসে গেল প্রভু আমাকে পাঠালেন কলকাতা। সেখানে ২১ দিন থেকে আবার ফিরে এলাম নবদ্বীপে। এইভাবে প্রায় এক বৎসর যাবার পর ছোট জ্যেঠামশাই ভাজনঘাট চ'লে গেলেন। তখন প্রভু নিজেই ভোগ রন্ধন করতেন আর আমাকে দিলেন শ্রীশ্রীগৌররায় জীউর পূজোর যোগাড়ের ভার। শ্রীগৌররায়জীর পূজোর যোগাড়, গোপালজীর পূজো এই ছিল আমার নিত্য নৈমিত্তিক কাজ।

প্রভু নিজেই তরকারী আমানি করে ভোগরন্ধন করতেন পরে পূজার্চন শেষ করে প্রসাদ পেতে ৩/৪ টা বেজে যেত। আমি বললাম, আমাকে রান্নার ভার কিছু দিন। তিনি বললেন, উনুনের ধারে ও বঁটির কাছে তোমাকে যেতে দেবনা। প্রভু রান্না করতেন আমি তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে থাকতাম এইভাবে ২/১ মাস গেল, আবার ছোট জ্যেঠামশাই ভাজনঘাট থেকে ফিরে এলেন। এখানে মাস কতক থেকে আবার ভাজনঘাট চ'লে গেলেন। এইবার আস্তে আস্তে রান্নার অংশ আমি হাতে নিলাম।

প্রভু তরকারী আমানি করতেন আমি ধুয়ে রান্না ঘরে গোছ করে রাখতাম। প্রথমে বললেন, 'তুমি আলুভাজা গুলো ভাজ আমি গিয়ে তরকারী করছি। ২/৩ দিন আলু পটল-ই ভাজার পর প্রভুকে না বলেই আলুর তরকারী চড়িয়ে দিলাম। তরকারী শেষ হ'য়ে যাবার পর প্রভু যখন অন্যান্য আমানি শেষ করে রান্নাঘরে এলেন, তখন আমার ভাজা ও আলুর চচ্চরী হয়ে গেছে। বললাম, আজ আলুর চচ্চরী আমি করে ফেলেছি। প্রভু বললেন, "হ্যাঁ, এর মধ্যে আলুর চচ্চরী হয়ে গেলো, যদি তেল ছিটকে লাগতো? এইভাবে একটা একটা করে তরকারী রান্না করতে আরম্ভ করলাম। একদিন ডাল রাঁধলাম, মিষ্টির আন্দাজ বুঝতে না পেরে প্রাণভরে মিষ্টি ঢেলেছি। প্রসাদ পাবার সময়ে প্রভু বললেন—'আঃ সরবৎ খাচ্ছি, এভাবেই রান্না শেখে। কোনদিন নুন বেশী হবে, কোনদিন মিষ্টি বেশী হবে, নিয়মই



প্রভুপাদ শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী

তাই। এবার রান্নার অংশ সম্পূর্ণ আমি নিলাম। কোন্‌টা কিভাবে তৈরী করতে হ'বে প্রভু মুখে বলে দিতেন আর আমি রাঁধতাম। প্রভু তরকারী আমানি করতেন।

নিশার ঘন অন্ধকারে মাঝে মাঝে শেয়াল ডাকছে তখন এই এলাকায় লোক বসতি খুবই বিরল ছিল, আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি, প্রভু পায়চারী করছেন, বললেন এখানে অন্ধকারের মধ্যে ভাল লাগছে না? ভয় করছে? বললাম, "ভাল লাগছে"। প্রভু বললেন, "শহরের হৈ-হট্টগোলের থেকে ঠাকুর আমাদের কত ভাল রেখেছেন।" মধ্যে মধ্যে কলকাতার কথা মনে হলে মন একটু চঞ্চল হতো বটে কিন্তু পরক্ষণেই শান্ত হ'য়ে যেতো।

একদিন প্রভু বললেন, "প্রত্যহ সন্ধ্যায় কীর্তন করবে।" আমি কীর্তনের সুর, তাল কিছুই জানিনা, তার পরে লজ্জা। কিন্তু প্রভুর আদেশ ও রক্ষা করতে হবে। আমার ঘরে গোপালজীর সামনে করতাল বাজিয়ে কীর্তন আরম্ভ করলাম। রাত্রে প্রভাতী সুর ধরলাম। গলা ওঠে না আর খুব লজ্জাও করছে। এইভাবে কয়েকদিন কীর্তন শোনার পর প্রভু গোপালদাকে বললেন, "গোপাল, তুমি দেবুকে কীর্তন শেখাবে।" গোপালদা প্রভুর অন্তরঙ্গ সেবক। থাকেন কাপালী পাড়া। তাঁর কাজ হ'লো প্রত্যহ সকালে গঙ্গাস্নান করে এসে আশ্রমের ফুল তুলে গৌররায়জীর মালা গাঁথা। মালা গেঁথে গোপালদা বাড়ি চলে যান। আর বিকেল ৬ টার সময় আসেন। প্রভু ঠাকুর ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় একটু পায়চারী করার পর ঘরে যখন গ্রন্থ লিখতে বসেন গোপালদা পায়ের কাছে বসে তাঁকে পাখার হাওয়া করতে থাকেন।

গোপালদা প্রভুর কথা ফেলতে পারলেন না। কিছু সময় প্রভুকে হাওয়া করে সাড়ে সাতটা নাগাদ আমাকে নিয়ে কীর্তনে বসতেন। গোপালদার অনেক রকম সুরতাল জানা ছিল। "নিতাই পদ কমল" ও "গৌরাঙ্গের দুটি পদ"—২/১ টি শ্রীনরোত্তমের পদ গেয়ে শ্রীনামকীর্তন ধরতেন। কীর্তন শেষ হতো সাড়ে আটটায়। আমি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে কীর্তন করতাম। সেই থেকে প্রত্যহ সন্ধ্যায় আশ্রমে কীর্তন আরম্ভ হোলো। আমি এখানে আসার পর বৎসরে একবার কলকাতা ছাড়া, সাত বৎসর আশ্রমের বাইরে যাইনি। কেবল চৈত্র-সংক্রান্তির দিন প্রভুর সঙ্গে গঙ্গাস্নানে যেতাম ও তার পরের দিন পয়লা বৈশাখ প্রভুরই সঙ্গে যেতাম শ্রীধামেশ্বর মহাপ্রভুর দর্শনে। আস্তে আস্তে সন্ধ্যায় ৪/৫ জন করে ভক্তরা আশ্রমে আসতে আরম্ভ করলেন ও কীর্তনে যোগ দিতেন। আর প্রতি মঙ্গলবার প্রভুর ধারাবাহিক হরিকথা আলোচনা হোতো ভক্তমহলে।

একদিন সুধীরবাবু (শ্রীসুধীর কুমার দাশগুপ্ত) সন্ধ্যার সময়ে আশ্রমের নীচে বেঞ্চিতে বসে আমাকে কীর্তন গেয়ে শোনাচ্ছেন। ভারী সুন্দর সুমিষ্ট গলা ছিল

তাই। এবার রান্নার অংশ সম্পূর্ণ আমি নিলাম। কোন্‌টা কিভাবে তৈরী করতে হ'বে প্রভু মুখে বলে দিতেন আর আমি রাঁধতাম। প্রভু তরকারী আমানি করতেন।

নিশার ঘন অন্ধকারে মাঝে মাঝে শেয়াল ডাকছে তখন এই এলাকায় লোক বসতি খুবই বিরল ছিল, আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি, প্রভু পায়চারী করছেন, বললেন এখানে অন্ধকারের মধ্যে ভাল লাগছে না? ভয় করছে? বললাম, "ভাল লাগছে"। প্রভু বললেন, "শহরের হৈ-হট্টগোলের থেকে ঠাকুর আমাদের কত ভাল রেখেছেন।" মধ্যে মধ্যে কলকাতার কথা মনে হলে মন একটু চঞ্চল হতো বটে কিন্তু পরক্ষণেই শান্ত হ'য়ে যেতো।

একদিন প্রভু বললেন, "প্রত্যহ সন্ধ্যায় কীর্তন করবে।" আমি কীর্তনের সুর, তাল কিছুই জানিনা, তার পরে লজ্জা। কিন্তু প্রভুর আদেশ ও রক্ষা করতে হবে। আমার ঘরে গোপালজীর সামনে করতাল বাজিয়ে কীর্তন আরম্ভ করলাম। রাত্রে প্রভাতী সুর ধরলাম। গলা ওঠে না আর খুব লজ্জাও করছে। এইভাবে কয়েকদিন কীর্তন শোনার পর প্রভু গোপালদাকে বললেন, "গোপাল, তুমি দেবুকে কীর্তন শেখাবে।" গোপালদা প্রভুর অন্তরঙ্গ সেবক। থাকেন কাপালী পাড়া। তাঁর কাজ হ'লো প্রত্যহ সকালে গঙ্গাস্নান করে এসে আশ্রমের ফুল তুলে গৌররায়জীর মালা গাঁথা। মালা গেঁথে গোপালদা বাড়ি চলে যান। আর বিকেল ৬ টার সময় আসেন। প্রভু ঠাকুর ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় একটু পায়চারী করার পর ঘরে যখন গ্রন্থ লিখতে বসেন গোপালদা পায়ের কাছে বসে তাঁকে পাখার হাওয়া করতে থাকেন।

গোপালদা প্রভুর কথা ফেলতে পারলেন না। কিছু সময় প্রভুকে হাওয়া করে সাড়ে সাতটা নাগাদ আমাকে নিয়ে কীর্তনে বসতেন। গোপালদার অনেক রকম সুরতাল জানা ছিল। "নিতাই পদ কমল" ও "গৌরাঙ্গের দুটি পদ"—২/১ টি শ্রীনরোত্তমের পদ গেয়ে শ্রীনামকীর্তন ধরতেন। কীর্তন শেষ হতো সাড়ে আটটায়। আমি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে কীর্তন করতাম। সেই থেকে প্রত্যহ সন্ধ্যায় আশ্রমে কীর্তন আরম্ভ হোলো। আমি এখানে আসার পর বৎসরে একবার কলকাতা ছাড়া, সাত বৎসর আশ্রমের বাইরে যাইনি। কেবল চৈত্র-সংক্রান্তির দিন প্রভুর সঙ্গে গঙ্গাস্নানে যেতাম ও তার পরের দিন পয়লা বৈশাখ প্রভুরই সঙ্গে যেতাম শ্রীধামেশ্বর মহাপ্রভুর দর্শনে। আস্তে আস্তে সন্ধ্যায় ৪/৫ জন করে ভক্তরা আশ্রমে আসতে আরম্ভ করলেন ও কীর্তনে যোগ দিতেন। আর প্রতি মঙ্গলবার প্রভুর ধারাবাহিক হরিকথা আলোচনা হোতো ভক্তমহলে।

একদিন সুধীরবাবু (শ্রীসুধীর কুমার দাশগুপ্ত) সন্ধ্যার সময়ে আশ্রমের নীচে বেঞ্চিতে বসে আমাকে কীর্তন গেয়ে শোনাচ্ছেন। ভারী সুন্দর সুমিষ্ট গলা ছিল

তাঁর। প্রভু ঠাকুর ঘর থেরে বেরিয়ে বারান্দায় পায়চারী করছেন, হঠাৎ কীর্তন শুনে সিঁড়ির কাছে এসে থমকে দাঁড়ালেন। ২/৩ টি কীর্তন শোনার পর আমি ওপরে এলাম, সুধীরবাবু পিছু পিছু আসছেন। প্রভু আমাকে বললেন, "কে গান গাইছিলরে?" "আমি বললাম, "সুধীরবাবু।" প্রভু সুধীর বাবুকে পেছনে দেখে বললেন, "বাঃ! আপনার এত মিষ্ট গলা, আপনি গোপনে রেখেছেন। আপনার কীর্তন শুনে আমি খুব সুখী হ'লাম। যাক আমাদের কীর্তনের আসরে আপনি রোজ কীর্তন করবেন। সেই থেকে সুধীরবাবু হলেন আমাদের কীর্তনের মাষ্টার। প্রভু তাঁর উপাধি দিলেন 'মধুকণ্ঠ'। সুধীরবাবু আসতে গোপালদা একটু মনঃক্ষুন্ন হলেন। সুধীরবাবু নানা রকম পদাবলী ও লীলাকীর্তন জানতেন। প্রত্যহ নূতন নূতন পদকীর্তন করে সুমিষ্ট গলায় নামকীর্তন করতেন। আমি আসার দুই বৎসর পরেই গোঁসাইজী (শ্রীমৎ গৌরগোপাল গোস্বামী) কর্মস্থল থেকে অবসর নিয়ে ধামবাসী হলেন। তিনিও প্রত্যহ এই কীর্তনের আসরে যোগ দিতেন। এবার কীর্তনের আসরে ৮/১০ জন ভক্ত আসতে লাগলেন। সন্তোষ বাবুও প্রায় সেই সময় থেকে আশ্রমে আসা আরম্ভ করলেন। আমি আসার বছর তিনেক পরেই কলকাতায় শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদজী দেহরক্ষা করলে পণ্ডিত কানাইলালজীকে নিয়ে মণিবাবু নবদ্বীপে এলেন। মণিবাবু প্রভুকে বলে পণ্ডিতজীকে আশ্রমে রেখে গেলেন পণ্ডিতজী হলেন আমাদের আশ্রমবাসী। তিনি আশ্রমের নীচের ঘরে থাকেন, এখানে সংস্কৃত কলেজে পড়ান। সন্ধ্যায় আমাদের সঙ্গে সংকীর্তনে যোগ দেন। প্রভু তাঁর উপরে আমার সংস্কৃত শেখার ভার দিলেন। কয়েকমাস তাঁর কাছে সংস্কৃত পড়লাম—"শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণ"। সময়ের অভাবে ও সেবার কাজ আমার উপর আসায় আমার সংস্কৃত শিক্ষা বেশীদূর এগোল না। কিছুদিন পরে পণ্ডিতজী অসুস্থ হয়ে পড়লেন, সেই সময় মণিবাবু ছিলেন। মণিবাবু অফিসের কাজে প্রায় কৃষ্ণনগর, কাটোয়া আসতেন সেই সময়ে আশ্রমে একদিন-দু'দিন থেকে চলে যেতেন। মণিবাবু তাঁর মোটরে করে পণ্ডিতজীকে কলকাতা নিয়ে গেলেন। সুস্থ হয়ে পণ্ডিতজী নবদ্বীপে এসেছিলেন, কিন্তু আশ্রমে না থেকে নূতন ভজন কুটিরে থাকতেন ও প্রায়ই সন্ধ্যায় আশ্রমে আসতেন। এর মধ্যে কয়েকমাস জগবন্ধু ভক্তের কাছে আমি মৃদঙ্গও শেখার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু সময়ের জন্য তাও হয়নি। তাই প্রভু আমাকে প্রায়ই বলতেন পূর্বসংস্কার নিয়ে এসেছিলে, সেটাই প্রকাশ পেল, নূতন করে কিছু এগোলনা।

প্রভু, আমি ও রমেন ভক্ত এই তিনজন আশ্রমে আছি। প্রভু একদিন বললেন, 'রমেন ভক্ত যদি তরকারী আমানি করার ভারটা নেয় তবে আমি গ্রন্থ লেখার অনেক

সময় পাই—এতে আমার অনেক সময় চলে যাচ্ছে, যার জন্য লেখা এগুচ্ছেনা। সেই কথা রমেন ভক্তকে বললাম তিনি সঙ্গে সঙ্গেই রাজী হয়ে গেলেন। সেই থেকে রমেনভক্ত তরকারী আমানি করতেন আর আমি ভোগ রন্ধন করতাম। শ্রীগৌররায়জীর পূজোর যোগাড় করে দিতাম, প্রভু শ্রীগৌররায়জীর অর্চনা করতেন। একদিন প্রভু আমাকে বললেন, "আমার বহুদিনের বাসনা আশ্রমে যে সব ভক্তরা আসেন, তাঁদের একজন একজন করে শ্রীশ্রীগৌররায়জীর অন্ন প্রসাদ দিই। তুমি যদি এই ভার নিতে পার তো দেখ। আমি রাজী হলাম। সেই থেকে প্রতি রবিবার আরম্ভ হলো বিচিত্র ভোগারাধনা। এক জন থেকে শেষে দাঁড়াল ৬/৭ জন। ভোগারাধনার দিন নানান পদ রান্না হোত, পুষ্পান্ন, ধোঁকা—প্রতি উৎসবেই হোত—প্রভু পুষ্পান্ন, ধোঁকা খুব পছন্দ করতেন। আমায় বলতেন তুমি আমার শেষ সময়ে অনেক কিছুই খাওয়ালে। এখানে আসার ২/১ বৎসর পরে আমি প্রভুকে বললাম, "আমাকে দীক্ষা দিন, প্রভু বলতেন—"পরে হবে"। পরে হবে, পরে হবে বলে' কয়েকমাস কাটালেন তারপর একদিন নিজেই দীক্ষার দিন ঠিক করে দীক্ষার প্রস্তাব তুললেন। ১৩৭১ সালে (ইং ১৯৬৪) ২০ শে শ্রাবণ ত্রয়োদশীর দিন শ্রীগৌররায়জীর আশ্রমে প্রভু আমাকে দীক্ষা দিলেন। আমি ছেলেবেলা থেকেই প্রতিবৎসর নবদ্বীপে আসতাম, ১৯৬১ সালে নভেম্বর (অগ্রহায়ণ) মাসের দিকে একবার নবদ্বীপে এসেছিলাম, তখন প্রভু আমাকে জপমালা দিয়ে ছিলেন। আমি এখানে আসার কয়েক বৎসরের মধ্যেই মণিবাবু কর্মস্থল থেকে অবসর গ্রহণ করে নবদ্বীপ ধামবাসী হলেন। তিনিও প্রত্যহ সন্ধ্যায় আশ্রমে এসে কীর্তনে যোগ দিতে লাগলেন। ইতিমধ্যে ছোট জ্যেঠামহাশয়ও ভাজনঘাট থেকে এসে পড়েছেন। আমি শ্রীগৌররায়জীর ভোগ রন্ধনের কাজ আর ছাড়িনি। প্রভু বলতেন, "এই তোমার ভজন।" গোপালদা ক্রমশঃই অথর্ব হয়ে পড়লেন। মালা গাঁথতে আর আসতে পারেন না। প্রত্যহ বিকালে একবারই আসেন। প্রত্যহ মালা গাঁথা, শ্রীগৌররায়জীর পূজোর যোগাড় করা, শ্রীগোপালজীর সেবা ও ভোগ রন্ধন আমার নিত্যকাজ। তখন ফুলও প্রচুর আসতো, বীরেন বাবু তাঁর ফুলের বাগান থেকে প্রত্যহ নানান রকম ফুল পাঠাতেন। আশ্রমের বাগানেও প্রচুর ফুল হতো। প্রভু একদিন বললেন, "গৌররায়জীর সেবার কাজ প্রায় সবই আমার করা আছে, তবে মালা কোন দিন গেঁথেছি বলে আমার মনে হচ্ছেনা এটাই বা কেন বাকী থাকে। আজকে একটা মালা গেঁথে নিঃসন্দেহ হওয়া যাক্ কেমন। আমি তাঁকে বেলফুল ও গন্ধরাজ ফুল দিলাম—যত্নের সঙ্গে বেলফুলের মালা গাঁথলেন—মধ্যে মধ্যে একটা করে গন্ধরাজ ফুল দিয়ে। খুব সুন্দর মালা হলো। নিজে হাতে শ্রীগৌররায়জীকে পরিয়ে দিয়ে বললেন সব সেবাই আমার প্রায় পূর্ণ করলেন ঠাকুর।

আমি নবদ্বীপে আসার ৪/৫ বৎসর পর হঠাৎ প্রভু বধির হয়ে যান। স্থানীয় চিকিৎসককে দেখান হলো তিনি বহু ঔষধের ব্যবস্থা করলেন, কিন্তু কোনটাই কার্যকরী হলো না। সকলের অনুরোধে ছোট জ্যেঠামশাইকে সঙ্গে করে এক সপ্তাহের জন্য কলকাতা গেলেন। সেখানে কানের বিশেষজ্ঞকে দিয়ে চিকিৎসা করালেন। আবার কানে শুনতে পেলেন। তারপরেই মণিবাবুর মোটরে প্রভু নবদ্বীপে ফিরে এলেন। তখন সকাল প্রায় ৯/১০ টা হবে। প্রভু খুব পরিশ্রান্ত। স্নানাদি সেরে তিনি তাঁর শয়ন কক্ষে বিছানার উপরে শুয়ে পড়লেন। সেই রূপটি আজও আমার চোখের সামনে ভাসছে। পীতবর্ণ অঙ্গ, কাশপুষ্প সম শুভ্র পক্কচুল। দুগ্ধ ফেনিলবৎ শয্যার ওপরে ধবধবে শুভ্র থান বস্ত্র পরিধানে কাপড়ের কোঁচার অংশ সর্বাঙ্গে আবৃত। হাতে সাদা মালার থলিতে মালা নিয়ে শুয়েই জপ করছেন চোখ বুঁজে। তখন ফাল্গুণ মাস। ঋতুরাজ বসন্তের মন্দ মন্দ বাতাস ভেসে আসছে, আম্রমুকুলের সুঘ্রাণ নিয়ে আর মধ্যে মধ্যে কোকিলের সুকণ্ঠে কুহু কুহু কুজনে মাতিয়ে তুলছে শ্রীশ্রীগৌরকিশোর শান্তিকুঞ্জ আশ্রম। প্রভু পারতপক্ষে ধাম ছাড়তে রাজী হতেন না। বলতেন, ধামের বাইরে গেলে কলি আমাকে মেরে ফেলবে। আমি দীর্ঘদিন ধামে বাস করে ধামের বাইরে প্রাণত্যাগ করতে রাজী নই। সেবার হঠাৎ বধির হয়ে যাওয়ায় সকলের অনুরোধে তাঁকে কলকাতা যেতে হয়েছিল, সেখানে গিয়ে শরীর খারাপ হওয়ায় ও ঠাকুরের কৃপায় কান শীঘ্র ভাল হয়ে যাওয়ায় বেশী দেরী না করে মণিবাবুর সঙ্গে ধামে চলে এসেছিলেন।

১৯৭১ সালে বড় বন্যা হয়, এর পূর্বে আমি ধামে আসার পর ২/১ বার বন্যা হয়েছিল, তবে সেরূপ ক্ষতিকর নয়, তাই আশ্রম ত্যাগ করতে হয়নি। ১৯৭১ সালে বন্যায় আমরা আশ্রম ছেড়ে দণ্ডপাণিতলায় একটা বাড়ী ভাড়া নিয়ে সেখানে ছিলাম। বীরেনবাবু ঐ বাড়ী ঠিক করে দিয়েছিলেন। জন্মাষ্টমীর কয়েকদিন পূর্বে ঐ বাড়ী গিয়েছিলাম। সেখানে নমঃ নমঃ জন্মাষ্টমী উৎসব পালন করা হয়েছিল। জল ক্রমশঃ বাড়তে থাকায় প্রভু আমাকে শ্রীশ্রীগৌররায়জীকে নিয়ে কলকাতা যেতে আদেশ করলেন। আমি শ্রীশ্রীগৌররায়জীকে ও শ্রীশ্রীকিশোরগোপালজীকে সঙ্গে নিয়ে সন্তোষবাবুর সঙ্গে কলকাতা গেলাম। নবদ্বীপে থাকলেন প্রভু, ছোট জ্যেঠামশাই ও রমেনভক্ত। কলকাতায় গিয়ে দেখি ছোড়দার স্ত্রীর মরণাপন্ন অসুখ। বাঁচবার কোন আশা নেই। সকলেরই মন বিষন্ন। আমি বললাম, "আর কোন ভয় নেই, গৌররায়জী এসেছেন, কোন বিপদ হবেনা। শ্রীশ্রীগৌররায়জীর কৃপায় কয়েকদিনের মধ্যেই ছোড়দার স্ত্রী সুস্থ হয়ে উঠলো। বন্যার কয়েকমাস ঠাকুর কলকাতায় রইলেন। নবদ্বীপে প্রভুরা খুবই কষ্টের মধ্যে আছেন। বন্যার জন্য

কিছুই পাওয়া যায়না। এরমধ্যে একদিন হঠাৎ বজ্রপাত। সন্ধ্যার কিছু আগে প্রভু ঠাকুর ঘর থেকে বেরিয়েছেন, নিত্যভজন সেরে। সেদিন একটু মেঘলা করেছিল। হঠাৎ কড়্‌কড়্‌ রবে বাজ পড়ল বাড়ীর উঠানে একটা নারকেল গাছের উপরে উঠোনে একটা তারের আলনা ছিল, তার এক মাথা নারকেল গাছের গায়ে বাঁধা আর এক মাথা ঠাকুর ঘরের জানালার সাথে বাঁধা। নারকেল গাছে বাজ পড়েই ঐ তার বেয়ে একেবারে ঠাকুর ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। ছুঁচ বাজী মতন সারা ঘর ছোটাছুটি করে পূজোর কিছু বাসন পত্রকে ফুটো করে দিয়ে জানালার তলার মাটি ফুঁড়ে বাজ বেরিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পরে লোকে লোকারণ্য—সকলের মুখে একই কথা নারকেল গাছে বাজ পড়েছে। বাজপড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছোট জ্যেঠামশাই ও রমেনভক্ত প্রভুর ঘরে ছুটে এলেন প্রভু বললেন—আমার মাথা যেন ভার লাগছে—খুব বারুদের গন্ধ বেরোতে লাগল। তখন তাঁরা বুঝতে পারেননি—তাঁদেরই বাড়ীর নারকেল গাছে বাজ পড়ে ঘরের মধ্যে তছনছ করে গেছে। লোক আসার পর দেখলেন, নারকেল গাছ পুড়ে গেছে—পরের দিন সকালে ঠাকুর ঘর খুলে দেখেন এলাহি কাণ্ড প্রভু বলতেন, "কলি সর্বদা আমাকে মারবার জন্য চেষ্টা করছে কিন্তু গৌররায়জী আমাকে রক্ষা করছেন। তাঁর উপর পদে পদে কলির বাধা আমরাও লক্ষ্য করতাম। প্রভু যখন গ্রন্থ লিখতে বসতেন বেশীর ভাগ দিন একটা না একটা বাধা এসে তাঁর লেখা বন্ধ করে দিত। বেশীর ভাগ দিন আলোর বিভ্রাট হ'তো—আশ্রমে ইলেকট্রিক ছিলনা—প্রভু ইলেকট্রিক পছন্দ করতেন না বলেই ইলেকট্রিক নেওয়া হয়নি। হ্যারিকেন বা কেরোসিন টেবিল ল্যাম্প ইত্যাদি আলোর ব্যবস্থা হ'তো। আলো জ্বালিয়ে প্রভু গ্রন্থ লিখতে বসেছেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই কালি পড়ে অন্ধকার হয়ে গেল। আবার চিমনি মুছে ঠিক ঠাক করে দিলেন রমেন ভক্ত। কিছু সময় পরে পূর্ববৎ। কোন কোন দিন প্রভুর হাত থেকে কলম পড়ে গিয়ে নিবটার ক্ষতি হয়ে গেল—সেদিনের মত লেখা বন্ধ করে দিল কলি। অথবা কোন কোন দিন আগন্তুক লোক এসে উপস্থিত, তাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে সময় চলে গেল। আবার কোন কোন দিন প্রভুর শরীর এমন অসুস্থ হয়ে পড়ল যে তাঁর লেখা ২/৩ দিন বন্ধ হয়ে গেল। তাই প্রভু বলতেন কলি যখন আমাকে এত বাধা দিচ্ছে তার মানে,কলির বিরুদ্ধে আমি লিখছি বলেই কলি সহ্য করতে না পেরে আমার পেছনে এত লেগেছে। কলি আমাকে যতই বাধা দিক আমি লেখা কিছুতেই বন্ধ করবো না।

প্রভু আজীবন শ্রীনাম সম্বন্ধে উপদেশ করতেন। নিজের আচরণেও তাই দেখিয়ে গেছেন। ভজন পথে কলির প্রধানতম অস্ত্র 'নামাপরাধ'। সেই দশবিধ নামাপরাধ

হতে সতর্ক হয়ে নাম করতে সকলকে বলতেন। হরিসভার আসরে যখনই যাহাই ব্যাখ্যা করতেন তার প্রথমে শেষে ও মধ্যে শ্রীনামের শ্রেষ্ঠত্ব ও নিরপরাধে শ্রীনামশ্রয় সম্বন্ধে জানিয়ে সকলের চেতনা জাগিয়ে তুলতেন। হরিসভার আসরে প্রভু লীলাকথা ব্যাখ্যা করতেন না। শাস্ত্রের দুরূহ সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করতেন। একবার সুধীরবাবু প্রভুকে বললেন, 'প্রভু, একদিন আমাদের 'রাসলীলা' সম্বন্ধে কিছু শোনান। তার উত্তরে প্রভু বললেন, 'আমাদের নাম সম্বন্ধে কিছুই জানা নেই—এই জীবনটা ভালভাবে নামকে জানি। নামই "রাসলীলা" সম্বন্ধে অন্তরে জানিয়ে দেবেন। কারো কাছে লীলাতত্ত্ব জানার প্রয়োজন হবেনা। একদিন মণিবাবু, আমি ও আরও ২/৩ জন ভক্ত বসে আছি। প্রভু আমাদের কাছে 'গোবর্ধন লীলা' ব্যাখ্যা করলেন। কি চমৎকার ব্যাখ্যা। পরে বললেন, 'দেখুন মণিবাবু, আমি কি লীলা বলতে পারিনা? কিন্তু লীলা বলে কোন লাভ নেই—যতক্ষণ না নিরপরাধ চিত্ত না হচ্ছে, লীলা শুনে কোন ফল হ'বেনা। এখন আমাদের প্রয়োজন কি করে নিরপরাধ হওয়া যায়। তাই নামাপরাধই সর্বাগ্রে আমাদের জানা প্রয়োজন।

১৯৬৯ সালে আমি বাবা, দাদাদের সঙ্গে শ্রীধাম বৃন্দাবনে গিয়েছিলাম। সেবার সেখানে বন্যা হওয়ায় বৃন্দাবন শহর ছাড়া আর কিছুই দর্শনের সৌভাগ্য হয়নি। তারপরের বৎসরই প্রভু আমাকে মণিবাবুদের সঙ্গে বৃন্দাবন পাঠালেন। সেবার মণিবাবু ব্রজমণ্ডলের অনেক স্থান দর্শন করালেন বটে কিন্তু খুব তাড়াহুড়োর মধ্যে। তাই তার পরের বছর পুনরায় প্রভু আমাকে পণ্ডিতজী, গোঁসাইজীর সঙ্গে ব্রজে পাঠালেন। সেবার মনের মতন লীলাস্থলী দর্শন হয়েছিল। শ্রীধাম থেকে ফেরার পর প্রভু প্রত্যহ সন্ধ্যায় আমাকে অষ্টকালীন লীলা সম্বন্ধে উপদেশ করতেন, এবং মালিকা গ্রহণের সময়ে সেই লীলা স্মরণ করার আদেশ করেছিলেন।

নবদ্বীপে আসার পর সাত বৎসর আশ্রমের বাইরে বের হ'তামনা। সাত বৎসর পর আশ্রমের বাইরে শহরের দিকে বের হতাম। তাতে প্রভু খুব উদ্বিগ্ন হতেন এমনকি সময়ে সময়ে তাড়ন ভর্ৎসনাও করতেন। শেষের দিকে বিশেষ কিছু বলতেন না। আমি আস্তে আস্তে বেরনো বন্ধ করে দিলাম। আমার সাধুদর্শনে খুব কৌতুহল হতো। শ্রীধাম বৃন্দাবন থেকে খ্যাতনামা একজন মহাত্মা শ্রীনবদ্বীপ ধামে এলেন। পূর্বে বৃন্দাবনে তাঁর দর্শন আমি করে ছিলাম। তিনি আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। নবদ্বীপে সাধু এসেছেন এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছে। প্রতিদিন শত শত লোক দর্শনে যায়। প্রভুর আদেশ নিয়ে আমিও মধ্যে মধ্যে সাধুর দর্শনে যেতাম। সাধুর জন্য মিষ্টাদি তৈরী করে নিয়ে যেতাম। প্রভুই উৎসাহ দিয়ে সাধুর জন্য খাবার করাতেন। একদিন প্রভু বললেন, "সাধুসঙ্গ করা খুব ভাল তবে দেখ গুরুকে যেন

ছাপিয়ে না যায়। বলা বাহুল্য এর কিছুদিন পরে প্রভু আমাকে নিকটে ডেকে একটি গোপন কথা বললেন, তখন একটু একটু শীত পড়েছে মনে হয় অগ্রহায়ণ মাস হবে। বিকালে ঠাকুর ঘর থেকে বেরিয়ে প্রভু একটু পায়চারী করার পর বিছানায় শুলেন। সেদিন কেউ আশ্রমে আসেননি। আমি তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। প্রভু আমাকে বললেন, "তোমাকে একটি কথা বলছি। বাড়ীর অন্য কেউ বুঝবে না, তুমিও মনে করতে পার—অহংকারের কথা। কিন্তু আমি না জানালে তোমরা বুঝতে পারবেনা। আর নিজের প্রশংসা নিজে করলে আত্মহত্যার তুল্য হয়। উপমা দিলেন—অর্জুনকে কোন কারণে শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "তোমার আত্মহত্যা করা উচিৎ।" অর্জুন বললেন, "আমি রাজী আছি—কি করতে হবে বল। শরবিদ্ধ হব—না আগুনে ঝাঁপ দেব? তুমি যা বলবে, তাই করতে রাজী আছি। ভগবান বললেন, "এসব তোমায় কিছু করতে হবেনা তুমি নিজ মুখে নিজের আত্মপ্রশংসা কর তাহলেই আত্মহত্যার তুল্য হবে।"—অর্জুন তাই করলেন। প্রভু বললেন আত্মহত্যাতুল্য নিজ প্রশংসা হলেও আমি করতে বাধ্য হচ্ছি না করলে বুঝতে পারবেনা। সাধুসঙ্গ করা খুব ভাল। শাস্ত্রও বলেছেন, "কৃষ্ণভক্তির জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।" তুমি সেই সাধুসঙ্গ করছ খুবই ভাগ্যের কথা কিন্তু এটুকু তুমি সর্বদা মনে রেখে সেই বুঝে সাধুসঙ্গ কর। রূপ সনাতনাদি গোস্বামীগণের পর ঠিক মহাপ্রভুর মনোভীষ্ট ও রূপানুগ ভাজনের আদর্শ স্বরূপ যদি জগতে কোন নিঃস্বার্থ সাধু এসে থাকেন তবে তোমার এই বড় জ্যেঠামশাইকেই জানবে। তার চরিত্রের মধ্যে কোন দোষ, অর্থ ও প্রতিষ্ঠা বিষয়ে লালসা কোথাও খুঁজে পাবেনা। ব্রহ্মচর্য জীবন সাধুর জীবনের একটি মহান্ আদর্শ জেনো। জগতে বহু প্রকার সাধু এসেছেন ও আসবেন কিন্তু শ্রীগোস্বামীগণের আদর্শে গড়া সাধু খুবই বিরল জেনো। এর বেশী আর কিছু বলবনা—তুমি সেই বুঝে সাধুসঙ্গ করো। আমি সেই থেকে নিজের মনকে সামলে নিলাম। বিশেষ আর কারো কাছে যেতামনা।

প্রভু, আমি রমেনভক্ত আশ্রমে আছি—প্রভু তখন ভোগরন্ধন করেন। একদিন আমাকে বললেন, "কালরাত্রে স্বপ্ন দেখলাম বাবাজী মশাই (কাষ্ঠাধারী বাবাজী) এসে যেন বললেন শ্রীশ্রীগৌররায়জীর প্রসাদ খাব। আমি তাঁকে প্রসাদ দিলাম—তিনি তৃপ্তির সঙ্গে প্রসাদ পেলেন বাবাজী মাশাই তখন দেহরক্ষা করেছেন।) একদিন ভাল করে রেঁধে তাঁর উদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীগৌররায়জীকে ভোগ দিয়ে কোন সাধুকে প্রসাদ দিলে ভাল হয়।" ২/৩ দিন পরে সেইরূপ ব্যবস্থা হলো নারায়ণ দাসজীকে প্রসাদ পাবার জন্য বলা হলো। প্রভু রন্ধন করছেন, আমি দাঁড়িয়ে আছি। শুক্তনী রাঁধা হলো। রাঁধার পর কোন পাত্রে ঢালবেন ঠিক করতে পারছেন না। আমি

একটি সরা এগিয়ে দিলাম। শুক্তোনী ঢালার জন্য। সাঁড়াশী দিয়ে কড়াটা ধরলেও প্রভুর হাত কাঁপছে। আমি সরাটা এগিয়ে দিচ্ছি, সেই সময়ে শুক্তোর কিছু অংশ আমার হাতে পড়ে গেল। আর যাবে কোথায় প্রভু চেঁচিয়ে উঠলেন। হায় হায়। আমি তোর হাত পুড়িয়ে দিলাম। শ্রীশ্রীগৌররায়জীর অচিন্ত্য কৃপায় ফুটন্ত শুক্তোনীর কিছু অংশ আমার হাতে পড়লেও আমার বিন্দুমাত্র ফোস্কা বা জ্বালা হয়নি। আমি বললাম, "আমার কিছুই হয়নি, দেখুন। প্রভু কি শোনেন যেন তাঁরই যন্ত্রনা বেশী। তাড়াতাড়ি কড়া নাবিয়ে ঠাণ্ডা জল ঢাললেন, বললেন, "একটু আলু থেঁতো করে দে—নারকেল তেল দে।" অনেক করে বলে তাঁকে শান্ত করলাম।

তখন শীতকাল। প্রভুর স্নান করতে খুব দেরী হ'ত তার উপর বার্ধক্যেও শীতে শরীর চলেনা। স্নানেরও ভীষণ দেরী হয়ে যায়। রমেন ভক্ত তখন আশ্রমে থাকেন। রমেন ভক্ত শহরে গেছেন নিজের কাজের জন্য। প্রভু স্নান সেরে ওপরে উঠলেন তখন প্রায় ১২/১২-৩০ মিঃ। সর্বাঙ্গ হিম হয়ে গেছে। বললেন, "শীঘ্র মকরধ্বজ ও বিষাণ যোগ মেরে দে, নাড়ী নেই।" —এই বলে লেপ গায়ে দিয়ে মালা নিয়ে শুয়ে পড়লেন। আমি তাড়াতাড়ি বিষাণযোগ ও মকরধ্বজ মেরে খাইয়ে দিলাম। তাড়াতাড়ি গরমজল উনুনে বসিয়ে দিলাম—কিছুক্ষণের মধ্যে জল ফুটে উঠলেই গরমজলের ব্যাগে পুরে পায়ে সেঁক দিচ্ছি, প্রভু বললেন, "হা গৌর হা নিতাই বলে কীর্তন শোনা। তাই করলাম—কিছুক্ষণ পরে শরীর গরম হলো। রমেনভক্ত শহর থেকে এলেন, তাকে ডাক্তারের কাছে পাঠালাম, সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ ভৌমিক এলেন দেখে বললেন অত্যন্ত ঠাণ্ডায় এরকম হয়েছে, আর ভয় নেই। একটা ওষুধ দিয়ে গেলেন।

মধ্যে মধ্যে প্রভুর শারীরিক ব্যাধি হতো। কিন্তু শ্রীশ্রীগৌররায়জীর সেবাপূজা কখনও ছাড়তেন না। ১০১° তাপমাত্রা—তাই নিয়েই স্নানাদি করে সেবা করতেন। একবার দীর্ঘদিন অরুচিতে ভুগেছিলেন। ১২টার মধ্যে প্রসাদ (এক পাকে খিচুরি) না পেলেই পরে আর ক্ষিদে থাকেনা। সেই সময় আমি শ্রীগৌররায়জীর অর্চনাদি সেরে তাঁর জন্য পৃথক একবার খিচুরী ভোগ দিয়ে ১২ টার মধ্যে তাঁকে প্রসাদ দিতাম। নিত্যভোগ পরে হতো।

১৩৮১ সালে হঠাৎ কবিতার ভাবের স্ফুরণ হ'লো ঐ সময়ে অনেক কবিতা প্রবন্ধ রচনা করে প্রভুকে দেখাতাম তখন যদিও আমার কবিতা সম্বন্ধে কোন জ্ঞান ছিলনা ছন্দ বা অক্ষরের মিল অত জানা ছিলনা তবুও প্রভু আমাকে খুব উৎসাহ দিতেন। আর বলতেন বড্ড শেষ সময়ে হ'ল আগে হ'লে ভাল হ'তো। যেদিন "শোন শ্যামরায় মোর যেন হয় বৃন্দাবনেতে স্থিতি" কবিতাটি লিখে প্রভুকে পড়ে

শোনালাম—শুনতে শুনতে তাঁর চোখের কোণে জল এল—মুখে একটা নূতন ভাবের সৃষ্টি হলো। পড়া শেষ হলে বললেন, "তুমি কবিতা শুনিয়ে আমায় কাঁদিয়ে দিলে খুব সুন্দর ভাব হয়েছে।" এই কবিতার ভাবটি বহুদিন পূর্বে তাঁর কাছেই আমি শুনেছিলাম। ব্রজে কুঞ্জসেবায় নবদাসী যদি হ'বার সৌভাগ্য নাও হয়, যদি কুঞ্জে মালতী লতাদিও হ'তে পারা যায়, সেও মহাসৌভাগ্য। মালতী লতা হ'য়েও কি সেবায় লাগবো তাও তিনি বলে ছিলেন, সেটি স্মরণ করে এই কবিতা ছন্দ রচিত হ'য়েছিল।

আমি নবদ্বীপে আসার ১০/১১ বৎসর পরে প্রভু দেহরক্ষা করেন। প্রভু তাঁর জপের মালা আমাকে দিয়ে গেছেন। আমার সঙ্গে অনেক কথা হ'তো তাঁর। আমাকে বলতেন আমি মারা যাবার পর এ'মালা আমার সঙ্গে দিওনা। তোমরা ভালভাবে রেখে দিও, প্রত্যহ একবার করে জপ করো। আমি বললাম এ'মালা আমি জপ করতে পারিনা। প্রভু বললেন, তোমার তো মালা আছে। আমি বললাম—আমারটা তো আসল তুলসী নয়। তখন প্রভু বললেন, 'তাহলে তুমি এ'মালা জপ করবে।

ছেলেবেলা থেকেই আমি প্রভুর কাছে কাছে সর্বদা থাকতাম। তিনিও আমাকে খুব স্নেহ করতেন। প্রভু যখন কলকাতায় থাকতেন তখন আমার বয়স ১১/১২ বৎসর হবে। প্রভু ঠাকুর ঘরে পূজো করতেন, আমি তাঁর পেছনে বসে পূজো দেখতাম। ঐ সময়ে তিনি একবার আমাকে শ্রীশ্রীগৌররায়জীর পূজোর যোগাড়ের ভার দিয়েছিলেন। ছোট জ্যেঠামশাই তখন নবদ্বীপ অথবা ভাজনঘাটে থাকতেন। প্রভু একাই সব সেবা করতেন। নিজেই ভোগরন্ধন করে চারতলার উপরে ঠাকুর ঘরে নিয়ে যেতেন। আমি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকতাম।

এরও দু'বৎসর পূর্বে তখন আমার বয়স ১০/১১ বৎসর হবে। মধ্যাহ্নে প্রভু শ্রীশ্রীগৌররায়জীর পূজো করছেন, আমি তাঁর পেছনে বসে আছি। হঠাৎ কানে এল, সিঁড়ি দিয়ে কে যেন ছাতে উঠ্ছে—হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ আওয়াজ হ'চ্ছে—উঠতে যেন খুব কষ্ট হচ্ছে। আমি উঠে গিয়ে দেখি বাবাজী মশাই (কাষ্ঠধারী বাবাজী) বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছেন। কাঁধে আপরিস্কার ৩/৪ টে ঝোলা। গায়ে একটি চাদর পরনে বর্হিবাস। সিঁড়িতে হাতের ভর দিয়ে উঠছেন। তাঁর হাতে যেন একটা কি রয়েছে। আমি বললাম, ওটা কি বাবাজী মশাই? তিনি বললেন, ঠাকুর! আমি প্রভুকে বললাম বাবাজী মশাই আসছেন। প্রভু আসন ছেড়ে উঠে এলেন। বাবাজী মশাই ছাতে এসে প্রভুকে বললেন, 'এই গোপালকে আপনি সেবা করুন।' মনে মনে আমার খুব লোভ হচ্ছে—যদি আমি পাই। প্রভু বললেন, 'বলেন কি! এক

গোপাল নিয়েই আমি পেরে উঠছিনা আবার আর এক গোপাল নিয়ে অপরাধ করবো। আমি নিতে পারবোনা। তখন বাবাজী মশাই হাসতে হাসতে আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'তুই নে।' অন্তর্যামী গোপাল বোধ হয় বুঝেছিলেন আমার মনের বাসনার কথা। আমি সঙ্গে সঙ্গে হাত পেতে গোপালকে নিলাম। প্রভু বললেন, বাবাজী মশাই, ও ছেলে মানুষ ওকে দিলেন—সেবাপরাধ হ'বে।' বাবাজী মশাই বললেন ও যেভাবে পারে সেবা করুক, কোন অপরাধ হ'বেনা—এই বলে বাবাজী মশাই হন্ হন্ করে নীচে নেবে গেলেন। আমি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলাম, আনন্দ আর ধরে না। প্রভু কিছুই বললেন না মুখ টিপে হেসে বললেন তোমার ঠাকুরের কাছে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে রাখ। আর একটা লাল রঙের গোলাপফুল ও তুলসীপাতা দিয়ে বললেন, 'এটা গোপালকে দাও।" আমি ঠাকুরকে নিয়ে নীচে এ'লাম। সকলকে দেখালাম। আমাদের শোবার ঘরে বেঞ্চির নীচে আমার ঠাকুর থাকেন—আমার যখন ৫/৭ বৎসর বয়স তখন খুব খারাপ টাইপের টাইফয়েড হ'য়েছিল অসুখের আবদারে অনেক কিছু চাইতাম। উমা মাসীর কাছে শ্রীশ্রীরাধাবল্লভের ছবি দাও বলে বায়না ধরেছিলাম, তখন উমা মাসী আমাকে একটি শ্রীশ্রীরাধাবল্লভের ছবি বাঁধিয়ে এনে দিয়েছিল, সেই ঠাকুর আমার বরাবর আছে। তারই পাশে শ্রীশ্রী গোপালজীকে বসালাম। সেই থেকে গোপালের ছেলেখেলার পূজো আরম্ভ হোলো। আর বাবাজী মশাই গোপালের টানে বরাহনগর থেকে প্রায়ই আসতে আরম্ভ করলেন। যখনই আসতেন, তাঁর কাঁধের ঝোলা থেকে গোপালের জন্য বার করে দিতেন ফল-ফুল মিষ্টি। যদি কিছু না থাকতো তবে চার পয়সা দিয়ে বলতেন, 'যা, বাতাসা কিনে নিয়ে আয়।' এর মধ্যে প্রভু কবে নবদ্বীপ চলে এসেছেন—আমার ততটা স্মরণ নেই। মধ্যে মধ্যে প্রভু নবদ্বীপে এসে থাকতেন, আবার কয়েকমাস কলকাতা থাকতেন মনে আছে। বাবাজী মশাইয়ের প্রতি সপ্তাহে আসা চাই-ই। রাত্রের দিকে বেশীর ভাগ দিন আসতেন। বাড়ীতে ঢুকেই 'দেবু' বলে ডেকে বাড়ীর ভিতরের বারান্দায় লাঠিখানা ফেলে দিয়ে কাঁধ থেকে ঝোলা নাবিয়ে বসতেন। সামনেই রান্না ঘর, মা রান্না করছে—মাকে দেখে বললেন, মা গোঁসাই রুটি দেন। মা ৪/৫ খানা রুটি করে দিলো, রুটি ঝোলায় পুরে আবার চলে গেলেন। কোন কোন দিন আটা নিয়ে যেতেন। বাবাজী মশাই ডাকার সঙ্গে সঙ্গে আমি ওপর থেকে নীচে নেমে আসতাম, 'তখন আমাকে ঝোলা থেকে ফলফুল ইত্যাদি বের করে দিতেন। বেশীর ভাগ দিন ফুলের কোন পদার্থ থাকতোনা—পাকা ফল হ'লেও তাই ঝোলার চাপে চটকে যেত।

প্রভুর কাছে শুনেছিলাম উনি সিদ্ধপুরুষ। উত্তর কলিকাতায় বরাহনগরে কাষ্ঠাধারী

মঠের শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরের সেবক। বাবাজী মশাইয়ের আসল নাম, 'শ্রীহরিলাল দাস বাবাজী' কিন্তু এ'নাম বিশেষ কেউ জানতোনা। 'কাষ্ঠাধারী' বাবাজী নামেই তিনি খ্যাত ছিলেন। বরাহনগর থেকে প্রাইভেট বাসে (শিখের বাস) শ্যামবাজারে আসতেন, সেখান থেকে সরকারী বাসে আমাদের বাড়ী আসতেন। প্রাইভেট বাসে তাঁর কোন পয়সা লাগতোনা শুনেছি। কারণ কন্ডাক্টররা সবাই তাঁকে চিনত। শুধু আমাদের বাড়ী না বহু ভক্তের বাড়ীতে যাওয়া আসা ছিল। সিদ্ধ মহাত্মার অহৈতুকী করুণা একেই বলে।

মহান্তের স্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজকার্য্য নাই তবু যান পর-ঘর ॥ (চৈচ)

শ্যামবাজারে শ্রীল জ্ঞানেন্দ্র নাথ ঘোষ মহাশয়ের বাড়ী প্রায়ই যেতেন। বাবাজী মশাই'এর প্রভাব সকলেই জানতেন। শুনেছি জ্ঞানবাবু দোকানের কর্মচারী দিয়ে তাঁকে কাঁধে তুলিয়ে ওপরে নিয়ে যেতেন। বাবাজী মশাই অত্যন্ত সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন—সর্বদা মুখে হাসিটি লেগে আছে। রাগ তাঁর মুখে কখনও দেখিনি। ছেলেপিলেদের অত্যধিক স্নেহ করতেন। আমরা তখন খুবই ছোট তাঁর মহিমা কিছুই বুঝতামনা। তবে ঐটুকু জানতাম বাবাজী মশাই ঠাকুরের সাথে কথা বলেন—একথা প্রভুর কাছে শোনা। যিনি ঠাকুরের সাথে কথা বলেন তিনি তাহলে কি ধরণের লোক হ'তে পারেন সে ধারণা তখন আমাদের ছিলনা। তাই বাবাজী মশাই এলেই সব ছেলেপিলে ঘিরে ধরতাম। সকলের হাতে মিছরি বা বাতাসা দিতেন। সকলেই বাবাজী মশাইয়ের সামনে হাত বাড়িয়ে দিতো—আমার হাতটা দেখে দিন-না বলে। বাবাজী মশাই পূর্ববঙ্গের লোক ছিলেন—তাই তাঁর কথার মধ্যে পূর্ববঙ্গের টান ছিল—তিনি রগড় করে এটা ওটা সেটা বলে দিতেন—পূর্ববঙ্গের কথা শোনার জন্য আমাদের ছিল হাত দেখান। হাসতে হাসতে বাবাজী মশাইয়ের গায়ে ঢলে পড়তাম—তিনি কখনও বিরক্ত হতেন না—তিনিও আমাদের সঙ্গে হাসতেন। কোন কোনদিন ঝোলা থেকে মিছরিখণ্ড ও গোলমরিচ বার করে দিয়ে মাকে বললেন, "মা গোঁসাই কাশ হয়েছে। তেজপাতা দিয়ে এটা সেদ্ধ করে দেন।" মা জানে, ফুটিয়ে চায়ের মত সেদ্ধ করে দিলে বাবাজী মশাই চুমুক দিয়ে খেয়ে আমাকে বলতেন, "তুই খা।" আমি তাঁর অধরামৃত খেতাম। তাই প্রভু বলতেন—ছেলেবেলায় অনেক বাবাজী মশায়ের এঁটো খেয়েছ—তাই তোমার ভক্তি হয়েছে।

প্রভু সেবার কলকাতায়। আমার বয়স তখন ১১/১২ বৎসর হবে। স্কুল থেকে ছুটির পর বাড়ী এসেছি সেদিন শনিবার ছিল আমার খুব ভালই মনে আছে। প্রভু প্রসাদ পাবার পর বিশ্রাম করতেন, বিশ্রাম থেকে ৪-৩০/৫ টার সময় ঠাকুর তুলতে

যেতেন। সেদিন দেখি প্রভু ৩-৩০/৪ টের মধ্যে ঠাকুর ঘরে যাচ্ছেন। বললাম আজ এত তাড়াতাড়ি যাচ্ছেন? প্রভু বললেন, বাবাজী মশাই অসুস্থ—তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতে বলেছেন, সেখানে যাব তাই তাড়াতাড়ি ঠাকুর ঘরে যাচ্ছি। আমি বায়না ধরলাম, আমিও যাব। আমি বাবাজী মশায়ের ঠাকুর দেখিনি দেখবো। প্রভু রাজী হলেন। হঠাৎ কিছুক্ষণ পরে বৃন্দাবনদা এলো প্রভুর সঙ্গে দেখা করতে। ঠাকুর ঘর থেকে প্রভু এসেছেন। বৃন্দাবনদাকে বললেন, 'আজ সকালে একটি ভক্তের হাতে বাবাজীমশাই চিঠি দিয়েছেন, তাঁর অসুখ বেশী; এই চিঠি টেলিগ্রাম মনে করে আমার সঙ্গে দেখা করে যাবেন, সঙ্গে জ্ঞানবাবুকে নিয়ে আসবেন। মণিবাবু এখনই আফিস থেকে আসবেন, তাঁর গাড়িতে যাব।

যথাসময়ে মণিবাবু এলেন। মণিবাবুকে প্রভু সব কথা বললেন। মণিবাবু আগ্রহ করে প্রভুকে গাড়ীতে বসালেন। আমি প্রভুর সঙ্গে উঠলাম। বৃন্দাবনদাও আমাদের সাথী হলেন। মণিবাবু গাড়ী চালিয়ে শ্যামবাজারে জ্ঞানবাবুর বাড়ীতে গাড়ী নিয়ে গেলেন। প্রভু গাড়ী থেকে নেমে জ্ঞানবাবুর বাড়ীতে ঢুকে গেলেন। আমরা গাড়ীতে বসে রইলাম। একটু পরেই জ্ঞানবাবু প্রভুর সঙ্গে গাড়ীতে উঠলেন—অন্ধকার হয়ে আসছে। যথাসময়ে বরাহনগরে গাড়ী গেল। জ্ঞানবাবু রাস্তা বলে দিতে লাগলেন। তখন বেশ অন্ধকার হ'য়ে গেছে। বাবাজী মশাইয়ের আশ্রমে গাড়ী এসে থামলো। আমরা সবাই গাড়ী থেকে নামলাম। আশ্রমের ভেতরে ঢুকলাম। তখন ফাল্গুন মাস মনে আছে—দোলের আগে না পরে জানিনা। আকাশে স্বচ্ছ চাঁদ উঠেছে। আশ্রমে ঢুকেই ডানদিকে মন্দির। সামনে বড় উঠান। উঠানের তিন কোণে ঘর। উঠানের একধারে ঘাটের সিঁড়ি রয়েছে। গঙ্গায় নামবার। গঙ্গার উপরেই মন্দির। জ্যোৎস্নার আলো জলে পড়ে চক্‌চক্ করছে—মৃদু মৃদু ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে খুব সুন্দর পরিবেশ। প্রভু এসেছেন সংবাদ পেয়ে বাবাজী মশাই নিজেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। টালির ঘর একজন সেবক আছেন। প্রভুকে একটা কম্বল পেতে দিলেন। প্রভু বললেন, 'আপনার অসুখ করেছে শুনলাম, কেমন আছেন—বাবাজীমশাই একটু হাসলেন। আমাকে একটা মিছরির টুকরা দিলেন। প্রভুকে দিলেন একটা বড় এলাচ। প্রভুর সঙ্গে অনেক কথা হোলো। কি কথা হোলো মনে নেই, তবে একটা কথা স্মরণ আছে—'যাব'। প্রভু বললেন, "শরীরটা খারাপ যখন হয়েছে এখন কিছু দিন বিশ্রাম করুন বেশী চলাফেরা করবেন না। এটুকু মনে আছে। আমি ঠাকুরের সামনে গিয়ে বসলাম। খুব সুন্দর নিতাই গৌর বিগ্রহ। বাবাজী মশাইয়ের সঙ্গে কথা হবার পর প্রভুরা ঠাকুর দর্শন করলেন। তারপরে সকলে যখন চলে আসছি, দেখি যে কম্বলে প্রভু বসেছিলেন সেই কম্বলটা

মাথায় নিয়ে বাবাজী মশাই কাঁদছেন। এ দেখে প্রভু বাবাজী মশাইয়ের কাছে গিয়ে কি বললেন, তা আমি শুনিনি। তারপর আমরা যথাসময়ে বাড়ী ফিরে এলাম। জ্ঞানবাবুকে শ্যামবাজারে তার বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে আসা হোলো। পরের দিন অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর সদর দরজায় কে যেন কড়া নাড়ছে। প্রভু তখন ঠাকুর ঘরে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন দরজা খুলে দেওয়া হোলো—সুরেশ ভক্ত। প্রভু জিজ্ঞেস করলেন—এত সকালে? উত্তরে ভক্ত বললেন—আপনারা আসার একটু পরেই বাবাজী মশাই দেহরক্ষা করেছেন। বাবু (জ্ঞানবাবু) বরাহনগরে চলে গেছেন। কি করণীয়, আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে তাঁকে খবর দিতে বলেছেন। প্রভু শুনে আশ্চর্য হয়ে বললেন—তাই বাবাজী মশাই বললেন, 'যাব'। তিনি যে জগৎ ছেড়ে চলে যাবেন বুঝতে পারিনি। জ্ঞানবাবুকে বলবেন, 'তিনি যেন নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সব করেন। সমাধি যেন না দেন—ভালভাবে দাহ করে গঙ্গায় যেন দেন, একটু অস্থি ও ভস্ম যেন রাখেন লোক দিয়ে বৃন্দাবনে পাঠাতে হবে। ফুল যেন না দেন—ঠাকুরের প্রসাদী মালা যেন মাথায় দিয়ে দেন। সুরেশভক্ত এ'শুনে বরাহনগরে চলে গেলেন। বাবাজী মশাইয়ের দেহরক্ষার ২/৩ বৎসর পর প্রভু নবদ্বীপে শ্রীগোবিন্দ মন্দিরে খুব বড় একটি মহোৎসব করে ছিলেন বাবাজী মশায়ের উদ্দেশ্যে। সেবার আমি ও বাবা নবদ্বীপে বেড়াতে এসেছিলাম। বহু ভক্ত, বাবাজী ও গোস্বামীগণ এ উৎসব ছিলেন। প্রভু যখন কোলকাতায় থাকতেন, তখন বহু হরিসভা থেকে তাঁকে ভাষণ দেবার জন্য আহ্বান আসতো। প্রায় প্রতিদিনই একটা না একটা জায়গায় প্রভু হরিকথা বলতে যেতেন। সন্ধ্যার সময় তাঁকে হরিসভায় নিয়ে যাবার জন্য গাড়ী আসতো। বৈকালের ঠাকুরসেবা সেরে প্রভু হরিসভায় যেতেন। একবার তাঁর সঙ্গে আমি কোন এক হরিসভায় গিয়েছিলাম। মনে হয়, বারানসী ঘোষ ষ্ট্রীটে শ্রীবলাই চাঁদশীল মশায়ের কলিকাতা হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভায়। তখন আমি খুবই ছোট, বাবাও সঙ্গে ছিলেন। প্রভু হরিসভা থেকে এসে তাঁর গলার ফুলের মালাটা আমাকে দিতেন। পূর্বে দাদা যখন ছোট ছিল ঐ মালার অধিকারী দাদা ছিল।

প্রত্যহই সন্ধ্যায় প্রভুর কাছে দূর-দূরান্তর থেকে বহু বহু ভক্ত সজ্জন আসতেন হরিকথা শোনার জন্য। ছুটির দিনে—বিশেষ করে রবিবার দিন এত লোক হোতো, ঘরে জায়গা দেওয়া যেতো না। সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদজী প্রায়ই বৈকালের দিকে প্রভুর কাছে হরিকথা শোনার জন্য আসতেন। জ্ঞানবাবু বিকেলের দিকে আসতেন না। তিনি প্রত্যহ ভোরবেলা আসতেন। প্রভু ঠাকুর শয়ন থেকে তুলে পূজাদি সেরে নীচে আসতেন ততক্ষণ জ্ঞানবাবু প্রভুর ঘরে চেয়ারে চুপ করে বসে মালা

করতেন। তখন তাঁর সঙ্গে বসে একঘণ্টার মত সময় প্রায় হরিকথা আলোচনা হোতো। মধ্যে মধ্যে রাধাশ্যামবাবু জ্ঞানবাবুর সঙ্গে সকালে আসতেন। কলকাতায় থাকাকালীন প্রভু শ্রীগৌররায়জীর অন্নকূট উৎসব খুব বড় করে করতেন। তাছাড়া রাস দোল ও জন্মাষ্টমী উৎসব হ'ত। এসব উৎসবে বহু ভক্তের সমাগম হোতো। বোধখানা থেকে শ্রীশ্রীসদাশিব কবিরাজের সেবিত শ্রীশ্রীরাধাপ্রাণবল্লভ কলকাতা আসার পর বরাহনগরে পাঠ বাড়ী লেনে যখন নূতন মন্দিরে ঠাকুর গেলেন, সে সময়ে একদিন মণিবাবুর মোটরে প্রভু, আমি ও বাবা শ্রীরাধাপ্রাণবল্লভ, দর্শনে গিয়েছিলাম। শ্যামবাজার থেকে বাবা যুঁই ফুলের মালা কিনে নিয়ে এলেন। শ্রীশ্রীপ্রাণবল্লভজীর সেবাইত শ্রীগৌরহরি গোস্বামিজী, প্রভুকে ও আমাদের যত্ন করে বসালেন। ঠাকুরকে মালা পরিয়ে দিলেন। প্রভু ঐ স্থানে প্রাণবল্লভের কথা কিছু আলোচনা করলেন। গোঁসাইজী আমাদের ঘরে বসিয়ে প্রাণবল্লভের শীতলী প্রসাদ দিলেন।

প্রভুর সঙ্গে মধ্যে মধ্যে রাত্রে আমাদের বাড়ীর সামনে অথবা হেদুয়া পার্কে পায়চারী করতাম। সে'সময়ে প্রভু আমাকে তাঁদের পূর্বের ইতিহাস কথা গল্প করতেন। একদিন হেদুয়ায় পায়চারী করতে করতে ৫২ নং বিডন ষ্ট্রীটের বাড়ী সামনে এসে বললেন—এ'বাড়ীতে আমরা বহু বৎসর কাটিয়েছি—বাবা এ'বাড়ীতে দেহরক্ষা করেন। যেদিন বাবা মারা যান নিমতলা থেকে রাস্তা পীচ হতে হতে সেদিনই বাড়ীর সামনে পর্যন্ত পীচ হয়—ইত্যাদি ইত্যাদি। যেদিন বাইরে কোথাও পায়চারী করতে যেতেন না, সেদিন তাঁর সর্বাঙ্গ টিপে দিতাম—ঐ'সময়ে অনেক পৌরাণিক ঘটনা বলতেন।

অতি শৈশবে দেখতাম জামাইষষ্ঠীর দিন মা আমাদের বাঁশপাতা দিয়ে 'ষাটের জল' দিয়ে হাওয়া করতেন আমি ঐ জল বাঁশপাতা দিয়ে প্রভুকে জল ছিটিয়ে হাওয়া করতাম। প্রভু হাসতেন, আর বলতেন—"আমার মা মরে এসেছে।" পরে প্রভুর কাছে লাভ হোতো মিষ্টি অথবা চারটে পয়সা।

নবদ্বীপে থাকাকালীন কোন কারণে প্রভু ঠিক করলেন নবদ্বীপে আর থাকবেন না। পুরীধামে থাকবেন ঠিক করলেন যা সিদ্ধান্ত তাই কাজ। এখান থেকে প্রভু শ্রীগৌররায়জীকে নিয়ে একাই ১১ টার ট্রেন ধরে কলকাতা গেলেন। বাড়ীতে যাবেন না ঐদিনই রাত্রের ট্রেনে পুরী যাবেন। প্রভুকে দর্শনের জন্য কলকাতার ভক্তরা সব হাওড়া ষ্টেশনে গেছেন আমি মণিবাবুর গাড়ী করে গিয়েছিলাম। বাবা প্রভুর সঙ্গে পুরী যাবেন ঠিক হোলো। প্রভু নবদ্বীপ থেকে গিয়ে হাওড়া ষ্টেশনে বেঞ্চিতে বসে একটু বিশ্রাম করলেন। তারপর শ্রীশ্রীগৌররায়জীকে নিয়ে গঙ্গার

ঘাটে গিয়ে ঠাকুর তুলে কিছু মিষ্টাদি ভোগ দিয়ে সে রাত্রের মতন তাই প্রসাদ পেলেন। আমার ভাগ্যেও প্রসাদ কিছু হ'য়েছিল। পুরীর ট্রেন আসার পূর্বেই আমাকে কার সঙ্গে বাড়ী চলে আসতে হলো মনে নেই। প্রভু আমাকে আসার সময় টাকা দিলেন। পুরীতে কয়েকমাস ছিলেন—কিন্তু অত্যন্ত জলকষ্টের জন্য পুরী থেকে চলে আসার মনস্থ করলেন। সামনে রথযাত্রা—তাই একটু দেরী করলেন। নবদ্বীপে ছোট জ্যেঠামশাইকে প্রভু লিখলেন, 'যদি জগন্নাথের রথ দেখতে চাও তো এস।' চিঠি পেয়ে ছোট জ্যেঠামশাই পুরী চলে গেলেন—শ্রীজগন্নাথদেবের রথ দর্শন করে তাঁরা দুজনেই পুরীবাসের সংকল্প ছেড়ে চলে এলেন। কলকাতার বাসায় উঠলেন—সেখানে বেশ কয়েকদিন থেকে পাণিহাটী মণিবাবুর বাড়ী চলে গেলেন। সেখানে কয়েক মাস থেকে পুনরায় নবদ্বীপে এলেন প্রভু। ছেলেবেলায় স্কুলের অ্যানুয়াল পরীক্ষা হয়ে যাবার পর আমি প্রায় প্রতিবৎসরই নবদ্বীপে এসে ২০/২৫ দিন থাকতাম। সে সময় প্রভু আমাকে নিয়ে কয়েকদিন রামচন্দ্রপুর বঙ্গবাণী স্কুল, অরবিন্দ আশ্রম, বালক সাধুর শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দির ও প্রাচীন মায়াপুরে গঙ্গার ধারে বেড়াতে বেড়িয়েছিলেন। তারপর আর কখনো আশ্রমের বাইরে বেড়োতেন না। চৈত্র সংক্রান্তিতে গঙ্গাস্নান ও ১ লা বৈশাখে শ্রীশ্রীধামেশ্বর মহাপ্রভুর দর্শন ছাড়া।

প্রভু আমাকে শৈশব জীবনের গল্প করে শোনাতেন। বলতেন, 'এসব জেনে রাখ—আমি মরে গেলে আর কেউ বলবেনা। প্রভুর যখন ৯/১০ বৎসর তখন শ্রীশ্রীগৌররায়জী আমাদের বাড়ী এসেছেন। তখন থেকে তার সেবা পূজা আরম্ভ। দমদমে বাগান বাড়ীতে যখন প্রভুরা থাকতেন সেখানে একটা লম্বা ঘরে গৌররায়জীকে রাখা হয়। ঘরের মধ্যে একটা তাকে ঠাকুর বসানো থাকতো। আর ঘরের দুপাশে সারিবদ্ধ পামগাছ ঝাড় গাছ ছিল। যেন কুঞ্জ কুটির। সেই ঘরে গাছের একপাশে একটা চেয়ার ছিল যখন যার সময় হোত সে চেয়ারে বসে ঠাকুরের স্মরণ মনন-আদি করা হতো। একবার মাণিকতলা বাড়ীতে প্রভুর বাবা গৌররায়জীর পূজো করতে বসে ভাবলেন আজ যদি ক্ষীর ভোগ হতো খুব ভাল হত। কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ করেননি। তখন ঠাকুরের দুধ মিষ্টি ভোগ হতো। হঠাৎ ঠাকুমা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ওই যাঃ! সব দুধ ক্ষীর হয়ে গেল।' দুধ উনুনে চাপিয়ে অন্য কাজ করছিলেন, দুধ উনুনে, তাঁর মনে ছিলনা—হঠাৎ দুধের দিকে নজর পড়তে দেখেন দুধের জল শুকিয়ে ক্ষীর হয়ে গেছে। চিনি দিয়ে সেই দুধ ঠাকুর ঘরে নিয়ে গিয়ে ঠাকুরদাদাকে বললেন 'অন্যমনস্ক হওয়ায় আজ সব দুধ ক্ষীর হয়ে গেছে। ঠাকুর দাদা হেসে বললেন, 'আজ ঠাকুরকে ক্ষীর দেবার ইচ্ছে হয়েছিল।'

আর একবার রাসের দিন ঠাকুরদাদা প্রভুদের বললেন, 'এই রাসের দিন ঠাকুর কানাই প্রভু কাঁঠাল ভোগ দিয়ে ব্রাহ্মণদের প্রসাদ পাইয়েছিলেন—আজ সেই দিন—যদি কাঁঠাল পাওয়া যেত গৌররায়কে ভোগে দিলে খুব ভাল হ'তো। তখন অগ্রহায়ণ মাস কাঁঠাল কোথায়? সে'দিনই ঠাকুরদাদার একটি ছাত্র বসন্তদা দেশ থেকে ফিরেছেন—গাছের কিছু তরকারী ও একটা এঁচর নিয়ে এসেছেন। হঠাৎ সকলের নাকে কাঁঠালের গন্ধ ভেসে এল। ঠাকুরদাদা বললেন, 'কাঁঠালের গন্ধ কোথা থেকে এল? বসন্ত! তুমি কি কাঁঠাল এনেছ? বসন্তদা—'না, আমি একটি এঁচোর এনেছি। ঠাকুরদাদা বললেন দেখতো ওটা বোধ হয় পেকে গেছে। বসন্তদা বললেন, 'না, না একেবারে অজ কাঁচা পেড়ে নিয়ে এসেছি। তুমি দেখইনা, ঠাকুরদাদা বললেন। ব্যাগ খুলে দেখেন এঁচোড়টা পেকে টস্‌টসে হয়ে আছে। 'আশ্চর্য তো' বসন্ত দা বললেন, "আমি এঁচড় আনলাম, সেটা অসময়ে এত সুন্দরভাবে পেকে গেল। ঠাকুরমা সেই কাঁঠালটা আমানি করে গৌররায়জীর ঘরে নিয়ে এলেন ভেতরে ৫/৬ টা বড় বড় কোয়া ছিল। ঠাকুরদাদা হাসলেন, বললেন, 'ঠাকুরের ইচ্ছে হলে অসম্ভবও সম্ভব হয়, দেখছ?"

প্রভুর বাবা তাঁর শৈশব জীবনের কথা প্রভুর কাছে গল্প করতেন—প্রভু আমাকে সেসব কথা বলতেন। একদিন ক্ষুধায় পেটের নাড়ী শুকিয়ে যাচ্ছে—ঘরে কিছুই নেই। মাকে খাবার কথা বললে যদি দুঃখ পান, নিরবে ক্ষিদে সহ্য করে যাচ্ছেন—আর টেঁকা যায় না—অন্যমনস্ক হ'বার জন্য বাগানে ঘুরতে লাগলেন—একটা বেলগাছের তলায় এসে বসে রাধাবল্লভকে ডাকছেন হঠাৎ একটা বড় পাকা বেল গাছ থেকে খসে পড়ল। শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ বালকের দুঃখে যেন সাড়া দিলেন। সেই বেল খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ হোলো।

জয়পুর-রাজপুত্রের প্রাইভেট টিউটরের কাজ নিয়ে গোস্বামী সুরেন্দ্র নাথ জয়পুরে গেছেন। রাজবাড়ীতে থাকেন। বিকেলে অবসর সময়ে শ্রীগোবিন্দজীর মন্দিরে এসে ঠাকুরের সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকেন। তখন বর্ষাকাল আকাশ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন, মাঝে মাঝে মেঘের গর্জন ও বিদ্যুতের ছটায় আলোকিত হ'য়ে যাচ্ছে—আর সে সঙ্গে রাজার ঠাকুর শ্রীগোবিন্দজীর সর্বাঙ্গে মণি-মাণিক্যের আভরণ ঝলমল করে উঠছে। সে সময় দর্শক বেশী নেই—একজন আধপাগল মধ্যবয়স্ক একটি লোক করুণ দৃষ্টিতে শ্রীগোবিন্দজীকে দর্শন করছেন—হঠাৎ বিদ্যুতের জ্যোতিতে অঙ্গের আভরণ যেই ঝল্‌মল্ করে উঠল সেই পাগল আর থাকতে না পেরে চিৎকার করে একেবারে ঠাকুর ঘরে ঢুকে গোবিন্দজীকে জড়িয়ে ধরলো। হায় হায় মার মার করে পূজারীরা ছুটে এলো—ভাবুক পাগলকে মারতে যাবে এ

সময়ে গোস্বামী সুরেন্দ্র নাথ তাঁদের বারণ করায় তাঁকে কেউ আর মারলোনা। হাত ধরে বাইরে বের করে দিল। দীর্ঘদিন জয়পুরে আছেন একদিন রাত্রে হঠাৎ স্বপ্নে দেখেন—তাঁর পিতা শ্রীমৎ মনোহর গোস্বামী প্রভু দেহরক্ষা করছেন। সজ্ঞানে জ্যেষ্ঠপুত্র নৃপেন্দ্রনাথকে যেন বলছেন 'নেপু' তোমরা আমাকে তুলসীতলায় নিয়ে চল—তুলসীতলায় তাঁকে আনা হোলো। বললেন, মালাটা দাও। মালা জপ করতে করতে আবার পুত্রকে বললেন, 'নেপু' তোমাদের তো দীক্ষা হয়নি—এসো তোমাদের দীক্ষা দিই। পুত্র ও পুত্রবধূকে এ'অবস্থায় দীক্ষা দিলেন। তারপর নাম করতে করতে নিত্যলীলায় চলে গেলেন। এই দুঃস্বপ্নে সুরেন্দ্রনাথের ঘুম ভেঙ্গে গেল। মন খুব বিষন্ন হয়ে গেল। পরের দিনই টেলিগ্রাম পেলেন সত্যই তাঁর বাবা গত দিনে দেহরক্ষা করেছেন। টেলিগ্রাম পেয়ে প্রাইভেট টিউটরের কাজ ছেড়ে দিয়ে বাড়ী চলে এলেন। বাড়ীতে এসে স্বপ্নের বৃত্তান্ত সকলকে বলায় সকলেই আশ্চর্য হ'লেন। এখানেও ঠিক ঐ সকল ঘটনাই ঘটে ছিল।

শ্রীধাম বৃন্দাবনে গিয়ে গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথ নিধুবনে বসে তন্ময় হ'য়ে শ্রীচরিতামৃত সুর করে পাঠ করছেন—তখন তাঁর বাহ্য স্মৃতি নেই—লোকজন দেখছে কিনা দেখছে। যখন তাঁর বাহ্যজ্ঞান এলো দেখলেন—তাঁকে ঘিরে বসে আছে শাখামৃগের দল। তাদের মনে কোন হিংসের ভাব নেই—তারাও যেন তন্ময় হয়ে চরিতামৃত শ্রবণ করছে।

হঠাৎ পেটে অসহ্য যন্ত্রণা। নিজে চিকিৎসক নানাবিধ ওষুধ খেয়েও যন্ত্রণার উপশম হ'লোনা। তখন ছেলেকে ডেকে (প্রভুকে) বললেন কানাই শ্রীঘ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতখানা দে তো। প্রভু চরিতামৃতটা তাঁর হাতে দিলেন। তলপেটে চরিতামৃতটা চেপে ধরে কিছুক্ষণ বসে রইলেন পরে প্রভুকে বললেন, 'চরিতামৃতের কৃপায় এ অসহ্য যন্ত্রণা কমে গেল।

অতি শৈশবে মাতৃদেবী লক্ষ্মীমণির সঙ্গে শিবিকা—আরোহণে মাতুলালয়ে যাচ্ছেন সুরেন্দ্রনাথ। পথিমধ্যে বেয়ারারা শিবিকা নাবিয়ে খেতে বসেছে। এদিকে সুরেন্দ্রনাথের তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে। আশেপাশে কোথাও জল নেই—দূরে নদী দেখা যাচ্ছে। নদী থেকে গ্রাম্যবধূ কলসী কাঁকে জল আনছে। মা বললেন, 'যাও, ওনার কাছে জল চাও।' ভয়ে ভয়ে সুরেন্দ্রনাথ তার কাছে গিয়ে খাবার জল চাইতেই বউটি দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠল, 'আমি কষ্ট করে নদী থেকে জল বেয়ে নিয়ে এলাম তোমাকে দেবার জন্য এইবলে সোজা পথ ধরে চলে গেল। ভয়ে শিশু সুরেন্দ্রনাথ দৌড়ে মায়ের কাছে চলে এলো। এ ঘটনা দূর থেকে অপর একটি গ্রাম্য বধূ লক্ষ্য করছিল, সেও নদী থেকে জল নিয়ে আসছিল। বালক

যখন বিষন্ন মুখে মায়ের কোলে গিয়ে বসল—অন্নপূর্ণার মতন দর্শনধারী সেই কুলরমণী হন্তদন্ত হয়ে এসে বললেন,—"এস এস খোকা জল খাও—তোমার তৃষ্ণায় মুখ শুকিয়ে গেছে—আহা বেচারী, কোন ভয় নেই এস আমি তোমার জন্যেই জল এনেছি।" সুরেন্দ্রনাথ সেই জল খেয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করলেন। প্রভু আমাকে বলতেন, 'এরকম একটা ছবি আঁকতে পার—একটি বালক জল চাইছে, একটি গ্রাম্য মহিলার কাছে সে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে মারতে যাচ্ছে যেন। দূর থেকে অন্নপূর্ণার মতন আর একজন কলসী কাঁকে ছুটে আসছে—বালককে জল দেবার জন্য।' গরীবের উপর গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথের খুব দয়া ছিল। গরীবের চিকিৎসা হয়না, বড় বড় চিকিৎসকগণ শহরেই চিকিৎসা করে গ্রামে গঞ্জে বিনা চিকিৎসায় গরীবরা কষ্ট পায় এ'ভেবে তিনি প্রথমজীবনে গ্রামাঞ্চলেই চিকিৎসা করতেন। যারা অক্ষম তাদের কাছে কোন অর্থ তিনি নিতেন না। এমন কি রোগীর পথ্যের জন্য নিজেই অর্থ দিতেন। তাই তখনকার মুসলমান রোগীরা তাঁকে দয়াল হাকিম বলতো।

গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথ তখন অসুস্থ। বাহিরে কোথাও 'কল'-এ যেতে পারেন না। বাড়িতে যেসব রোগী আসেন তাঁদের দেখেন, এমন সময়ে হঠাৎ শিলং থেকে একটি 'কল' এল। শিলংয়ের একজন বড় অফিসার এর স্ত্রীর খুব অসুখ-তাঁকে দেখতে যেতে হ'বে। এ' অবস্থায় তিনি কি করে যান। প্রভুকে ডেকে বললেন—কানাই, তুমি শিলংয়ে গিয়ে রোগী দেখে এসে আমাকে জানালে আমি ওষুধ পত্রের ব্যবস্থা করে দেব। প্রভু পিতার সঙ্গে থেকে চিকিৎসাদি ভালভাবেই শিখেছেন, তাহলেও তিনি তখন খুবই ছেলেমানুষ—১৯/২০ বৎসর বয়স। কোথা দিয়ে শিলং যেতে হয় তাও তাঁর জানা নেই। কিন্তু পিতৃ আদেশ, না বলতে পারলেন না। প্রভু বলতেন 'আমি জীবনে কখনও বাবার মুখের উপরে না বলিনি। আর সব সময়েই আমার মনে এই ধারণা ছিল—পৃথিবীতে আমার বাবার মতন লোক আর নেই। তাই সর্বদাই তাঁর আদেশ ও মর্যাদা মেনে চলতাম। বাবার আদেশ শিলং যেতেই হবে। মা দেড় দিনের মতন লুচি ও ভাজা করে দিলেন আর কিছু মিষ্টি সঙ্গে দিলেন। প্রয়োজনীয় ওষুধ সঙ্গে নিয়ে ষ্টেশনের দিকে রওনা হলেন। শিলংয়ে সম্পর্কের একজন জ্যেঠামশাই থাকতেন—(শ্রীমৎ চারুচন্দ্র গোস্বামী)। তিনি ওখানে বড় পোষ্টে কাজ করতেন। তাঁকে টেলিগ্রাম করে দেওয়া হয়েছে তিনি যাচ্ছেন বলে। ষ্টেশনে এসে শুনলেন কোন ট্রেন যাবেনা ব্রহ্মপুত্রে ভীষণ বন্যা হয়েছে। ষ্টিমার যাবে। প্রভুর তখন ছেলেমানুষ-বুদ্ধি অত না বুঝে ষ্টিমারের টিকিট কাটলেন। যথাসময়ে ষ্টিমারে উঠ্‌লেন, যখন ষ্টিমার ছেড়ে দিল—তখন শুনলেন এ ষ্টিমার গৌহাটি পৌছাতে তিনদিন লাগবে। সেখান থেকে ট্রেন বা

বাস ধরে শিলং যেতে হবে। এখন উপায়? চিন্তা করেও কোন লাভ নেই। সঙ্গে মাত্র দেড়দিনের খাবার। ষ্টিমারে সবই পাওয়া যায়, ভাত-ডাল ইত্যাদি। তাতো তাঁর চলবেনা। ঐ দেড়দিনের খাদ্য তিনভাগ করে অল্প অল্প আহার করেন—মধ্যে মধ্যে ষ্টিমার বন্দরে থামে—কিন্তু তাঁর আহারের উপযোগী কিছুই পাওয়া যায় না। মধ্যে এক জায়গায় অনেক কলা দেখলেন। ডজন খানেক কিনে নিলেন। ওমা ছাড়িয়ে দেখেন বিচিতে ভর্তি। টান মেরে ব্রহ্মপুত্রের জলে ফেলে দিলেন। ষ্টিমারের সকলেই বাবুর্চির রান্না ভাত-ডাল খায়। কি করবে কোন উপায়তো নেই—ধর্ম রাখতে গেলে প্রাণ রাখা ভার হয়ে যায়। তৃতীয় দিন একটি যুবক প্রভুর কাছে এসে বলল—"আমি ও আমার বৃদ্ধা মা ভুল করে ষ্টিমারে উঠেছি—এখন বিধবা মার তো মুমূর্ষু অবস্থা। তিনি তো ষ্টিমারের কিছুই খাচ্ছেন না। কি করি উপায়। প্রভু বললেন, 'আগে যদি জানাতেন তবে আমার কাছে যা সামান্য কিছু খাবার আছে—তার থেকে দিতে পারতাম—এখন'ত মাত্র একদিনে খাবার আমার কাছে আছে—আচ্ছা এটাই আপনার মাকে দিন—একেবারে অনাহারে আছেন একটুতো কিছু হবে। শেষ সম্বলটি যুবকের হাতে তুলে দিলেন। যথা সময়ে গৌহাটী এসে ষ্টিমার পৌছাল। শরীর আর চলেনা অতি কষ্টে ষ্টিমার থেকে নেমেছেন। ঐদিন গৌহাটিতে প্রভুদেরই জানাশোনা এক ভদ্রলোকের বাড়ী উঠবেন—আগে তাঁদেরও খবর দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের বাড়ী থেকে লোকও এসেছে প্রভুকে নিতে। যথাসময়ে তাঁদের বাড়ী এসে পৌছলেন। স্নানাদি সেরে খেতে বসেছেন—ভাজাভুজি ও উগ্র তরকারীই বেশী। অল্প কিছু খাওয়ার পর ঐদিনই শিলং যাত্রা করলেন—গাড়ীতে উঠলেন। গাড়ীর জানালায় সব ত্রিপলের পর্দা, হু হু করে গাড়ী ছুটে চলল। পথিমধ্যে প্রভুর কম্প দিয়ে জ্বর এসে গেল। আবার কোথা থেকে ঘন মেঘ এসে মুষলধারে বৃষ্টি। ত্রিপলের পর্দা দিয়ে জল এসে ভিজে নেয়ে গেলেন প্রভু। বৃষ্টিতে স্নান করার পর শরীর যেন ঝরঝরে হয়ে গ্যালো, জ্বরও চলে গেল। যথাসময়ে শিলংয়ে চারুজ্যেঠামশাই'-এর বাড়ী এলেন ওখানে উঠে পরের দিন সেই রোগীর বাড়ী গিয়ে রোগীকে দেখলেন। স্থানীয় বড় ডাক্তার বসে আছেন। রোগীকে রোগসম্বন্ধে প্রভুর প্রশ্ন শুনে ডাক্তার খুব প্রশংসা করলেন। তাকে ঔষধাদি দিতে রোগী ক্রমশঃ সুস্থ হয়ে উঠল। সেখান থেকে পাহাড়ের উপরে গারো আদিবাসী জাতিরা থাকে তাদের দলপতির বাড়ীতে কার অসুখ করেছে। প্রভুকে যাবার জন্যে তারা ডাকলেন যান বাহনের কোন ব্যবস্থা নেই। বন্যজাতি বাহকের পিঠে ঝোলায় বসে যেতে হবে। আরেক জন পাহারাদার বল্লম হাতে সঙ্গে সঙ্গে যাবে—শের ভালুক যদি আক্রমণ করে—তার থেকে রক্ষা করবে বলে। এ শুনে

প্রভু রাজী হলেন না। শিলংয়ে কদিন থেকে ওখান থেকে ফিরলেন। তখন রাস্তা খুলেছে। গাছের তলায় বিছিয়ে আছে প্রচুর নাশপাতি। একটি ঝোলা করে নাশপাতি নিয়েছেন। তিস্তা নদীর উপর দিয়ে পায়ে হেঁটে এসে এ'পারে ট্রেন ধরতে হবে। বর্ষার তিস্তা নদী ফুলে ফেঁপে আছে। নদীর ব্রীজ কাঁপছে। একজন সাথী নিয়ে নদীর এপারে এসে ট্রেন ধরে কলকাতা এলেন। পরের দিন কাগজ খুলে দেখেন ঐদিন রাত্রে তিস্তার ব্রীজ জলের চাপে ভেঙ্গে গেছে।

স্বদেশের আমলে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যখন দেশপ্রেমিকরা আন্দোলন করছিলেন, সে সকল নেতাদের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের ভাই বারীন্দ্র ঘোষ, যতীন্দ্র নাথ মুখার্জী (বাঘা যতীন) আরও কয়েকজন গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথের কাছে চিকিৎসা করতে আসতেন। বাঘা যতীনের মামা হেমন্ত চ্যাটার্জী ছিলেন গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু— সে'সূত্রে তাঁরা সকলে আসতেন। একবার গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথকে ঐ সকল দেশপ্রেমিকদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবার জন্য থানা থেকে আহ্বান করে। প্রভু বলতেন, 'হঠাৎ একদিন দুই ভ্যান লালমুখ ব্রিটিশ পুলিশ বাড়ীতে এসে উপস্থিত। বাবাকে তারা ডেকে ভ্যান করে থানায় নিয়ে গেলো। সি.আই.ডি ডিপার্টমেন্ট থেকে বহু প্রশ্ন ও ছবি দেখালো, তিনি এদের চেনেন কিনা, জানতে চাইলো। তার উত্তরে গোস্বামী সুরেন্দ্র নাথ বললেন, "আমি চিকিৎসক, আমার কাছে বহু পেশেন্ট আসে। সব পেশেন্টকে চিনে রাখা ডাক্তারের সম্ভব নয়। আমি প্রেসক্রিপশন করে দি আমার ছেলে ঔষধ দেয় সে যদি চিনতে পারে, তো তাকে দেখান।" এ শুনে ঐ ভ্যানে করে গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথকে সি.আই.ডি সম্প্রদায়ের লোকেরাও এলো প্রভুদের বাড়ীতে। গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথ গাড়ী থেকে নেমে হন্তদন্ত হয়ে বাড়ীর ভেতরে ঢুকে, প্রভুকে ডেকে বললেন, "কানাই, এনারা তোমাকে কতকগুলো ছবি দেখাবেন—'তুমি তাদের চেন কি চেন না আ আ বলবে। সি.আই.ডির লোকেরা বুঝতে পেরে গোস্বামী বাবুকে বলল, 'না, আপনি ঘরে যান।' তারপরে প্রভুর কাছে এসে তারা ছবিগুলো বার করে বলল—'এদের কি তুমি চেন? "প্রভু ভাবলেন—বাবা যখন না কথার উপর জোর দিয়েছেন তখন 'চিনিনাই' বলতে হবে। এ' ভেবে প্রত্যেকটি ছবিই দেখে বললেন, "আমি এদের একেবারেই চিনিনা। ডাক্তারদের কোট বা থানায় সাক্ষী দেবার জন্য ডাকলে—তখনকার দিন ১৬ ̦ টাকা করে ফি দিতো। থানা থেকে গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথের ফি দিচ্ছিল ৩২ ̦ টাকা। তখন গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথ বললেন, 'আমি একদিন থানায় গিয়েছিলাম—আমার ফি হবে ১৬ ̦ টাকা। একদিনের বেশী দিচ্ছেন কেন? তাঁর এ সততা দেখে ব্রিটিশ সি.আই.ডি বললেন, 'ইনি একজন সৎলোক—এনার সব কথাই ঠিক। প্রভু বলতেন,

'আমাদের আমলে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের ধ্বনি ছিল 'জয় জগদীশ হরে'। পরে হয়েছে বন্দে মাতরম্'। প্রখ্যাত বৈষ্ণবাচার্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিতও গোস্বামীসুরেন্দ্র নাথের বিশেষ অন্তরঙ্গতা ছিল। বহুবার ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চিকিৎসা ভার ছিল সুরেন্দ্রনাথের উপর।

একবার প্রভু অ্যানিমিয়া অর্থাৎ রক্তশূন্যতা অসুখে দীর্ঘদিন ভুগেছিলেন। সে'সময়ের চিকিৎসার জন্য কলকাতার বাড়ীতে ছিলেন। ছোট জ্যেঠামশাই ঠাকুর নিয়ে নবদ্বীপে না পাণিহাটীতে ছিলেন আমার স্মরণ নেই। প্রভুর অসুখের সংবাদে বহুভক্তের সমাগম হোতো। সন্ধ্যায় ভক্তমহলে হরিকথা পরিবেশনও হত। আমি তখন খুব ছোট। ঐ সময়ে আমার ঠাকুরের ঝুলনোৎসব করেছিলাম। ঠাকুরের প্রসাদী ফলমিষ্টি ও তালের বড়া প্রভুর কাছে নিয়ে গেলাম। প্রভু কারো কিছু খাননা জানতাম, কিন্তু সেবার প্রভু একটু ফল ও একটা তালের বড়া তুলে নিয়ে খেলেন। আমাদের আনন্দ আর ধরেনা। প্রভু আমাদের তৈরী তালের বড়া খেয়েছেন দেখে। ঐ সময়ে একবার আমাদের খুব নিকট সম্বন্ধীয় দাদা—তাঁদের অফিসের থিয়েটার হবে তার পাশ এনে আমাদের সকলকে দিলেন। আমাকেও বললেন, 'তুই যাবি?' আমি বাবাকে বললাম, বাবা বললেন, এখন জ্যেঠামশাই আছেন তাঁকে জিজ্ঞেস কর।' আমি ভয়ে ভয়ে প্রভুর কাছে গিয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করায় প্রভু বললেন, 'পাশ দিয়েছে বলেই যেতে হবে। যদি কেউ তোমাকে মদের গ্লাস দেয়, খাবে?" সেই থেকে সিনেমা থিয়েটার দেখা ছেড়েদিলাম। প্রভু আমাকে প্রায়ই বলতেন, 'ভক্তি লাভ করা বহু বহু সৌভাগ্যের ফল, কিন্তু লব্ধ ভক্তি হারিয়ে গেলে এর চাইতে দুর্ভাগ্য আর হয়না।' পথে যেতে যেতে যদি কেউ একটা হীরের টুকরা পায় তার মনে যত না আনন্দ হবে তার চাইতে ভয় হবে বেশী। কারণ পথে যদি কেউ তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। বা হাত থেকে পড়ে হারিয়ে যায়। কিন্তু অপর পথিক যার ভাগ্যে হীরে জোটেনি তার মনে আনন্দও নেই, ভয়ও নেই। সেই রকম যারা ভক্তিলাভ করেনি তাদের কোন লাভ নেই কিন্তু যারা ভক্তি লাভ করে তারা যদি যথাযথ ভক্তির মর্যাদা না রাখতে পারে, আর সেই কারণে ভক্তিদেবী যদি তাকে ছেড়ে চলে যায় এর চাইতে দুঃখের আর কিছু হতে পারে না। প্রভু আরো বলতেন, "সাধু সেজে বিষয়ী হওয়ার চাইতে দুর্দৈব আর কিছু নেই।" তাই আমাদের বলতেন, 'বিষয়ী সাজবে কিন্তু বিষয়ী হবেনা—আর সাধু হবে কিন্তু সাধু সাজবে না।' প্রভু আরও বলতেন, "বাবা মারা যাবার পর আমাকে কত অভাব অনটনের মধ্যে পড়তে হয়েছিল। তখন তোমার বাবা ছোট, জ্যেঠামশাইরা ছেলেমানুষ—সমস্ত আপদ বিপদের ঝড় আমার মাথার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে।

কিন্তু আমি গোড়া থেকেই গৌররায়জীকে ভরসা করেছিলাম তাই অত দুর্দিনের মধ্যেও তিনি আমাদের রক্ষা করেছেন। ছিলাম চারতলায়— নেবেছিলাম গাছতলায়। ঠাকুর ধরে ছিলাম বলে তিনি আবার উঠিয়েছেন চারতলায়।"

১৯৭১ সালে বন্যার পর কলকাতা থেকে আসার সময়ে বাবা আমাকে একটা হরলিক্স কিনে দিলেন—বললেন "বন্যার জন্য নবদ্বীপে দুধের খুব কষ্ট দেখে এ'লাম। যতদিন না দুধ পাওয়া যাচ্ছে ততদিন এ হরলিক্সটা খাস্। "আমি এখানে আসার পর প্রত্যহই হরলিক্স গুলে খাই। প্রভু লক্ষ্য করেন কিছু বলেন না। হরলিক্স শেষ হয়ে যাবার পর বললেন, "এটা কে দিল?" আমি বললাম, "বাবা কিনে দিয়েছেন, দুধ পাওয়া যাচ্ছেনা তাই। প্রভু বললেন, "তোমার বাবা কিনে দিয়েছে আমার বলার কিছু নাই, তবে আমার ইচ্ছা তোমার এসব না খাওয়াই ভাল।" সেই থেকে আমি হরলিক্স খাওয়া ছেড়ে দিলাম। ১৯৭৫ সালে প্রভু অসুখের সময় যখন মুখে খুব অরুচি, কিছুই খেতে পারেন না, তখন ডাক্তারের নির্দেশে হরলিকস বিস্কুট ও হরলিকস খেতেন একদিন আমাকে বললেন, "আমার ইচ্ছা হয় আমি যা খাই তোমাকে দিয়ে যাই, ওষুধটা পর্যন্ত, কিন্তু সেতো আর হয়না। আজ অসুখের জন্য এসব নিষিদ্ধ জিনিসও আমাকে খেতে হচ্ছে। হয়তো তোমার ইচ্ছা হচ্চে একটু খাই। কিন্তু আমি তোমাকে এসব দিতে ইচ্ছুক নই। তুমি যখন এসব খাওয়া ছেড়েছ তখন না খাওয়াই ভাল মনে করি। আমার দূর্দৈব তাই খেতে হচ্ছে। আমি বললাম, "না, আমার খাবার কোন বাসনা হচ্ছেনা। আমি এসব খাবনা।" আর একবার একদিন শুদ্ধ কাপড়টা মালকোঁচা দিয়ে পড়েছি। প্রভুকে সকালে প্রণাম করতে গেছি হঠাৎ তাঁর চোখে পড়েছে। বললাম কাপড়টা একটু ছিড়ে গেছে তো তাই। প্রভু বললেন, "কাপড় পড়বে, বাবুদের মতন কোচা দুলিয়ে বা মালকোচা দিয়ে কাপড় পড়বেনা। সাধারণ ভাবে পড়বে, এখানে ওখানে গুজে নেবে যেন বাবু গিরি না হয়। মাথার চুল ছোট ছোট করে কাটবে। মাথায় সিঁথি কাটবেনা। ১৩৭৯/৮০ সালে আমি ও প্রবীর পুরী বেড়াতে গিয়ে ছিলাম পুরী থেকে ফেরার সময়ে আমরা দুজন দুটি দারুময়ী বিগ্রহ কিনে নিয়ে এলাম। প্রবীর নিল জগন্নাথের বিগ্রহ আর আমি নিলাম পীতবর্ণ গৌরকৃষ্ণ বিগ্রহ। নবদ্বীপে এসেছি ঠাকুর নিয়ে ভয় করছে প্রভু যদি বকেন। আমাদের দেখে প্রভু খুব খুশী। তীর্থের কথা সব জিজ্ঞেস করলেন। সেদিন ঠাকুরের বিষয়ে কিছু বললাম না। পরদিন সকালে প্রভু যখন নাম জপ করছেন, প্রণাম করতে গেলাম তখন প্রভুকে বললাম, পুরীতে একটা দোকানে দেখি বহু কাঠের ও পাথরের বিগ্রহ তৈরী করে বিক্রি করছে। আমি একটা বিগ্রহ অর্ডার দিয়ে তৈরী করে নিয়ে এসেছি খুব সুন্দর

হয়েছে পূজো করবনা; সাজিয়ে রাখব। প্রভু বল্লেন, 'দেখি'। আমি মূর্তি! তাঁর কাছে নিয়ে গেলাম, দেখেই বললেন, "বাঃ গৌরগোবিন্দ! খুব সুন্দর হয়েছে তো। আমাদের গৌররায় তো গৌরগোবিন্দ, ফেড হয়ে আসছে তাই গৌররায়জীর প্রেরণাতেই এই বিগ্রহ তোমার মারফৎ এলেন। একে তুলে রেখে কি হবে। তোমার গোপালজীর পাশে বসিয়ে পূজো কর। আমার মনে মনে ইচ্ছা ছিল এঁর পূজো করি, কিন্তু ঠাকুর বেড়ে যাচ্ছে বলে প্রভু যদি রাগ করেন, তাই সাজিয়ে রাখব বলেছিলাম। আমার আশা এবার পূর্ণ হলো। তখন আমি প্রভুকে বললাম, 'তাহলে আপনি এঁর প্রতিষ্ঠা করে দিন। প্রভু বললেন, 'তবে তিনদিন গৌররায়জীর পাশে বসিয়ে রাখ। মণিবাবু তখন এখানে ছিলেন। মণিবাবু যখন প্রভুর কাছে এলেন প্রভু বললেন, "মণিবাবু! দেবু কি সুন্দর গৌরগোবিন্দ বিগ্রহ পুরী থেকে এনেছে দেখুন, চিত্রপটে গৌররায় দর্শনের অসুবিধে—তার উপর ফটো কালো রং—লোকে গৌর গোবিন্দ বলে বুঝতে না পেরে মনে করে আমি একলা কৃষ্ণের পূজা করি। ঠাকুরের প্রেরণায় এ বিগ্রহ এসেছেন এবার গৌররায় স্বরূপটি কি ভালমতন বোঝা যাবে।" মণিবাবু পরে আমাকে বললেন, 'দেখ, দেবু! তুমি গৌরগোবিন্দ বিগ্রহ এনেছ, প্রভুর খুব আনন্দ—যদি কৃষ্ণ বিগ্রহ আনতে এত আনন্দ হতো না কারণ সারাজীবন প্রভুতো গৌরগোবিন্দ (গৌররায়জী) সেবা করে আসছেন, তাই গৌরগোবিন্দের উপর তাঁর দৃঢ় আবেশ। সাবিত্রীদি গৌরগোবিন্দের পোশাক করে দিলেন। গৌররায়জীর পাশে তাঁকে সাজিয়ে রাখলাম। প্রভু বললেন, 'খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। তিনদিন প্রভু তাঁর অর্চনা করলেন। একটা ছোট ভোগ আরাধনাও হলো—চার জন প্রসাদ পেলেন। পরে প্রভু বললেন, 'আমি এর আহ্বানও করে রাখলাম। ভবিষ্যতে যখন একাসনে গৌররায়জীর সঙ্গে পূজো হবে তখন এঁর প্রতিষ্ঠা করে নিও। এঁর নাম থাকলো শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ। এই গৌরগোবিন্দ বিগ্রহ শাস্ত্র সম্মত। মহাপ্রভু স্বহস্তে সেবা করে কাশীশ্বরকে সেবা করতে দিয়েছিলেন। কাশীশ্বর সেই বিগ্রহ নিয়ে বৃন্দাবন গেলেন।" প্রবীরও তার জগন্নাথকে একদিন নিয়ে এসে প্রভুকে দিয়ে পূজো করালো।

প্রভু গৌররায় গিরিধারী ও একটি শালগ্রাম শিলার সেবা করেন। আমাকে একদিন নিজে হাতে করে এনে শালগ্রাম শিলার গায়ে মৎস, ধ্বজ, বেণু আদি শিলার প্রাপ্তি ইতিহাস বললেন। ৪০ নং সিমলা ষ্ট্রীটে প্রভুর কবিরাজী ডিসপেন্সারী ঘর ছিল। ঔষধের তাকে অনেক কৌটা সাজানো ছিল। তার মধ্যে একটা বড় গোল কাঠের কৌটা ছিল। ঐ কোটা নাকি তাঁর জ্যেঠামশাই, দিল্লী থেকে পাঠিয়ে ছিলেন। তিনি দিল্লীতে কাজ করতেন। ঠাকুরদাদা দেহরক্ষার পর অনেক বাড়ী

পাল্টানো হয়েছিল, জিসিপত্রেরও অনেক নাড়াচাড়া করতে হয়েছিল, কিন্তু ঐ কাঠের কৌটা বরাবর তাঁদের প্রয়োজনীয় জিনিসের মধ্যেই ঘুরত, এ বাড়ী ও বাড়ী। ঐ কৌটার মধ্যে যে কি আছে তা খুলে দেখার অবকাশ ছিলনা। জিনিষপত্রের মধ্যে আছে থাক এরূপ অবহেলার মধ্যেই পড়েছিল। প্রভু বললেন, একদিন ডিসপেনসারী ঘরে বসে আছি। সেদিন লোকজন কেউ নেই। ডিসপেনসারী ঘরেরই একপাশে আলমারীর পেছনে একটি সরু ফালি জায়গা। সেখানে একটা টুলে গৌররায়জী আছেন। হঠাৎ প্রভুর খেয়াল হল ঐ কাঠের কৌটার মধ্যে কি আছে, দেখি ত। দীর্ঘদিন সঙ্গে সঙ্গে কৌটাটা ঘুরছে, তার মধ্যে কি আছে, এ যাবৎ খুলে দেখা হয়নি, এই মনে করে তাক থেকে কৌটাটা নাবিয়ে খুললেন। কৌটার মধ্যে দেখেন ঠিক ঐ রকম আর একটা কাঠের ছোট গোল কৌটা। সেই বাক্সটা খুলে দেখেন, কতকগুলো ছোট ছোট সাদা নুড়ি পাথর, পাথরগুলো ঢেলে ফেলে দেখেন তার মধ্যে এই ছোট্ট শালগ্রাম শিলাটি। শিলার গায়ে বজ্রকীটের ছিদ্র, চক্র ও নানান ধ্বজ-মৎসাদি চিহ্ন। প্রভু দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। পরে কোন একজন বিশিষ্ট বৈষ্ণব পণ্ডিতকে সেই শালগ্রামটি দেখিয়েছিলেন তিনি শালগ্রামের চিহ্নাদি হরিভক্তিবিলাসের শালগ্রামের চিহ্নাদি বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়ে বলেন এই শালগ্রামটি শ্রীকৃষ্ণ শালগ্রাম। সেই থেকে প্রভু ঐ শালগ্রামের সেবা করেন শ্রীশ্রীগৌররায়জীর সাথে একাসনে বসিয়ে। প্রভু বলতেন, "আমি মনে করি এই শালগ্রামটি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবিত শালগ্রাম শিলা। মনে করতে তো আর দোষ নেই। তিনি কৃপা করে আমার কাছে এসেছেন প্রভু যেবার শ্রীধামবৃন্দাবন গিয়েছিলেন সেবার একটি গিরিধারী শিলা এনেছিলেন। গিরিণ বাবাজী এ শিলাটি প্রভুকে পছন্দ করে দিয়েছিলেন। যে কাঠের বাক্সের মধ্যে শালগ্রাম শিলাটি ছিলেন, সে বাক্সে একটি ছোট ছিন্ন গুঞ্জামালা দেখেছিলাম, প্রভু বলতেন—প্রভু যেবার বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন, সেবার নিধুবন না নিকুঞ্জবনের মধ্যে এই গলার ছিন্ন 'গুঞ্জামালার' টুকরোটা কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। রাধারাণীর গলার ছিন্ন গুঞ্জামালা। মনে করে প্রভু সেটি রেখে দিয়েছিলেন।

প্রভুর নিজের জীবনের কয়েকটি স্মরণীয় ঘটনা আমাকে বলতেন, প্রভু বাড়ীর বড় ছেলে ছিলেন বলে সকলের আদরের পাত্র ছিলেন। প্রভুর দাদা মশাই গোপীমোহন রায় তৎকালীন বিখ্যাত কবিরাজ ছিলেন। গোপীমোহন রায় মশাই শারীরিক অসুস্থ হওয়ায় চিকিৎসকদের নির্দেশে তাঁকে পরিবারের সকলে মিলে পুরীধামে নিয়ে যান। প্রভু সকলের আদরের পাত্র ছিলেন বলে প্রভুর মামা প্রভুকেও তাঁদের সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। তখন প্রভুর বয়স হবে ৭/৮ বৎসর। তাঁরা সকলে

পুরীতে এসে সমুদ্রের ধারে একটা বাড়ী ভাড়া করেছিলেন। সমুদ্রের সৌন্দর্য দর্শনে সকলে মশ্‌গুল। জগন্নাথ দর্শনের দিকে কাহারও মন নেই। প্রভু শুনেছেন পুরীতে দর্শনীয় জগন্নাথদেব আছেন। জগন্নাথ দর্শনের জন্য তাঁর প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠল—সঙ্গের অভিভাবকদের বললেন, 'জগন্নাথ দর্শনে চলুন, কিন্তু কারও গা নেই—বলেন, 'পরেহবে'। এ'ভাবে ৫/৬ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর একদিন জগন্নাথ দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে কাউকে কিছু না বলেই একাকীই সমুদ্রের ধার ধরে জগন্নাথ দর্শনের জন্য চললেন, দূর থেকে শ্রীমন্দিরের চূড়াদর্শনে আনন্দ আর ধরেনা। এভাবে মন্দিরের নিকটে এসে উপস্থিত হ'লেন, সম্পূর্ণ অজানা জায়গা কোথায় যাবেন, কাকে জিজ্ঞেস করবেন কিছুই বুঝতে পারছেন না, একটু যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছেন—হঠাৎ এমন সময়ে একটি সুদর্শন নবীন সন্ন্যাসী এসে প্রভুর হাত ধরে বললেন, 'খোকা', তুমি জগন্নাথ দর্শন করবে, চল, আমার সঙ্গে। আমি তোমাকে দর্শন করিয়ে দিচ্ছি—এ'বলে প্রভুর হাত ধরে মন্দিরের মধ্যে নিয়ে গেলেন, গরুড় স্তম্ভের কাছে এসে সন্ন্যাসী প্রভুকে বললেন, 'ঐ দেখ সামনে জগন্নাথ দেখা যাচ্ছে, আর মহাপ্রভু এ গরুড়ের কাছে দাঁড়িয়ে জগন্নাথ দর্শন করতেন।" প্রভুর খুব আনন্দ, একটু আগ্রহের সঙ্গে জগন্নাথ দর্শন করছেন—হঠাৎ পেছনে তাকিয়ে দেখেন সে সন্ন্যাসী আর নেই। যাঁর কৃপায় জগন্নাথ দর্শন পেলাম—তিনি একমুহূর্তের মধ্যে কোথায় গেলেন, প্রভু এদিকে সেদিকে খুঁজতে লাগলেন, কোথাও পেলেন না তাঁকে। তখন প্রভুর মনে হলে, এ সন্ন্যাসী আর কেউ নয় ইনিই মহাপ্রভু, সুদর্শন গৌরবর্ণ সৌম্যবিগ্রহ সন্ন্যাসী—যাঁর দর্শনে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এর মধ্যে তিনি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন। হায়! আমি একবার তাঁকে প্রণাম করতেও পারলাম না। তখন প্রভুর জগন্নাথের চেয়ে সন্ন্যাসীর কথা বেশী স্মরণ হচ্ছিল। যথাসময়ে বাড়ী ফিরলেন, সেও এক আশ্চর্য তিনি যে দীর্ঘসময়ে বাড়ীতে নেই, কেউ একবারও জিজ্ঞেসও করলেন না, কোথায় গিয়েছিল। কিছুদিন পরে প্রভুর পিতা প্রভুকে আনতে পুরী গেলেন, বাবাকে দেখে প্রভু আনন্দে তাঁর সেদিনকার অলৌকিক ঘটনা সব বললেন। শুনে প্রভুর পিতা বললেন, "চলতো, দেখি কোনখানে সেই সন্ন্যাসী তোকে দেখা দিয়েছিলেন, এ বলে পিতাপুত্র বেরিয়ে পড়লেন জগন্নাথ দর্শনে। মন্দিরের সামনে এসে প্রভু তাঁর বাবাকে বললেন, 'এইস্থানে সন্ন্যাসী আমার হাত ধরে ভেতরে নিয়ে গেলেন আর এখানে জগন্নাথ দর্শন করিয়ে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তখন প্রভুর পিতা প্রভুকে বললেন, "তোমার পরম সৌভাগ্যে, ইনি সাক্ষাৎ মহাপ্রভু তোমার আগ্রহ উৎকণ্ঠা দেখে তোমাকে দর্শন দিলেন।"

আর একবার ভাজন ঘাটে বজরা (বোটে) প্রভু একা আছেন। এই বজরা প্রভুর

বাবাই কিনেছিলেন। ভাজনঘাটের নদীতে বাঁধা থাকত। দীর্ঘদিন চিকিৎসা কার্যে পরিশ্রান্ত হয়ে গেলে তিনি কিছু দিনের জন্য ভাজনঘাটে এসে নদীর মুক্ত হাওয়ায় ঐ বজরায় এসে থাকতেন। এ বজরার মধ্যে ছিল, তাঁর বৃহৎ গ্রন্থাগার। অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল তাঁর। সব সময়েই গ্রন্থ নিয়ে থাকতেন। গোস্বামী গ্রন্থ—ধর্মগ্রন্থই ছিল মুখ্য। মধ্যে মধ্যে প্রভুকে তিনি পাঠিয়ে দিতেন বিশ্রামের জন্যে ভাজনঘাটে। তখন প্রভুর বয়স হবে ১৮/১৯ বৎসর; সেবার প্রভু একা এসেছেন। সন্ধ্যার পরে বজরার ঘরে বসে শ্রীজীবের ষটসন্দর্ভ গ্রন্থ নিয়ে পড়ছেন প্রভু। কিন্তু বুঝতে পারছেন না তবুও পড়ে যাচ্ছেন। তন্দ্রা নেবে এলো দুচোখে, গ্রন্থ রেখে বিছানায় শুয়ে পড়লেন প্রভু। তখনই তন্দ্রার মধ্যে স্বপ্ন দেখেন প্রভু সীতানাথ অদ্বৈত গোঁসাই যেন প্রভুর সন্মুখে এসেছেন। চরণে গুলওয়ালা পাদুকা। প্রভু সীতানাথকে দেখে প্রভু স্বপ্নে তাঁর চরণে প্রণাম করলেন। সীতানাথ সপাদুকা-চরণ প্রভুর মাথায় তুলে দিয়ে বললেন, 'এরপর থেকে ধর্মগ্রন্থের দুরূহ সিদ্ধান্ত তোমার অন্তরে আপনা হতেই প্রকাশিত হবে। এ'বলে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। প্রভুর ঘুম ভেঙ্গে গেল, কি স্বপ্ন দেখলাম। সীতানাথের কত করুণা! তখনই গ্রন্থ খুলে পড়তে লাগলেন—পূর্বে যেগুলো তাঁর বোধগম্য হচ্ছিল না এখন যেন সেগুলো সহজ-সরল। বলাবাহুল্য প্রভু জীবনে কোন পণ্ডিতের কাছে শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন করেননি। কিন্তু শাস্ত্রের জটিল সিদ্ধান্ত তাঁর কাছে সহজ সরল ভাবে প্রকাশ পেত। তাই শাস্ত্রের জটিল সিদ্ধান্তের সমাধান করে প্রভু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। "জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম"। "শ্রীশ্রীনামচিন্তামণি (৩খণ্ডে)" "শ্রীভক্তিরহস্য কণিকা", "বৈজয়ন্তী প্রবন্ধমালা"-র মত আরো অমূল্য ভক্তিগ্রন্থ রাজী।

প্রভুর কাছে শুনেছি, আর একবার প্রভু বাড়ীর এক ভৃত্য বিশুকে সঙ্গে নিয়ে বজরায় আছেন। পুরাতন বজরা মাঝে মাঝে সংস্কার করতে হয়, বজরার তলায় আলকাতরা দিতে হবে তাই বিশুকে পাঠিয়েছেন, কলকাতায় সেদিন। বিকেলে সুরন মালো এসে প্রভুকে বলল, 'দাদা গোঁসাই, আজ আপনাকে একা থাকতে হবে, যদি বলেন, 'আমি আজ আপনার কাছে রাত্রে থাকব।" প্রভু বললেন, "না, তোমাকে রাত্রে কষ্ট করে আসতে হবে না, একটা রাত্রিতো কেটে যাবে। কালই তো বিশু আসবে। সুরন মালা চলে গেল। প্রভু যথারীতি নিত্যকর্ম সেরে রাত্রে শুয়েছেন, হঠাৎ মধ্যরাত্রে একটা কল্‌কল্‌ কল্‌কল্‌ শব্দে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল, বিছানা থেকে উঠে পড়লেন। কোথায় এ শব্দ হচ্ছে—হায় হায় একে বজরা ফুটো হয়ে গেছে, বজরার খোলে হু হু করে জল উঠছে, এখন উপায়? এত রাত্রে এই নদীর ধারে কাকে পাব, কিছুক্ষণের মধ্যেই তো বজরা ডুবে যাবে, আর সাজানো গ্রন্থাগার ও

অন্যান্য আসবাব পত্র সব নষ্ট হয়ে যাবে, তাঁর একার পক্ষেও তো সম্ভব নয় বজরাকে টেনে ডাঙ্গায় তোলা। এ দারুণ সঙ্কটের একমাত্র রক্ষক 'ভগবান্'। এ ভেবে প্রভু বজরার ছাতের উপরে বসে গৌররায়জীকে স্মরণ করতে লাগলেন। তুমি আমাদের সকল আপদ বিপদ হতে রক্ষা করে আসছ'—এ সঙ্কট হতে রক্ষা কর প্রভু!

কিছুক্ষণ পরেই দেখলেন প্রভু বহুদূরে একটা আলো দেখা যাচ্ছে। আলোটা যেন এদিকেই আসছে না? এখান দিয়ে কেউ এলে ডাকব প্রভু ভাবলেন। আস্তে আস্তে আলো বজরাটার দিকেই এলো—দূর থেকে কার গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না, 'ছাতে কে দাদা গোঁসাই?' প্রভু বললেন, "হ্যাঁ আমি, তুমি? "আমি সুরন"। "এত রাতে সুরন তুমি?" সুরন মালো একজন সঙ্গী সহ বজরায় কাছে এসে দাঁড়াল। "দাদা গোঁসাই আপনি একা আছেন, মন ভাল লাগছেনা, তাই আপনাকে দেখতে এসেছি। আপনি দাদা গোঁসাই এত রাতে একা ছাতে বসে আছেন কেন? প্রভু বললেন, "সুরন, ভগবান তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন আমি ভীষণ বিপদে পড়েছি।" "কি হয়েছে, দাদা গোঁসাই আপনার?" প্রভু বজরার ছাত থেকে নেমে এসে বললেন, "এই দেখ, বজরার তলা ফুটো হয়ে বজরায় জল উঠছে জলের আওয়াজ শুনছ না? আমার কি একার সাধ্য বজরাকে টেনে ডাঙ্গায় তোলার। আমি হতাশ হয়ে ছাতে বসে ভগবানকে ডাকছি এমন সময় দূরে আলো দেখতে পেলাম ভাবলাম, আলোটা কাছে এলে যে যাচ্ছে তাকে ডাকবো। যাক্ ভগবান তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন, আমি তোমাকে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।" সুর মালো বলল, "দাদা গোঁসাই আপনি ঘরে শুয়ে পড়ুন গিয়ে—আমরা দুজন আছি যা হয় ব্যবস্থা করছি। তাদের অভয়বাণী শুনে প্রভু দেখলেন সুরন মালো ও তার সঙ্গী সারারাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে বাঁশের গোঁজ পুঁতে বজরা টাকে বেঁধে রেখেছে; যাতে জল উঠে ডুবে না যায়। সকালে স্থানীয় মিস্ত্রি আনিয়ে বজরা মেরামত করা হলো। ঐদিন বিশুও কলকাতা থেকে এসে পড়ল আলকাতরা নিয়ে। বজরার তলায় আলকাতরাও লাগনো হলো।

১৩৮১ সাল থেকেই প্রভুর শরীর ক্রমশঃই দুর্বল ও অসুস্থ হয়ে পড়ে। কিন্তু শ্রীশ্রীগৌররায়জীর সেবাপূজা কোনদিনের জন্য বাদ দেননি। শারীরিক দূর্বলতার জন্য সবকাজেই দেরী হতে থাকে।

১৩৮২ সালে প্রভুর শারীরিক অসুস্থতাও দূর্বলতা এত বাড়ে যে শ্রীগৌররায়জীর সেবাপূজা সেরে ভোগরাগাদিতে বিকেল চারটে বেজে যায়। সেই সময় ভীষণ কাশি হওয়াতে প্রভু খুব কষ্ট পান। বড় বড় ডাক্তার দেখে ঔষধের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাছাড়া এক্সরে ও অন্যান্য পরীক্ষা সবই করা হলো। শারীরিক

ব্যাধির জন্য শেষের কয়েকমাস বাধ্য হয়েই তাঁকে সেবাপূজা ছাড়তে হয়েছিল, কিন্তু নিয়মিত পূজাহ্নিক স্মরণে করতেন।

এরমধ্যে ডাক্তারদের ভুল চিকিৎসায় কয়েকদিন আগে তাঁকে ভীষণ শারীরিক কষ্টের মধ্যে পড়তে হয়েছিল। তীব্র জ্বরের ঘোরে কেবলই ঠাকুরের কথা বলেন। সর্বাঙ্গে ওষুধের প্রতিক্রিয়া বেরিয়ে অদ্ভুত দৃশ্য। তার জ্বালা যন্ত্রনা প্রচণ্ড। ডাক্তাররা নিজেরাই ভীত হয়ে পড়লেন। কয়েকদিন পরে কলকাতায় একজন ডাক্তার (ডাঃ সিংহ, প্রভুরই আশ্রিত) তিনি এসে দেখে সব ঔষধ বন্ধ করে দেন। এরপর থেকে জ্বর বন্ধ হয়ে যায় ক্রমশঃ শরীরের সমস্ত প্রতিক্রিয়া মিলিয়ে যায়। খাওয়াতে কোন রুচি নেই। প্রসাদী দই-অন্ন খুব মিহি চটকে দুই এক চামচ মুখে দেন। শ্রীশ্রীগৌররায়জীর শ্রীচরণামৃতই তাঁর প্রধান খাদ্য হয়েছিল। প্রভু একদিন ডেকে আমায় বললেন, "তুমি আমার ভক্তছেলে, তোমাকে একটা কথা জানাচ্ছি, তুমি প্রত্যহ ঠাকুরকে জানাও আমি যেন শীঘ্র জগৎ ছেড়ে চলে যাই। আমাকে রাখবার জন্য ভক্তরা কেবলই প্রার্থনা জানাচ্ছে—কিন্তু আমি আর থাকতে রাজী নই।" আমি এই কথা ঠাকুরকে কি করে জানাই—ঠাকুরকে জানালাম তুমি যা ভাল মনে কর—তাই কোরো।

ঐদিনই প্রভু আশ্রমবাড়ী ছেড়ে পাশের শ্রীগৌররায় সেবাকুঞ্জ চলে যাবেন। প্রভু সকলকে বললেন, আশ্রমবাড়ীর উপরে আমার থাকা ঠিক হবেনা। একটাই ঘর কাঠের পার্টিশন। মারা গেলে অনাচার হবে। আমায় নীচের ঘরে নিয়ে চল। তখন সকলে বললেন তার চাইতে আপনি ও বাড়ী চলুন, ইলেকট্রিক আছে—আপনার হাওয়ার প্রয়োজন, খুব সুবিধে হয়। পাখাও আছে। প্রভু তাতে সম্মত হলেন। কি করে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন দাদা, মণিবাবু পরামর্শ করে একটা ইজিচেয়ার নিয়ে এলেন। এতে প্রভু বসবেন। আমরা ধরাধরি করে নিয়ে যাব।

ও বাড়ী যাবার পূর্বে প্রভু শ্রীশ্রীগৌররায়জীকে প্রণাম করতে এলেন। ধরে ধরে নিয়ে আসা হলো যেন অভিমানের সঙ্গে বললেন—আর যেন ফিরে আসতে না হয়। এই বলে প্রণাম করলেন। দাদা ও মণি বাবুর কাঁধে ভর দিয়ে নীচে নাবলেন। নীচে বেঞ্চিতে বসলেন কিছুক্ষণ। তারপর ইজিচেয়ার আনা হোল মণিবাবু বললেন, 'প্রভু চেয়ারে বসুন, আমরা ধরাধরি করে আপনাকে ও বাড়ী নিয়ে যাচ্ছি।' প্রভু বললেন, 'কোন প্রয়োজন নেই। আপনি ও নিমাই আমাকে দুদিকে ধরুন। তাঁদের কাঁধে ভর দিয়ে হেঁটেই ও বাড়ী চলে গেলেন।

ও' বাড়ীতে প্রভু থাকেন। পালা করে তাঁর কাছে সকলে বসে থাকেন। কারেন্ট

না থাকলে হাওয়া দেওয়া হয়। দাদা মণিবাবু, বাবা, ছোট জ্যেঠামশাই ও রমেনভক্ত সারাদিনে ও সন্ধ্যায় তাঁর কাছে পালা করে থাকেন। আর রাত্রে আমি তাঁর কাছে শুই। ও বাড়ী গিয়ে প্রায় মাস তিনেক ছিলেন। প্রতি মাসে দাদা দশদিনের ছুটি নিয়ে নবদ্বীপে আসতো ও শেষ একমাস এখানে ছিল। ঐ দশদিন দাদা তাঁর কাছে রাত্রে থাকতো—দিনেও প্রায় সব সময়েই সেবা করতো। রাত্রে তাঁর কাছে আমি যখন শুতে যেতাম, তখন মধ্যে মধ্যে অনেক কথা বলতেন।

এরমধ্যে একসময়ে বেনারস থেকে শ্রীযদুনন্দন সহায় মহাশয়ের জামাই শ্রীবিহারী দাসজী (জজ সাহেব) সস্ত্রীক এলেন একমাত্র ছেলে নিমাই দাসকে সঙ্গে করে। তাঁদের থাকার ব্যবস্থা প্রভু এ অবস্থায়ও তাঁর অনুগত ভক্তদের বলে ভাল ধর্ম্মশালায় ঠিক করে দিলেন। লোক দিয়ে দর্শনের ব্যবস্থা করালেন। তাঁরা ১০/১২ দিন ধামে ছিলেন। তাঁরা প্রভুর কাছে শ্রীহরিনামের মালা ও মহামন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, এখান থেকে ফেরার ২/৩ দিন পূর্ব্বে।

ডাক্তার মণীন্দ্র কুমার সিংহ প্রতিমাসেই ১/২ বার করে কলকাতা থেকে প্রভুকে দেখতে আসতেন। ডাক্তার বাবু একদিন চিঠি দিলেন, আমি কাল নবদ্বীপ যাচ্ছি। আমি সেদিন রাত্রে প্রভুকে বললাম, ডাক্তার বাবু আপনার খুব অনুগত, তাঁকে দীক্ষাটা দিয়ে দিন। পূর্ব্বে প্রভুর কাছে তাঁর হরিনামের মালা হয়েছিল। প্রভু প্রথমে রাজী হলেন না—পরে বললেন, দেখা যাক্। পরের দিন ডাক্তারবাবু যথাসময়ে এলেন, তাঁকে আমি বললাম—আপনি প্রভুকে অনুরোধ করুন আপনার দীক্ষা হয়ে যাবে মনে হয়। ডাক্তার বাবুর খুব আনন্দ। তিনি প্রভুকে অনুরোধ জানালেন। তার পরের দিন স্নান সেরে প্রভু আসতে বললেন। অনেক উপদেশাদি দেবার পর তাঁকে শ্রীগৌরমন্ত্রে দীক্ষা দিলেন।

স্থানীয় ডাক্তাররা প্রতিদিনই একবার করে দেখে যান। একদিন ডাঃ সুশীল ভৌমিক প্রভুকে বললেন, 'প্রভু, আমাদের ইচ্ছা, আপনার একটি ভাষণ আমরা রেকর্ড করে রাখি। যদি অনুমতি করেন তাহলে একদিন টেপরেকর্ডটা নিয়ে আসি। প্রভু বললেন, আমার এই অবস্থায় আমি কি বলতে পারবো? ডাক্তারবাবু বললেন, 'যতটা পারেন, বলবেন। প্রভু রাজী হলেন। পরের দিন ডাক্তার ভৌমিক তার টেপরেকর্ডটা নিয়ে এলেন দুপুর বেলা। ঐ সময়ে প্রভু প্রায় দু'ঘন্টা হরিকথা আলোচনা করেছিলেন। সেটি রেকর্ড হয়ে আছে ডাক্তারবাবুর কাছে।

ইতিমধ্যে আমেরিকা থেকে প্রশান্ত ভারতে এল। নবদ্বীপে প্রভুর সঙ্গে দেখা করতে এল—প্রভু তাকে খুব আশীর্বাদ করলেন। সে জপমালা গ্রহণ করবার বাসনা প্রভুকে জানালো। ১৩৮২ সালে ১৪ই শ্রাবণ সে মালা শোধন করে প্রভুর

কাছে গেল। প্রভু তাকে বললেন,—এই অবস্থায় আমার মালা দেওয়া ঠিক হবেনা, তুমি দেবুর কাছে মালা নাও।" একবাক্যে সে রাজী হয়ে গেল। আমি বললাম "আমি এনাকে কি করে মালা দেব।" প্রভু বললেন "না তুমিই দাও।" এই বলে প্রভু মালায় হাত স্পর্শ করে আমাকে দিলেন। ঐদিন প্রশান্ত ও রাধাশ্যামবাবুর শ্রীশ্রীগৌররায়জীউর অন্নপ্রসাদ পাবার নিমন্ত্রণ। আয়োজনও সব করা হয়েছে। ভোগ রন্ধন ও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। দাদা তখন নবদ্বীপে আছে। দাদা স্নানাদি সেরে পূজোয় বসেছে। কিছুক্ষণ পরেই মণিবাবু হন্তদন্ত হয়ে এসে ডাকছেন— "নিমাইজী" "নিমাইজী" শীঘ্র আসুন। দাদাও তাড়াতাড়ি দৌড়াল, আমার কাছে মানু বসেছিল—তাকে বললাম, 'মানু দেখে আয়তো, কি হয়েছে।' মানু দেখে এসে বলল, 'দেবুদা শীঘ্র যান, প্রভু কেমন করছেন। আমি রান্না নাবিয়ে দৌড়ালাম। দেখি, প্রভু বালিশে হেলান দিয়ে চোখ তাকিয়ে বসে আছেন। নাকে অক্সিজেনের নল লাগানো। দাদা, বাবা পাশে বসে নাম শোনাচ্ছে। আমি তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমাকে দেখে প্রভু আঙ্গুল নাড়িয়ে বললেন, 'ও বাড়ী চলে যাও। তখনও তাঁর খেয়াল আছে প্রশান্তরা প্রসাদ পাবে তার ব্যবস্থা কর গিয়ে। আমি তাঁর আদেশে চলে এলাম। ঐভাব একটু পরেই কেটে গেল। যথাসময়ে শ্রীশ্রীগৌররায়হরির ভোগ আরাধনার পর প্রশান্ত ও রাধাশ্যাম বাবু এসে প্রসাদ পেয়ে গেলেন। পরে দই-অন্ন খুব চটকে প্রভুর জন্য ও বাড়ী নিয়ে গেলাম, ২/৪ চামচ গ্রহণ করলেন। বৈকাল পাঁচটার সময়ে ঠাকুর তুলে ও বাড়ী গেলাম—দেখি প্রভুর আচ্ছন্ন ভাব পূর্বের মতন। ইতিমধ্যে বহুভক্তের সমাগম হয়েছে। মণিবাবুর স্ত্রী (সাবিত্রীদি) বললেন, 'আজ ঠাকুরসেবা তাড়াতাড়ি সেরে নাও। আমি সন্ধ্যের পরেই শ্রীশ্রীগৌররায়জী, শ্রীকিশোর গোপালজীর সেবা সেরে ঠাকুর শয়ন দিয়ে ও বাড়ী চলে গেলাম। তখনও ঐ অবস্থা। আমি মণিবাবুর ঘরে বসে মালা করছি। সাবিত্রীদি বললেন—'দেবু, প্রভুর কাছে যাও, প্রভু বোধ হয় আর থাকবেন না। আমি দৌড়ে প্রভুর ঘরে এসে তাঁর সামনে বসলাম। ঘরের বাহিরে ও ভিতরে প্রায় ৩০/৩৫ জন লোক হবে সকলেই মহামন্ত্র নাম কীর্তন করে প্রভুকে শোনাচ্ছে। প্রভুর আচ্ছন্ন ভাব—বসে আছেন নাকে অক্সিজেনের নল—এই অবস্থা দেখে আমার খুব কান্না পেল। মণিবাবু খুব কাঁদছেন। স্থানীয় ডাক্তারবাবুরা (যুগলবাবু ও ভৌমিক) এসে বসে আছেন। একটু পরেই প্রভু চোখ—তাকিয়ে বললেন, 'এত লোক কেন? মণিবাবু বললেন, আপনার দর্শনে এসেছেন, আর আপনি নামপ্রিয় তাই নাম শোনাচ্ছেন। প্রভু বললেন, 'কেন, আমার শেষ সময় বলে? কোন ভয় নেই কেটে গেছে। প্রভুকে ধরে শুইয়ে দেওয়া হোলো। ছোড়দাকে 'ট্রাঙ্ক-কল'

করা হলো আসার জন্য। ইতিমধ্যে শ্রীমৎ বালক সাধুজী এলেন প্রভুর দর্শনে। আমি বললাম বালক সাধুজী এসেছেন। প্রভু বললেন, 'সাধুজীর চরণধুলি নিয়ে আমার মাথায় দিয়ে দাও। সাধুজী সঙ্কুচিত হয়ে আপত্তি করলেন। সাধুজী প্রভুর অঙ্গে হাত বোলাতে লাগলেন। শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীচরণতুলসী প্রভুকে দিলেন। প্রভু বললেন, 'জগন্নাথকে জানান—আজই রাত্রে যেন আমি যেতে পারি, আমার থাকবার একটুও ইচ্ছে নেই। রাত্রি দশটার মধ্যে সব ভক্তরা চলে গেলেন। কয়েকজন (ছেলেরা) রইল। প্রশান্ত আছে। রাত্রি ১০-৩০/১১টা নাগাদ ব্রজ ও বিভু ষ্টেশনে গিয়ে ছোড়দাকে নিয়ে এল। ছোড়দাকে দেখে প্রভু বললেন, 'এত রাত্রে? বাবা বললেন,—আপনার শরীরটা খারাপ হয়েছে তাই দেখতে এসেছে।' প্রভু—সুজাতা ভাল আছে তো? যাও, রাত হয়েছে, প্রসাদ পেয়ে শুয়ে পড়ো।' আশ্রমে ও বাড়ীর রোয়াকে যারা ছিল, শুয়ে রইল। প্রশান্তকে প্রভু বললেন, 'প্রশান্ত, শুয়ে পড়ো। রাত্রে দাদা, বাবা, আমি পালা করে প্রভুর কাছে থাকলাম। মাঝরাতে ঐ ভাব অল্প সময়ের মতন প্রভুর হয়েছিল। ঠাকুরের কৃপায় শীঘ্র কেটে গিয়েছিল। তখন প্রভু দাদাকে বললেন—আর এক অঙ্ক বাকী আছে। প্রশান্ত একটু শুয়ে আবার প্রভুর কাছে গিয়ে বসে রইল। ১৫ই শ্রাবণ (ইং ১লা আগষ্ট) শুক্রবার ১৩৮২ সাল দেখতে দেখতে ভোর হ'য়ে গেল। ডাক্তার বাবুরা এসে প্রভুর হার্ট,—নাড়ী সব পরীক্ষা করে বললেন, 'সব ভালই আছে ভয় নেই।' আমি স্নানাদি সেরে যথানিয়মে ঠাকুর ঘরে গেছি। রাধারমণদা এসেছে তাকে বললাম যদি কিছু প্রভুর অবস্থা খারাপ মনে কর আমাকে খবর দিও। তখন প্রায় ৭-৩৫ মিঃ হ'বে। হঠাৎ ও বাড়ী থেকে রাধারমণদা আমাকে চিৎকার করে ডাকলো, 'দেবুদা, দেবুদা.......। আশ্রমে তখন ছোড়দা, পণ্ডিতজী, কেষ্টদাস মাষ্টার ছিলেন। ব্রজ ঘুমোচ্ছিল। ডাক শুনে সকলে ও বাড়ী দৌড়ে চলে গেল। ব্রজরও ঘুম ভেঙ্গে গেছে—তাকে বললাম, সব তালা দিয়ে চল।' আমি গিয়ে দেখি, পূর্বদিনের মত অবস্থা। প্রভু বালিশে হেলান দিয়ে বসে আছেন। মাথাটা বাবার কাঁধে, পা ছড়ানো দাদার কোলের উপরে। নাকে অক্সিজেনের নল। দু'হাতে কর গুণে নামজপ করছেন। আমি তাঁর বুকের উপরে শ্রীশ্রীগৌররায়জীর চিত্রপট নিয়ে ধরলাম আর শ্রীশ্রীগৌররায়জীকে ডাকতে লাগলাম। ইতিমধ্যে শ্রীজীব গোস্বামী আদি অনেকে এসেছেন—তাঁরা প্রভুকে মহামন্ত্র নাম শোনাচ্ছেন। আমি প্রভুর অঙ্গে শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডাদি তীর্থের জল ছিটিয়ে দিলাম। বাবা ছোট জ্যেঠামশাইকে মকরধ্বজ নিয়ে আসতে বললেন। ছোট জ্যেঠামশাই মকরধ্বজ মেরে আনলেন, আমি প্রভুর মুখে আঙ্গুল দিয়ে খাইয়ে দিলাম। এদিকে সকলেই কাঁদছেন—আর শ্রীহরিনামের উচ্চধ্বনি উঠেছে। মণিবাবু

প্রভুর হাতের নাড়ী ধরে আছেন—নাড়ী ক্ষীণভাবে চলছে। যেই দশবার নাম জপা শেষ হল—নাড়ীও বন্ধ হয়ে গেল। শ্রীমহামন্ত্র নামের ধ্বনির মধ্যে প্রভু সকলকে ত্যাগ করে নিত্যলীলায় চলে গেলেন। প্রভুকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হোলো। এ'সংবাদ দেখতে দেখতে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো। স্ত্রী পুরুষ সকলেই প্রভুকে দর্শন করতে এসেছেন। প্রভু যখন দেহরক্ষা করলেন তখন সকাল ৭-৪০ মিঃ। বেলা ৮টা নাগাদ দেখি ডাঃ মণীন্দ্র কুমার সিংহ কলকাতা থেকে এসেছেন। ছোড়দাকে যখন ট্রাঙ্ক-কল করা হয়েছিল তখন কলকাতার বাড়ী থেকেই ডাক্তারবাবু ও দুলালদাকে খবর দেওয়া হয়েছিল। তাই তাঁরা দু'জনেই রাত্রি ৪ টে গাড়ী ধরে নবদ্বীপে এসেছিলেন। আমি ডাক্তারবাবুকে বললাম, 'ডাক্তারবাবু, প্রভু চলে গেলেন। ডাক্তারবাবু বললেন, 'ধরে রাখতে পারলেনা', বলে কেঁদে ফেললেন।

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুকে নূতন কাপড় পরিয়ে দিলেন—দ্বাদশ অঙ্গে শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডের রজ দিয়ে তিলক করে দিলেন। ইতিমধ্যে দুলালদা শ্রীধামেশ্বর মহাপ্রভুর প্রসাদী মালা এনে প্রভুর মাথায় দিয়ে দিলেন। তারপর প্রায় বেলা বারটা নাগাদ একটা ছোট চৌকীতে বিছানা করে প্রভুকে শোয়ানো হ'লো। মাথায় চাঁদোয়া করে আবরণ দেওয়া হোলো। ভক্তরা প্রচুর মালা এনেছিলেন। সেই সব মালা দিয়ে চৌকি সাজানো হোলো—ঠিক যেন চতুর্দোলা মনে হচ্ছিল। প্রভুর আদেশ ছিল, একবার তাঁকে নিয়ে যেন শ্রীশ্রীগৌররায়জীকে পরিক্রমা করা হয়। তারপর সকলে ধরাধরি করে পরিক্রমা করানো হোলো, আশ্রমের উঠোনে নামান হলো। শ্রীজীব গোস্বামী আর্তনাদের সঙ্গে হা গৌররায় হা গৌররায় বলে কাঁদতে লাগলেন পরে ও বাড়ী দিয়ে রাস্তায় নিয়ে যাওয়া হোলো। প্রভুর আদেশ ছিল তাঁর অনুগত ভক্তদের মধ্যে যাঁদের যে নাম রুচিকর তারা যেন সেই নাম কীর্তন করতে করতে তাঁকে নিয়ে যান। আর যারা তাঁকে বহন করে নিয়ে যাবেন তারা "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ—হরেকৃষ্ণ হরেরাম শ্রীরাধাগোবিন্দ" এই নাম করেন। আর একদল যেন মহামন্ত্র করেন। তাই হোলো। প্রথমদল, 'গৌরহরি বোল' নাম ধরলেন। দ্বিতীয় দল 'হা গৌরাঙ্গ' নাম ধরলেন। তৃতীয় দল মহামন্ত্র 'হরেকৃষ্ণ' নাম ধরলেন, সবশেষে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য......শ্রীরাধাগোবিন্দ' নাম করতে করতে প্রভুকে গঙ্গার দিকে নিয়ে যাওয়া হলো। অগণিত লোক। সব মন্দির থেকে ভক্তরা মালা এনে প্রভুর উপরে ছুঁড়ে দিতে লাগলেন—যেন চতুর্দোলায় চড়ে ঠাকুর যাচ্ছেন। এ'ভাবে তাঁকে শ্মশান ঘাটে নিয়ে যাওয়া হলো। যথাকালে গঙ্গাজল স্নানাদি করিয়ে চিতায় শোয়ানো হলো—কর্পূর, চন্দন কাঠ ও গাওয়া ঘি অফুরন্ত ভক্তরা নিয়ে গিয়েছিলেন। বাবাকে দিয়ে চিতায় অগ্নিসংযোগ করানো হলো। দেখতে দেখতে চিতা দাউ দাউ

করে জ্বলে উঠলো। দুলালদা চিতাকে পরিক্রমা করে প্রায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মহামন্ত্র নামকীর্তন করতে লাগলেন। এদিকে চিতা না নেভা পর্যন্ত গৌরনাম, মহামন্ত্র নামকীর্তন করতে লাগলেন। ৩/৪ ঘণ্টার মধ্যে সব শেষ। বাবাকে দিয়ে নাভি অংশ গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া হলো। কিঞ্চিৎ অস্থিভস্ম রাখা হলো শ্রীধামবৃন্দাবনে দেবার জন্য। এভার ছিল রাধারমণদার উপরে। চিতায় জল দিয়ে ঐ অগণিত লোক একসঙ্গে কীর্তন করতে করতে রাণীর ঘাটে স্নান করে নিজ নিজ বাড়ীতে চলে গেলেন। আমি, দাদা, ছোড়দা, প্রশান্ত ও ডাক্তারবাবু একসঙ্গে বাড়ী এলাম। একটু পরেই মণিবাবু, বাবা, ছোট জ্যেঠামশাই বাড়ী এলেন। প্রভুর ঘর শূন্য, যাঁকে নিয়ে সকলে এতদিন সেবাকাজে ব্যস্ত ছিলেন, আজ আর কোন কাজ নেই। আমি শ্রীশ্রীগৌররায়জীকে অভিষেক করিয়ে পূজার্চনা সারলাম। ঐদিন ফলমূলাদি ভোগ দেওয়া হোলো। যথাকালে দশদিন অশৌচান্তে চৌষট্টি মহান্তের ভোগ-আরাধনা হয়েছিল। ১৫ দিন পরে শ্রীগোবিন্দ বাড়ী বিরাট আয়োজনে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীর প্রসাদান্ন ভক্তবৃন্দকে পাওয়ানো হয়েছিল। এর ২/১ দিন পরে শ্রীশ্রীগৌররায়জীর সম্মুখে পাঠ—কীর্তন অন্তে পাকী প্রসাদ ভক্তগণকে বিতরণ করা হয়েছিল। তারপর থেকে প্রতি বৎসরই প্রভুপাদের স্মরণ তিথি উৎসব খুব সমারোহের সঙ্গে করা হয়। যিনি কোনদিন খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা চাননি—'যেনাবাঞ্ছে তার হয় ঈশ্বর নির্মিত।—এইভাবে শ্রীশ্রীগৌররায়জীউর ইচ্ছায় তাঁর প্রিয় ভক্তের মহোৎসব অচিন্ত্যভাবেই নিয়ম মত হচ্ছে। আগামী বৎসর (১৩০৫ সাল) তাঁর তিরোভাবের ২৫ বর্ষপূর্তি অর্থাৎ সুবর্ণ জয়ন্তী।

৪। মদীয় জ্যেষ্ঠতাত ও শ্রীগুরুদেব—'ফিরে দেখা'

শ্রীগৌররায় গোস্বামী

জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত সময়ে সময়ে এই পৃথিবীতে যাঁরা আসেন সেই ভগবৎপ্রেরিত বা চিহ্নিত পুরুষের সংখ্যা একান্তই বিরল। এঁদের আবির্ভাবও তাই এক দুর্লভ শুভকর ঘটনা। শাস্ত্র তাই বলেছেন,—

দুর্লভো মানুষো জন্মো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ।
তত্রাপি দুর্লভঃ মন্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনম্ ॥

(শ্রীভাঃ ১১/২/২৯)

অর্থ,—অনিত্য হ'লেও মনুষ্যজন্ম লাভ করা একান্তই দুর্লভ। কিন্তু তার থেকেও দুর্লভ ভগবৎপ্রিয় ভক্তের দর্শন লাভ করা।

মানুষের সমাজে, জড় জাগতিক মঙ্গলের সহায়করূপে যেসব প্রতিভাধর পুরুষ জন্মগ্রহণ করে মানব কল্যাণ সাধন করেন, তাঁরা অবশ্যই সম্মানার্হ। কিন্তু কেবল ইহ জীবনের ক্ষেত্রেই নয়, মানুষের অনন্ত জীবনের পরমানন্দ লাভের পথে যাঁরা দিশারী রূপে আসেন আমাদের মনের মণিকোঠায় তাঁদের শ্রদ্ধার আসন আরও উচ্চে বিরাজমান। কারণ তাঁরা আমাদের এই ত্রিতাপসঙ্কুল জীবনে শুধু শান্তি-বারিই সিঞ্চন করেন না, শাশ্বত নিত্য মানবাত্মার পরাশান্তি বিধানে তাদের ভূমিকা অতুলনীয়। শ্রীনামবিজ্ঞানাচার্য শ্রীশ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী প্রভুপাদ তেমনিই এক বিরল মহাত্মা ছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে (নভেম্বর, ১৮৯১) আবির্ভূত হয়ে তিনি আমাদের মধ্যে কাটিয়ে গেছেন ৮৪ বৎসর আয়ুষ্কাল। তাঁর মহাপ্রয়াণ ১লা আগষ্ট ১৯৭৫ সাল। প্রচারের পাদপ্রদীপের অন্তরালে, তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের ব্যবহারিক ও পারমার্থিক তপশ্চর্যা, বর্তমান কলি প্রভাবিত নীতিহীন ভ্রষ্ট অবক্ষয়িত সমাজের ঘনান্ধকারের মধ্যেও সত্য, আশা, আদর্শ ও পারমার্থিক পথের উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা স্বরূপ ছিল।

অতিসূক্ষ্মবস্তু করতলগত হ'লে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তার বিশ্লেষণ করা চলে, অনেক দূরবর্তী বস্তুও দূরবীণের সাহায্যে আমাদের দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়—কিন্তু কোন

বিরাট বস্তু যদি খুব সন্নিকটে অবস্থান করে, তবে তার অনুভব বা তার স্বরূপ অবধারণ দুরূহ হয়ে পড়ে। এ'রূপ ক্ষেত্রে আংশিক সমীক্ষার (Part survey) সামগ্রিক ফলই মূল্যায়ণের প্রকৃষ্ট উপায়। এ'কারণে প্রভুপাদের মহতী জীবনের বিভিন্ন দিকে আলোকপাতের চেষ্টা বিভিন্ন জনের দৃষ্টিতেই করা হয়েছে।

প্রভুপাদ আজ আর আমাদের মধ্যে নেই—শতাব্দীর এক-চতুর্থাংশ তাঁর অপ্রকটের পর অতিক্রান্ত। মেরুপ্রদেশে সূর্যাস্তের পরও যেমন আকাশদেশ সূর্যেরই বিচ্ছুরিত আলোকে (অরোরা বোলিয়ালিস্) সমুদ্ভাসিত থাকে, তেমনি তাঁর প্রয়াণের পরও তাঁর রচিত ভক্তিগ্রন্থরাজী বিদ্যমান আছেন—যাঁর মধ্য দিয়ে আমরা তাঁর ব্যক্তি বা পারিবারিক জীবনের কোন চিত্র তেমনভাবে না পেলেও, তাঁর আধ্যাত্ম্য ভাবনা, ভক্তি ও শ্রীনাম সম্বন্ধে তার সাধনলব্ধ অনুভবের প্রোজ্জ্বল স্বাক্ষর দেখতে পাই। বর্তমান ধর্ম সঙ্কটের দিনে প্রকৃষ্ট পরমার্থ পথের দিগ্‌দর্শন ও জটিলতার আবর্ত থেকে অনুসন্ধিৎসু জনের উত্তরণের পথনির্দেশ আছে এ সকল গ্রন্থে। এমন কি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম সমাজে কলিকৃত অপরাধ সংঘটনের ফলে, শুদ্ধভজন এবং ভজনশীল জনের ভজনরক্ষার উপায় নির্দেশিত হয়েছে এতে। এ কারণে তাঁর মহতী জীবনচর্যার বিষয়ে আলোচনার সাথে সাথে তাঁর গ্রন্থ সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ আলোচনা করা একান্ত অপরিহার্য বলে মনে হয়।

প্রভুপাদের জীবনকে বুঝতে গেলে তাঁর বংশধারা ও তাঁর জীবনে তাঁর পিতার প্রতিভাদৃপ্ত জীবনের প্রভাব সম্বন্ধেও কিছু জানা প্রয়োজন। এ'কারণে আমরা গ্রন্থারম্ভে কবিরাজ শ্রীমৎ সুরেন্দ্র নাথ গোস্বামীর, প্রভুপাদকৃত সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য বিধৃত করেছি। অতঃপর নিম্নে শতঞ্জীব বৈষ্ণবাচার্য শ্রীল রসিকমোহন বিদ্যাভূষণকৃত—প্রভুপাদের প্রথমগ্রন্থ 'জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম' এর ভূমিকাস্বরূপ যা প্রকাশিত হয়েছে তারই কিয়দংশ পরিচিতি হিসাবে তুলে ধরছি—

প্রশ্ন হতে পারে, প্রভুপাদের আবির্ভাবের পর কিঞ্চিদধিক শতবর্ষ অতিক্রান্ত হওয়ার পর, তাঁর জীবনী প্রকাশের সার্থকতা কোথায়? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এই পৃথিবীতে জনজীবনের গড্ডালিকা প্রবাহের মধ্যে ব্যতিক্রমী আদর্শ জীবনের দৃষ্টান্ত সচরাচর বড় একটা চোখে পড়েনা। এ' জগতে মানুষের সমাজে কেবল 'আমি', 'আমার', বিষয়ভোগ, ইন্দ্রিয়তর্পণ, সুখাশা, সন্তাপ, আরও চাওয়া, আরও পাওয়া ও যশোলাভের বিকারঘোরে আচ্ছন্ন গৃহমেধীজন প্রবাহ যুগ যুগ ধরে কোথা থেকে আসে আর কোথায় বা অনন্ত কালের জন্য বিলীন হয়ে যায় তা কে জানে? ভাবতে অবাক লাগে এ প্রবাহ থেকে স্বতন্ত্র হয়ে জীবনের আলাদা একটা মানে খুঁজে পেয়ে যাঁরা এ মহাকালের স্রোতের বিপরীতে উত্তরণের পথ খোঁজেন তাঁরা

কি বা কেমন? প্রচলিত ধারণা ও সংস্কারের থেকে স্বতন্ত্র অজ্ঞানতার মোহজাল ছিন্নকারী যে অমৃতবাণী তাঁরা বয়ে আনেন সংসার সন্তপ্ত মরণ পথযাত্রী অভাগা জীবের প্রতি অশেষ করুণায় তার কতটুকু আমরা বিনীত ও দীন হয়ে নিতে পারি। আর কতখানিই বা আকাশচুম্বী অহঙ্কারে সবজান্তার গর্বে অনায়াসে ও অবহেলায় ফিরিয়ে দিই। তবু সময়ে অসময়ে বিবেকের কোণে যে চেতনা জাগে তা হ'ল আমি নিতে না পারলেও অনাথ ও অসহায় কেউ যদি সত্যিই একটা অবলম্বন পায় যদি মরজীবন থেকে মহাজীবনের পথের পথিক হয়ে জীবনকে সার্থক করতে পারেন, তবে তাঁদের জন্যও কিছু একটা করা উচিৎ। কারণ সত্যতো নিত্য, আদর্শ বা মূল লক্ষ্য একটাই সেখানে মানবজীবনের চরম সার্থকতা, ভগবৎ প্রাপ্তিতে ও পরমানন্দের চরম উপলব্ধিতে। সেটি সৃষ্টির আদিতে ও যা অন্তেও তাই,—সুতরাং শতবর্ষের ব্যবধানের প্রশ্ন অকিঞ্চিৎকর। ক্ষুদ্র প্রয়াসে গ্রন্থ প্রকাশনাই তাই করণীয় বলে মনে হ'ল। তা ছাড়া তাঁর গ্রন্থের পাঠকবৃন্দেরও কেউ কেউ তাঁর সংসার ও পরমার্থ জীবন সম্বন্ধে উৎসাহী হ'তে পারেন—এটাও একটা কারণ।

গ্রন্থমধ্যে ইতিপূর্বেই পাঠক মদীয় পিতৃদেব লিখিত 'অনুজের অনুভবে অগ্রজ'য়ে প্রভুপাদের জীবনালেখ্যের কিছুটা দর্শন করেছেন। অতঃপর শ্রীরসিকমোহন প্রভুর বক্তব্য শ্রবণ করুন।

কিঞ্চিদধিক পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে—শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বেও বাঙ্গলার পল্লীবিশেষে সময়ে সময়ে যে সকল মহানুভব মহাপুরুষ ধারাধামে অবতীর্ণ হইয়া-ভূতধাত্রী ধরিত্রীর বক্ষ অলঙ্কৃত করিতেন, সুতীক্ষ্ণ জ্ঞানের সমুজ্জ্বল প্রভায় নরনারীগণের হৃদয় উদ্ভাসিত করিতেন, প্রেমভক্তির যমুনা-জাহ্নবী-প্রবাহে ত্রিতাপতাপে প্রতপ্ত নরনারীগণের হৃদয় অভিষিক্ত করিতেন, আদর্শ চরিত্রের সুস্নিগ্ধ কিরণচ্ছটায় নরনারীগণের হৃদয়ে সর্ব্বপ্রকার সুশিক্ষার প্রভাব সংস্থাপন করিতেন, এই গ্রন্থকার, শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী, সেই সকল মহাত্মারই একতমের সর্ব্বগুণান্বিত সুযোগ্য বংশধর।

কলিপাবনাবতার শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর নিত্যসিদ্ধ পার্ষদরূপে যে সকল মহাত্মার নাম ভক্তিভরে গৃহীত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে শ্রীসদাশিব কবিরাজ, তৎপুত্র শ্রীপুরুষোত্তমদাস ও তৎপুত্র শ্রীকানু ঠাকুর বা ঠাকুর কানাই, এই পুরুষত্রয়ও নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পার্ষদরূপে শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে সম্পূজিত হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্য-ভাগবত প্রভৃতি বৈষ্ণবগ্রন্থে ইঁহাদিগের পরিচয় দৃষ্ট হয়।

'শ্রীসদাশিব কবিরাজ বড় মহাশয় ।
শ্রীপুরুষোত্তমদাস তাঁহার তনয় ॥



“মনোহর স্মৃতিকুঞ্জ”, ভাজনঘাট, নদীয়া— পঃ বঙ্গ।

আজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে।
নিরন্তর বাল্য-লীলা করে কৃষ্ণ সনে ॥
তাঁর পুত্র মহাশয় শ্রীকানু ঠাকুর।
যাঁর দেহে রহে কৃষ্ণ প্রেমামৃতপুর ॥'

(শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে ; আদি—১১পঃ)

শ্রীলঘুভাগবতামৃতে 'ভক্তামৃত' নামক উত্তর খণ্ডে নির্ণীত হইয়াছে—শ্রীহরিভক্ত সকলের মধ্যে প্রহ্লাদ শ্রেষ্ঠ, প্রহ্লাদ হইতেও পাণ্ডবগণ শ্রেষ্ঠ ভক্ত; এতাদৃশ পাণ্ডবগণ হইতেও কোন কোন যাদব শ্রেষ্ঠ, —আবার সমস্ত যাদবগণের মধ্যে উদ্ধব শ্রেষ্ঠ; উদ্ধব হইতেও ব্রজদেবীগণ বরীয়সী; যে-হেতু শ্রীমদুদ্ধব মহাশয়ও সেই ব্রজদেবীগণের শ্রীচরণধুলি প্রার্থনা করেন; আবার এতাদৃশ ব্রজরমাগণের মধ্যে শ্রীরাধিকা ও শ্রীচন্দ্রাবলীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা বলিয়া ভক্তিশাস্ত্রে কীর্ত্তিতা হইয়াছেন,—

তত্রাপি সর্ব্বথা শ্রেষ্ঠে রাধাচন্দ্রাবলীত্যুভে।
যুথয়োস্তু যয়োঃ সন্তি কোটি সংখ্যামৃগী দৃশঃ ॥

(শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিঃ ৪/১)

অর্থাৎ সর্ব্বপ্রধানা যুথেশ্বরীদিগের মধ্যেও শ্রীরাধা ও শ্রীচন্দ্রাবলীই সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠা। যাঁহাদিগের যুথমধ্যে কোটি কোটি গোপী ছিলেন।

এই উভয়ের মধ্যে আবার শ্রীরাধিকাই শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত-বল্লভা বলিয়া, একমাত্র শ্রীরাধিকাই সর্ব্বভক্ত-শিরোমণি।

আমরা বৈষ্ণবগ্রন্থে শ্রীল সদাশিব কবিরাজকে পূর্ব্বলীলার সেই চন্দ্রাবলী রূপেই নির্ণীত দেখিতে পাই,—

'চন্দ্রাবলী প্রাণতুল্যা কবিরাজঃ সদাশিবঃ।' (অনন্ত সংহিতা)
'পুরা চন্দ্রাবলী যাসীদ্ ব্রজে কৃষ্ণপ্রিয়াপরা।
অধুনা গৌড়দেশেঽসৌ কবিরাজঃ সদাশিবঃ ॥'

(শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা—১৫৬)

শ্রীল সদাশিব কবিরাজের পুত্র শ্রীল পুরুষোত্তমদাসও পিতার ন্যায় বৈষ্ণব জগতে সুপ্রসিদ্ধ ভক্তিভাজন ছিলেন। শ্রীগৌর-লীলায় শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দের সহচর—দ্বাদশ-গোপালরূপে বিখ্যাত যে কয়েকজন মহাত্মা এই বঙ্গদেশে নাম ও প্রেমের বিশাল প্লাবন আনিয়াছিলেন, শ্রীপুরুষোত্তমদাস ঠাকুর সেই সকল মহাত্মারই অন্যতম ছিলেন। ইনি পূর্ব্বলীলায় স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রিয়সখার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ 'স্তোককৃষ্ণ' রূপে বৈষ্ণব গ্রন্থের বর্ণিত হইয়াছেন;

'স্তোককৃষ্ণঃ সখাপ্রাগযোদাসঃ শ্রীপুরুষোত্তম।'

(শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা—১৩০)

'স্তোককৃষ্ণ যেঁহো তেঁহো দাস পুরুষোত্তম' ॥ (ভক্তমাল)

সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-বন্দনাকার শ্রীল দেবকীনন্দন এই শ্রীপুরুষোত্তমদাস ঠাকুরের পদাশ্রয় করিয়া পরম পবিত্র ও ধন্য হইয়াছিলেন,—ইহাও 'বৈষ্ণব-বন্দনা' গ্রন্থে গ্রন্থকার স্বয়ংই উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীল পুরুষোত্তমদাসের পুত্র শ্রীকানু-ঠাকুরও পিতা ও পিতামহের ন্যায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদরূপেই সম্মানিত হইয়াছেন। অতি শৈশবকালে ইঁহার নাম ছিল 'শিশু-কৃষ্ণদাস'। অত্যল্প বয়সেই ইহার হৃদয়ে অলৌকিক প্রেম-মাধুর্য্যের বিকাশ হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের সখাগণের মধ্যে প্রিয়-নর্ম্মসখাগণেরই সর্ব্বোচ্চ স্থান; তন্মধ্যে আবার সুবল ও উজ্জ্বল সর্ব্বপ্রধান বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছেন;—'প্রিয় নর্ম্মবয়স্যেষু প্রবরৌ সুবলোজ্জ্বলৌ।'—(ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ)। শ্রীমদ্বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তদীয় 'শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয়' নামক গ্রন্থে * ইঁহাকে ব্রজের সেই উজ্জ্বলসখা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; যথা—

'পুরুষোত্তম-সুত শিশু-কৃষ্ণদাস গোস্বামী।
উজ্জ্বল স্বরূপ অনুভবে জানি আমি ॥'

ইনি কিশোর বয়সে শ্রীমতী জাহ্নবা দেবীর সহিত শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার অলৌকিক সৌন্দর্য্য ও অনুপমনৃত্য ভঙ্গিমার সহিত অপূর্ব্ব বংশীবাদন-মাধুর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া, শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতি ব্রজবাসী আচার্য্যগণ চমৎকৃত হয়েন এবং সেই সময় হইতে তাঁহাকে 'শ্রীকানু-ঠাকুর' নামে অভিহিত করেন। এই ঘটনা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবতকার শ্রীমদ্বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহোদয় তদীয় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন;—

'কিশোর বয়স যখন তখন বৃন্দাবনে।
মহা অনুভব তাঁর দেখিয়াছি নয়নে ॥
সঙ্কীর্ত্তনে অদ্বিতীয় মদন গোপাল।
মণিহার কণ্ঠে দোলে গলে বনমাল ॥
মুরলীর রবে সবার হরিলেন চিত।
ব্রজবাসী বলে কানাই হইল প্রতীত ॥

* শ্রীমৎ বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বিরচিত 'শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয়' গ্রন্থ হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি হইতে, নিত্যধামগত কবিরাজ সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী-মহাশয় কর্ত্তৃক ৪২৯ চৈতন্যাব্দে সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়।

শ্রীজীব গোস্বামী আদি ব্রজবাসিগণ।
দেখিয়া তাঁহার রূপ করিলা স্তবন ॥
সেই হৈতে হৈল নাম 'শ্রীকানু-ঠাকুর'।
কি আর কহিব তাঁর মহিমা প্রচুর ॥
এই উজ্জ্বল সখার কৃপা কিছু যারে হয়।
সহজেই সেই জন রাধাকৃষ্ণ পায় ॥'

কথিত আছে এই নৃত্যকালে তাঁহার চরণস্খলিত নূপুর বিচ্ছুরিত হইয়া যশোহর জেলার বোধখানা গ্রামে পতিত হয়; এই কারণে পরবর্তীকালে তিনি বোধখানা গ্রামকেই স্বীয় বাসস্থানরূপে নির্ব্বাচন করেন। এখানে তাঁহাদিগের স্থাপিত শ্রীশ্রীরাধা-প্রাণবল্লভ বিগ্রহ এখনও বিদ্যমান আছেন* এবং তাঁহার পঞ্চমদোল উপলক্ষ্যে প্রতি বৎসর এই স্থানে আনন্দময় উৎসবাদি হইয়া থাকে। এবং তদ্দিনে আশ্চর্য্য কদম্বফুল প্রস্ফুটিত হয়।

ঠাকুর কানাই বংশীয় গোস্বামিগণের মধ্যে কেহ কেহ বোধখানা হইতে নদীয়া জেলায় অন্তর্গত ভাজনঘাট গ্রামে আসিয়া বাস করেন। এখানে শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ, শ্রীশ্রীরাধা-বৃন্দাবনচন্দ্র ও শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দ নামক যুগল বিগ্রহত্রয় প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়া অদ্যাবধি তাঁহাদিগের দ্বারা সেবিত হইতেছেন। শ্রীল ঠাকুর কানাই, এই পরম প্রেম-ভক্তিসম্পন্ন পবিত্র বংশের শেষ নিত্যসিদ্ধ পুরুষ। এই নিমিত্ত 'ঠাকুর কানাই বংশীয় গোস্বামী' বলিয়াই ইঁহারা বৈষ্ণব সমাজে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন।

শ্রীল সদাশিব কবিরাজ হইতে শ্রীল ঠাকুর কানাই পর্য্যন্ত একাদিক্রমে এই নিত্যসিদ্ধ পুরুষত্রয়ের* আবির্ভাবেও সেইরূপ বৈদ্যবংশের গৌরব সমুজ্জ্বল হইয়াছে। শ্রীকানু ঠাকুরের পরবর্ত্তী সময়েও এই বৈষ্ণব কুলে অনেক পুণ্যাত্মা ও কৃতবিদ্য সাধুপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। বিদ্যা গৌরবে ও ভক্তি-বৈভবে ইঁহাদের অনেকেই সমাজে সমাদৃত হইয়াছেন। পরবর্ত্তীকালেও এই বংশে যে সকল স্বধর্ম্মপরায়ণ ও কৃতবিদ্য পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন, তন্মধ্যে 'শ্রীকানুতত্ত্ব-নির্ণয়' প্রণেতা বিহারীলাল গোস্বামী ও ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রে অসাধারণ অভিজ্ঞ হারাধন গোস্বামী-মহাশয়ের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গে যাঁহার গীতি-কাব্যনিঃ

* পাকিস্তানী হাঙ্গামায় স্থানান্তরিত হইয়া, বর্ত্তমানে কলিকাতায় বরাহনগরে ১৫৪ নং এস, পি, ব্যানার্জ্জি রোডে, শ্রীমৎ গৌরহরি গোস্বামী প্রভুর বাসভবনে অবস্থান করিতেছেন।

* কোন কোন বৈষ্ণব সাহিত্যিকের মতে, শ্রীল কংসারি সেন ব্রজের রত্নাবলী সখী, শ্রীল সদাশিব কবিরাজের পিতা। তাহা হইলে এই বৈষ্ণব বংশকে উপর্য্যুপরি চারি পুরুষ নিত্যসিদ্ধের বংশ বলা যায়।

সৃত ভক্তিরস এক বিপুল আনন্দপ্রবাহের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই স্বনামধন্য পরমশ্রদ্ধাস্পদ কৃষ্ণকমল গোস্বামী মহোদয় ভাজনঘাটে এই পবিত্র বংশেই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার সহিত ঢাকায় আমার সাক্ষাৎকার হয়। আমি তখন তরুণ যুবক, তিনি প্রবীণ। তাঁহার কবি-প্রতিভায় আমার চিত্ত আকৃষ্ট হয়; স্বপ্ন-বিলাস, বিচিত্র-বিলাস, রাই-উন্মাদিনী ও ভরত-মিলনের অনেক গানই আমার কণ্ঠস্থ হইয়াছিল; এখনও সেই গানগুলি আমার স্মৃতিপটে বিরাজমান আছে। প্রাচীনকালের ভক্তনিষ্ঠ সদাচার সম্পন্ন বৈষ্ণবগণের আচার, ব্যবহার, সৌজন্য ও বিনয়, আমি নিজেও তাঁহাতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এই গ্রন্থ-প্রণেতার পরমারাধ্য ঋষিকল্প নিত্যধামগত পিতৃদেব, কবিরাজ সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, বি-এ, এল-এম-এস, মহাশয় আমার পরম প্রীতিভাজন ছিলেন। সাক্ষাৎ হওয়ার মূহূর্ত্ত হইতেই উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার ভাব উপজাত হইয়াছিল। বয়সে তিনি আমার দীর্ঘকালের কনিষ্ঠ ছিলেন; কিন্তু তাঁহার স্থৈর্য্যে, গাম্ভীর্য্যে, মাধুর্য্যে বিদ্যানুরাগিতায়, ত্যাগ-স্বীকারে, সত্যনিষ্ঠায়, মিতভাষিতায়, সরলতায় ও সর্ব্বোপরি বৈষ্ণবতায় সততই তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা হইত। আমি তাঁহাকে ভালবাসিতাম—স্নেহ করিতাম; কিন্তু সে স্নেহ ঠিক কনিষ্ঠের প্রতি স্নেহের ন্যায় ছিল না; উহা প্রগাঢ় শ্রদ্ধা-বিমিশ্র স্নেহ ছিল। আমি অন্তরে অন্তরে শ্রদ্ধার ভাব লইয়া তাঁহাকে স্নেহ করিতাম। তাঁহার নিত্যধাম প্রবেশে আমি দীর্ঘকাল নিদারুণ শোকের জ্বালা অনুভব করিয়াছি।

এই গ্রন্থপ্রণেতা শ্রীমান্ কানুপ্রিয় গোস্বামী আবাল্য আমার পরিচিত। ইঁহার সত্যনিষ্ঠা, চারিত্রিক পবিত্রতা, ধর্ম্মানুরাগ, মর্য্যাদারক্ষণ-বুদ্ধি, বাল্যকালেই বিকশিত হইয়াছিল, আমি তাহাও লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলাম, কিন্তু ইনি এই সময়ের মধ্যে বৈষ্ণব সমাজে এত অধিক সমাদৃত, সম্মানিত, ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম-সাহিত্যে এত উৎকর্ষলাভ করিয়া জগৎপূজ্য স্বীয়বংশের সম্মান সংবর্দ্ধনে যে কৃতীত্ব লাভ করিবেন, তখন সে ধারণা করিতে পারি নাই। ইঁহার ইন্দ্রিয়সংযম, আত্মসংযম, আকুমার ব্রহ্মচর্য্য, ভোগলালসা ত্যাগ প্রভৃতি সদ্‌গুণ ইঁহার তরুণ বয়স হইতেই বিশেষরূপে বিকশিত হইয়াছিল। অতি ক্ষুদ্রতম অশ্বত্থবীজে যেমন উহার মহা-মহীরুহত্বনিষ্ঠ গুণ সকল লুক্কায়িত থাকে, কালে কালে ধরিত্রীবক্ষে উহা যেমন ক্রমবিকাশের নিয়মানুসারে সুবিকশিত ও সম্প্রসারিত হয়, সেইরূপ বাল্য হইতে ইঁহার অশেষ চারিত্রিক সদ্‌গুণের বিকাশ প্রত্যক্ষ করিতাম; কিন্তু এই সিদ্ধ-বংশের ধারা ইঁহাতে যে এত অধিক সম্প্রসারণ লাভ করিবে, তাহা তখন অনুমানেরও অগোচর ছিল। ইনি স্কুলে, কলেজে বা কোন চতুস্পাঠিতে শিক্ষালাভ করেন নাই, কিন্তু পূর্ব্বজন্মার্জিত প্রতিভা-প্রভাবে এবং শ্রীভগবৎ কৃপায় যেরূপ বিদ্যাবুদ্ধি ও জ্ঞান-ভক্তির উৎকর্ষ লাভ

করিয়াছেন, অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যেও সে সকল গুণ অতি বিরল। ইঁহার বাগ্মিতা-শক্তি-প্রবাহ গঙ্গা-যমুনা প্রবাহের ন্যায় অনর্গল অথচ শব্দশুদ্ধিপূর্ণ ও ভাবশুদ্ধিপূর্ণ। তাহাতে কোন প্রকার অসম্বন্ধ-ভাবিতা উদ্দেশ্যভ্রষ্টতা, শ্রুতিকর্কশতা বা নিষ্প্রয়োজনীয় বাগ্‌ব্যবহার প্রভৃতি আবর্জ্জনার লেশাভাসও পরিলক্ষিত হয় না। বক্তৃতার অনেক পরেও ভাবরসগ্রাহী সুশিক্ষিত শ্রোতৃবর্গের কর্ণে সেই বক্তৃতার ভাবপূর্ণ মধুর ঝঙ্কার বর্ত্তমান থাকে।

এখন ইঁহার লিপিকুশলতার কথা বলিতেছি। ইঁহার ভাষা প্রাঞ্জল অথচ সুমার্জ্জিত; প্রত্যেক কথাই চিন্তাশীলতার পরিচায়ক অথচ লিপিনৈপুণ্যে অল্পশিক্ষিতা মহিলাদের পক্ষেও সুখবোধ্য। প্রবন্ধগুলি দার্শনিকতায় পরিপূর্ণ অথচ কাব্যের সৌন্দর্য্যে-মাধুর্য্যে এবং ভাষার লালিত্যে উহা পাঠকমাত্রেরই চিত্তাকর্ষী হইয়াছে। এই গ্রন্থের আর এক বিশিষ্টতা এই যে, গ্রন্থকার যখন যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতেই ভাবের নূতনত্ব এবং চিন্তার মৌলিকত্ব অতীব পরিস্ফুটভাবে পরিলক্ষিত হয়। চিন্তাধারার এইরূপ নূতনত্ব ও মৌলিকত্ব অন্যত্র অতি বিরল। অতীব সূক্ষ্মতথ্য-সম্বলিত সিদ্ধান্তগুলিও ইঁহার ব্যাখ্যান-কৌশলে জনসাধারণের বোধগম্য হইয়াছে। উপমা, উদাহরণ প্রভৃতি এবং সুললিত সুমধুর ভাষার সৌন্দর্য্যে, প্রবন্ধগুলিকে পাঠকগণের চিত্তাকর্ষণ-যোগ্যতা-সাধনও ইঁহার এক প্রধান বিশিষ্টতা।"

বস্তুতঃ প্রভুপাদের সমগ্র জীবনই ছিল শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাবাদর্শে গড়া। শিশুকাল হ'তে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি কখনও কখনও তাঁর অমলিন ভগবৎ ভক্তি ও ভজনাদর্শ শ্রীশ্রীগৌররায়জীউর পদাশ্রয়রূপ আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি। অন্তরঙ্গ জনের প্রতি তাঁর উপদেশ ছিল,—"গৃহী সাজবে কিন্তু গৃহমেধী হবেনা আর সাধু হবে কিন্তু সাধু সাজবেনা।" —এই উপদেশের তাৎপর্য, বর্তমান কলির ঘোর ধর্মবিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে আপনভজন রক্ষার জন্য সাধক যদি গৃহস্থের ছদ্মে অবস্থান করেন তবে তাঁর ভজন রক্ষা সহজ হয়। আর সাধক যদি সোচ্চার বৈষ্ণবচিহ্নধারী বা সাধুবেশে অবস্থান করেন তবে বহুজনের দৃষ্টি আকর্ষণ হেতু যুগপ্রভাব জনিত অনর্থের আবর্তে পড়ে ভজন রক্ষা করা দুরূহ হয়ে পড়ে। প্রকৃতিতেও [Camouflage] 'ক্যামোফ্লাজিং' বলে একটা জিনিস আছে—যাতে প্রকৃতির দুর্বল প্রাণীদের শত্রুদের হাত থেকে আত্মরক্ষায় সাহায্য করে। কোন বস্তুর সঙ্গে গাত্রবর্ণের সাম্য যেমন সবুজ 'লাউডগা' সাপ, সুঁয়োপোকার ধূসর বর্ণ তাদের শত্রুর চোখ এড়িয়ে যেতে সাহায্য করে—ঠিক তেমনি এই উপদেশের উদ্দেশ। —এই আদর্শ তিনি তাঁর নিজের ক্ষেত্রেও আচরণ করে দেখিয়ে গেছেন। অতি অল্প বয়স থেকে তিনি সমগ্র পরিবারের দায়িত্বভার নিয়ে গৃহে থাকলেও নিজ প্রয়োজন ও ভজন পূজনের

ক্ষেত্রে নিরাসক্ত ত্যাগী সন্ন্যাসীর জীবন কাটিয়ে গেছেন। গৃহস্থ জীবনের কর্তব্য পালনের যে বিরল আদর্শ তিনি রেখে গেছেন তা বিস্ময়কর। আবার গৃহস্থ হয়েও তিনি ছিলেন সন্ন্যাসীরও আদর্শ। আমার পিতৃদেবের লেখনীতে তাঁর কর্তব্যনিষ্ঠা, কষ্ট সহিষ্ণুতা, স্নেহমমতা ও ত্যাগী জীবনের কিছুটা চিত্র পাওয়া যায়। তাঁর আকুমার ব্রহ্মচর্য পালন, পিতামাতার সেবা, ভ্রাতা-ভগিনীকে মানুষ করা এমন কি পিতামাতার সেবা তাঁদের সন্তান-সন্ততিদেরও পালন ও সুস্থজীবনপথে পরিচালন করা তাঁর বিরল কর্তব্য নিষ্ঠার পরিচায়ক।

পরপর তিনপুরুষ নিত্যসিদ্ধ গৌরপার্ষদবংশের ৫০০ বৎসরের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য এই বংশে আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল গঠনের সহায়ক হ'য়েছিল। শ্রীল সদাশিব কবিরাজ, শ্রীগৌরাঙ্গের জনক শ্রীল জগন্নাথ মিশ্রের পরম মিত্র ও প্রতিবেশী ছিলেন নবদ্বীপে। যদিও তাঁদের আদিনিবাস ছিল কাঁচড়া পাড়া ও পরে 'সুখচর' যা অধুনা গঙ্গা কবলিত। শ্রীল সদাশিব কবিরাজের পিতা, শ্রীল শম্বরারীর বংশধারা (মহাপ্রভুর প্রায় ২০০ বৎসর পূর্বের) বৈদ্যকুল পঞ্জিকামতে বাংলার প্রতাপশালী রাজা বল্লালসেনের মন্ত্রী হরিহরি খাঁর বংশ্য ছিলেন। রাজা ও অমাত্য স্বজাতীয়তা নিবন্ধন আত্মীয়সূত্রে বদ্ধ ছিলেন। শ্রীল সদাশিব কবিরাজের পুত্র শ্রীল পুরুষোত্তম দাস দ্বাদশ গোপালের অন্তর্ভূক্ত ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর নাম-প্রেমপ্রচার অভিযানের নিত্যসহচর হওয়ায় তাঁর কোন স্থায়ী নিবাসের কথা জানা যায় না।

তদীয় পুত্র শ্রীল ঠাকুর কানাইপ্রভুর মাত্র ১২ দিন বয়ঃক্রমকালে মাতৃবিয়োগ হওয়ায় তদবধি তিনি শ্রীমন্নিত্যানন্দ জায়া মাতা জাহ্নবাদেবীকর্তৃক পরিপালিত হন। শ্রীল ঠাকুর কানাইয়ের মাতার নামও জাহ্নবা এবং তিনি ও জাহ্নবামাতা সমনাম্নী ও একই গ্রামের অধিবাসী হওয়ায় সখীসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। জাহ্নবা মাতার অপ্রকটের পর শ্রীল ঠাকুর কানাই প্রভু, শ্রীবৃন্দাবন হ'তে চরণনূপুর বিচ্ছুরিত স্থান যশোহরের বোধখানা গ্রামে স্বনিবাস স্থাপন করেন। তাঁর পঞ্চপুত্র মধ্যে চতুর্থপুত্র শ্রীল বংশীবদনের বংশ্যধারায় প্রভুপাদের আবির্ভাব। যশোহরে পরিবারের সদস্য সংখ্যার বৃদ্ধিহেতু শ্রীঠাকুর কানাই বংশের কতিপয় সদস্য বোধখানা ত্যাগ করে নদীয়া জেলার ভাজনঘাট (মাজদীয়ার সন্নিকটে) গ্রামে ইছামতী নদীর তীরে নূতনভাবে বসতি স্থাপন করেন। উক্ত গোস্বামী পরিবারের লোকেরা শ্রীধাম নবদ্বীপ-বাসের উদ্দেশ্যে আগমন কালে কালীগঞ্জের জমিদার বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করলে উক্ত জমিদারের একান্ত সনির্বন্ধ অনুরোধে ভজনঘাট গ্রামে বসবাস শুরু করেন। উক্ত গ্রামের পূর্ব ও পশ্চিমপাড়ার বিস্তৃত ভূখণ্ড জমিদার পরিবার কর্তৃক নিষ্কর দেবত্র সম্পত্তি রূপে গোস্বামীদের প্রদত্ত হয়। এ'সকল বিষয় শ্রীমৎ বিহারীলাল

গোস্বামী প্রণীত 'কানুতত্ত্ব নির্ণয়' ও শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ রচিত 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে বিশিষ্ট তারকাত্রয়' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করা হ'য়েছে।

ভাজনঘাটে প্রায় ৩০০/৩৫০ বৎসর বসবাসকালে এই বংশ ধারা আরও বিস্তারলাভ করে এবং বর্তমানে বিপুল বংশধারার সন্তান সন্ততিগণ কলিকাতা ও বাংলার বহুস্থানে, বাংলার বাইরে বিভিন্ন শহরে এলাহাবাদ, দিল্লী, বেরিলি (রামপুর), মুম্বাই এমনকি সুদূর আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডে বসবাস করছেন। তবে দুঃখের বিষয় বর্তমান যুগপ্রভাবের অমোঘফলে বর্তমান পরিবার সকলের মধ্যে ভক্তিধারার সংরক্ষণ ও প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতার নিদর্শন তেমন দৃষ্ট হয়না। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলিত তনু গৌরসুন্দরের ও শ্রীমতী রাধারাণীর বিলাসমূর্তি শ্রীল গদাধর গোস্বামীপাদের কোন বংশ্য না থাকায়-শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সীশ্রেষ্ঠা চন্দ্রাবলী স্বরূপের গৌরপরিকর শ্রীল সদাশিব কবিরাজের বংশ, যাকে বর্তমানে পৃথিবীমধ্যে ভক্তিসূত্রে শ্রেষ্ঠতম বংশ্য বলে বিবেচনা করা যায়। কবিরাজের আপন বংশের অধঃস্তনদের এই সুমহান ঐতিহ্য ও ভক্তিসম্পদের অননুভবতা বড়ই পরিতাপের বিষয়।

যা'হোক প্রভুপাদ শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামীর পিতামহ শ্রীল মনোহর গোস্বামী, একজন দরিদ্র হ'লেও অত্যন্ত সরল প্রকৃতির সদাচারী, নির্লোভী ও পরমভক্ত লোক ছিলেন। দীক্ষা প্রাপ্ত শিষ্যভক্তগণের সামান্য গুরুপ্রণামীতে কোনক্রমে তাঁহার সংসারের ব্যয় নির্বাহ হতো। তথাপি এই ভক্ত পরিবারের ভগবদ্ কৃপায় জীবনযাত্রা অভাবের মধ্যেও সুশৃঙ্খল ও শান্তিপরায়ণ ছিল। ভজনক্রিয়াদিও যথাযথ স্বল্প উপকরণেই নির্বাহ করা হ'তো। দারিদ্রতা হেতু এই সময়েই ভাজনঘাটস্থ শ্রীল ঠাকুর কানাই বংশীয়গণ সেবিত তিন বিগ্রহের মধ্যে পশ্চিম পাড়ায় অবস্থিত শ্রীল রাধা মদনমোহন বিগ্রহের শরিকী সেবাভার আমাদের পরিবারের হাত থেকে চলে যায়। বর্তমানে উক্ত বিগ্রহ বাঁকুড়া জেলার বড়জোড়ার নিকটে দুর্গাপুর থেকে প্রায় ৭/৮ কি. মি. দূরে হাট আশুড়িয়া গ্রামে অবস্থান করছেন এবং উক্ত স্থানে অবস্থিত এই বংশেরই সেবায়িতের গৃহে সেবিত হ'চ্ছেন। বর্তমান সেবায়েতের নাম শ্রীগোপালকৃষ্ণ গোস্বামী। ইনি ডি ভি সি থার্মাল পাওয়ার স্টেশনের ডেপুটি চীফ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন—এবং তাঁরা পাঁচভাই-ই জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত।

এখন ভাজনঘাটে অপর দুই বিগ্রহ শ্রীশ্রীরাধা-রাধাবল্লভ (স্বপ্রকাশ বিগ্রহ) ও শ্রীশ্রীরাধাবৃন্দাবন চন্দ্রজী গ্রাম্যদেবতা রূপে গোস্বামী সন্তানগণ কর্তৃক সেবিত হচ্ছেন।

শ্রীমৎ মনোহর গোস্বামীর তিনপুত্র ও এককন্যা। বড় শ্রীমৎ নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ গোস্বামী, মেজ শ্রীল সুরেন্দ্র নাথ গোস্বামী, ছোট শ্রীরমণী মোহন গোস্বামী এবং কন্যার নাম শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী। কন্যার বিবাহ বলাগড়ের জমিদার শ্রীজগৎদুর্লভ

মজুমদারের পুত্র শ্রীহরিপদ মজুমদারের সঙ্গে হয়েছিল। কিন্তু অকাল বৈধব্যের ফলে তাঁকে ভাগ্যবিড়ম্বিত হ'তে হয়। পরে কলিকাতায় মধ্যম ভ্রাতা ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর নিকট পুত্রদ্বয় ও এক কন্যা সহ বাস করায় নিরাপত্তা ও শান্তিলাভ করেন। শ্রীমতী প্রভাবতীদেবীর পুত্রদ্বয়ের নাম শ্রীকালীসহায় মজুমদার ও শ্রীকালীজীবন মজুমদার ও স্বল্পায়ু কন্যার নাম ছিল কালীদাসী।

জ্যেষ্ঠ শ্রীমৎ নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামীর একমাত্র পুত্র শ্রীমৎ হরিজীবন গোস্বামী—ইনি কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চ পদাধিকারী ছিলেন (টেলিগ্রাফ্‌সে) পরে অবসর জীবনে ভক্তিজগতেও যথেষ্ঠ সুনাম অর্জন করেছিলেন। তাঁর একমাত্র ভগিনী শ্রীমতী পঙ্কজিনী দেবীর বিবাহ সিউড়ীতে হয়। তাঁর একমাত্র পুত্র শ্রীশ্যামলসুন্দর গুপ্ত এখনও বর্তমান। কনিষ্ঠ শ্রীমৎ রমণীমোহন গোস্বামী নিঃসন্তান ছিলেন।

ডাঃ সুরেন্দ্র নাথ গোস্বামীর চারপুত্র ও এককন্যা। জ্যেষ্ঠ প্রভুপাদ শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী মদীয় জ্যেষ্ঠতাত ও শ্রীগুরুদেব, মধ্যম শ্রীদাম মাত্র ২০ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। সেজ শ্রীল গোকুলানন্দ গোস্বামী প্রভুও আকুমার ব্রহ্মচারী। গৃহদেবতা শ্রীশ্রীগৌররায় জীউর সেবায় ও স্বীয় অগ্রজ ও শ্রীগুরুদেব শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী প্রভুর সেবায় সর্বতোভাবে উৎসর্গীকৃত প্রাণ। আমরা তাঁর অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলাম।

মদীয় পিতৃদেব শ্রীল রমানাথ গোস্বামী এঁদের অনুজ আমাদের পিতৃষ্বসা ললিতা দেবী সর্বকনিষ্ঠা। আমার মায়ের নাম শ্রীমতী সুকৃতিদেবী। আমরা তিনভাই—আমি বড়, মেজ শ্রীমান শ্যামরায় গোস্বামী কনিষ্ঠ শ্রীমান কিশোররায় গোস্বামী—আমাদের নবদ্বীপ শ্রীশ্রীগৌরকিশোর শান্তিকুঞ্জ আশ্রমে বর্তমানে শ্রীশ্রীগৌররায় জীউর সেবা-সংরত। আমাদের পিসতুতো ভগ্নীপতি শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গোস্বামী, ভাজনঘাটের শ্রীরাধাবল্লভের সেবাইত বংশ্য। বর্তমানে উত্তর প্রদেশের রামপুর প্রবাসী। সংক্ষেপে এই-ই প্রভুপাদের বংশপরিচয়। প্রভুপাদের জন্ম উত্তর কলিকাতায়, সিমলা কাঁসারী পাড়ায় মামার বাড়িতে। প্রায় প্রত্যেক মহাপুরুষেরই শিশুকাল থেকেই একটা বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। প্রভুপাদ পরম সুদর্শন, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, আয়তলোচন ও সুন্দর মুখশ্রীযুক্ত ছিলেন। অতি শিশুকাল থেকেই তাঁর চরিত্রে গাম্ভীর্য সদাচার বিষয়ে আগ্রহ ও ভক্তিসংস্কার লক্ষণ সকল প্রকট হ'তে দেখা যায়।

প্রভুপাদের চরিত্র সম্বন্ধে জানার আগে আমাদের গৃহে তাঁর প্রাণপ্রিয় বিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌররায়হরির শুভ আবির্ভাব বিষয়ে সর্বাগ্রে জানা প্রয়োজন। তাঁরই শ্রীমুখে শুনেছি যে আমার পিতামহ ডাঃ সুরেন্দ্র নাথ গোস্বামী কলিকাতা মেডিকেল কলেজের

স্বর্ণপদক প্রাপ্ত গ্র্যাজুয়েট ছিলেন। তৎকালে এম. বি. ডিগ্রী চালু হয়নি। কোর্সের নাম ছিল এল. এম. এস। প্রখ্যাত কিংবদন্তী চিকিৎসক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁর এম. বি. কোর্সে পাশে বাধা পড়ায় পুরাতন এই এল. এম. এস কোর্সে পাশ করে বিলাত যান।

পাশ করার পর সরকারী চাকরীর সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও তিনি গ্রামের মানুষের সেবার নিমিত্ত নিজের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সুযোগ ত্যাগ করে কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালীতে প্র্যাক্‌টিস আরম্ভ করেন। তাঁর কুমারখালীতে অবস্থানকালে নাটোরের রাণীর গুরুতর অসুস্থতায় চিকিৎসার ভার পড়ে পিতামহের উপর। তাঁর সুচিকিৎসায় রাণী সুস্থ হ'লে নাটোরের রাজা সুখী হ'য়ে তাঁকে জমি কিম্বা যা ইচ্ছা প্রয়োজনমত গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথ, তাঁর প্রাপ্য ফিসের অতিরিক্ত কোন কিছুই গ্রহণ করতে সম্মত হননা, বলেন---'আমি এমন অতিরিক্ত কিছুই করিনাই কেবল কর্তব্য ছাড়া। বারংবার অনুরোধে তিনি অবশেষে রাজাকে জানান যদি তিনি সুখী হ'য়ে একান্তই কিছু দিতে চান তবে তাঁর গৃহে রক্ষিত শ্রীশ্রীগৌর গোবিন্দের চিত্রপটের (তৈলচিত্র) একটি ফটোকপি দিলেই তিনি নিজেকে ধন্য ও অনুগৃহীত মনে করবেন। কারণ ঐ চিত্রের পরম চিত্তাকর্ষক শ্রীমূর্তির শোভা তাঁকে প্রথম দর্শনেই মোহিত করে তাঁর হৃদয়ে স্থায়ী আসন গ্রহণ করেছিলেন। বিস্মিত রাজা ভক্তহৃদয়ের আকুলতা দেখে খুব সন্তুষ্ট হন, এবং কলিকাতা থেকে জার্মান ফটোগ্রাফার নিয়ে গিয়ে উক্ত তৈলচিত্রের দুইটি সিপিয়া রঙের ফটো তুলে তার একটি পদ্মাকৃতি সুন্দর কাঠের ফ্রেমে বাঁধিয়ে উভয় চিত্রই সুরেন্দ্রনাথকে প্রদান করেন। সেটি ১৯০২ সালের কথা।

পিতামহ উক্ত চিত্রপট দমদমের বাগান বাড়িতে একটি হলঘরের দেয়ালে টাঙ্গিয়ে তাঁর নীচে ফার্ণ জাতীয় গাছে সজ্জিত করে রাখেন এবং অবসরে ঐ চিত্রপটের সামনে ধ্যানে বসে নিজ আরাধ্য দেবতার ভজন করতেন। গৃহে শ্রীবিগ্রহের আগমন মাত্রেই বালক কানুপ্রিয়ের, তখন তাঁর বয়ঃক্রম মাত্র ১১ বৎসর, চিত্তকেও অভিভূত করে।

১৯০২ সাল থেকেই শ্রীশ্রীগৌররায় জীউ আমাদের গৃহে অধিষ্ঠিত হ'লেও এবং তাঁর সম্মুখে প্রার্থনা, স্তব, কীর্তন ও মাঝে মধ্যে প্রসাদাদি নিবেদন চলতে থাকলেও, ১৯০৬ সাল থেকেই শ্রীবিগ্রহের নিয়মিত অর্চন শুরু হয়। এই সময়েই একদিন পিতামহ বিশেষ রকম অসুস্থ থাকায় ঠাকুরের অর্চন ও ভোগ নিবেদনের ভার পড়ে প্রভুপাদের উপর। কিন্তু সে'সময় পর্যন্ত প্রভুপাদের দীক্ষা না হওয়ায় ভোগ নিবেদন বিষয়ে তাঁর অসুবিধার কথা পিতাকে জানালে তাঁর পিতৃদেব পরমস্নেহে তাঁকে সেই

সময়েই দশাক্ষর গোপাল মন্ত্রে দীক্ষাদান করে অর্চনের অনুমতি দেন। শ্রীশ্রীগৌররায়জীউর সেবা-পূজাদির একাদিক্রমে শতবর্ষপূর্তি আসন্ন।

পিসিমার কাছে শুনেছি—পূর্বে শ্রীবিগ্রহের ভোগে ফলমূল মিষ্টান্নাদিই নিবেদিত হ'ত। পরে আমার অন্নপ্রাশণের দিন প্রসাদান্ন মুখে দেওয়ার প্রয়োজনে, সেইদিনই বিশেষ ভোগারাধনা করে প্রথম অন্নভোগ নিবেদিত হয় এবং তারপর থেকে যথাবিহিত ভোগরাগাদি সহ অষ্টকালীন পূজার্চনাদি চলতে থাকে। প্রভুপাদের সময় থেকেই অপতিতভাবে শ্রীশ্রীগৌররায়জীউর রাস, দোল ও জন্মাষ্টমী উৎসব ও পরে অন্নকূট উৎসব অনেক ভক্ত সমাগমের মধ্যে ভোগরাগাদি ও উচ্চকীর্তন সহ উদযাপিত হয়ে আসছে। বর্তমানে আমার অনুজ শ্রীমান কিশোররায় গোস্বামীর উপর সেবাভার ন্যস্ত আছে প্রভুপাদের অসুস্থতার সময় থেকেই। সেবাকার্যে তার পরম উৎসাহের ফলে এখন আমাদের নবদ্বীপ আশ্রমে ঠাকুরের রথ, ঝুলন, জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী, দোলপূর্ণিমা প্রভৃতি উৎসবও ভক্তগণের উপস্থিতিতে উৎসাহের সহিত উদ্‌যাপিত হয়।

প্রভুপাদের দীর্ঘবৎসরব্যাপী প্রেমসেবার ফলে শ্রীশ্রীগৌররায়জীউ আমাদের নিত্য অভিভাবকই শুধু নন তিনি যেন "কথা বলা ঠাকুর" (প্রভুপাদের নিজোক্তি)—এমনই জাগ্রত দেবতা। আমরা তাঁর কৃপাদৃষ্টির অনুপযুক্ত হ'লেও প্রভুপাদের সম্বন্ধগুণেই মনে হয় তৎকর্তৃক অহৈতুকীভাবেই সংরক্ষিত ও প্রতিপালিত হচ্ছি।

এই দীর্ঘ বৎসরে কতই না অলৌকিক অভূতপূর্ব ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। সাক্ষাৎ শ্রীবিগ্রহের সম্মুখেই তিনটি বজ্রপাতের ঘটনা মনে পড়ে। কলকাতায় আমাদের বাড়ী ছিল ৫/এ বারানসী ঘোষ লেন (সিমলা কাঁসারী পাড়া)। তিনতলা বাড়ী সিমলা ব্যায়ামসমিতি পার্কের পূর্বদিকে। পাশেই বিবেকানন্দ রোড। বাড়ির ছাদে চারতলায় ঠাকুর ঘর। আমি তখন স্কুলে পড়ি। একদিন বিকালে অল্প বৃষ্টির মধ্যেই প্রবলভাবে বাজ পড়ল ঠাকুর ঘরের ছাদের কোণে সেখান থেকে ছিটকে গিয়ে সামনের পার্কের দক্ষিণ পশ্চিম কোণের বিরাট বটগাছের কিয়দংশে আগুন ধরিয়ে দিয়ে দু'ফার্লং দূরের তারক প্রামাণিক রোডের পশ্চিমে শিবমন্দিরের চূড়ায় পড়াতে চূড়া ভেঙ্গে পড়ে গেল নীচে শিবলিঙ্গ বালি ইটের স্তূপে চাপা পড়ে গেল। তীব্রশব্দ ও আলোকে বাড়ির সবাই হকচকিত। বড়জ্যেঠামশাই ও আমরা সকলে ছুটলাম ঠাকুর ঘরে। ঘর খুলে দেখা গেল ঘরের উত্তর পশ্চিমের কোণের ছাদ ভেঙ্গে আকাশ দেখা যাচ্ছে। সমস্ত ঘর ইঁট ও বালিতে ভর্তি। সিড়ির মাথার 'এল' আকৃতির ঘরের ঐ কোণেই একটা দেড়ফুট উচু আখরোট কাঠের টেবিলে চিত্রপট বসানো। কেবল কয়েকটা ছোট ইটের টুকরা ছাড়া টেবিলের উপর আর কিছুই

পড়েনি—মাল্যভূষিত, পুষ্পশোভিত, শ্রীবিগ্রহের চিত্রপট যথাযথ দণ্ডায়মান।

দ্বিতীয়বার নবদ্বীপ আশ্রম এর দোতলার ঠাকুর ঘরের সামনে টিনের চালের বারান্দা। বারান্দার কোল ঘেযে দাঁড়িয়ে বিরাট এক নিমগাছ ও পাশে একটা বড় আমগাছ। নিমগাছের একটা বিশাল ডাল ঠাকুর ঘরের ছাদের উপর প্রলম্বিত। হনুমানের বড়ই উৎপাত নবদ্বীপে। তারা দল বেঁধে ঐ ডালের থেকে লাফায় ধুপধাপ শব্দ হয়। পূজার সময় তাদের উপদ্রবে পূজার বিঘ্ন ঘটে।

সেটা ষাটের দশকের গোড়ার দিকের ঘটনা সকাল ১১/১১-৩০ মিনিটে হঠাৎ কালবৈশাখীর ঝড় উঠল। প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল নিমগাছের উপর। ছাদের উপরকার অতবড় ডালটা ভেঙ্গে উড়ে গিয়ে আছড়ে পরল বাগানে। গাছটাকে ফেরে দিয়ে গেছে বাজ। হনুমানের উপদ্রব কমল। কয়েকদিনের মধ্যেই দেখা গেল অত বড় গাছটা পাতা ঝরে মারা গেছে। অথচ আশ্রমে প্রভুপাদ ও অন্যান্য যাঁরা ছিলেন তাঁদের কারোরই কোন ক্ষতি হয়নি, ক্ষতি হয়নি সিংহাসনারূঢ় শ্রীবিগ্রহেরও।

শ্রীশ্রীগৌররায়জীউর কৃপার এমন আরও অলৌকিক নিদর্শনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে কিম্বা বলা যায় কতইবা উল্লেখ করবো। সামান্য দু'চারটি বিষয় জানাচ্ছি। আবার সেই বজ্রপাতের ঘটনা—একটি ছেলের আশ্রমে প্রায়ই যাতায়াত ছিল। একবার তার ইলেকশান ডিউটি পড়ে বর্ধমানের এক গ্রামে। যাওয়ার আগে প্রভুর কাছ থেকে ঠাকুরের শ্রীচরণতুলসী নিয়ে গেল। ইলেকশনে পোলিং চলাকালীন প্রাকৃতিক দুর্যোগ শুরু হ'ল। প্রবলবেগে বাজ পড়ল প্রাথমিক স্কুলের টিনের চালা ঘরে। একটি টেবিলের সামনের বেঞ্চে ছেলেটি ও তার সঙ্গী বসে, ধারের দিকে প্রিজাইডিং অফিসার। অফিসারটি তড়িতাহত হ'য়ে তৎক্ষণাৎ মারা গেলেন। সঙ্গী ছেলেটি গুরুতর আহত হ'ল। আমাদের পরিচিত ছেলেটি কিন্তু অক্ষত থেকে গেল। প্রভুকে এই বিবরণ দেওয়ার সময় বিভ্রান্ত ও কৃতজ্ঞ ছেলেটি কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

সেটা ১৯৭২ সাল—বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময়। অধ্যাপক শ্রীরবীন্দ্রনাথ দাস মহাশয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হোস্টেলের বাসিন্দা। যুদ্ধের বিপদ বঝে তাঁর অগ্রজ বনগাঁ থেকে তাঁকে আনতে ঢাকা গিয়ে আটকে পড়েছেন। দুজনেই হোস্টেলে আছেন। রাত এগারোটার পর খানসেনারা হানা দিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে হোস্টেলের সব হিন্দু বাসিন্দাদের ধরে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ দিয়ে বয়ে চলা বুড়িগঙ্গার ধারে জলের দিকে পিঠ করে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে দিল। তারপর কোন কিছু বলা বা ভাবার আগেই মেশিনগানের গুলি চালিয়ে দিল পর পর।

দেহগুলি কতক মাটিতে কতক জলে লুটিয়ে পড়ল---তীব্র আর্তনাদ করে। কেউ ফিরেও দেখল না। রাত দুটো পেরিয়ে গেছে। নিঝুম নিস্তব্ধ জ্যোৎস্না আলোকিত রাত্রি। আমাদের অধ্যাপকের হঠাৎ জ্ঞান ফিরে এলো। অসহ্য যন্ত্রণা গুলি বিঁধে রক্তে ভেসে যাচ্ছে। পাশে দাদার নিথর দেহ, উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই—ফের জ্ঞান হারালেন। আরও কতক্ষণ পর কে জানে—মুখের উপর টর্চের আলো—অন্ধকারে কতকগুলি মানুষের মূর্তি চেনা যায়না। মনে হ'ল তুলে নিয়ে যাচ্ছে কোথাও, নৌকায় কি? ঠিক বুঝতে পারলেন না আবার অন্ধকারে তলিয়ে গেলেন—তিনদিন পর জ্ঞান ফিরে দেখলেন—বনগাঁ হাসপাতালের শয্যায় অপারেশন করে বুক থেকে গুলি বার করা হ'য়েছে। হার্টের পাশে কিছু উপরে গুলি বিঁধে ছিল। ৩ মাস হাসপাতালে থাকার পর ছাড়া পেয়ে ছিলেন। প্রভুর গ্রন্থ পড়ে প্রথমে তিনি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন—পরে মাঝে মধ্যে চলতো পত্রালাপ। বার বার নবদ্বীপে আসার অনুমতি চেয়েও পাননি। বাংলাদেশে গোলমাল শুরু হ'তেই তাঁর আত্মীয়রা দেশ ছেড়ে বনগাঁয় চলে আসেন—কিন্তু তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়েননি। প্রভু তাঁকেও চলে আসতে বলেন—একলা লোক অবিবাহিত। প্রভু ঠাকুরের শ্রীচরণতুলসী ধারণ করবার জন্য পাঠিয়ে দেন। শেষ সময়ে দাদার সঙ্গে ফেরার কথা এমন সময় এই ঘটনা। ঠাকুরের কৃপায় অলৌকিকভাবে বাঁচার পর আরও তিন বছর অপেক্ষার অন্তে প্রভুর অনুমতি পেয়ে নবদ্বীপে তাঁকে দর্শন করতে আসেন ১৯৭৫ সালে। প্রভু তখন শেষ শয্যায়—তাঁকে আশীর্বাদ করে নবজীবনে বৃন্দাবনে গিয়ে ভজন করতে বলেন—তিনি তাই করেছিলেন। এমনি কত ঘটনার কথাই বা বলা যায়। কত অসংখ্য জন কত অসংখ্যবার দুর্ঘটনা, আসন্ন মৃত্যু, বড় বড় বিপদ থেকে অলৌকিকভাবে রক্ষা পেয়েছেন। আমার নিজের ক্ষেত্রেই একবারের ঘটনা —প্রথম চাকরী নিয়ে বাইরে যাচ্ছি। বয়স ২২/২৩ বৎসর। বয়লার কনস্ট্রাকশনের কাজ। যাওয়ার আগে প্রভু আলাদা করে একটা মাদুলি দিয়ে দিলেন, ধারণ করার জন্য।

কানপুরে রিভার সাইড পাওয়ার স্টেশনে বয়লার তৈরী হচ্ছে। প্রায় ৯০-০" লেভেলে বয়লার ড্রাম বসবে। কালাম ও ক্রস গার্ডার লাগানো হ'য়েছে। সাইট ইনচার্জ বললেন, গোস্বামী ডায়াগোনালটা চেক্ করে দেবে? যদিও ওটা আমার কাজ নয় (আমি ইনস্ট্রুমেন্টের লোক) তবু গেলাম। বিরাট কোলস্ ক্রেনে একটা ঝোলায় চড়ে ক্রশ গার্ডারের উপর গিয়ে দাঁড়ালাম। ঝোলাটা সমেত ক্রেনের জিবটা ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। হঠাৎ সামনের খোলা বিশাল গঙ্গার দিকে থেকে ঝোড়ো হাওয়ার এক ঝটকায় মাথার হ্যাটটা উড়ে গেল। কিসের ইঙ্গিতে জানিনা আমি

হাত বাড়িয়ে সেটা ধরতে গিয়ে ভারসাম্য হারিয়ে ফেললাম। শূন্যে দু'বার হাত ঘুরিয়ে হঠাৎ ডানহাতে পেয়ে গেলাম ঝোলার লোহার দড়িটা। পাটা তখনও গার্ডারে লেগে। দড়িটা চেপে ধরে নীচে তাকালাম—মাথার উপর প্রখর সূর্য। ক্রেন ড্রাইভার ক্রেন থামিয়ে দিয়েছে, ইশারায় ধরে থাকতে বলে ধীরে ধীরে গার্ডারের কাছে ঝোলাটা নিয়ে এল। আমি কি করে যে নীচে নেবে এলাম তা একমাত্র শ্রীশ্রীগৌররায় জীউই জানেন। হাত পা তখনও কাঁপছে। নিচে তখন স্তব্ধ বিস্ময়ে সকলে হতবাক।

অলৌকিক ক্ষমতা প্রকাশ কোন মহাপুরুষের সব লক্ষণ নয়। প্রভু শ্রীশ্রীগৌররায়জীউর কৃপা ও করুণার কথাই বলতেন—নিজেও ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করতেন। সুতরাং সেই বিষয়ে অধিক আলোচনার কোন প্রয়োজন নেই। বহু ব্যক্তি ও ভক্তবৃন্দ যাঁরা প্রভুর সান্নিধ্যে এসেছেন এরূপ বহু ঘটনা তাঁদের অনুভবের বিষয়। পিতৃবিয়োগের সময় প্রভুর বয়স তখন ২৫/২৬ বৎসর। পিতার রোগ শয্যার পাশে তিনি ছিলেন সর্বক্ষণের সেবক। রাত্রে চেয়ারে বসে নিদ্রা যেতেন। পিতাকে ছেড়ে শয্যায় নয়। একদিন অসুস্থ সুরেন্দ্রনাথ খুবই উদ্বেগ ও অস্বস্তি ভোগ করছেন প্রভু বললেন, "বাবা, আপনার কি কষ্ট হচ্ছে? "পিতামহ বললেন 'কানাই, আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে—এই বিরাট সংসার কিভাবে চলবে? ছোটভাইরা মামার বাড়ি দুটো ভাতের জন্য পাখা টানবে? (প্রভুর দাদামশাই গুপ্তিপাড়ার শ্রীগুপীনাথ রায়, কলকাতার ধনী কবিরাজ, বিরাট ৩ মহলা বাড়ী।) প্রভু বললেন, "বাবা আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—আমি থাকতে ওরা কোনদিনও মামার বাড়ি রাত কাটাবেনা। পিতামহ বললেন, 'ভবিষ্যতে তোমার নিজের সংসার হ'লে ওদের কি গতি হবে? প্রভু তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন,—'বাবা কিছু ভাববেন না—আমি বিবাহ করব না।' রোগাক্রান্ত চোখদুটো তুলে পিতামহ একবার প্রভুর দিকে তাকালেন প্রভুর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। তারপর পরম নিশ্চিন্তে তিনি চোখ বুজে চুপ করে রইলেন। কোন কথা বললেন না। চোখের কোণ বেয়ে কেবল দুফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। তার একদিন পরই পিতামহ লোকান্তরিত হন—সেটা ১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারীর গোড়া।

প্রভুর সারা জীবনই এই আশ্বাস বাক্যের জ্বলন্ত সাক্ষ্য ছিল। ঠাকুরমা বাপের বাড়ির দুর্গোৎসব বা অন্যান্য উৎসবাদিতে যোগ দিয়েছেন কিন্তু রাত্রে আবার ফিরে এসেছেন—কোনদিন রাত কাটাননি। প্রভুও তাই- যদিও মামার বাড়ির সকলেই তাঁদের খুব ভালবাসতেন ও আদর যত্ন করতেন।

বর্তমান উত্তর কলকাতার ব্রাহ্মসমাজের পাশের গলিতে 'দেবালয়' নামে একটি প্রতিষ্ঠান ছিল। সেখানে নিয়মিত ধর্মালোচনা হ'ত। ঠাকুরদাদা ডায়াবেটিস রোগে

অল্প বয়সেই অসুস্থ হয়ে পড়ায় প্রভুকে সেখানে পাঠাতেন ধর্মসভায় বক্তৃতা দিতে —প্রভুর তখন খুব কম বয়স ২১/২২ হবে। তখন থেকেই সুবক্তা হিসাবে প্রভুর যথেষ্ট সুনাম হয়।

একবার বৃন্দাবনে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ বাঁদর ধরে চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণার জন্য চালান দিতে লাগলেন। স্থানীয় বাসিন্দারা এর বিরোধিতা করে। কলকাতায় এ্যালবার্ট হলে মহারাজা শ্রীল মণীন্দ্রনন্দী, শ্রীবিপিণ পাল প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে এক সভা হয় এর প্রতিবাদ কল্পে। সেই সভায় প্রভু সামান্য সময়ে বৈষ্ণব ধর্ম, বৃন্দাবনের চিন্ময়ত্ব, মানবিকতা, পশুরক্ষা বিষয়ে এত সুন্দর বক্তৃতা করেন যে সেই সভাতেই সর্বসম্মতিক্রমে তাঁকে ও বসুমতী সম্পাদক শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ বসুকে প্রতিনিধি নির্বাচন করে মথুরায় জেলাশাসকের কাছে প্রতিবাদ লিপি দেওয়ার জন্য পাঠানো হয়। পথে তাঁরা কয়েকদিনের জন্য দিল্লী কালীবাড়িতে অবস্থান করেন।

সেখানে কালীবাড়িস্থিত হরিসভায় প্রথমদিন তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম সম্বন্ধে বিশেষ করে শ্রীনামতত্ত্ব সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা করেন তাতে শ্রোতৃবৃন্দ এমনই মুগ্ধ হন যে তারপর দুদিন কালীবাড়ির পাশের ফাঁকা জমিতে প্যাণ্ডেল (শামিয়ানা) করে তাঁকে ধর্মালোচনা করতে হয়। প্রথমদিন ৫০০ শ্রোতা হয় ও দ্বিতীয় দিন প্রায় দেড় হাজার জন মহা উৎসাহে তাঁর পাঠ শোনেন ও ফেরার পথে পুনরায় তাঁকে দিল্লীতে কয়েকদিন অবস্থান করার জন্য অনুরোধ জানান। ১৯৬৯ সালে আমরা বাবার সঙ্গে সপরিবারে দিল্লী গিয়েছিলাম। সেখানে সন্ধ্যায় হরিসভা ঘরে আমরা কীর্তন করি। হরিসভার তৎকালীন সম্পাদক আমাদের সঙ্গে আলাপ করার সুযোগে বহু পূর্বের প্রভুর পাঠের স্মৃতিচারণ করেন। আমরা ফিরে এসে প্রভুকে সেকথা বললে তিনি একটু হেসে বললেন, "ঐ ভদ্রলোক এখনও বেঁচে আছেন আর এত সব কথা মনে রেখেছেন?" প্রভুর ভজন জীবন সম্পূর্ণ রূপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাবাদর্শে ও গোস্বামীগণের আনুগত্যে গড়া ছিল। অর্থ ও যশ এই দুটিকেই তিনি বরাবর সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেছেন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে তাঁর যেরূপ খ্যাতি ও সম্মান ছিল তাতে তিনি ইচ্ছা করলে লক্ষাধিক শিষ্য, প্রচুর সম্পদ ও বড় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারতেন অনায়াসেই। কিন্তু খ্যাতির মধ্য গগনেই তিনি সবকিছু ছেড়ে গূঢ় ও একান্ত বাসের উদ্দেশ্যে নবদ্বীপে শ্রীশ্রীগৌরকিশোর শান্তিকুঞ্জ আশ্রমে চলে আসেন, সেকথা পরে বলছি।

প্রভুর অনুরাগী ভক্তের সংখ্যা বহু হ'লেও তাঁর কৃপাপ্রাপ্ত দীক্ষিত শিষ্যের সংখ্যা খুবই স্বল্প সংখ্যক ছিল। প্রথমজীবনে তিনি (১) শ্রীমদন মোহন সাহা (২)

শ্রীমন্মথ মজুমদার (আমাদের স্বজাতি ও দূর সম্পর্কিত আত্মীয়) (৩) শ্রীজ্যোতির্ময় গোস্বামী (ঠাকুর কানাই বংশীয় ও শ্রীরাধাবল্লভের সেবায়েত বংশ্য) (৪) শ্রীগোকুলানন্দ গোস্বামী ও (৫) শ্রীরমানাম গোস্বামী (শেষোক্ত দুজন নিজ অনুজ) (৬) শ্রীশ্যামাপদ সিংহ (উকিল) মাত্র এই ছয়জনকে দীক্ষা দেন। মধ্যবর্তী সময়ে সস্ত্রীক শ্রীমণীন্দ্র নাথ গুহকে দীক্ষা দান করেন। পরবর্তী কালে তিনি দেবুকে, আমাকে, ও নেপুকে (প্রভুর ভ্রাতুষ্পুত্রত্রয়), শ্রীরমেন্দ্র নাথ দাস (তাঁর একান্ত সেবক) ও শ্রীফকিরমোহন দাস (পি. এইচ. ডি) কে দীক্ষা দেন এবং জীবনের অন্তিম সময়ে সস্ত্রীক শ্রীবিহারীলাল দাস (শ্রীবাস্তব) (উত্তর প্রদেশের জেলা জজ) ও ডাঃ মণীন্দ্র কুমার সিংহকে দীক্ষা দান করেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী পাদের 'অধিক শিষ্য না করিবে' এই সত্যকেই তাঁর আচরণে প্রতিফলিত হ'তে দেখি, এছাড়া তিনি স্বল্প সংখ্যক কয়েক জনকে মালিকার দীক্ষা দিয়েছিলেন। শ্রীশ্রীরাধাপ্রাণবল্লভজীউর সেবায়েত শ্রীশ্রীগৌরহরি গোস্বামী প্রভুর স্ত্রীকে ও আমার কন্যাকে শিশুকালে শ্রীমালিকা দেন। শ্রীহরেন্দ্র নাথ পোদ্দার ও শ্রীরবীন্দ্র নাথ পোদ্দার তাঁর মালার শিষ্য ছিলেন।

কলকাতায় অবস্থান কালে ৫০ এর দশকে প্রভুর তখন খুব নাম। অনঙ্গমোহন হরিসভার তিনি প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। চালতা বাগান বৈষ্ণব সম্মিলনীর সহসভাপতি। সার পেণ্টাইন লেন হরিসভা, বাগবাজার হরিসভা, বারানসী ঘোষ ষ্ট্রীটে কলিকাতা হরিভক্তি প্রদায়িণী সভা, বেহালা হরিসভা দাসনগর হরিসভা, হাওড়া বৈষ্ণব সমাজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের তিনি নিয়মিত বক্তা এবং এসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। বাবার লেখায় এ সকল বিষয়ে বলা হয়েছে।

কলিকাতায় আমাদের বারানসী ঘোষ লেনের বাসায় ও তার আগে সিমলা ষ্ট্রীটের ডিসপেনসারীতে নিয়মিত সন্ধ্যায় পাঁচটা থেকে সাতটা পর্যন্ত প্রচুর ভক্ত সমাগম হত ও প্রভু হরিকথা পরিবেশন করতেন। তৎকালীন প্রখ্যাত ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রভুপাদ অতুল কৃষ্ণ গোস্বামী, প্রভুপাদ প্রাণগোপাল গোস্বামী, প্রভুপাদ সত্যানন্দ গোস্বামী, অধ্যক্ষ শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী (সংস্কৃত কলেজ), দেশ সম্পাদক বঙ্কিম সেন, শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ বসু, কলিকাতার পুলিশ কমিশনার শ্রীহরিসাধন ঘোষ চৌধুরী, প্রভুপাদ প্রাণ কিশোর গোস্বামী ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার, জ্ঞানবাবু (প্রখ্যাত মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী শ্রীদ্বারিক ঘোষের জ্যেষ্টপুত্র) শ্যামাপদ বাবু রাধেশ্যাম বাবু (উকিল) ডাঃ নরেন্দ্র নাথ দত্ত, শ্রীগৌরমহারাজ, শ্রীনিবাস পোদ্দার (অনিন্দীলাল পোদ্দারের কাকা), মন্ত্রী শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ এবং 'বৃন্দাবন ও পুরীর ভক্ত বাবাজী, মহারাজগণ নিয়মিত সেখানে উপস্থিত থাকতেন। এঁদের সনির্বন্ধ অনুরোধে প্রভুকে প্রায়শঃই বাইরে

হরিসভায় বক্তৃতার জন্য যেতে হ'ত। শ্রীহরি সাধন ঘোষ চৌধুরী মহাশয়ের দেশ কাঁথিতে তিনি দু'তিন বৎসর গিয়েছিলেন। এ'ছাড়া ঢাকা, নবদ্বীপ, রংপুর, তমলুক প্রভৃতি স্থানেও যান।

ঢাকা হরিসভার একটি ঘটনা প্রসঙ্গক্রমে এখানে স্মরণীয়। সন্ধ্যায় অনেকলোকের মধ্যে হরিসভা চলাকালীন প্রভু ধর্মক্ষেত্রে কলির প্রভাবের কথা ব্যাখ্যা করছেন। হঠাৎ সামনের শ্রোতাদের মধ্য থেকে ভীষণ দর্শন প্রায় পাগলের মত চেহারা বিশিষ্ট রক্তচক্ষু এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে বলতে লাগল—কলি! কলি!! কলি!!! হ্যাঁঃ .....। বলে পেছন ফিরে শ্রোতাগণের ঘাড়ের উপর দিয়ে অতিদ্রুত বেগে ছুটে বেরিয়ে গেল। সকলে কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে রইলেন—পরে প্রভু স্বাভাবিকভাবেই তাঁর বক্তৃতা শেষ করেন। পরে বলেন—ঐ লোকটি সাক্ষাৎ কলিই ছিল—তার বিরুদ্ধ ভগবৎকথা সে সহ্য করতে পারেনি।

কাঁথি হরিসভার একটি ঘটনা প্রভুর চরিত্রের আরো একটি বৈশিষ্ট্য উন্মোচিত করে। কাঁথিতে প্রায় দশ দিন ধরে বাৎসরিক বৈষ্ণব সন্মিলনী হ'ত বহু ভক্ত সমাগমের মধ্যে। প্রধানত পুলিশ কমিশনার শ্রীহরিসাধন চৌধুরী মহাশয়ের উদ্যোগে, প্রভু গেছেন কয়েক দিনের জন্য। স্থানীয় বিদ্যালয়ের একটি ঘরে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হ'য়েছে। সন্ধ্যায় কয়েকজন সঙ্গীসহ সভায় উপস্থিত হয়ে দেখেন বিশাল শামিয়ানার নীচে প্রায় সহস্রাধিক লোক। সভার মাঝখানে বক্তার আসন। আসন ঘিরে মহিলা শ্রোতাদের সমাবেশ—তারপরে বৃত্তাকারে পুরুষরা বসেছেন। প্রভু সভার প্রান্তেই দাঁড়িয়ে গেলেন। বিস্মিত উদ্যোক্তাদের বললেন, 'আমি এ সভায় মহিলাদের মণ্ডলী মধ্যে বসে বক্তৃতা দিতে পারব না। আমায় ক্ষমা করবেন। উদ্যোক্তাদের একজন বললেন—কেন, গত কয়েকদিন ধরেইতো অনেক বক্তা এখানে সভা করেছেন। এমন কি গতকালও প্রাণ গোপাল গোস্বামী প্রভু এখানে বসেই পাঠ করেছেন।' প্রভু বিনীতভাবে উত্তর করলেন; 'তারা সমর্থ পুরুষ, প্রণম্য; তাঁরা যা পারেন আমি তা পারি না। আমার শ্রীগুরুদেবের নিষেধ—আমায় ক্ষমা করবেন। তখন উদ্যোক্তারা মহাব্যস্ত হ'য়ে ব্যাসাসন উঠিয়ে আনতে গেলেন। প্রভু অনেক কষ্টে তাঁদের শান্ত করে বললেন 'আপনারা একটুও ব্যস্ত হ'বেন না। আমি এখানে দাঁড়িয়েই যা বলার বলব।' তখনকার দিনে মাইকের তেমন প্রচলন ছিল না। প্রভু খালি গলায় প্রায় ১ দেড় ঘণ্টা বক্তৃতা দিলেন পিন পতন নীরবতার মধ্যে। কোথাও এতটুকু শব্দ হয়নি।

পরদিন বেলার গাড়ীতে প্রভু সঙ্গীদের নিয়ে কলকাতায় ফিরবেন। খুব সকালে দু'জন বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। বেশী বয়স্ক যিনি অত্যন্ত

সুপুরুষ এবং আইনজীবি, তিনি বললেন, 'কানুপ্রিয়, আমি তোমার পিতৃবন্ধু, কাল তুমি যে আদর্শ দেখিয়েছ তা অনেকেরই শিক্ষণীয়। আমি তোমায় আশীর্বাদ করছি, তুমি দীর্ঘজীবি হয়ে, পিতার মুখোজ্জ্বল কর এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদর্শ ও প্রেম ধর্ম প্রচারে একজন শীর্ষস্থানীয় আচার্য হও।" দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন কাঁথি মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, তিনিও বললেন, "আপনার ভজন ও আচার নিষ্ঠা, বিনয়, দৈন্য ও দৃঢ়তা অতি উচ্চস্তরের। মহাপ্রভুর মনোভীষ্ট প্রতিস্থাপনে আপনিই সক্ষম। আপনার কথা আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মনে থাকবে।"

সেবার কোরবা থেকে ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসেছি। ১৯৫৯ সালের পূজার সময়। চম্পা থেকে রাত্রের ট্রেন ধরে ভোরে কলকাতা পৌঁছলাম। সেদিনই ১-৩০ টার ট্রেন ধরে বিকালে নবদ্বীপ। আশ্রমে যখন পৌঁছলাম বড় জ্যেঠামহাশয় তখন ঠাকুর তুলতে যাচ্ছেন। প্রাথমিক কুশল বিনিময়ের পর বললেন, 'বোস্ ঠাকুর তুলে আসি।' তিনি তখন একাই থাকেন আশ্রমে। ছোট জ্যেঠামহাশয় দেশের বাড়ীতে। নীচে কেবল রমেন ভক্ত। দোতলায় জ্যেঠা মহাশয়ের ঘরের সামনে তুলসী তলায় বসে থাকতে থাকতে ক্লান্তিতে কখন বারান্দার মেঝেতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি। হঠাৎ তন্দ্রা ভাঙ্গতে চেয়ে দেখি জ্যোৎস্নার আলোয় বারান্দা ভরে আছে। বড় জ্যেঠামহাশয় আমার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। একটু হেসে বললেন—তুই এখন অনেক বড় হয়ে গেছিস। খালি মেঝেতে শুয়ে আছিস্"—নিজের বিছানাটা দেখিয়ে বললেন—"ভাবলাম কোলে করে ওখানে নিয়ে শুইয়ে দিই—তাকি এখন আমি পারি!" আমি ধড়মড় করে উঠে বসলাম বললেন, —'তুমি বাড়ীর বড় ছেলে—তোমার ছেলেবেলায় একমাত্র তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বড় একটা কোলে নিইনি। আমার অস্বস্তি হ'তো। তোমাকে একবার করে কোলে নিতাম আর একটা স্যুটকেসের উপর মাঝে মাঝে তোমায় শুইয়ে দিতাম। তখন তুমি ঐ স্যুটকেসের চেয়ে কিছু বড় ছিলে লম্বায়।" আমি তাঁর অপার স্নেহের কথা মনে করে চুপ করে বসে রইলাম, চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল—অবাধ আনন্দাশ্রু।

পরের দিন সকালে প্রভু ভোগ রাঁধছেন, আমি সামনে বসে আছি নানা কথা হচ্ছে মাঝে মাঝে। হঠাৎ বললেন 'কি খাবি বল।' আমি বললাম, 'ঠাকুরের প্রসাদ যা দেবেন, তাই ভাল।' বললেন—'এতদূর থেকে এলি, ভাল কিছু ক'রে দিতে পারছিনা, খারাপ লাগছে। গোকুল থাক্‌লে যা হয় একটা ব্যবস্থা হতো।' আমি বললাম, 'বড় জ্যেঠামহাশয়, আপনি কিছু, ভাববেন না—আমার সবই ভাল লাগবে।' একটু পরে বললেন, 'যা দেখি নীচে বাগানে অনেক বড় বড় বেলফুল ফুটে আছে,

কয়েকটি নিয়ে আয়। আমি নিয়ে এলাম। প্রভু বেসন দিয়ে ফুলের বড়া তৈরী করলেন। পরে প্রসাদ পাওয়ার সময় আমরা সামনাসামনি বসেছি'—প্রভু বললেন, 'তুই এত কম খাস্। শরীর থাকবে কি করে? অত পরিশ্রমের কাজ। ফুলের বড়া কেমন লাগছে? আগে খেয়েছিস্ কখনও?' আমি বললাম, 'কি সুন্দর সুবাস! আগে কখনও খাইনি।' প্রভু হাসতে লাগলেন, —আরও কয়েকটা বড়া নিজের থেকে আমাকে দিলেন। মনে হ'ল একেবারে মাতৃস্নেহে ভরপুর।

তারপরের বছর, ১৯৬০ সাল। তখন আমি মহারাষ্ট্রের পারাসে। আকোলা ও ভুসোয়ালের কাছে। মহারাষ্ট্র স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের কাজ হচ্ছে। রোজ সকালে যখন সাইটে (site) যাই দেখি আপ ক্যালকাটা মেল হাওড়ার দিকে চলেছে। সন্ধ্যায় যখন ফিরি ডাউন মেল বম্বের দিকে যাচ্ছে। বড় জ্যেঠামহাশয়কে লিখলাম—মনে হয় সকালের ঐ গাড়ী চড়ে শীঘ্র আপনার কাছে চ'লে যাই।' — প্রভু প্রবোধ দিয়ে বুঝিয়ে মন স্থির করে কাজ করতে চিঠি লিখলেন। সঙ্গে সঙ্গে এও লিখলেন কলকাতায় বা ধারে কাছে কোথাও ষ্টেশন সার্ভিস জোগাড় করতে। পরে বাবার কাছে শুনেছি আমার চিঠি পেয়ে বড় জ্যেঠামহাশয়ের ক'দিন খুবই মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সর্বত্যাগী, অনাসক্ত, সাধুচিত্তও কতইনা স্পর্শকাতর কোমল।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে—আমি তখন খুবই ছোট ৩/ সাড়ে তিন বছর বয়স। ১৯৪০ সালে মা আমাকে নিয়ে রাঁচীতে তাঁর মামার কাছে বেড়াতে গিয়েছিলেন। এইখানে আমার মধ্যম ভ্রাতার জন্ম হয়। খুবই দুরন্ত ছিলাম, তাই প্রায়ই ঘরে বন্ধ করে রাখতে হ'তো। বাড়ীর সামনেই রাঁচীর বিখ্যাত লাল বাস সার্ভিসের গ্যারেজ। জানালার একটা শিক আল্‌গা ছিল। সেটা খুলে বেড়িয়ে গিয়ে একটা বাসে উঠতে যাচ্ছি। বাসটা আর পনের মিনিট পরেই চাঁইবাসার দিকে চ'লে যাবে। হঠাৎ বাড়ীর পরিচিত একজন দেখতে পেয়ে ধরে নিয়ে এল বাড়ীতে। মা, মাসিমা, দিদিমারা কাজে ব্যস্ত। ভদ্রলোক পৌঁছে দিলে সকলে সন্ত্রস্তভাবে জিজ্ঞেস ক'রলো, 'হ্যাঁরে কোথায় যাচ্ছিলি?' বগলের পুটলীটা কেড়ে নিলে দেখা গেল তাতে আমারই কয়েকটা জামাপ্যাণ্ট। —আমি হাত ছাড়িয়ে দৌড়ে যেতে ব্যস্ত—'বাস চলে যাবে, আমিতো বড়জ্যেঠামহাশয়ের কাছে যাচ্ছি।' মা চিঠিতে বাবাকে জানালেন কলকাতায়। শুনে প্রভুর চোখে জল—অনেক খেলনা পত্র দিয়ে বাবাকে ক'দিন পরে পাঠালেন রাঁচীতে আমাদের নিয়ে আসতে।

পারাস থেকে কানপুর যাওয়ার আগে নবদ্বীপে এলাম বড়জ্যেঠামহাশয়ের কাছে। সেবারও প্রভু একা। রান্নার আগে জিজ্ঞেস করলেন,—'কিরে, কি খাবি? আলুর

দাম বেশী, বললাম, ঠাকুরকে ঝিঙে পোস্ত করে দিন।' প্রভু রমেনদাকে ডেকে পোস্ত কিনে আনতে বললেন। পরে ঘরে যা ঝিঙে ছিল, আলুর সঙ্গে রমেনদা তা আমানি করতে লাগলে আমি বললাম, 'বড়জ্যেঠামহাশয়, এখানে প্রসাদ পেতে তো আমরা তিনজন তরকারী বেশী হ'য়ে যাবে না?' তিনি বললেন 'ঝিঙে কমে কতটুকুই বা দাঁড়াবে—খেতে ভাল লাগে, না হয় একটু বেশী করেই খাবি।' পরে রান্নার সময় যখন কড়া উপচে পড়তে লাগল তখন হেসে বললেন, নারে একটু বেশীই হয়ে গেল। তা খানিকটা রেখে দেব'খন, রাত্রে পাস্।' আমি হাসতে লাগলাম—'এমনিতেও যা হয়েছে আজ অন্নের বদলে ঝিঙেপোস্তই খেয়ে পেট ভরে যাবে।'

এমনি সরল স্নেহময় হৃদয় ছিল জ্যেঠামহাশয়ের। আমার থেকেও কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ আমার এক সহকর্মী প্রভুর গ্রন্থ পড়ে তাঁর খুব অনুরাগী ছিলেন। তার পূজার সিংহাসনে তিনি প্রভুর চিত্রপট রেখেছিলেন নবদ্বীপেও তিনি প্রভুকে দর্শন করতে দু'বার আসেন আমাকে বলেন, 'আমার দীর্ঘ জীবনে আজ কালকার এই আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপর সংসারে যেখানে একান্নবর্তী পরিবার সব ভেঙ্গে পড়ছে, সেখানে বাড়ির প্রতিটি জন কি করে এমন একজনের আনুগত্য শ্রদ্ধায়, ভালবাসায়, ভক্তিতে এতখানি স্বীকার করে নেয়, ভাবতে অবাক লাগছে। প্রভুর কাছে এখানেও কারোরই কোন স্বতন্ত্রতা দেখিনা—সকলকেই তিনি ভালবাসেন, স্নেহ করেন, কর্তব্য নির্দেশ করেন, পরিচালন করেন অথচ সংসার তো তাঁর নয়। আমার এই অভিজ্ঞতা আমি কখনও ভুলব না।'

বাবার পিসুতুতো দাদা অকালে মারা গেলে তাঁর ছেলেরা অর্থাৎ আমাদের চার দাদা ও দুই দিদি জ্যেঠিমাকে নিয়ে, আমাদের সঙ্গেই প্রথমে মধুরায় লেনের বাড়ীতে পরে বারাণসী ঘোষ লেনের বাড়িতে একত্রে থাকতেন। আমার দাদাদের নাম যথাক্রমে শ্রীকমলেন্দু মজুমদার, শ্রীবিমলেন্দু মজুমদার, শ্রীনির্মলেন্দু মজুমদার ও শ্রীচপলেন্দু মজুমদার। দিদিরা পুষ্প ও প্রতিমা (ভুজাদিদি) উভয়েই বিবাহিতা। বর্তমানে এঁদের মধ্যে কেবল শ্রী নির্মলেন্দু মজুমদার ও ভুজাদিদি বেঁচে আছেন, সল্টলেকের নিজস্ব বাড়িতে থাকেন। (মেজদার পুত্র পার্থ মজুমদার আমেরিকা প্রবাসী। তার মা ও ভগ্নী, ভগ্নীপতি সল্টলেকে থাকে।

আমরা একত্রে থাকলেও পৃথক্ অন্নের ব্যবস্থা ছিল। দাদারা জীবনে প্রতিষ্ঠিত ও যথেষ্ঠ বয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও যতদিন বড় জ্যেঠামহাশয় কলকাতায় বাসায় ছিলেন তাঁকেই অভিভাবক জ্ঞান করতেন।

প্রভু ছিলেন শান্ত কিন্তু পরম গম্ভীর। তাঁর চোখের জ্যোতির্ময় দিব্যদৃষ্টির প্রতি

চোখ রেখে বড় একটা কেউ কথা বলতে পারত না। আপনিই শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে যেত। সেই দৃষ্টির সঙ্গে একটি করুণার ছায়াও বর্তমান ছিল। যে কারণে যারাই তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন, সকলেই তাঁর হৃদয়ের প্রীতির স্পর্শ অনুভব করতেন। আচার্যস্থানীয় বলে প্রভুর একটা স্বতন্ত্রতা থাকলেও—ছোটদের তিনি ভাল বাসতেন। খুব একটা মাখামাখি না করলেও তাদের সৎশিক্ষার প্রতি তাঁর যথেষ্ট দৃষ্টি ছিল। সময় পেলেই তাদের নানাভাবে উপদেশ দিতেন। আমাদের ছেলেবেলায় মাঝে মাঝেই তিনি আমাকে বা দেবুকে সঙ্গে নিয়ে সামনের সিমলা ব্যায়াম সমিতির পার্কে বা হেদোয় সন্ধ্যাবেলায় কিছুক্ষণের জন্য বেড়াতে যেতেন, তখন নানাভাবে বড় হ'বার, মহৎ জীবনের কথা, কর্তব্য নিষ্ঠার কথা সহজভাবে বুঝিয়ে বলতেন।

সপ্তাহের প্রতিদিনই সন্ধ্যায় কলিকাতায় প্রভু, ভক্ত সমক্ষে হরিকথা পরিবেশন করতেন। তাছাড়াও প্রতি বুধবার বিকালে ঠাকুর ঘর থেকে নেবে এলে বাড়ীর সব ছেলেরা এমনকি আশ পাশের বাড়ীরও কয়েকজন একত্রিত হ'য়ে তাঁর ঘরে উপস্থিত হতাম। তিনি আমাদের উপনিষদ পুরাণ, শ্রীচরিতামৃত, ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে সুন্দর সুন্দর গল্প বলতেন ও সঙ্গে সঙ্গে উপদেশ ও শিক্ষাও দিতেন। এ'সময় প্রায়ই তাঁর ভাবাবেগে চোখে জল এসে যেত দেখতাম।

একবার মনে আছে পাড়ার এক দাদার উদ্যোগে আমরা ছোটরা রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসব পালন করি। যদিও প্রভু সাধারণের সঙ্গে একেবারেই মেলামেশা করতেন না, তবু সত্যদা (শ্রীসত্যচক্রবর্তী) তাঁর সঙ্গে দেখা করে এই অনুষ্ঠানে তাঁকে সভাপতিত্ব করতে অনুরোধ করেন। আমরা সবাই খুব শঙ্কিত ছিলাম—কিন্তু প্রভু কিছুক্ষণ সময় দিতে রাজী হ'লেন। সন্ধ্যায় আমাদের বাড়িতেই বাইরের ঘরে অনুষ্ঠানটি হ'লো। ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান হলেও অনেক লোকের সমাগম হ'য়েছিল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দিয়ে গান আবৃত্তি, পাঠ করান হল। আমি 'ভারতবর্ষ' ও 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ' কবিতা দুটি কবির স্মরণে আবৃত্তি ক'রেছিলাম—ও সকলের খুব প্রশংসা পেয়েছিলাম।

শেষে সভাপতির ভাষণে বড় জ্যেঠামহাশয় খুব সুন্দরভাবে রবীন্দ্রনাথের একটা ব্রহ্মসঙ্গীত আবৃত্তির পর ভগবৎ বিশ্বাস সম্বন্ধে—একটি খুব সুন্দর গল্প বলেন। গল্পটি সংক্ষেপে বলি বিদেশীগল্প—"কোন এক জেল পালানো কয়েদী পুলিশের তাড়া খেয়ে প্রাণভয়ে ছুটতে ছুটতে শহরের প্রান্তে এক পাদ্রীর বাড়িতে ঢুকে পড়ে। বিস্মৃত পাদ্রীর কাছে সে প্রাণরক্ষার জন্য আশ্রয় চায়। পাদ্রী করুণার বশবর্তী হয়ে তাকে বাড়ির ভেতর লুকিয়ে রাখলেন। খানিক পরে পুলিশ এলো। পাদ্রীকে নিশ্চিন্তে উপাসনারত দেখে তারা কোন কিছু সন্দেহ না করে চলে গেল।

পাদ্রীসাহেব কয়েদীটিকে ক্ষুধার্ত ও পরিশ্রান্ত দেখে তাকে খাবার ও বিশ্রাম করার জায়গা দিলেন। পরিস্কার বস্ত্র দিলেন পরার জন্য। কিন্তু নানা দুশ্চিন্তায় ও উদ্বেগে সে ঘুমাতে পারলনা। নিজ দুষ্কর্ম, দুর্ভোগ ও লাঞ্ছনার কথা ভেবে সমাজের বিরুদ্ধে ভগবানের বিরুদ্ধে মনের আক্রোশে ফুলতে লাগল। পৃথিবীতে এত লোক থাকতে তার ভাগ্যেই বা এত দুঃখ ও বিড়ম্বনা কেন? তারপর একসময় সে একটি খড়ি দিয়ে ঘরের দেওয়ালে বড় বড় করে লিখল—'GOD IS NO WHERE'.ঘরের একপাশে একটি টেবিলের উপর যীশুখ্রীষ্টের পবিত্র ক্রুশচিহ্ন—তার সামনে অতি সুদৃশ্য দুটি রৌপ্যাধারে মোমবাতি জ্বলছে। ঘরে কয়েদী একা—শেষরাত্রে সে আর ঠিক থাকতে পারলনা। ঐ রূপোর বাতিদান দুটো তুলে নিয়ে নিঃশব্দে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। ভোরে যাজক লোকটির খোঁজে এসে তাকে দেখতে পেলেন না, বাতিদান দুটোও নেই—সামনের দেওয়ালে নাস্তিক হৃদয়ের আহত অভিব্যক্তি লেখা—'GOD IS NO WHERE'.যাজক নতমুখে যীশুর কাছে সেই পাপী ও তাপীত হৃদয়ের জন্য প্রার্থনা জানালেন।

কিছুপরে দুটি পুলিশম্যান সেই কয়েদীকে বমাল এনে হাজির করল পাদ্রীর কাছে—বলল, 'এই চোর আপনার বাতিদান চুরি করে পালাচ্ছিল। পাদ্রী সেই লোকটির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, —"অফিসার, ওকে ছেড়ে দিন —ও নির্দোষ—আমিই ওকে বাতিদান দুটো উপহার দিয়েছি।" —অফিসাররা ওর সঠিক পরিচয় না জানায়—তাকে পাদ্রীর কাছে রেখে চলে গেল।

এবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল লোকটি। নতজানু হয়ে অনুতপ্ত হৃদয়ে সেই বাতিদান দুটো ফেরৎ দিয়ে যাজকের পা জড়িয়ে ধরে ক্ষমা চাইতে ও কাঁদতে লাগল ফুপিয়ে ফুপিয়ে। তার হৃদয়ের সকল পাপ সকল অপরাধ অনুতাপের অশ্রু হয়ে বেরিয়ে এল। যাজক তাকে ধীরে ধীরে ধরে ওঠালেন—এ সময় অশ্রুসজল নয়নে কয়েদীটি দেখল কোন যাদুবলে তারই লেখা দেওয়ালের লিখনের একটি অক্ষর 'W' সরে এসে 'NO' এর কাছে দাঁড়িয়েছে—পরম বিস্ময়ে সে পড়ল, লেখা আছে—"GOD IS NOW HERE" পরিবর্তিত মানুষটিকে এবার পাদ্রী বুকে টেনে নিলেন—পরে বিদায়কালে সেই বাতিদান দুটি তার পরিবর্তনের সাক্ষ্য স্বরূপ পরম কৃপায় দান করে দিলেন—বললেন ভগবানের বিশ্বাস রাখ, আমি নই তিনিই প্রকৃত রক্ষাকর্তা।" —বড় জ্যেঠামহাশয় এত সুন্দরভাবে, এত দরদের সঙ্গে আস্তে আস্তে গল্পটা বললেন উপস্থিত ছোট বড় সকলেই একেবারে অভিভূত হয়ে গেল। সকলেই তাঁর প্রসঙ্গে অসীম শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করতে লাগলেন।

আর একবার কলকাতার গিরীশপার্কে মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের উদ্যোগে

সপ্তাহব্যাপী যজ্ঞের আয়োজন হ'ল। বহু সম্প্রদায় তাতে যোগ দিয়েছিলেন। শ্রীনিবাস পোদ্দার খুব বিনয় করে প্রভুকে উদ্বোধনের দিন ভাষণ দিতে নিয়ে গেলেন—প্রচুর বক্তা থাকায় সময়ও স্বল্প। কিন্তু ঐ অল্প সময়ের মধ্যেই প্রভু একেবারে নূতন জিনিস বললেন। তিনি বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদির দিক দিয়েই গেলেন না। তিনি বললেন—ধর্মই ধারণরজ্জু—"ধর্ম্ম ধরাধারকঃ।" বর্তমান যুগ কলিযুগ। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরাদি ভেদে যুগধর্মের পার্থক্য থাকে, এটা শাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত। কলিযুগের যুগধর্ম নামসঙ্কীর্তন। এই নাম যজ্ঞও বটে—'কলিযুগে নামযজ্ঞ সর্বযজ্ঞসার।' —শ্রীনামের সংযোগে সকল কিছুর শুচিতা রক্ষিত হয়; অপূর্ণ বস্তুর পূর্ণতা সাধিত হয়। অতএব সকলেরই যা কিছু করণীয় সবই শ্রীনামের আনুগত্যেই করতে হবে। অতএব আপনারা সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ যা সেই উচ্চ হরিসঙ্কীর্তন করুন।"—সভাস্থল হরিধ্বনিতে পূর্ণ হয়ে গেল।

আমাদের নবদ্বীপ আশ্রমে এক উৎসবাদি ছাড়া অন্য সময়ে প্রভুর সময়ে মহিলাদের প্রবেশাধিকার ছিলনা। রাত্রিবাসের তো কথাই নেই। আমার মা, পিসিমা বা নিকট আত্মীয়ারা শ্রীশ্রীগৌররায় জীউকে দর্শনে এলে বা প্রভুর সঙ্গে দেখা করতে এলে সকালের গাড়িতে এসে বিকেলের গাড়িতে ফেরত যেতেন। নয়তো কোন অন্তরঙ্গ শিষ্যভক্তের বাড়ি যেমন ঢাকা ষ্টোর্সের মালিকের বাড়ি রাত কাটিয়ে পরের দিন কলকাতায় ফিরে যেতেন। কারণ তখনও বাবা আশ্রমের পাশে বাড়ীটি করেননি।

আমি একবার প্রভুকে প্রশ্ন করেছিলাম—'বড় জ্যেঠামহাশয়, আপনি তো বাবাকে, পিসিমাকে ছেলেবেলা থেকে মানুষ করেছেন। পিসিমার, বাবার এমনকি পিসতুতো দিদির বিবাহও আপনি দিয়েছেন। মাতো আপনার পুত্রবধূর মত—তবে তাঁরা আশ্রমে এসে থাকলে দোষ কি? প্রভু বললেন, " এতে কোন দোষ নেই ঠিকই তবে তোমাদের দূরদৃষ্টির অভাব। তোমার মা পিসিমারা এখানে থাকলে সকলের নজরে পড়বে। স্নানাদি করে কাপড় শুকোতে দিলে পথচারীরা দেখে ভাববে নবদ্বীপের আর সব আশ্রমে যা এখানেও তাই—এই আশ্রমের যে শুচিতা সুনাম আছে তা রক্ষা করার জন্য আমাকে অনেকদূর পর্যন্ত ভাবতে হয়।" মহিলারা প্রভুকে স্পর্শ করে প্রণাম করতে পারতেন না। দূর থেকে প্রণাম করতে হ'ত। প্রভুর অপ্রকটের পর আমরা সেই নিয়ম রাখতে পারিনি—প্রায় ৪/৫ ঘণ্টা ব্যাপী স্রোতের মত লোক নরনারী নির্বিশেষে প্রভুকে শেষ প্রণাম করতে লাগলেন। কোনও বাধাই মানলেন না।

কলকাতার মত নবদ্বীপ আশ্রমেও বহু সজ্জন ব্যক্তির প্রভুর সঙ্গে সংযোগ হয়।

ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার, পাটনা ইউনিভার্সিটির ইতিহাস বিভাগের প্রধান, শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, শ্রীগৌরাঙ্গ দাস বাবাজী, বৃন্দাবনের প্রখ্যাত বন মহারাজ, প্রভুপাদ জীতেন্দ্রনাথ গোস্বামী, বালক সাধুজী, শচীনন্দন দাস বাবাজী, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাস বাবাজী, শ্রীকানাইলাল অধিকারী (পণ্ডিতজী) যদুনন্দন সহায়জী, বিহারীলাল দাস জী (জজসাহেব) বংশীদাস বাবাজী মহারাজ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

নবদ্বীপের বহু স্মৃতি, প্রভুর অপার স্নেহ ভজনাদর্শ প্রভৃতি অনেক কিছু কথা মনে ভির করে আসে। প্রভু শয্যাত্যাগ করতেন রাত্র তিনটে। সাড়ে তিনটেয়। তখন শ্রীমালিকা নিয়ে ঘরের মধ্যে স্মরণে থাকতেন। তারপর সাড়ে পাঁচটা ৬ টায় বেরিয়ে মুখ প্রক্ষালনাদি করে ঠাকুর ঘরে যেতেন। ঠাকুর জাগরণ, বাল্যভোগাদি দিয়ে বেরতেন প্রায় ৭ টায়। তখন আশ্রমের সমাগত ভক্তমণ্ডলী তাঁকে প্রণাম করতেন। পুনরায় ৮ টা পর্যন্ত স্মরণ ও জপ। ৮ টা-১০ টা স্নান ও শৌচাদি কাজে যেত। ১০ টায় ঘরে বসে কিছুক্ষণ ভাগবত পাঠ। তারপর ১১ টায় পূজার জন্য ঠাকুর ঘর। পূজা শেষে প্রসাদ পেতে ৩ টে, ১ ঘণ্টা বিশ্রামের অন্তে ৪/৪-৩০ মিঃ বৈকালী দেওয়ার জন্য ঠাকুরঘরে। ৫.৩০/৬ নাগাদ সন্ধ্যায় সামনের বারান্দায় ১৫/২০ মিনিট পায়চারী। তারপর গ্রন্থ লিখতে বসতেন, দোতলার বারান্দায় তুলসী বৃক্ষের কাছে তখন সান্ধ্য কীর্তন চলতো। কীর্তন ও ভক্ত সমাগম শেষ হতে রাত্র ৯/৯.৩০ মিঃ। তারপর পুনরায় ঠাকুরের পূজা আরত্রিক। রাত্রে প্রসাদ পেতে ১০/১০-৩০ মিঃ। তারপর কিছু সময় চিঠিপত্রের উত্তর নিজে হাতে লিখতেন। বিশ্রাম নেওয়ার অবকাশ হতো রাত্র ১১.৩০ মিনিটের পর। এইভাবে ঘড়ির কাঁটার সঙ্গেই বাঁধা ছিল তাঁর সাধন ভজনের জীবন—যা স্মরণ করিয়ে দেয় —ষড় গোস্বামীর আদর্শ—"সাড়ে সার্দ্ধ প্রহর যায় স্মরণে কীর্তনে। চারি দণ্ড আহার নিদ্রা তভো নহে কোন দিনে।" প্রভু তাঁর ভজন জীবনে খুব একটা কৃচ্ছসাধনের দিকে যাননি। নিরন্তর নামানুগত্যে সহজ স্বাভাবিক ভজন প্রণালীর মধ্য দিয়ে সংসারে থেকেও সত্যকার অনাসক্তির মধ্যে দিয়ে তাঁর সুদীর্ঘ জীবন পরিচালিত হয়েছে—কোথাও, কখনও তার এতটুকুও বিচ্যুতি ঘটেনি।

"একটি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় যা আমরা প্রায় তিনশতাধিক বৎসরের মধ্যেও জানতে পারিনি, সেই শ্রীকানুঠাকুরের পরবর্তী জীবনের অদ্ভুত ঘটনা সকল ও তাঁর সমাধি মন্দিরের বিষয় এতদিন পরে। (১৩২৬ সালে) যে আমরা বিদিত হয়েছি, এটা তাঁর বংশধর ও পরিবারগণের প্রতি শ্রীকানুঠাকুরের অদ্ভুত কৃপার প্রকাশ বলে বুঝতে হবে। গড়বেতা নিবাসী শ্রীমদনমোহন শুকুল নামে জনৈক শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্ত যুবকের নিকট দৈব্যক্রমে শ্রীকানুঠাকুর বংশোদ্ভব শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী, এই

সুসংবাদ সর্ব প্রথম অবগত হইয়া—অপর অনেককে বিদিত করেন। ২৮ শে, পৌষ, ১৩২৬ সালে এই অসম্ভাবিত ঘটনা ঘটে। এর কয়েক মাস পরে শ্রীঠাকুর কানাই বংশোদ্ভব শ্রীনির্মলচন্দ্র গোস্বামী শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী, শ্রীযুক্ত হরিজীবন গোস্বামী সর্বপ্রথমে এই তিনজন গড়বেতা গ্রামে উপস্থিত হইয়া এই পবিত্র সমাধি পরিদর্শন করার সৌভাগ্য লাভ করেন ও এ সম্বন্ধে সমুদয়তত্ত্ব অবগত হয়ে প্রত্যাবর্তন করেন।" "কানুতত্ত্ব নির্ণয়"। বর্তমান লেখকের দুবার এই সমাধি মন্দির দর্শনের সৌভাগ্য হয়েছে। বর্তমান সেবাইত বংশের কৃতি সন্তান শ্রীমান প্রকাশ গোস্বামী ও তার অপর দুই ভ্রাতা এই সমাজ রক্ষা করছেন।

এই অভাবিত বিষয়টি সম্বন্ধে সবিস্তৃত আলোচনা বিহারী লাল গোস্বামী প্রণীত শ্রীকানুতত্ত্ব নির্ণয় গ্রন্থে ও শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয়কৃত শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে বিশিষ্ট তারকাত্রয় গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

পুরী ও বারিপদাবাসী শ্রীল দীনবন্ধু মিশ্রজী (OES) সপরিবারে প্রভুর খুব অনুগত ছিলেন। তাঁরও প্রভুর সঙ্গে পরিচিতি গ্রন্থের মাধ্যমে—পরে অবশ্য তিনি অনেকবার আমাদের আশ্রমে এসে ছিলেন। মিশ্রজী গৌড়ীয় মঠের শ্রীল ভক্তিরত্ন স্বামীর কাছে দীক্ষিত হলেও প্রভুকে গুরুর ন্যায় ভক্তিকরতেন। তাঁর একপুত্র শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস প্রখ্যাতচক্ষু চিকিৎসক, আমার মেজ জ্যেঠামহাশয়ের আশ্রিত। আমরা ২/১ বার তাঁর পুরীর গৌড় বাটসাহীর বাড়িতে গিয়েছি। শ্রীযুক্ত গদাধর মিশ্রজী ইনি দীনবন্ধু মিশ্রজীর জামাতা, জগৎবল্লভ পুর র‍্যাভেনশা কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। ইংরাজীর অধ্যাপক ইনিও প্রভুর খুব অনুগত ও তাঁর গ্রন্থের গুণগ্রাহী ছিলেন।

ভুবনেশ্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের এককালীন উপাচার্য শ্রীযুক্তরমানাথ মহান্তী সপরিবারে প্রভুপাদের অনুগত ভক্ত। তিনি আমাদের নবদ্বীপ আশ্রমে কয়েকবার আগমন করেন। ডঃ ফকির মোহন দাস। এনার ছাত্র ও আশ্রিত ছিলেন। শ্রীখণ্ডের শ্রীল রাখালানন্দ ঠাকুর, শ্রীল গৌরগুণানন্দ ঠাকুর শ্রীরামচন্দ্রমল্লিক প্রভৃতিরা প্রভুপাদের গুণগ্রাহী বান্ধব স্থানীয় ছিলেন।

শ্রীধাম বৃন্দাবন ভ্রমণকালে প্রভুপাদ শ্রীল অদ্বৈত পণ্ডিত বাবা, প্রভুপাদ বিনোদবিহারী গোস্বামী, শ্রীমৎ গৌরাঙ্গদাস বাবাজী, শ্রীমৎ হরিদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীমৎ প্রেমানন্দ দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীমৎ প্রিয়াচরণ দাস বাবাজী মহারাজ শ্রীমৎ মনোহর দাস বাবাজী মহারাজ ও শ্রীমৎ দীনশরন দাস বাবাজী মহারাজ প্রভৃতি ভজনীয়া ভক্তবৃন্দের সান্নিধ্যে আসেন এবং তন্মুহূর্ত থেকে এঁদের সকলের সঙ্গেই তাঁর আন্তরিক প্রীতি সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

নবদ্বীপের প্রভুপাদ শ্রীমৎ প্রাণগোপাল গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীমৎ চৈতন্যচন্দ্র গোস্বামী, প্রভুপাদ শ্রীমৎ দীনেশচন্দ্র গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীমৎ জীতেন্দ্রনাথ গোস্বামী, শ্রীমৎ আনন্দ গোপাল গোস্বামী ও প্রভুপাদ শ্রীমৎ প্রাণকিশোর গোস্বামী (কলিকাতা) প্রভুপাদ শ্রীমৎ রাধাবিনোদ গোস্বামী প্রভৃতি প্রভু বংশীয় গোস্বামী পাদের সহিত প্রভুর অন্তরঙ্গতা সখ্য ও প্রীতি সম্বন্ধ ও শ্রদ্ধা শেষ দিন পর্যন্ত অটুট ছিল। বহু সভায় তাঁহারা একত্রে ভগবৎ প্রসঙ্গ আলোচনা করেন।

ডাঃ যুগল চন্দ্র সাহা, ডাঃ সুশীলকুমার ভৌমিক ও ডাঃ মণীন্দ্রকুমার সিংহ, শুধু আমাদের পারিবারিক চিকিৎসকরূপেই প্রভুপাদের অপ্রকটের পূর্বে তাঁহার সকল চিকিৎসাভার ইঁহারা একত্রে সমাধান করেন। পূর্বে ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য সঙ্গেও প্রভুর বিশেষ অন্তরঙ্গতা ছিল এবং নবদ্বীপ বাস কালে ইহারা সময়ে সময়ে তাঁহার চিকিৎসাদি ব্যবস্থা করে নিজেদের ভাগ্যবান বলে মনে করতেন।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্রদে ও তাঁর ভাইপো ও ভাগ্নে শ্রীযুগল কিশোর দে ও শ্রীরাধারমণ দাস প্রভুর একান্ত সেবক ও অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন। শ্রীগোপাল ও শ্রীরমেন্দ্রনাথ দাস ও শ্রীসন্তোষ কুমার সাহা একান্ত সেবক ছিলেন।

তিনজন সুকণ্ঠ গায়ক তাঁদের শ্রীনামসংকীর্তনের দ্বারা প্রভুপাদের পরম সন্তোষ বিধান করে তাঁর প্রীতিভাজন হয়েছিলেন। তাঁরা হ'লেন নামানন্দী শ্রীনদীয়াভূষণ রায়, সুধাকণ্ঠ শ্রী সুধীরকুমার দাশগুপ্ত এবং মধুকণ্ঠ শ্রীবিনয় রাহা। গোপাল দাও দীর্ঘদিন ধরে আশ্রয়ের সান্ধ্যকীর্তন পরিচালনা করেন। তারপর থেকে আমার অনুজ শ্রীমান কিশোর রায় গোস্বামী সেই কার্য সম্পাদন করছে।

প্রভুপাদের সংস্পর্শে এসে নবদ্বীপের বনেদী ও প্রাচীন পরিবারভুক্ত শ্রীদুলাল চন্দ্র মুখার্জী ভক্তি পথে অনেকের দৃষ্টান্ত স্বরূপ হয়েছিলেন। সর্বদা তাঁর মুখে জয় গৌর নাম উচ্চারিত হত। নবদ্বীপের পথচারী, ট্রেনের নিত্যযাত্রী থেকে তাঁর পোর্ট কমিশনারের অফিসের সহকর্মীবৃন্দ তাঁকে জয়গৌর নামেই সম্বোধন করতেন। এমনকি টেলিফোনেও এই নামে সম্ভাষণ শুরু হত।

প্রভুপাদের কলিকাতাস্থ অসংখ্য ভক্ত, অনুরাগী, বন্ধু স্নেহ ও প্রীত্যাস্পদ এবং পারমার্থিক সুহৃদগণের সকলের সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে বলা সম্ভব নহে। একারণে তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ কয়েকজনের নামমাত্র নিম্নে উল্লেখ করে এবিষয়ের উপসংহার টানছি।

প্রভুপাদ শ্রীঅতুল কৃষ্ণ গোস্বামী, পণ্ডিত শ্রীরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ, পণ্ডিত শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্তপ্রমথনাথ তর্কভূষণ (কাশীবিশ্ববিদ্যালয়), প্রভুপাদ শ্রীল সত্যানন্দ গোস্বামী, প্রভুপাদ শ্রীল

রাধাবিনোদ গোস্বামী, পণ্ডিত শ্রীগৌরসুন্দর ভাগবত দর্শনাচার্য, স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী; রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর; রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়, বিচারপতি পাটনা হাইকোর্ট, মাননীয় বিচারপতি শ্রীদ্বারিকানাথ মিত্র। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, রায়বাহাদুর শ্রীগোবিনলাল বন্দোপাধ্যায়; রায় বাহাদুর শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, রায় বাহাদুর শ্রীমন্মথ নাথ সেন; শ্রীযুক্ত গোপাল ভট্টাচার্য ডি, এম.। মহামহোপাধ্যায় শ্রীগননাথ সেন, পণ্ডিত শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত পি. আর. এস, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু এম. এ. বি. এল। ডঃ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র বিমল চৌধুরী, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ ভারতাচার্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্তকালীপদ তর্কাচার্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অশোকনাথ শাস্ত্রী; রায়বাহাদুর ডাঃ নগেন্দ্রনাথ দত্ত; শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ; শ্রীযুক্ত বঙ্কীমচন্দ্র সেন; শ্রীমৎ রামেশ্বর ভাদুরী; মহামহোপাধ্যায় ডঃ শ্রীল গোপীনাথ কবিরাজ, মাননীয় মন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ; শ্রীল রামদাস বাবাজী মহারাজ; শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ তর্কতীর্থ; শ্রীনিরঞ্জন রায় ডাঃ ইন্দুভূষণ বসু (শ্রীমৎ যতীন্দ্ররামানুজাচার্য); ডাঃ যুগলচন্দ্র সাহা মহারাজ মণীন্দ্র নন্দী; শ্রীঅহীন্দ্রনারায়ণ শর্মা চৌধুরী, ডাঃ মণীন্দ্রকুমার সিংহ; শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ গুহ; শ্রীযুক্ত মণিকান্ত গুহ।

গৌড়ীয় মঠ তখন অবিভক্ত। শ্রীমৎ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহারাজ দেহ রেখেছেন। পুরীদাসজী তখন মহান্ত। বৃন্দাবনে তাঁর প্রিয় অন্তরঙ্গ সঙ্গী গুরুভ্রাতা শ্রীলসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদজীকে দু'খানি গ্রন্থ পড়তে দিলেন—'জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম' ও 'শ্রীশ্রীনামচিন্তামণি'। গ্রন্থকারের নামের পাতাটা কেটে রাখা হয়েছে। তখন মঠে বাইরের কারোর গ্রন্থ পড়া নিষিদ্ধ ছিল। বললেন—'আস্বাদন করুন। —এক পরম সাধক মহাত্মার অনুভবের লেখা।" সুন্দরানন্দজীকে তখন গৌড়ীয় মঠের 'ব্যাসদেব' বলা হ'ত। গ্রন্থ ও প্রচার বিভাগের তিনি সর্বেসর্বা।

গ্রন্থপাঠে তাঁর মধ্যে এক বিপুল পরিবর্তন এলো। পুরীদাসজীর নিকট গ্রন্থকারের পরিচয় জেনে নবদ্বীপে পত্র দিলেন, সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করে—শর্ত তাঁদের সাক্ষাৎকার গোপন রাখতে হবে। প্রভু বিনয় সহকারে লিখলেন—তাঁর এখানে বৈষ্ণবদের অবারিত দ্বার, কারোর ক্ষেত্রেই নিষেধ নাই—তবু তার মধ্যেও যেসময়ে ভক্তরা সচরাচর আসেননা সেই সকালের দিকে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা হবে।

শ্রীমণীন্দ্রনাথ গুহ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্তবিভাগের পদস্থ বাস্তুকার। তিনি পূর্বে প্রায় চারবৎসর গৌড়ীয় মঠে ছিলেন তবু দীক্ষা পাননি। শেষে পুরীদাসজীর একান্ত প্রিয়পাত্র হওয়ায় পুরীদাসজী তাঁকে বললেন, 'আপনি এতদিন মঠের সঙ্গে যুক্ত আছেন তাই আপনার যাতে মঙ্গল হয়—তাই করা আমার কর্তব্য। আমি

নিজে আর কাউকে দীক্ষা দেব না—আপনি শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামীর সঙ্গে যোগাযোগ করুন এবং সর্বতোভাবে তাঁর পদাশ্রিত হওয়ার জন্য চেষ্টা করুন যদি সফল হন তবে আপনার মহাসৌভাগ্য জানবেন—কারণ গোস্বামীপ্রভু সচরাচর কাউকে দীক্ষা দেন না। ১৯৫২ সালে মণিবাবু প্রভুর সঙ্গে প্রথমে পত্র মারফৎ সংযোগ স্থাপন করেন। শ্রীশ্রীগৌররায়জীউর কৃপায় তিনি সস্ত্রীক প্রথমে শ্রীনামদীক্ষা পান—ও তারও প্রায় আট বৎসর পর প্রভুপাদের আশ্রিত হন।

এদিকে সুন্দরানন্দজী কলকাতায় এসে মণিবাবুর মারফৎ প্রভুর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন—তাঁদের সাক্ষাৎকারের দিন ঠিক হয়। প্রভু তাঁর অভ্যর্থনার জন্য এ'দিন মাল্যচন্দনাদির ব্যবস্থা রাখেন। কিন্তু কি কারণে জানিনা এ'দিন মণিবাবুর গাড়িতে আসতে আসতে তিনি মাঝপথ থেকে বাড়ি ফিরে যান। পরে প্রভু জানতে পারেন—সন্দুরানন্দজী পারিবারিক সূত্রে তাঁর বাল্যকালেই ঠাকুর কানাইবংশীয় শ্রীমৎনিত্যগোপাল গোস্বামী প্রভুপাদের আশ্রিত ছিলেন। পরে উচ্চশিক্ষার জন্য যখন কলকাতায় আসেন তখন শ্রীমৎ সিদ্ধান্ত সরস্বতী মহারাজের নিকট দীক্ষা সংস্কার করেন ও গৌড়ীয় মঠে যোগ দেন। সেক্ষেত্রে প্রভুপাদ গুরুবংশীয় হওয়ায় গুরুবর্গের ক্ষেত্রে শিষ্যোপমকে মাল্যচন্দনাদির দ্বারা অভ্যর্থনা সমীচীন হয় না বলে ঠাকুরের ইচ্ছায় ঐ যাত্রা স্থগিত হয়।

এর কয়েকমাস পরে শ্রীলসুন্দরানন্দজী—পণ্ডিত শ্রীকানাইলাল অধিকারী—পঞ্চতীর্থ—যিনি পরে নবদ্বীপ সরকারী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন—তাঁকে সঙ্গে করে গোপনে নবদ্বীপ আসেন ও এখানে বাড়িভাড়া করে প্রায় দেড়মাস অবস্থান করেন। প্রথম সাক্ষাৎকারে প্রভু তাঁকে যথোচিত মর্যাদা সহকারে অভ্যর্থনা করেন এবং পরবর্তী দেড় মাস প্রত্যহ সকাল ১০ টা থেকে ১১ টা পর্যন্ত একঘণ্টাকাল উভয়ের মধ্যে শ্রীহরিকথা প্রসঙ্গ বিশেষ করে শ্রীনামতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হয়। যার ফলে উভয়ের মধ্যে এক অটুট শ্রদ্ধা, প্রীতি ও অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে ওঠে—যা তাঁদের জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। এই সংযোগের ফলে শ্রীল সুন্দরানন্দজী, যিনি একজন পরম পণ্ডিত, মহাভাগবত ও বিরল প্রতিভাবান ব্যক্তি ছিলেন, তাঁর জীবনের ও ভজন পথের আমূল পরিবর্তন হয়। এর পরে গৌড়ীয় মঠের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে পড়ে, তিনি নিজ শ্রীগুরুদেব অপ্রকট হওয়ায় তদীয় পুত্রবধূ গোস্বামী মাতার নিকট পুনরায় দীক্ষা সংস্কার করেন। জয়ন্তী গ্রন্থাবলী নামে নূতনভাবে বৈষ্ণবদর্শন ও সিদ্ধান্ত গ্রন্থ সকল রচনা করতে থাকেন। তদীয় 'শ্রীশ্রীনামচিন্তামণি কিরণ কণিকা' নামক অনবদ্য গ্রন্থটি প্রভুপাদের নামচিন্তামণির অর্থপুস্তক স্বরূপ—'পরতত্ত্ব সীমা' নামক বিপুল সন্দর্ভটি প্রভুরই

পরতত্ত্বসীমা নামক প্রবন্ধকে উপজীব্য করে লেখা এবং শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে বিশিষ্ট তারকাত্রয় ও বৈষ্ণববন্দনাকার দৈবকীনন্দনদাস প্রভৃতি গ্রন্থ আত্মশুদ্ধির নিমিত্তই রচিত। ঐ সকল গ্রন্থরচনার ক্ষেত্রে সুন্দরানন্দজী সর্বতোভাবে প্রভুর সঙ্গে সংযোগ রেখে চলেছিলেন বিভিন্ন সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাঁদের মধ্যে পত্রালাপ হ'ত। এ'সকল বিষয়ে প্রভুর নির্দেশ তাঁর পক্ষে প্রভূত সহায়ক হয়েছিল। আমরা তাঁকে দেওয়া প্রভুর অজস্র পত্রের মধ্যে একটি মাত্র পত্র দৃষ্টান্ত স্বরূপ এ'গ্রন্থে সন্নিবদ্ধ করছি। গৌড়ীয় দর্শন ও তত্ত্ব—বিষয়ে উভয়ের মধ্যে যে উপলব্ধি ও মত বিনিময় হত—তা' থেকে বলা যায় বিরল কয়েকজনের মধ্যে সুন্দরানন্দজীই প্রভুকে ঠিক চিনেছিলেন এবং তিনিও সুন্দরানন্দজীর অগাধ পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে সম্যক অবহিত ছিলেন। ১৯৬২ সালে এই মহাভাগবত পণ্ডিত ব্যক্তি লোকান্তরিত হন।

নবদ্বীপে আসার পর প্রথম কয়েক বৎসর প্রভু মধ্যে মধ্যে বিশেষ করে বন্যার আশঙ্কায় ও শীতের সময় কলকাতায় গিয়ে থাকতেন। সেই সময় সুন্দরানন্দজী প্রায়ই দুপুরে তিনটা সাড়ে তিনটা নাগাদ আমাদের বাড়ি আসতেন। প্রভু বিশ্রামে আছেন জেনে সদর দরজার সিঁড়িতে বসে অপেক্ষা করতেন—প্রভুকে ডাকতে বারণ করতেন। আমি অনেক অনুরোধ করে তাঁকে ভিতরের প্যাসেজের রোয়াকে বসাতাম। একবার প্রভু জানতে পেরে আমাকে তিরস্কারের সুরে বললেন—কেন আমায় খবর দাওনি বৈষ্ণবের যথার্থ সম্মান না করলে অপরাধ হয়। এরপর থেকে উনি এলেই আমায় খবর দেবে বা সোজা আমার ঘরে নিয়ে আসবে। পরে তিনি তাড়াতাড়ি বাইরে এসে তাঁকে অভ্যর্থনা করে হাত ধরে পরমযত্নে নিজের ঘরে নিয়ে যেতেন। সুন্দরানন্দজীও প্রভুর বিশ্রামের ব্যাঘাত হওয়ায় ও তাঁর ব্যস্ততা দেখে একান্ত সঙ্কুচিত হতেন কিন্তু তাঁর পক্ষে বাসে ভীড়ের জন্য প্রয়োজনে ঐ সময় আসা ছাড়া গত্যন্তরও ছিলনা। প্রভু কিন্তু এতে কিছু মনে করতেন না। পরস্পর পরস্পরকে শ্রদ্ধাও করতেন খুব। গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ থাকাকালীন পুরীদাসজী তখন এলাহাবাদে বাস করছেন। গ্রন্থের মাধ্যমেই প্রভুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। গৌড়ীয় মঠ থেকে প্রকাশিত পুরীদাসজীর সম্পাদিত সকল গ্রন্থ ও শ্রীল সুন্দরানন্দজী রচিত গ্রন্থগুলি তাঁরা উভয়ে নিজের হাতে লিখে প্রভুকে উপহার স্বরূপ প্রদান করতেন। প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি চেয়ে তিনি বার বার চিঠি দিতে থাকেন। পরে সাক্ষাতের দিন ঠিক হলে তিনি অত্যন্ত গোপনে এলাহাবাদ থেকে মাত্র ২/৩ জন অন্তরঙ্গ সেবককে নিয়ে কলিকাতার শিয়ালদহ অঞ্চলের ইন্ডিয়া হোটেলে উঠেন। পরের দিন সাক্ষাৎকারের কথা। কিন্তু সেইদিন রাত্রেই কোন এক অজ্ঞাত কারণে তিনি হোটেল ও কোলকাতা ছেড়ে চলে যান। দীর্ঘদিন পরে

অনেক অনুসন্ধানের পর শ্রীধামবৃন্দবনের ৮৪ ক্রোশের মধ্যে পাঞ্জাব সীমান্তের কাছে কোন এক অখ্যাত গ্রামে একটি মাত্র সেবকের সঙ্গে তাঁকে ভজন নিরত দেখা যায়। অপ্রকটের কয়েকদিন মাত্র আগে অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে বৃন্দাবনে আনা হয়। পণ্ডিত শ্রীকানাইলাল অধিকারী প্রথম জীবনে গৌড়ীয় মঠে শ্রীল সুন্দরানন্দজীর সহকারী হিসাবে ছিলেন। পরে তাঁর অপ্রকটের পর তাঁরই নির্দেশে তিনি প্রথম শ্রীধাম নবদ্বীপে এসে প্রভুর নিকট আশ্রমবাটীতে অবস্থান করেন। পরে অন্যত্র যান। তিনি প্রভুর অত্যন্ত স্নেহভাজন ব্যক্তি। তাঁর সঙ্গে প্রভুর গ্রন্থাদি বিষয়ে ভগবৎ বিষয়ের সিদ্ধান্ত সমূহের আলোচনা হ'ত। পরবর্তী কালে তিনি প্রভুর অনেক গ্রন্থের প্রকাশনা কালে প্রুফ সংশোধন ও তত্ত্বাবধান কাজের সহায়ক হন। আজও তিনি আমাদের একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী, পারমার্থিক সুহৃদ ও উপদেষ্টা।

গৌড়ীয় মঠের আচার্য থাকাকালীন পুরীদাসজীর স্নেহপাত্র ও মঠবাসী বালকসেবক ছিলেন শ্রীফকির মোহন দাস। একদিন পুরীদাসজী তাঁকে ডেকে একান্তে বলেন তুমি অনেকদিন আমার একনিষ্ঠ সেবা করেছ। আমি শীঘ্রই মঠ ছেড়ে চলে যাব। এ'কারণে তোমার যাতে যথার্থ মঙ্গল হয় তাই বলছি—তুমি কলকাতায় গিয়ে কানুপ্রিয় গোস্বামী প্রভুর শরণ নাও এবং অকপটে তাঁর নির্দেশমত কাজ কর।

ফকির মোহন এসে এই সম্বন্ধে প্রভুকে জানালে তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করেন বাড়ীতে থাকাকালীন সে কতদূর লেখা পড়া করেছে? ফকিরমোহন জানায় সে ৭/৮ ক্লাশ পর্যন্ত পড়ে গৌড়ীয় মঠে চলে যায়। তখন তার বয়স ১৫/১৬ বৎসর হবে। প্রভু তাকে সাধারণভাবে শ্রীনামসম্বন্ধে উপদেশ করেন ও গৃহে ফিরে গিয়ে নামাশ্রয়ে থেকে পুনরায় পড়াশোনা শুরু করতে এবং মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে তারপর তাঁর কাছে আসতে বলেন। ফকিরজী প্রাইভেটে ভালভাবে মাধ্যমিক পাশ করে প্রভুর চরণে উপনীত হ'লে প্রভু তাঁকে শ্রীনামদীক্ষা ও গিরিধারী সেবা দেন এবং পড়াশোনা চালিয়ে যেতে বলেন। ফকিরজীর ততটা ইচ্ছা না থাকলেও প্রভুর একান্ত আগ্রহ ও নির্দেশে সে ক্রমে ক্রমে উচ্চমাধ্যমিক, ওড়িয়া ভাষায় অনার্স সহ বি.এ। পরে ওড়িয়াতে এম.এ তে প্রথমশ্রেণী পায়। ভুবনেশ্বর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের চাকুরী পায়। ভুবনেশ্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস্ চ্যান্সেলর ডঃ রমানাথ মহান্তি প্রভুর গ্রন্থের ও প্রভুর অনুরাগী ছিলেন। তাঁরা সপরিবারে প্রভুর একান্ত ভক্তরূপে পরিচিত ছিলেন। ফকিরমোহন তাঁর বিরাট কোয়ার্টাসের আউট হাউসে থেকে পড়াশোনা করেন এবং তাঁদের খুব স্নেহপাত্র ছিলেন। পরে ডঃ মহান্তির সহায়তায় সে শ্রীচৈতন্যদেবের সময়কার ওড়িয়া ভাষায় রচিত গৌড়ীয় ধর্ম ও

সাহিত্য এবং মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের (উড়িষ্যা মধ্যে) পথ চিহ্নিত করন বিষয়ে গবেষণা করে পি.এইচ.ডি উপাধি পায়। সে প্রভুর বিশেষ কৃপাপাত্র। প্রভু তাঁকে বিবাহ করতে নিষেধ করেন এবং তাঁর দ্বারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অনেক উপকার হবে বলে মনে করতেন। বর্তমানে ফকিরজী শুনেছি স্বতন্ত্রভাবে হলেও পরমার্থ বিষয়েই রত আছেন ও ভুবনেশ্বরেই অবস্থান করছেন।

উত্তর প্রদেশের ফতেপুর নিবাসী প্রখ্যাত অ্যাডভোকেট ছিলেন শ্রীযদুনন্দন সহায়জী। তাঁর এক কন্যা মালতীদি এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটি থেকে বাংলা নিয়ে এম.এ পাশ করেন। বিদ্যোৎসাহী পিতা কন্যার সহায়তায় বাংলা শেখেন। পরে কোন সুত্রে প্রভুর গ্রন্থ পড়ে পিতাপুত্রী উভয়েই তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধান্বিত হন। সহায়জী প্রভুর সঙ্গে পত্র মারফৎ যোগাযোগ করেন এবং পরবর্তী কালে আমাদের নবদ্বীপ আশ্রমেও কয়েকবার প্রভুকে দর্শনে আসেন এবং কিছুদিন অবস্থানও করেন। প্রভুর সঙ্গে তাঁর পরিবারের প্রভূত অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে। সহায়জীর বৈষ্ণবতা, দৈন্য, আর্তি, বিনয় প্রভৃতি সদ্‌গুণ অতি উচ্চস্তরের ছিল। তিনি একান্ত আগ্রহে প্রভুপাদের 'ভক্তিরহস্য কণিকা' গ্রন্থের সম্পূর্ণ হিন্দী অনুবাদ করেন। পরে প্রভুর নির্দেশে এক তৃতীয়াংশ গ্রন্থরূপেও প্রকাশ করেন।

মালতীদির স্বামী শ্রীবিহারীলাল দাসজী (শ্রীবাস্তব) ও পরমভক্ত ও প্রভুর অনুগত জন ছিলেন। তাঁর অকাল বিয়োগ আমাদের প্রভূত দুঃখের কারণ হয়েছিল। সহায়জীর দৌহিত্র শ্রীমান নিমাইদাস এলাহাবাদে অ্যাডভোকেট। বিহারীলালজীর জামাতা শ্রীধ্রুবদাসও জেনারেল ম্যানেজার অপারেশনস (টেলিফোনস, লক্ষ্ণৌ) পরমভক্ত। তাঁরা সপরিবারে সকলেই গৌর অনুগত।

জ্ঞানবাবুর সঙ্গে আমাদের পরিবারে ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতার বিষয় আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। সেটা পঞ্চাশের দশকের একেবারে গোড়ার কথা। প্রভু বারাণসী ঘোষ লেনের বাড়ীর একতলায় ডানদিকের ছোট একটি ঘরে থাকেন। সন্ধ্যায় যখন ভক্ত, সমাগম হয় তখন ঘরে স্থান সঙ্কুলান হয়না। ঘরের বাইরে রোয়াকও ভর্তি হয়ে যায়। ঠাকুর থাকেন চারতলায় সিঁড়ির মাথায় উপরের ঘরে। প্রভুকে দিনে আটবার উপরনীচ করতে হয় সেবাপূজার জন্য খুবই অসুবিধা হয়।

আমি তখন সবে কলেজে ঢুকেছি। একদিন দেখলাম জ্ঞানবাবু প্রভুকে খুবই বিনয় করে বলছেন "প্রভু, এখানে আপনার খুবই অসুবিধা হচ্ছে। বাড়ীতে লোক অনেক। ভক্তরা এলেও বসার জায়গায় অভাব হয়। দিনে কতবার আপনাকে উপর নীচ করতে হয়। আমার রসা রোডে একটা ছোট দ্বিতল বাড়ি আছে। আমি ঐ বাড়ী আপনাকে লিখে দিচ্ছি। আপনি ওখানে স্বতন্ত্রভাবে ভজন করতে পারবেন

অথচ কলকাতাতেও থাকা হবে। আপনি দয়া করে এটুকু স্বীকার করুন।"

প্রভু একটু চুপ করে থেকে বললেন—'জ্ঞানবাবু এই যে আপনি এখানে প্রত্যহ আসেন, আপনার সঙ্গে ভগবৎ প্রসঙ্গ, সংসারের অনিত্যতা, বিষয়বাসনা ত্যাগ করে আনাসক্ত ভাবে সংসারে থেকে ভজন করা, সাধু সেবা ও ভক্তিসংস্কার গড়ে তোলা—এসব নিত্য আলোচনা হয়। তা যে আপনার ক্ষেত্রে সত্যই ফলপ্রসূ হয়েছে—তার প্রমাণ আপনি অনায়াসে দক্ষিণ কলকাতর মত জায়গায় একটি বাড়ী আমায় দিয়ে দিতে চাইছেন এতে আমি অতীব সন্তুষ্ট হ'য়েছি এবং গৌররায় চরণে আপনার ভজনসিদ্ধি প্রার্থনা করছি। কিন্তু বলুন তো যে বিষয় আপনি এমন আনায়াসে ত্যাগ করতে চাইছেন—আমি তা গ্রহণ করি কিভাবে? বিষয়মানেই অনর্থ—তার সংরক্ষণ, সংস্কার, ট্যাক্স ইত্যাদি বিষয় কর্মে মন দেব না ভজন করবো—সুতরাং ওটা সম্ভব নয়।" জ্ঞানবাবু আর কি বলেন। তার ৪/৫ বৎসর পর প্রভুর তখন খুব খ্যাতি, নানা স্থানে বক্তৃতায় যেতে হয়—তার ফলে তাঁর নিজস্ব খাওয়া দাওয়া ভজন-পূজন ও গ্রন্থরচনাদি কার্যে বিঘ্ন ঘটে। পাঠ বা বক্তৃতা করে প্রভু কখনও কোথাও কোনদিন এক পয়সাও প্রণামী হিসাবে গ্রহণ করেননি। তিনি বলতেন ধর্ম বিক্রি করা যায় না। কেউ বেশী পীড়াপীড়ি করলে বলতেন, "আমার শ্রীগুরুদেবের আদেশ আছে হরিকথা পরিবেশন করে টাকা পয়সা নেবেনা।" —কেবল মাত্র যাতায়াতের পাথেয়মাত্র স্বীকার করতেন—তাও অর্থাদি বিশেষ নিজে হাতে তেমন স্পর্শ করতেন না।

ঠাকুর সেবা ও গ্রন্থ প্রকাশনার জন্য অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বিশেষ কয়েকজনের নিকট ছাড়া—তিনি তাঁর শিষ্যভক্তদের কাছেও অর্থ পরিগ্রহ করতেন না।

আমি যখন স্কুলে থাকতেই টিউশনি আরম্ভ করি—তখন ঠাকুর সেবার কথা বলে তাঁকে টাকা দিতে গেলে তিনি প্রথমে উপদেশ দেন—তোমার ছোট জ্যেঠামহাশয় পিসিমা ও মাকে কিছু করে হাত খরচ দিও। ঠাকুর সেবাতো ঠাকুর চালিয়ে নিচ্ছেন—এখন প্রয়োজন নেই। পরে অনেক করে বলায় তিনি ১০ টাকা মাত্র মাসে গ্রহণ করতে রাজী হন—তাও যাতে শ্রীশ্রীগৌররায়জীর সেবার সাথে সংযোগ সূত্র থাকে।

পরে একবার তিনি আমায় ও আমার স্ত্রীকে বলেন, "—শ্রীগৌররায়জীউ আমাদের গৃহদেবতা। আমার সময় আমি একরূপভাবে তাঁর সেবা চালাচ্ছি—ঠাকুরের কৃপায় সব অচিন্ত্যভাবে চলে। কিন্তু ভবিষ্যতে এই ঠাকুর সেবার ভার 'তোমাদের, তোমরা সকলে একমত হয়ে যাতে গৌররায়জীউর সেবা সুষ্ঠুভাবে চলে তা দেখবে। নিজেদের সামর্থ্যের মধ্যে নিষ্ঠার সঙ্গে সেবা করবে—কোনরকম

প্রত্যবায় না করাই ভাল। পারলে নিজেরাই ঠাকুরের রাজসেবা করবে —নিজেদের সংসারকে ঠাকুরের সংসার ভাববে—তিনিই সকলের অভিভাবক।" এখন মূলতঃ আমাদের তিনভায়ের দ্বারাই সেবাকার্য নির্বাহ হয়। (ঢাকা ষ্টোর্স), প্রশান্ত, কল্যাণ বা জ্ঞান বাবুর পরিবারের মত অন্তরঙ্গ ক্ষেত্রে সেবা উপকরণ গৃহীত হয়ে থাকে মাত্র।

আমার স্ত্রীকে বলেন—"আপনি বড়, আপনারই দায়িত্ব বেশী।" শেষ অসুস্থতার সময় তাঁকে বলেছিলেন "আপনি এলে আমি নিশ্চিন্ত থাকি।" কারণ তখন প্রভুর অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে অনেক ভক্ত অনুরাগী রোজই প্রায় প্রভুকে দর্শন করতে আসছেন। দেবুর উপর চাপ পড়ে যাবে। বৌমা থাকলে অতিথিদের সব সুষ্ঠুব্যবস্থা হবে। তিনি উপদেশ দেন—"দেখুন বৌমা, আধুনিক হবেন না আধুনিকতা মানে অসভ্যতা। ভগবান প্রাচীনের প্রাচীন। প্রাচীন ঋষিগণ সেবিত ও আচরিত আদর্শই তাঁর প্রিয়। ক্ষমা, মৈত্রী, গার্গী, শ্রদ্ধা এঁরা বা গৌরলীলাকালে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী, মালিনী, সীতাদেবী, জাহ্নবা মাতা এঁদের আচরণই আদর্শ। আপনারাই অপরের শিক্ষণীয় হবেন।"। —এই উপদেশ সে সর্বথা মান্য করে চলেছে।

যা হোক যে প্রসঙ্গের কথা হচ্ছিল—কলকাতায় যখন প্রভুর খ্যাতি চারিদিকে লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা যশের হাতছানি। ১৯৫৫ সালে বাংলার বাণিজ্যমন্ত্রী মাননীয় শ্রীতরুণ কান্তিঘোষের উদ্যোগে দেশবন্ধু পার্কে দশদিন ব্যাপী বিরাট ধর্ম মহাসভা হয়। দোলের দিন ১০৮ খোলের বিশাল নামসঙ্কীর্তনের শোভাযাত্রা শহরের নানাপথ পরিক্রমা করে। এই উৎসব পরবর্তী বেশ কয়েক বছর ধরে হয়েছিল। কোনবার উত্তর কলকাতার দেশবন্ধু পার্কে, কোনবার দক্ষিণ কলকাতার দেশপ্রিয় পার্কে। প্রথম বৎসরের উদ্যোগপর্বে শ্রীতরুণ কান্তি ঘোষ মহাশয় তাঁদের পরিবারের গুরুদেব শ্রীগৌর মহারাজকে সঙ্গে নিয়ে প্রভুর কাছে এই উৎসবের সভাপতি হ'বার অনুরোধ নিয়ে আসেন। প্রভু পরে তাঁকে জানাবেন বলেন। পরে তিনি বাবাকে বললেন—দেখ, এ আমি কি বিপদে পড়লাম। এনারা সব রাজনীতির জগতের খ্যাতিমান ব্যক্তি—বিরাট ব্যাপার, এ সবের মধ্যে আমি কি করে ঢুকি। অথচ এখান থেকে যদি না যাই তবে তাঁদের অবমাননা করা হ'বে। আমার ভজনরক্ষার জন্য আমাকে সব ছেড়ে বৃন্দাবন চলে যাওয়া ছাড়া উপায় নাই।

ভক্তরা সব প্রমাদ গুনলেন। জ্ঞানবাবুকে সঙ্গে নিয়ে তাঁরা সকলে এসে প্রভুকে অনুরোধ করলেন—"প্রভু, আপনি বৃন্দাবন চলে গেলে আমরা কার সঙ্গ করব। তাছাড়া বৃন্দাবন অতদূরে গেলে আমরা খুবই উদ্বেগের মধ্যে পড়ব। আপনার সংবাদ নিয়মিত না পেলে সেটা চিন্তার কারণ হবে এবং প্রয়োজনমত এখান থেকে

করোর শীঘ্র সেখানে পৌছানোও শক্ত হবে। তাই আমাদের সকলের অনুরোধ যে—আপনি বৃন্দাবনে না গিয়ে নবদ্বীপে বাস করুন। নবদ্বীপ কলকাতার কাছে আমাদেরও নিয়মিত যাতায়াত আছে। সেখান থেকে কারোর আসাও সময় সাপেক্ষ নয়।

জ্ঞানবাবু বললেন—নবদ্বীপে প্রাচীন মায়াপুরের নূতন চড়ায় গঙ্গার কাছে আমার একটি দোতলা বাড়ী আছে। তার এক তলায় বৈষ্ণবখণ্ড অর্থাৎ ত্যাগী বৈষ্ণবরা বাস করেন দোতলাটা ফাঁকা আছে। বাড়ির নাম "শ্রীশ্রীগৌরকিশোর শান্তিকুঞ্জ।" সিদ্ধ মহাত্মা গৌরকিশোর দাস বাবাজীর সমাজ করার উদ্দেশ্যে এটা তৈরী হ'য়েছিল—পরে তা নিকটেই অন্যত্র করা হয়।

আমি বৈষ্ণবদের অন্যত্র থাকার ব্যবস্থা করে সম্পূর্ণখালি অবস্থায় আপনাকে লিখে দিচ্ছি—যাতে আপনার কোন সঙ্কোচ বা অসুবিধা না হয়।

এবার কিন্তু প্রভু রাজী হলেন, কিন্তু এই শর্তে—যে বাড়ি তাঁর নামে বা গৌররায়জীউর নামে করা চলবেনা। বৈষ্ণবরা যাঁরা আছেন তাঁরা তেমনই থাকবেন। তিনি কেবল দোতলাটাই ব্যবহার করবেন। উপরের একটি বড় ঘর। সেটাকে কাঠের পার্টিশন করে তিনভাগ করা হয়েছিল—সামনে বারান্দা একপাশে রান্নার ছোটঘর।

শ্রীলত্রিভঙ্গ দাস বাবাজী, পরে ইনি প্রভুর অনুরোধে একচাকায় নিত্যানন্দ জন্মস্থানের (বীরচন্দ্রপুরে/বীরভূমে, তারাপীঠের কাছে) সেবাভার গ্রহণ করেন। তাঁর সমাজও সেখানে আছে। দ্বিতীয়জন শ্রীল গৌরাঙ্গদাস বাবাজী, ইনি পূর্বাশ্রমে পুলিশের ইন্সপেক্‌র ছিলেন। পরে প্রভুর কথায় বৃন্দাবনে গিয়ে তীব্র ভজন করেন। প্রথমে ব্রহ্মকুণ্ডের পরে সমগ্র ব্রজমণ্ডলের মহান্ত হয়েছিলেন। সম্প্রতি প্রায় ৯৩ বৎসর বয়সে তিনি দেহরক্ষা করেন। এই উভয়ের সঙ্গেই প্রভুর খুব প্রীতি সম্বন্ধ ছিল—তাঁরাও প্রভুকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। শ্রীব্রজানন্দদাসজী ও শ্রীহরিপদ দাসজীও এই আশ্রমে থাকতেন ও প্রভুকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন।

এ'বাড়ি প্রভুর পূর্ব পরিচিত। ইতিপূর্বে তিনি এখানে ২/১ বার কিছুদিনের জন্য বাস করেছিলেন। মনে আছে যুদ্ধের Evacuation এর সময় কলকাতার বাসা ছেড়ে সকলে যখন ভাজনঘাট যান। তখন কয়েকমাস ভাজনঘাটে থেকে মা আমাদের নিয়ে নবদ্বীপে যোগনাথতলায় মামার বাড়িতে আসেন। এখানে এসে হঠাৎ আমার টাইফয়েড জ্বর হয়—তখনকার দিনে এই রোগের ডাক্তারীতে কোন ভাল ঔষধ ছিলনা। এমারজেন্সি পিরিয়ড বলে বাবা ছুটি পেলেননা। তাঁর চিঠি পেয়ে বড় জ্যেঠামহাশয়, ছোটজ্যেঠামহাশয়ের উপর শ্রীশ্রীগৌররায়জীউর সেবার ভার দিয়ে নবদ্বীপে চলে আসেন এবং জ্ঞানবাবুর এই আশ্রমে থেকে আমার

চিকিৎসার ভার নেন সুদীর্ঘ ২২ দিন পরে আমাকে সুস্থ করে তোলেন। তারপরই আমরা কোলকাতায় ফিরে আসি। প্রভু জ্ঞানবাবুকে বলেছিলেন—"দেখুন জ্ঞানবাবু, পরগৃহে না থাকলে ভজন হয় না। অধিকার বোধ অনর্থের সৃষ্টি করে। আপনার যখনই প্রয়োজন হবে আমায় জানালে আমি আশ্রম খালি করে দেব—আপনি কোন প্রকার ইতস্ততঃ করবেন না। আর যতদিন আমি আশ্রম ব্যবহার করব ততদিন বাড়ির ট্যাক্স ও ছোট খাট সংস্কারকার্য আমি নিজেই করে নেব। জ্ঞানবাবু তাতেই রাজী হয়েছিলেন।

পারমার্থিক দিক ছাড়াও জ্ঞানবাবু প্রভুর প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞ ছিলেন—তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র অল্পবয়সেই টাইফয়েড রোগে মারা যায়—ডাঃ ললিতব্যানার্জী তার চিকিৎসা করেছিলেন। কিন্তু তার কিছু দিন পরেই তাঁর মেজ ছেলে ও বড়কন্যা একসঙ্গে ঐ রোগে আক্রান্ত হয়। জ্ঞানবাবু খুবই বিহ্বল অবস্থায় প্রভুকে সব জানান—এবং প্রভুকে ছেলেমেয়ের চিকিৎসার ভার নিতে অনুরোধ করেন। প্রভুর চিকিৎসায় তারা ক্রমশঃ সুস্থ হয়ে ওঠে।

পরবর্তী কালের ঘটনা—জ্ঞানবাবু ব্যবসাপত্রের কাজ দেখলেও ভজন, সাধুসেবা ও পরমার্থ বিষয়েই তাঁর অধিক আগ্রহ ছিল ও সময় ব্যয় হ'ত। তাঁর মধ্যমভ্রাতা নিশিবাবুর উপরই সামগ্রিক ভার ছিল। যুদ্ধের সময় নানাকারণে প্রচুর টাকা ইনকামট্যাক্স বাকী পড়ায় ব্যবসায় খুব সঙ্কট দেখা দেয়। প্রভুর পরামর্শে জ্ঞানবাবু ও তাঁর পরিবার এই সঙ্কট থেকে উদ্ধার পান। ব্যবসা ভাইদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে যায়। যা হোক অবশেষে ১৯৫৫ সালে প্রভু শ্রীশ্রীগৌররায়জীকে নিয়ে নবদ্বীপে চলে আসেন এবং নিয়ম করেন তিনি আশ্রম ছেড়ে আর কোথাও যাবেন না। খবর পেয়ে পরে শ্রীযুক্ত তরুনকান্তি কর্তৃক প্রেরিত হয়ে গৌরমহারাজ কলকাতার উৎসবের জন্য তাঁকে নিতে আসেন। কিন্তু প্রভু সবিনয়ে বলেন, "দেখুন, আপনারা আমার পারমার্থিক সুহৃদ—এই শেষ বয়সে আমার যাতে ভজন রক্ষা হয়—আপনারা সেই শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা করবেন বলে আশা করি। এরপর সুদীর্ঘ ২০ বছর কালের মধ্যে একবার কানের চিকিৎসার জন্য ও একবার পুরী যাওয়া ছাড়া প্রভু আশ্রম ছেড়ে কোথাও যাননি। চৈত্রসংক্রান্তির দিন গঙ্গাস্নান করে ১ লা বৈশাখ পদব্রজে ধামেশ্বর মহাপ্রভু দর্শনে যাওয়া ছাড়া আশ্রমপ্রাঙ্গণের বাইরে বড় একটা কোথাও যেতেন না।

নবদ্বীপে আসার প্রথম প্রথম তিনি শ্রীবাস অঙ্গন হরিসভা ইত্যাদি কয়েকটি জায়গায় বক্তৃতা করতে যান। পরে জনসংযোগ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেন। কেবল প্রথমদিকে সপ্তাহে ২ দিন সোম ও মঙ্গলবার পরে মাত্র একদিন মঙ্গলবার সন্ধ্যায়

আশ্রমে শ্রীহরিকথাপ্রসঙ্গ আলোচনা করতেন---জীবনের প্রায় শেষদিন পর্যন্ত। সপ্তাহের অন্যান্য দিনে বিশেষ অনুমতি ছাড়া তাঁর দর্শন মিলতনা। যদিও প্রভু তেমনভাবে কাউকে নিষেধ করতেন না—তবুও এই নিয়মই শেষপর্যন্ত চালু হয়ে গিয়েছিল।

নবদ্বীপে শ্রীল তিনকড়ি গোস্বামী প্রভুর সঙ্গে প্রভুর শেষ অসুস্থতার সময় দেখা হয়। গোস্বামী প্রভুর নাম, শ্রীল কিশোরী কিশোরানন্দ, তিনি প্রভুকে দাদাপ্রভু বলে সম্বোধন করতেন। মেদিনীপুরের মনোহরপুকুর গ্রামে ও নবদ্বীপের মণিপুরে তাঁর সেবিত বিগ্রহ ও মন্দির আছে। বহুপূর্বে কলকাতার এক ধর্মসভায় উভয়ের প্রথম সাক্ষাৎকার হয়। গোস্বামী প্রভু ধামেশ্বর মহাপ্রভু দর্শনে এসে, হঠাৎ কাউকে কিছু না বলে সঙ্গীদের নিয়ে আশ্রমে প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ করতে চলে আসেন। কিন্তু ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাওয়ায় বিপুল লোক সমাগম হয়।

উভয়ের মধ্যে ভাব ও ইঙ্গিতে কিছু অন্তরঙ্গ কথা হয় গোপনে দেবুর ঘরের মধ্যে। এ'বিষয়ে পরে বড়জ্যেঠামহাশয় আমাকে লেখেন—প্রভু যে তাঁর অনুভবের কথা—মহাপ্রভুর প্রকটের পর পাঁচশ বছর অতিক্রান্ত হলে কলির অকালে বিদায় নেওয়ার সূচনা হবে এবং মহাপ্রভুর অপ্রকটের পাঁচশ বছর পর কলি তার নামাপরাধরূপ অস্ত্রসহ সম্পূর্ণরূপে অপগত হলে প্রেমযুগের আবির্ভাব হবে বলতেন। তখনও শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাঁচশ বছর পূর্তির ১০ বছর বাকী ছিল। শ্রীল তিনকড়ি প্রভু—বড় জ্যেঠামহাশয়ের হাত ধরে অনুরোধ করেন—"প্রভুপাদ, আপনি আর ১০ বছর অনন্ত প্রকট থেকে আমাদের সেই প্রেমযুগের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে দিন।

বড়জ্যেঠামহাশয় লিখেছিলেন---কলির এই ঘোর তাণ্ডবের মধ্যে সম্প্রদায় মধ্যে দিন দিন বর্ধিত নামাপরাধ সংক্রমণ ইত্যাদি অনিষ্টকারিতা ও দুর্দিনের মধ্যে তিনি আর থাকতে ইচ্ছা করেন না। তিনি গৌরচরণে এই আন্তরিক প্রার্থনা করেন যে যেন সকলের পাপ নিয়ে তিনি অতি শীঘ্র এই জগৎ থেকে চলে যান। তার পর তিনি তিনকড়ি প্রভুর নিকট করজোড়ে তাঁকে বিদায় দেওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন। গোস্বামীপ্রভু নীরবে সাশ্রুনেত্রে সম্মতি জানান। তিনি প্রভুপাদকে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ বলে চিহ্নিত করেন। প্রভুর অপ্রকটের সময় তিনি বৃন্দাবনে ছিলেন এবং সেখানে প্রভুর স্মরণে চৌষট্টি মহান্তের ভোগ দেন।

[পরিশেষে প্রার্থনা জানাই —"হে মহাজীবন, জানিনা কোন অজানিত সুকৃতির ফলে তোমায় আমরা আমাদের মধ্যে পরমাত্মীয়রূপে পেয়েছিলাম। তোমার নিঃস্বার্থ স্নেহ, অহৈতুকী কৃপা, মঙ্গলময় অভিভাবকত্বের মধ্যদিয়ে আমরা মানুষ হয়েছি। আজ বহু দিন হ'ল তুমিও অনিত্য জগতের মায়া কাটিয়ে চির আনন্দময় চিন্ময়

লোকে প্রয়াণ করেছ। আজ জীবনের উপান্তে এসে তোমার করুণা-শীতল ও রাতুল চরণে একান্তভাবে এই প্রার্থনা করি,—তুমি আশীর্বাদ কর যেন তোমারই প্রদর্শিত পথে নিরপরাধে নামাশ্রয়ে থেকে ভজন করতে পারি এবং অন্তিমে তোমার সর্বতাপহারী শ্রীমূর্তির দর্শন পাই—যেন তোমার প্রাণপ্রিয়, গৌররায়জীউর সেবায় সংরত থেকে সংসারে কর্তব্যনিষ্ঠ জীবনের অন্তে সেই শ্রীগৌররায়ের শ্রীচরণাশ্রয়লাভ করতে পারি।]

৫। জনৈক ভক্তের দৃষ্টিতে প্রভুপাদ

শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গ প্রসঙ্গে আমি রাধারমণ বলছি। আমার অত্যন্ত ছেলে বেলায় মা ও বাবা মারা যাওয়ায় আমি সেজ মামা ও মামীর স্নেহ লতায় মানুষ হয়েছি। মামা মামী নিঃসন্তান ছিলেন, তাই পুত্র স্নেহ সম্পূর্ণ আমার ওপরেই ছিল তাঁদের। মামা, মামী পরম বৈষ্ণব, শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীল কানুঠাকুরের কুলে দীক্ষিত ছিলেন তাঁরা। আমি আমার আত্মশোধন হেতু সেই কানুকুলোজ্জল, পরম গৌরব ও শ্রীরূপ সনাতনাদি গোস্বামীগণের আদর্শে গড়া বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী প্রভুপাদের সান্নিধ্যে আমার স্মরণীয় দিনগুলি কীর্ত্তন করে নিজেকে ধন্য করতে চাই।

সেজমামার কলকাতায় আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে খুব বড় মুদির দোকান ছিল। শ্রীল প্রভুপাদের ঠাকুরের সংসারের যাবতীয় মাল, মশলা আমাদের এই ঢাকা ষ্টোর্স নামক দোকান থেকে যেত। সেজমামা এই বৈষ্ণব চূড়ামণির সঙ্গ দীর্ঘদিন ধরে করতেন। একদিন সেজমামা প্রভুপাদের ঠাকুরের সংসারের দ্রব্যাদি দিয়ে আমাকে বললেন যাতো খুকু এই জিনিস গুলো প্রভুপাদের বাড়ী গিয়ে দিয়ে আয়। (প্রভুপাদ তখন কলকাতায় সীমলাস্ট্রীটে থাকতেন।) আর প্রভুকে বলবি সেজমামা বলেছিল আমাকে কৃপা করতে। মামার আদেশে ঠাকুরের দ্রব্যাদি মাথায় নিয়ে প্রভুপাদের বাড়ী এলাম। প্রভু বললেন কি এনেছ খোকা? বললাম সেজমামা এইগুলো পাঠিয়ে দিয়েছেন আর মামা বললেন আপনাকে বলতে আমাকে কৃপা করতে। প্রভু হেসে বললেন আচ্ছা তোমাকে কৃপা করলাম। আর একবার খুব ভাল যশোরের মাখন মামা আমাকে দিয়ে প্রভুকে পাঠিয়ে দিলেন। সেবার প্রভু নিলেন। তার পরের ক্ষেত্রে মামা আবার মাখন আমাকে দিয়ে প্রভুর কাছে পাঠালেন। প্রভু

প্রভুপাদের পাণ্ডুলিপির হস্তাক্ষর

বললেন খোকা দেখেছ আমি তোমাদের সেই মাখন খেয়ে কত মোটা হয়ে গেছি, আর লাগবে না ঐ মাখনটা ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

আমাদের ছুতোর পাড়ালেনের বাড়ীতে প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় পাঠ কীর্ত্তন হোত। বহুভক্তের সমাগম হতো। মধ্যে মধ্যে প্রভুপাদ সেই সভায় যোগ দিতেন। একবার উদণ্ড কীর্ত্তনের মধ্যে প্রভুপাদের সে কি নৃত্য আজও চোখের সামনে যেন ভাসছে। "একবার বলো হরিবোল, এনাম বলতে বলতে লাগবে ভাল, এনাম যতই বলো ততই ভাল। এনাম অরুচিকে রুচি করে, বদন ভোরে হরি বলো" ইত্যাদি নাম কীর্ত্তন করতে করতে। প্রভুপাদের সঙ্গে আমি ও সেজমামা কলকাতার বহু হরিসভায় যেতাম। সেখানে প্রভুর হরিকথা হতো অগণিত ভক্ত সমাগমের মধ্যে। সেই সভায় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল রসিকমোহন বিদ্যাভুষণ মহাশয়কে দর্শন করেছি। একদিন একটা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করে প্রভুপাদকে নিয়ে সেজমামা বেড়াতে বেরলেন আমিও হলাম তাঁদের সাথী, ঠিক হলো বাগবাজারে গৌড়ীয় মঠের ঠাকুর দর্শনে যাওয়া হবে। যথা সময়ে গাড়ী মঠের সামনে এসে দাঁড়ালো। গাড়ী থেকে নামবার সময়ে প্রভু হেসে বললেন যাচ্ছি তো ওরা আবার ধরে মারবেনা তো? (কারণ মঠের সঙ্গে আমাদের এদিকার বৈষ্ণবদের খাপখায় না তো তাই প্রভু এই কথা বলে ছিলেন।) ৪০ নম্বর সিমলাষ্ট্রীটের ডিসপেন্সারীতে প্রভু তখন কবিরাজী করেন। দূর্গা পূজোর সময়ে মামীকে নিয়ে আমি সিমলেষ্ট্রীটের দূর্গা ঠাকুর দেখতে গেছি, প্রভু আমাদের দেখতে পেয়ে ডিসপেনসারী ঘরের জানলা দিয়ে বললেন দূর্গার কাছে লোকে ধন সম্পত্তি ঐশ্বর্য চায়, কেউ ভক্তি চায় না, তোমরা দূর্গার কাছে কৃষ্ণভক্তি চেও। প্রভুপাদের পরিবারের সঙ্গে আমাদের বাড়ীর খুব হৃদ্যতা ছিল।

সেজমামার সঙ্গে সেজমামীর মতবিরোধ হলে মামীমা প্রায়ই বাড়ী থেকে চলে গিয়ে প্রভুপাদের বাড়ী এসে থাকতেন। প্রভুর মা আমার মামীমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। রাগ কমলে আমি দু-তিন দিন পরে গিয়ে মামীকে বাড়ী নিয়ে আসতাম।

জাপানী যুদ্ধের সময়ে প্রভুপাদ ও বাড়ীর সকলে ভাজন ঘাটে চলে গিয়েছিলেন। আমাদের বাড়ীর সকলে নবদ্বীপ চলে এসেছে। নবদ্বীপে আমাদের একটা ছোট দোকান ও বাড়ী ছিল। সেজমামা কলকাতার দোকান কি করবেন—ভেবে পাচ্ছেন না, কর্মচারীরা সকলে দোকান রাখতে বলছে। মামা কর্মচারীদের ওপরে দোকান ফেলে কি করে নবদ্বীপ চলে আসেন।

প্রভুপাদের ছোট ভাই (কাকা প্রভু) একা কলকাতার বাড়ীতে থেকে অফিস করেন। একদিন মামা কাকা প্রভুর কাছে দোকানের বিষয় জিজ্ঞেস করায় তিনি

বললেন, তুমি যখন নিজে দোকান দেখতে পারবে না তখন কর্মচারীর উপরে দোকান রেখে চলে যাওয়া ঠিক হবে না। তুমি নবদ্বীপে দোকান তুলে নিয়ে যাও। সেখানে ভাল করে দোকান করো।

কাকা প্রভুর কথায় সেই দিনই মামা দোকান তুলে দিয়ে নবদ্বীপে নিয়ে গেলেন। নবদ্বীপে তখন তেমন বড় কোন দোকান ছিলনা। প্রভুপাদের আশীর্ব্বাদে আমাদের দোকান খুব জেঁকে উঠলো। যুদ্ধ থামার পর যথা সময়ে প্রভু নবদ্বীপে দ্বারিক ঘোষের আশ্রম বাড়ীতে এসে উঠলেন। আমরা নিত্য তাঁর দর্শন করি। শ্রীগৌররায়জীর নিত্য বাজার হাট করেদিই। প্রত্যহ প্রত্যুষে সেজমামা ও ছোট মামার সঙ্গে প্রভু বেড়াতে বেরতেন গঙ্গার ধার দিয়ে মাধাই তলা। আমিও তাঁদের সঙ্গে যেতাম। এখানকার মঠ মন্দির থেকে প্রভুপাদকে হরিকথা বলবার জন্যে আহ্বান করতো। প্রভুপাদের সঙ্গে আমি যেতাম। শ্রীল প্রাণগোপাল গোস্বামীর শ্রীশ্রীমদনগোপাল মন্দিরে আমাদের প্রভুপাদ গেছেন হরিকথা পরিবেশন করতে। হরি কথা শেষ হবার পর প্রভু যখন আসর ছেড়ে উঠে আসবেন এমন সময়ে শ্রীল যদুগোপাল প্রভু আসর ছেড়ে উঠে মন্দিরের মধ্যে গিয়ে শ্রীশ্রীমদনগোপাল দেবের শ্রীঅঙ্গের উত্তরীয়টা খুলে এনে প্রভুপাদের শ্রীঅঙ্গে জড়িয়ে দিলেন। যদুগোপাল প্রভু জানতেন, আমাদের প্রভুপাদ কারো কাছ থেকে এক কর্পদক গ্রহণ করেন না। মদনগোপালের প্রসাদি উত্তরীয়টি প্রভুকে দিই তাহলে প্রভু নিশ্চয়ই আপত্তি করবেন না। সেই মনে করেই যদুগোপাল প্রভু প্রসাদী উত্তরীয় এনে প্রভুপাদকে দিয়েছিলেন, প্রভুপাদও সাদরে গ্রহণ করেছিলেন।

প্রভুপাদ প্রাণগোপাল গোস্বামী প্রভুর শ্রীগুরু নির্যান মহোৎসব। পাত্র, মিত্র, ব্রাহ্মণ, সজ্জন, বৈষ্ণব মহান্ত সকলের অবারিত দ্বার। প্রাণগোপাল প্রভু আমাদের প্রভুপাদকে অনেক বলে রাজী করিয়ে একদিন তাঁর শ্রীমদনগোপালজীর মধ্যাহ্নের প্রসাদ পাওয়ালেন। ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের যথা যোগ্য সম্মান ও আসন দেওয়া হয়েছে। প্রাণগোপাল প্রভু তাঁর নিজের পাশে প্রভুপাদকে বসালেন। দুই প্রভু একত্রে শ্রীমদন গোপালের প্রসাদ পেলেন।

হরিকথা প্রচার করতে প্রভুপাদ শ্রীবাস অঙ্গনে গেছেন। শ্রীমৎ চৈতন্য গোস্বামী প্রভু ব্যাস্ত হয়ে উঠে এসে প্রভুপাদকে জড়িয়ে ধরলেন, দুজনায় সেকি মিলন আনন্দ।

প্রভুপাদ পাদুকা ছেড়ে আসরে গিয়ে বসলেন। আর এদিকে চৈতন্য প্রভু তাঁর পরিবারের একজনকে ডেকে বললেন এই পাদুকা বাড়ীর ভেতরে নিয়ে রাখ, এখানে থাকলে চুরি হয়ে যেতে পারে। যথা সময়ে হরিকথা প্রসঙ্গ শেষ হলে প্রভুপাদকে

নিয়ে গেলেন চৈতন্য প্রভু তাঁর বাড়ির অভ্যন্তরে। উত্তম আসনে বসালেন তাঁকে, আর জনে জনে ডেকে প্রণাম করালেন তাঁকে। শেষে আসার সময়ে এক বড় ভাণ্ড ক্ষীর প্রসাদ এনে প্রভুপাদের হাতে তুলে দিয়ে বললেন আপনি তো কিছুই গ্রহণ করেন না, মহাপ্রভুর এই শীতলী প্রসাদ কৃপা করে গ্রহণ করুন। প্রভুপাদ সাদরে মস্তকে ধারণ করলেন। পরে রাস্তায় এসে আমাদের সেই ভাণ্ড দিয়ে বললেন তোমরা সকলে ভাগ করে নাও।

নবদ্বীপ হরিসভায় একবার প্রভুপাদের বক্তৃতার কথা আজও স্মরণ হয়। দর্শন ধ্যান সংস্পর্শে মৎস্যকুর্ম বিহঙ্গমা—এই শ্লোকটি ব্যাখ্যা করলেন প্রভু। যেমন বাগ্মিতা শক্তি তেমনি ব্যাখ্যা। সকলে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল এই ব্যাখ্যা শুনে। আমরা প্রভুপাদের সঙ্গ করি, প্রভুপাদ আমাদেরই কুলগুরু বংশ। আমাদের উপরে প্রভুর অগাধ স্নেহ ভালবাসা। সেবার প্রভু কলকাতায় গেছেন (মধ্যে মধ্যে প্রভু কলকাতায় যেতেন) আমি প্রভুর কাছে চিঠি লিখলাম, প্রভু আমাকে দীক্ষা দিন। আমার মা-বাবার গুরুদেবের তো সন্তানাদি নেই—যে তাঁদের কাছে নেব। আমরা যখন দীর্ঘদিন ধরে আপনার চরণশরণ করে আছি, আপনি আমাকে বঞ্চিত করবেন না। মামারও ইচ্ছা আমি আপনার কাছ থেকে দীক্ষিত হই। আমরা সাত ভাই ছিলাম, সকলেই মারা গেছে একমাত্র আমি জীবিত, জ্যোতিষী বলেছে আমারও আয়ু বেশী নেই। কবে কোনদিন মরে যাব, তাই আমাকে দীক্ষা দিয়ে কৃপা করুন ইত্যাদি। তার উত্তরে প্রভু চিঠি দিলেন, তুমি শতজীবি হয়ে ভজন কর। তুমি যদি ইচ্ছা কর তবে আমার ভাইয়ের কাছ থেকে দীক্ষা নিতে পার। এই চিঠি পেয়ে আমি শ্রীল রামদাস বাবাজী মহারাজের অনুগত শিষ্য পাগলদাকে বললাম। প্রভুর কথা লিখেছেন, পাগলদা বললেন এই তো তোমার প্রভুর কাছে দীক্ষা হয়ে গেছে। প্রভু মুখ ফুটে যখন বলেছেন আমার ভাইয়ের কাছে নাও, এইতো তাঁর আদেশ হয়ে গেল। যথা সময়ে স্নান যাত্রার দিন প্রভুপাদের সেজ ভাই-পূজ্যপাদ শ্রীল গোকুলানন্দ গোস্বামী প্রভুর কাছে আমার দীক্ষা হল। এরপর প্রভু অনেকবার নবদ্বীপে এসেছেন।

একবার প্রভু ও গুরুদেব কলকাতার যাবার সময়ে আশ্রমের চাবি গুরুদেব আমার কাছে দিয়ে বলেন রাধারমণ চাবিটা রেখে দাও আমি না বললে কাউকে দেবেনা।

প্রভুরা কলকাতা চলে গেছেন—বেশ কিছু দিন পরে প্রভুর খুব অনুগতও পরমভাগবত গিরীন বাবাজী নবদ্বীপে এসেছেন, তিনি জানেন আমার কাছে আশ্রমের চাবি থাকে। গিরীনভক্ত আমার কাছে চাবি চাইতে আমি তাঁকে বললাম, গুরুদেব বলেছেন, তিনি না বললে চাবি কাউকে দেবে না। আমি কি করে আপনাকে

চাবি দিই বলুন। গিরীন ভক্ত আর কিছু না বলে চলে গেলেন। আশ্রমের নীচের বারান্দায় থাকেন পূজা আহ্নিক করেন। এই খবর কি করে প্রভুর কাছে চলে গেছে। আমি মঙ্গলবার কলকাতায় মাল কিনতে গিয়ে প্রভুর দর্শনে গেছি। প্রভু বললেন তুমি গিরীন ভক্তকে চেন? বললাম হ্যাঁ চিনি। প্রভু—তাকে আশ্রমের চাবি দাওনি কেন? বললাম গুরুদেবের আদেশ নেই, তিনি বলেছেন আমি না বললে কাউকে চাবি দিও না। প্রভু ওঃ বড় গুরুভক্ত হয়েছে, গুরুর সব কথা শুনতে নেই। যাও নবদ্বীপে গিয়ে গিরীনকে আশ্রমের চাবি দিও। প্রভু আমাদের আপদে বিপদে সব সময়েই তাঁর শ্রীগৌররায়জীর চরণ তুলসী দিতেন আর বলতেন গৌররায়ের কৃপায় তোমাদের সব মঙ্গল হবে।

আমার বড় ছেলে শ্যামসুন্দরের প্রায়ই জ্বর হত। একদিন মনে মনে ভাবলাম, প্রভু তো খালি বলেন চরণ তুলসীর কৃপায় সব ভাল হয়ে যাবে একবার পরীক্ষা করে দেখাই যাক না। আমি কেবল মনে মনে ভাবছি শ্যামসুন্দরের ১০৫° জ্বর হোক দেখি চরণ তুলসীর কৃপায় কেমন কমে। ওমাঃ দেখতে দেখতে সত্যিই ১০৫° জ্বর হয়ে গেল। আমি গৌররায়জীর চরণ তুলসী তাকে খাইয়ে দিলাম। তার কিছু ক্ষণের মধ্যেই জ্বর কমে গেল। পরের দিন প্রভুকে এসে সব ঘটনা বললাম। প্রভু বললেন ঠাকুরের কৃপায় সবই সম্ভব হয় কিন্তু কখনো পরীক্ষা করতে নেই। এই শ্যামসুন্দরের নাম প্রভুরই দেওয়া। শ্যামসুন্দরকে কোলে নিয়ে আশ্রমে এসেছি। প্রভুকে বললাম একটা কালো ছেলে হয়েছে। প্রভু বললেন কালো কোথায় এতে শ্যামসুন্দর। সেই থেকে তার নাম হল শ্যামসুন্দর। প্রভু স্ত্রী লোকদের যেন বাঘের মতন ভয় করতেন। শ্রীমহাপ্রভুর আদর্শে তাঁর ভজন ছিল।

আমার ছোট মামীমার মাথা মধ্যে একটু খারাপ হয়েছিল। ছোটমামী রোজ একবার করে আশ্রমে এসে প্রভুকে প্রণাম করে চলে যেত। একদিন প্রভু আমাকে বললেন তোমার ছোট মামী রোজ একা একা আশ্রমে আসেন। আমার এখানে প্রায়ই বাবাজী বৈষ্ণবরা আসেন তাঁরা যদি দেখেন একজন মেয়ে ছেলে আশ্রমের উপরে উঠেছে তাহলে তাঁরা কি মনে করবেন। তোমরা যখন জান আশ্রমে মেয়েদের আসার নিয়ম নেই। তখন তোমাদের বাড়ীর মেয়েরা যেন কেউ আশ্রমে না আসেন। যারা এনিয়ম জানেন না তাদের কথা আলাদা। আমি বাড়ী গিয়ে সেই কথা সকলকে জানিয়ে দিলাম। সেজ মামা ১৩৬২ সালে দেহরক্ষা করলেন। তখন প্রভু পুরীতে আছেন। মামা তাঁর দোকান ও বাড়ী আমাকে দিয়ে গেলেন। আমার অনভিজ্ঞতার ফলে দোকানের ক্রমশই অবনতি দেখা দিল। ইতিমধ্যে প্রভু

পুরী থেকে নবদ্বীপে চলে এসেছেন। মহাজনদের কাছে বহু টাকা ঋণ। কোন কোন মহাজন আমার নামে কোর্টে কেসও করেছে। আমার এমনই দুরবস্থা যে ১০ সের চাল কেনবারও ক্ষমতা নেই। তার উপরে মহাজনদের তাগাদা। আমার এই দুরবস্থা দেখে প্রভুর উদ্বেগ ও চিন্তার শেষ নেই। রাত্রে তাঁর ঘুম নেই। আমাকে পরামর্শ দিতে দিতে মুখ চোখ লাল হয়ে উঠছে, বাঁধান দাঁত খুলে আসছে। যেন তাঁরই শতদায়। আমার এমন অবস্থায় আমার আত্মীয় স্বজনরা কেউ ফিরেও চাইল না। প্রভু বলেন, আমি টাকা দিচ্ছি তুমি লটারি ধর। মহাজনদের কাছে তোমার অবস্থার কথা জানিয়ে ঋণ মাপ করে নিতে বলো। প্রভু লটারীর টাকা সাধলেও আমি নিতাম না, তবে মধ্যে মধ্যে প্রভুকে না বলে তাঁর পয়সার থলি থেকে টাকা নিয়ে লটারী কিনতাম যদি লেগে যায়, না লাগলে প্রভুর অলক্ষে টাকা রেখে দিয়ে যেতাম। প্রভুর আদেশে জামাইবাবুকে সঙ্গে নিয়ে আমি কলকাতা গিয়ে মহাজনদের আমার দুরাবস্থার কথা জানালাম। শ্রীগৌররায়জীর কৃপায় ও প্রভুর আশীর্বাদে একজন মহাজন ছাড়া সকলেই ঋণ মুকুব করে দিলো। আমার এই অবস্থা দেখে শ্রীল দীনেশ প্রভু বলেছিলেন রাধারমণ তুমি ভয় করো না, তুমি যে নৌকায় দড়ি বেঁধেছ, তোমার কোন ভয় নেই। প্রভুর আদেশে দোকান অর্দ্ধেক বিক্রি কোরে সেই মহাজনের ঋণ শোধ করে দিলাম। তারপর মধ্যে মধ্যে অফিসাররা এসে দোকানের মাল পত্র দেখে, এটা সেটা ছুতো কোরে কেস ঠুকে দিতো। আমি প্রভুকে এসে জানাতাম, প্রভু বলতেন, তোমাদের আপদ বিপদের কথা শুনতে শুনতে আমি গেলাম, আমার কি ক্ষমতা আছে তোমাদের বিষয়ের কথা যা জানাবার ঐ গৌররায়ের দরজায় গিয়ে জানাও। তোমরা বিষয় নিয়ে গোলমাল পাকাবে আর ঠাকুর তোমাদের বিপদ থেকে রক্ষা করবে।

প্রভুর আচরণে লীলায় মহাপ্রভুর কথা মনে পড়ে যায়। ভবানন্দের ছেলে গোপীনাথ রাজার কর দিতে না পারায় তাকে নিয়ে গিয়ে যখন চাঙ্গে চড়াল তখন ভক্তরা ছুটে এসে মহাপ্রভুকে জানালেন, মহাপ্রভু বল্লেন আমি কি করতে পারি সে রাজার কর না দিয়ে পাপ করেছে তার ফলে রাজা তাকে শাস্তি দিচ্ছে এতে আমার কিছু করবার নেই। পরে আর এক দল ভক্তরা এসে প্রভুর কাছে তাঁর প্রাণ ভিক্ষার জন্য জানালে প্রভু বললেন আমার কোন কিছু করার ক্ষমতা নেই যাও জগন্নাথকে গিয়ে জানাও তাঁর কৃপায় অসম্ভব ও সম্ভব হতে পারে ইত্যাদি। প্রভুর কথাও ঠিক এইছিল যা কিছু জানাবার ঐ গৌররায়কে বলো তিনি সব করতে পারেন।

১৩৬৩ সালে বন্যার পর বহরমপুর কোর্ট থেকে সংবাদ এল ৮ বৎসরের ইনকাম্ ট্যাক্সের সব খাতা দেখাতে হবে। ঐ খাতা আমার কোথায়। বন্যায় অনেক নষ্ট হয়ে গেছে। প্রভুকে এসে জানালাম, প্রভু গৌররায়জীর চরণ তুলসী দিলেন। ঐ চরণ তুলসী নিয়ে কোর্টে গেলাম। আমার আগের ব্যাবসাদারকে হাকিম ডাকলেন। সে কাঠ গড়ায় দাঁড়াতে জজ তাঁর কাছে আট বৎসরের খাতা দেখতে চাইলেন। সে বললেন বন্যায় সব ভেসে গেছে। উত্তরে জজ বললেন খাতা গুলো ভেসে গেল, তুমি ভেসে গেলে না। পরে অনেক জরিমানা হল। এবার আমার পালা। আমার উত্তরও তো তাই। যথা সময়ে আমার ডাক পড়ল। জজ সাহেব খাতা দেখতে চাইলেন। আমি গৌররায়জীও প্রভুপাদকে স্মরণ করে বললাম বন্যায় সব নষ্ট হয়ে গেছে। জজসাহেব আমার দিকে চেয়ে বললেন কাগজে লিখে দিন যে খাতা সব বন্যায় নষ্ট হয়ে গেছে।

গৌররায়জীর কৃপাও প্রভুপাদের আশীর্বাদে আমার আর কোন অর্থদণ্ড হলো না। আর একবার ঘিয়ের কেসেও এই অবস্থা। আমার আগের লোকের ছিল পাঁচসের ঘি-তার দণ্ড হলো ৫০০ টাকা। আমার ছিল দুই টিন ঘি—গৌররায়জীর চরণ তুলসী ও প্রভুর আশীর্বাদ থাকায় আমার হলো ১০০ টাকা জরিমানা।

আমার দীর্ঘ দিনের বাসনা ছিল একবার যদি গৌররায়জী আমাদের বাড়ী গিয়ে থাকতেন তবে আমরা ধন্য হতাম। এতো সম্ভব নয় বামনের চাঁদ ধরার প্রয়াস।

১৩৬৩ সালের বড় বন্যা যখন আসল, ছাড়া গঙ্গা ছাপিয়ে হুহুরবে বন্যার জল আসতে লাগলো। মিউনিসিপালটি থেকে আমাদের বাড়ীর সামনে বাঁধ দিতে লাগলো। হুদোয় হুদোয় লোক আসছে দেখতে, সকলের মুখে এককথা ঢাকা স্টোর্সের এই বাড়ী ভেঙ্গে যাবে জলের স্রোতে। এই শুনে আমাদের বাড়ীর সকলে বাড়ী ছেড়ে রাধাবাজারে আমার খুড় শ্বশুরের বাড়ীতে আশ্রয় নিলো। এদিকে আশ্রমে জল ঢুকেছে। আমি প্রভুকে দেখতে এলাম। প্রভু ঠাকুর নিয়ে আমাদের বাড়ী যেতে চাইলেন। প্রভুকে নিয়ে নৌকায় করে ছাড়া গঙ্গার ওপর দিয়ে আসছি। আর প্রভুকে বললাম—সকলে বলছে আমাদের বাড়ী থাকবে না, বন্যায় ভেঙ্গে যাবে। আমার দোকানের তো এই অবস্থা, তার উপরে বাড়ী পড়ে গেলে কি উপায় হবে। তার উত্তরে প্রভু বললেন দেখাই যাক্ না। প্রভু আমাদের বাড়ী এসে উঠলেন। অন্তরযামী গৌররায় আমার অন্তরের কথা শুনেছেন, তাই বন্যার জল আমাদের বাড়ী এলেন। আমরা রাধা বাজারে থাকি। প্রত্যহ প্রভুর দর্শনে আসি। প্রভুও গুরুদেব সুখেই আমাদের বাড়ী আছেন। প্রভুকে জিজ্ঞেস করলাম, প্রভু কোথায় স্নান করবেন। প্রভু বললেন, কেন ঠাকুর কানাই ঘাটে। আমাদের

বাড়ীর নাম ঠাকুর কানাই নিকেতন। গঙ্গার স্বচ্ছজল বয়ে যাচ্ছে বাড়ীর উঠোনের ওপর দিয়ে। প্রভু সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ঐ জলে স্নান করতেন।

আমাদের বাড়ী ছেড়ে চলে গিয়ে দূর্গতির শেষ নেই। শহরের নোংরা জল ও লোকের হৈ হট্টোগোলে অস্থির।

গৌররায়জী যাওয়ায় বাড়ীর কোন ক্ষতি হয় নি। সকলে অনুমান করেছিল আমাদের বাড়ী ভেঙ্গে শহরে জল ঢুকবে। কিন্তু ঠাকুরের কৃপায় বাড়ী ভেঙ্গে জল না গিয়ে ছাড়া গঙ্গা ছাপিয়ে গিয়ে শহর ভাসিয়ে দিয়েছিল। প্রভু একদিন বলেছিলেন, গৌররায়জী তোমাদের বাড়ী গেছেন। তোমাদের পাঁচ পুরুষের কোন আপদ হবে না। শ্রীল বিশ্বম্ভর বাবাজী মহারাজ বলেছিলেন, রাধারমন, তোমাদের বাড়ী মহাতীর্থ হলো জানবে।

প্রভুপাদের আশ্রমে তখন প্রতি সোম ও মঙ্গলবার ধারাবাহিক হরিকথা আলোচনা হতো। ঐদিন প্রভুর মুখে হরিকথা শোনবার জন্যে বহু ভক্তের সমাগম হতো আশ্রমে।

শ্রীল গোপীদাস বাবাজী প্রতি সপ্তাহেই আসতেন প্রভুর মুখে হরিকথা শুনতে। বাবাজী মহাশয়ের ভজন ছিল প্রত্যহ প্রতি মন্দিরে পাঠ শোনা। পাঠ শুনে তাঁর খুব ভাব হতো আমরা দেখেছি। একদিন বাবাজী মশাই প্রভুকে বলছেন, প্রভু এত পাঠ শ্রবণ করি কই ভজনের তো কিছু অনুভব পাচ্ছি না। উত্তরে প্রভু বললেন বর্তমানে পাঠ শুনতে যাওয়া মানে স্ত্রী লোকের গায়ের হাওয়া লাগান। এই কথা শোনা মাত্র বাবাজী মশায়ের মত পরিবর্তন হয়ে গেল। সেই দিন থেকে সপ্তাহে সপ্তাহে প্রভুর পাঠ শোনা ছাড়া অন্য মন্দিরে আর কোন পাঠ শুনতে যেতেন না।

এই সংবাদে প্রভু সুখী হয়ে তাঁকে বলেছিলেন, অনেক পাঠ শুনেছেন, এবার বাড়ীতে দরজা দিয়ে কেবল একান্ত ভাবে নামাশ্রয় করে ভজন করুন, তাহলে নামের কৃপায় ভজনের উপলব্ধি পাবেন। যাঁরা প্রভুর পাঠের হরিকথা শ্রবণ করে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই এদিক সেদিক ছোটাছুটি না করে নামে একনিষ্ঠ হয়ে ভজনে বসে গিয়েছিলেন।

আমাদের কালীবাবুকে দেখেছি, পূর্বে তিনি বহু সাধুসঙ্গ ও হরিকথা শ্রবণ করতে যেতেন। যেদিন তিনি আমাদের প্রভুপাদের সঙ্গ করলেন, সেইদিন থেকে তিনি কোথাও আর হরিকথা শ্রবণ করতে যেতেন না।

তখন শীতকাল আশ্রমের দুতলার বারান্দায় আর বসা যায় না, তাই আশ্রমের নীচের ঘরে হরিসভার আয়োজন করা হয়েছে। সোমবার বহু ভক্ত সজ্জন এসে উপস্থিত হন প্রভুর হরিকথা শোনবার জন্যে। একদিন প্রভু হরিকথা আরম্ভ করবেন,

সেই সময়ে নবদ্বীপের একজন বিশিষ্ট ডাক্তার কে.সি. ঘোষ একজন লাল গেরুয়াপরা সাধুকে নিয়ে উপস্থিত। ডাক্তারবাবু প্রভুকে লক্ষ্য করে বললেন ইনি কলিকালের শঙ্করাচার্য্য ইনি প্রমাণ করবেন ঈশ্বর নেই। তার উত্তরে প্রভু বললেন, আমরা তো এই সভায় ঈশ্বর নেই প্রমাণ করতে আসিনি, ঈশ্বর আছেন আমরা সকলেই স্বীকার করি। আপনার প্রমাণ এই ক্ষুদ্র সভায় ঠিক্ শোভা পাবে না। বহু বড় বড় সভা নবদ্বীপে হয় সেই সব স্থানে হলেই শোভা পায়। আর শাস্ত্রও বলেছেন যাঁরা ঈশ্বর স্বীকার করেন না তাদের সঙ্গে কোন কথাই বলবেন না। আমরা শাস্ত্রবাক্য অনুসারে আপনার সঙ্গে এই বিষয় কোন কথা বলতেই চাই না।

তখন ডাক্তারবাবু বললেন, তাহলে এখানে বাইজী নাচ হলে ভাল হয়। এই কথা শোনা মাত্র প্রভুর চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল গড়িয়ে পড়লো। ভক্তরা সকলে বিচলিত হয়ে পড়লেন। কালীবাবু বললেন ডাক্তারবাবু আপনি এখান থেকে চলে যান। ডাক্তারবাবু সেই সাধুকে নিয়ে চলে গেলেন, সেদিন আর হরিকথা হল না। কেবল শ্রীনাম সংকীর্ত্তন হয়েছিল। এদিকে আমার গুরুদেব ডাক্তারবাবুর অপমান সহ্য করতে না পেরে বাইরে গিয়ে ডাক্তারবাবুকে বললেন, আপনি কাকে বলে বাড়ীর মধ্যে ঢুকেছেন, জানেন আমি আপনাকে পুলিশে ধরিয়ে দিতে পারি। যথা সময়ে কীর্ত্তন সমাপন হলে প্রভু ওপরে উঠে এসে আমার গুরুদেবকে খুব বকলেন, বললেন তোমার কি একটুও ধৈর্য নেই, বৈষ্ণবদের স্বভাব সর্বদা ধৈর্যশীল হওয়া। আমাকে উদ্দেশ্য করে কত অপমান করে গেল কই আমি তো কোন প্রতিবাদ করলাম না। মহতের কাছে অপরাধের ফলে এর কয়েক সপ্তাহ পরেই ডাক্তার কে.সি. ঘোষ মারা গেল।

আমি প্রায়ই রাত্রের দিকে এসে প্রভুপাদের চরণ টিপে দিতাম। প্রভু আমার ম্যাসেজ খুব পছন্দ করতেন। রাত্রে ঠাকুর ঘরে যাবার পূর্বে কিছু সময় ম্যাসেজ করতাম। আমি শুনেছিলাম বৈষ্ণবের হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম। তাহলে বৈষ্ণবকে স্পর্শ করলে নিশ্চয়ই গোবিন্দকে স্পর্শ করা হয়। প্রভুর চরণ টিপতে টিপতে মধ্যে মধ্যে তাঁর চরণ দুটি আমার বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরতাম। একদিন প্রভুকে বললাম, প্রভু শুনেছি বৈষ্ণবের হৃদয়ে ভগবান থাকেন, তাহলে বৈষ্ণবকে স্পর্শ করলে নিশ্চয়ই ভগবানকে স্পর্শ করা হয়। তার উত্তরে প্রভু বললেন হ্যাঁ, বৈষ্ণব হলে তো।

১৩৭০/৭১ সালে শ্রীধাম বৃন্দাবন থেকে শ্রীমৎ তিনকড়ি গোস্বামী প্রভু নবদ্বীপে এসেছেন। প্রত্যহ অগণিত ভক্ত সমাগম হয়, তাঁর দর্শনে আমি একদিন শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর সঙ্গে গেলাম। তিনকড়ি প্রভু ঘরের ঝুপড়ির মধ্যে বসে

আছেন। শ্রীজীব প্রভুকে দেখে তিনি খুব খুশী। আমি তাঁর চরণসেবা করবো, এই বাসনা শ্রীজীব প্রভুকে বললাম, তিনি তিনকড়ি প্রভুকে বললেন, এই আমাদের রাধারমণদা, আপনার পাদসেবা করতে চান। ইনি প্রত্যহ আমাদের প্রভুর পাদসেবা করেন। তিনিকড়ি প্রভু রাজী হলেন, আমি তাঁর পদসেবা করলাম। পরের দিন প্রভুকে এসে বললাম কাল, তিনকড়ি প্রভুর পদসেবা করেছি, প্রভু বললেন যাক্ তোমার ভাগ্য ভাল আমার অঙ্গসেবার ফলে একজন মহতের সেবা তুমি পেয়ে গেলে। একদিন প্রভুর শরীর বিশেষ খারাপ হওয়ায় ডাক্তার যোগেশ ভট্টাচার্যকে কল দেওয়া হয়েছে। সকালে কল দেওয়া হয়েছে, ডাক্তার বাবু এলেন রাত্রে। পরে আর একদিন তাঁকে কল দিতে হবে, প্রভু বলে দিলেন ডাক্তার বাবুকে বলো তাঁর তো সময়ের খুব দাম তিনি কোন সময়ে আসতে পারবেন জানালে প্রভু সেই সময়ে প্রস্তুত থাকবেন। আমি গিয়ে ডাক্তার বাবুকে বললাম, আপনার কোন সময় যাওয়ার সুবিধে হবে বলুন সেই সময়ে প্রভু প্রস্তুত থাকবেন কারণ তিনি তো ভজনে থাকেন। তার উত্তরে ডাক্তারবাবু বললেন আপনার প্রভুকে একটু ভজন কম করতে বলবেন।

পরের দিন প্রভু জিজ্ঞেস করলেন ডাক্তারবাবু কি বললেন—বললাম ডাক্তার বাবু বলেছেন, আপনার প্রভুকে একটু ভজন কম করতে বলবেন। প্রভু একটু হাসলেন। যথা সময়ে ডাক্তারবাবু এলেন। প্রভুর সে কি দৈন্য আপনার অমূল্য সময় নষ্ট করে এসেছেন, এতেই ডাক্তারবাবু লজ্জিত হয়ে পড়লেন। পরে ডাক্তারী বিষয়ে কয়েকটি প্রভুর মুখে কথা শুনে তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তারপর থেকে প্রভু তাঁকে যখনই কল দিতেন তার ২/১ ঘণ্টার মধ্যেই ডাক্তারবাবু প্রভুকে দেখতে চলে আসতেন।

একদিন বাজার নিয়ে সকালে আশ্রমে গেছি। প্রভু আমাকে দেখে বললেন শহরের খবর কি? সেদিন শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী মহারাজ দেহরক্ষা করেছেন প্রভু তখনও জানেন না—একথা কেন প্রভু জিজ্ঞেস করলেন। বললাম রামদাস বাবাজী মশাই দেহরক্ষা করেছেন। শুনে প্রভু খুব দুঃখিত হলেন। পরে পাগলদাকে বললাম প্রভু আজ হঠাৎ একথা কেন জিজ্ঞেস করলেন 'শহরের খবর কি?' আজ যে শহরে হৈচৈ পড়ে গেছে বাবাজী মশায়ের জন্যে। পাগলদা বললেন তাঁদের মধ্যে তারে তারে খবর চলে যায়। জানানোর অপেক্ষা করেনা।

শ্রীগৌররায়জীর জন্য ভাল কিছু রান্না হলেই প্রভু আমার জন্যে রেখে দিতেন। আমি রাত্রে আসবো জানা সত্ত্বেও প্রভু গুরুদেবকে পাঠিয়ে দিতেন আমাকে ডাকার জন্যে। আমার যখন খুব অবস্থা খারাপ তখন একদিন সামান্য একটু সরিষা শাক

এনে ঠাকুরকে দিয়েছিলাম। তাতে প্রভুর কি আনন্দ। পরের দিন আমাকে প্রভু বললেন কালকে ঠাকুর যা তৃপ্তির সঙ্গে খেয়েছেন এমন আর কোন দিন খান না।

১৯৬৩ সালে চীনের যুদ্ধে সকলেই উদ্বিগ্ন। প্রভু প্রত্যহ শ্রীগৌররায়জীর চরণে তুলসী দিয়ে জানান। প্রত্যহ সকালে আমার কাছে খবর নেন চীন কতদূর এগলো। প্রভু বলেন আমি প্রত্যহ তো তুলসী দিচ্ছি। তুলসী যেন থাকতে চাইছে না। দেখি ঠাকুর কি করেন। যেদিন প্রভুকে বললাম প্রভু চীন ভারত ছেড়ে চলে গেছে, প্রভু যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন ঠাকুর সকল আপদ-বিপদ থেকে রক্ষা করেন। কিন্তু আমরা অধৈর্য হয়ে বিশ্বাস রাখতে পারি না। প্রভু তাঁর মনের কথা প্রাণের কথা আমাকে বলতেন। আর সকলকে বলতেন আমার ভাব রাধারমণ কিছুটা জানে।

একবার মঙ্গলবারের সকালে ঠাকুরের সেবার দ্রব্যাদি দিয়ে ঐদিন নয়টার ট্রেনে কলকাতা গিয়ে দোকানের মাল পত্র কিনে ঐদিন রাত্রে নবদ্বীপে ফিরেছি। পরের দিন ভোরে আবার ঠাকুরের বাজার (দ্রব্যাদি) নিয়ে আশ্রমে এসেছি। আমাকে দেখে প্রভু বললেন এই কলকাতায় ছিলে এর মধ্যে নবদ্বীপ ফিরে এলে। এই বলে একটা কাগজে নিম্নোক্ত কবিতাটি লিখে আমার হাতে দিলেন।

"ওগো তুমি রেলগাড়ী ।
যাই তোমায় বোলিহারী ॥
এই ছিলাম কলকাতায় ।
তাতে আবার ভুল কোথায় ॥
নবদ্বীপে এসেছি সদ্য ।
যোগান দিচ্ছি সবার খাদ্য ॥

প্রভুর মাড়িতে বেদনা হতো বলে প্রত্যহ রাত্রে শোবার সময়ে একটুকরো হরতুকী মুখে দিয়ে শুতেন। একটা শিশিতে আমি হরতুকী ভেঙ্গে টুকরো করে রেখে দিতাম, ফুরোবার আগেই, শিশির আধা আধি হলেই আবার হরতুকী ভেঙ্গে এনে শিশিতে ভোরে রাখতাম। প্রভু বলতেন যেন প্রদীপের সলতে এক ভাবেই জ্বলছে বাড়াতে হয় না। তুমি যে কত টাকার হরতুকী খাওয়ালে এর হিসাব নেই। সেজমামা নবদ্বীপে রামগোবিন্দ রোডে যে জমি কিনবেন ঠিক করেছেন সেই জমিটা দেবত্ব সম্পত্তি। এই জন্য কেউ নিতে চায় না। যার জমি তিনি এক জন বাবাজী। তাঁর নাম প্রায় সকলেই জানেন। বাবাজী মশাই মামাকে কোর্টে নিয়ে গিয়ে হাকিমের কাছে লিখে দিলেন আমি যোগেশচন্দ্রদের কাছে জমি বাবদ ৮০০ টাকা

পাইলাম। এদিকে সেজমামাকে সকলেই ঐ জমি নিতে বারণ করছে। এমনকি কলকাতায় উকিলদের সঙ্গে পরামর্শ করায় তাঁরাও জমি নিতে বারণ করলেন। মামা টাকা দিতে দেরী করছেন বাবাজী মশাই ভাবলেন বোধ হয় যোগেশদে আর টাকা দেবে না, এই চিন্তায় তাঁর ঘুম নেই, বায়ু চড়ে গেছে একদিন মামা দেখেন বাবাজী মশাই মাথায় ঘৃতকুমারী তেল দিচ্ছেন। তখন প্রভুপাদ কলকাতায়। মামা কলকাতায় গিয়ে প্রভুকে বললেন বাবাজীকে দেখে এলাম মাথায় ঘৃতকুমারী তেল দিচ্ছেন হয় তো বাবাজী মনে করছেন জমিটা হাত ছাড়া হয়ে গেল। এই কথা শুনে প্রভু মামাকে বললেন 'যোগেশ' তুমি ধামে গিয়ে একজন বাবাজীর মৃত্যুর কারণ হবে। টাকাও যা মাটিও তা, যাও বাবাজীকে টাকা দিয়ে দাও। প্রভুর কথায় মামা সেই দিনই নবদ্বীপে এসে বাবাজী মশাইকে টাকা দিয়েছিলেন। পরে ওর আসেপাশের জমি বহু মূল্যে বিক্রি হয়েছে।

১৩৮২ সালে ১৫ই শ্রাবণ প্রভুর দেহরক্ষার পূর্বদিন সন্ধ্যায় যখন তাঁর অবস্থা খুব খারাপ হয়েছিল। তাঁর দর্শনে বহু বহু ভক্ত গিয়েছিলেন। আমি ১০/১০-৩০ পর্য্যন্ত আশ্রমে থেকে বাড়ী ফিরেছি। পরে শুনলাম প্রভু আমার খোঁজ করেছিলেন একটু ম্যাসেজের জন্যে। নিমাই দাদা বললেন রাধারমণ বাড়ী চলে গেছেন, নিমাই দাদাই প্রভুকে ঐসময়ে একটু ম্যাসেজ করে দিয়েছিলেন।

পরের দিন সকালে আমাদের বাড়ীর সকলেই প্রভুর দর্শনে যাবার জন্য ব্যাস্ত। আমরা ধারণাই করেছিলাম প্রভু আর থাকবেন না। কিন্তু যে যাবে সে তো প্রভুর ঐ অবস্থা দেখে ফিরবে না, বাড়ীতে থাকবে কে। আমি বারণ করা সত্ত্বেও বাড়ীর সকলেই চলে এল আশ্রমে আমি একা বাড়ীতে রইলাম। তারা আশ্রমে এসে দেখে প্রভু অনেকটা ভাল আছেন, এই দেখে সকলেই বাড়ী ফিরে গেল। তখন আমি আশ্রমে এলাম।

দেবুদা তখন ঠাকুর সেবায় বসেছেন। আমাকে দেখে দেবুদা বললেন রাধারমনদা প্রভুর অবস্থা যদি খারাপ বোঝ আমাকে ডেক। আমি ঐ গৌররায়জীকে প্রণাম করে প্রভুর কাছে গেলাম, দেখি গিয়ে প্রভু আর থাকবেন না, কাকা প্রভুর অঙ্গে হেলান দিয়ে কর জোপছেন। ভক্তরা অনেকেই ইতিমধ্যে এসে গেছেন তাঁরা নাম শোনাচ্ছেন। আমি চিৎকার করে দেবুদা দেবুদা বলে ডাকলাম। দেবুদা এক দৌড়ে প্রভুর কাছে চলে গেলেন। শ্রীগৌররাজয়ীর একটি আলেখ্য তাঁর বুকে ধরলেন ও শ্রীরাধাকুণ্ডের জল অঙ্গে মুখে দিয়ে দিলেন। প্রভু সেই সময়েই জপ করতে করতে হরিনাম কীর্ত্তনের মধ্যে মহাপ্রস্থান করলেন। প্রভু যেন আমাকে

এই লীলা দেখাবেন বলেই অপেক্ষা করছিলেন—আমি না আসা পর্য্যন্ত।

দেখতে দেখতে অগণিত লোক এসে উপস্থিত। প্রভুকে যথা সময়ে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে যাওয়া হলো। অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার পর তাঁর চিতা ভস্ম ও অস্থি আমি বাড়ীতে নিয়ে এলাম ভবিষ্যতে শ্রীধাম বৃন্দাবনে গিয়ে রাধাকুণ্ডে দেবার জন্যে। এই ভার প্রভু আমার উপরেই দিয়েছিলেন। এই জন্য প্রভু আমার পথের পাথেয় হিসাবে ২০০ টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন। আমি ঐ টাকা খরচ না করে প্রভুকে মহাজন করে ঐ টাকা ব্যাবসায় লাগিয়ে ছিলাম। শ্রীগৌররায়জীর কৃপায় ও প্রভুর আশীর্বাদে আবার ব্যাবসার উন্নতি হয়।

শ্রীধামাদি দর্শন

৬। শ্রীব্রজমণ্ডল দর্শন

[প্রায় ষাট বৎসর পূর্বেকার এই সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ কাহিনীর মধ্য দিয়ে আমরা এক শুদ্ধ ভক্তের পূতদৃষ্টিতে তৎকালীন ব্রজমণ্ডলের একটা সহজ পরিচয় পাই। অনুষঙ্গে মেলে দেশ, কাল ও পরিবেশের খণ্ডচিত্র। সকৌতুকে লক্ষ্য করা যায় সেই সময়ের বাজারদর, জয়পুর শহরে প্রথম বৈদ্যুতিক আলোকসজ্জার কথা, কিম্বা স্থানে স্থানে নূতন BUS SERVICE চালু হওয়ার বিবরণ।

ব্রজমণ্ডলের ভজনজগতে যেখানে ভজনীয়াগণের মধ্যে শুদ্ধমাত্র স্মরণেরই প্রাধান্য সেখানে প্রভুপাদ কর্তৃক নববিধা ভক্তির অঙ্গীরূপে শ্রীনামের স্বরূপতত্ত্ব ও মহিমাদি প্রচার এবং শ্রীনামের একমুখ্যতারূপ সর্বোপরি বিজয়বার্তা ঘোষণা তৎকালে শ্রীধামবৃন্দাবনে কিরূপ আলোড়ন তুলেছিল ও পরিশেষে অবিসংবাদিত ভাবে সকলের শ্রদ্ধা, অনুমোদন ও প্রশংসার মধ্য দিয়ে প্রভুপাদের সম্মাননায় যার পরিসমাপ্তি তার একটা আভাস কৌতুহলের সঙ্গে লক্ষ্য করার বিষয়। প্রখ্যাত চিকিৎসক, ও সাধকভক্ত ডাঃ ইন্দুভূষণ বসু (শ্রীমৎ যতীন্দ্র রামানুজাচার্য), পণ্ডিত বাবা শ্রীমৎ অদ্বৈতদাস বাবাজী প্রমুখ প্রভুপাদের সমসাময়িক বিখ্যাত বৈষ্ণব সাধকগণের সঙ্গে পরিচয় সূত্র ও জানা যায়]



নামবিজ্ঞানাচার্য কানুপ্রিয় গোস্বামী

আশ্বিন মাস। বুধবার ইং ১৪/১০/৩১ তারিখ। তুফানমেলে হাওড়া হয়ে শ্রীধাম বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া গেল। ট্রেনের সময় বিকাল ৪/১৫ মিনিট। স্টেশনে জ্ঞানবাবু (বিখ্যাত মিষ্টান্ন বিক্রেতা শ্রীদ্বারিক ঘোষের জ্যেষ্ঠপুত্র) দধি (প্রভুপাদের অনুজ) ও শৈলেনবাবুর (জনৈক ভক্ত) সঙ্গে দেখা। সঙ্গী হইলেন নিরঞ্জন বাবু, পঞ্চাননবাবু, যোগেশ (নবদ্বীপের ঢাকা ষ্টোর্সের মালিক, শ্যামপদবাবু (প্রভুপাদের শিষ্য, উকিল) ও যোগেন্দ্র বাবু, (নিরঞ্জন বাবুর গুরুভাই)। ট্রেনে বিশেষ কোন অসুবিধা হয় নাই। সন্ধ্যার পূর্ব পর্যন্ত কিছুক্ষণ উভয় পার্শ্বের শ্যামল দৃশ্যাবলী বিশেষ উপভোগ্য বিষয়। পরে ক্রমশঃ নৈশ অন্ধকার আসিয়া সব কিছু ঢাকিয়া দিল। পথে আর বিশেষ কিছু দেখা যায় নাই। মোগলসরাই, একটানা কেবল বৃন্দাবন যাওয়ার অপেক্ষা। প্রয়াগে নামিয়া দর্শনাদি করিয়া যাওয়াই ভাল বিবেচনায় —প্রত্যুষে এলাহাবাদে অবতরণ করিয়া ধর্মশালায় আশ্রয় গ্রহণ করা গেল।

১৫.১০.৩১ —**প্রয়াগ।** —নৈশ অন্ধকার অপসারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পুণ্যক্ষেত্র প্রয়াগের অন্তবর্তী স্থানসকল দৃষ্টিপথে জাগিয়া উঠিল, কিছুক্ষণ পরে যমুনা সেতুর উপর গাড়ি আসিল। প্রত্যূষেই সর্বপ্রথম সেতুর উপর গাড়িথেকে দূরস্থিত সঙ্গমস্থলের উদ্দেশ্যে আমরা প্রণাম করিলাম। এই পুণ্য প্রয়াগে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পবিত্রচরণরজ স্থাপিত হইয়াছিল—ইহা স্মরণে স্থানটিকে আরো পবিত্র মনে হইতে লাগিল। তা ছাড়া কুম্ভমেলার উদ্দেশ্যে এইস্থানে বহু সাধুর সমাগমে স্থানের পবিত্রতা বৃদ্ধি হইয়াছে।

ধর্মশালাটি স্টেশন থেকে অধিক দূরে নহে। ঘর গুলি খুব বড় ও পরিস্কার না হলেও বাড়ীতে বেশ আলোবাতাস আছে। দ্রব্যাদি দ্বিতলের একটি ঘরে রাখিয়া আমরা দুই খানা টাঙ্গা ভাড়া করিয়া সঙ্গমে স্নান করিবার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলাম। যে পথ দিয়া টাঙ্গা চলিল, তাহা পুরাতন শহর। পথগুলি অপেক্ষাকৃত পরিস্কার। তবে এদিকের বাড়িঘর গুলি তেমন পরিস্কার পরিচ্ছন্ন নহে। প্রায় ৩/৪ মাইল পথ। শহরের বাহিরের মাঠ ও পথের দৃশ্যাবলী মন্দ নয়। প্রাচীন কেল্লার উচ্চভূমি দেখা গেল। Wireless station এর খুব উঁচু ছয়টি পোষ্ট। পার্শ্বে উচ্চ প্রস্তর প্রাচীরবেষ্টিত দুর্গ—যমুনার তট পর্যন্ত বিস্তৃত। দেখিলে যেন অনেক পুরাতন কল্পনা মনে জাগিয়া উঠে। প্রায় ১৭০০ বৎসর আগেকার সম্রাট অশোকের প্রস্তরলিপি আছে। দুর্গের পার্শ্বস্থ যমুনার ঘাটে অনেক নৌকা। ছোট বোটের মত দেখতে উপরে নানা প্রকার চাল (আচ্ছাদন)। এখান হইতে সঙ্গমস্থলে লইয়া গিয়া স্নান করায়। নিকটেই ঘাটের উপর ছোট ছোট দরমা ও বেড়ার ঘর। এক একটা পতাকা উড়ান। প্রত্যেক পতাকায় নানা প্রকারের চিত্র আঁকা। এসব পাণ্ডাদের আড্ডা

ও বিশেষ বিশেষ চিহ্ন। একটি গঙ্গার খাল পার হইয়াই সঙ্গমস্থল। গঙ্গা ও যমুনা পরস্পর মিলিয়াছেন। সেখান হইতে পুনরায় গঙ্গা বাঁকিয়া কাশীর দিকে গিয়াছেন। জল এখন ঘোলা। দুই নদীর সঙ্গমস্থলে কিছু বিশেষ রেখা' প্রভৃতি বুঝা যায় না। যেমন নবদ্বীপের নীচে খোড়ে নদী (জলঙ্গী) ও গঙ্গায় দেখা যায়। স্নান করে পূর্বঘাটে ফিরিয়া আসিলাম। নৌকার ভাড়া ৭৫ পয়সা লইল। আসিবার সময় কেল্লার মধ্যে অনেক দেবদেবীর মূর্তি আছেন শুনিয়া দেখিতে গেলাম। মূল দেবতা অক্ষয় বট। কেল্লার ভিতর সমস্ত স্থান পাশ ব্যতীত দেখা যায় না। নানা প্রকার উচু নীচু বাড়ীঘর, খাত, সুড়ঙ্গ প্রভৃতি। মাটির নীচে Tunnel এর মত লম্বা পাথরের দালান—ভিতরে নানা প্রকার ঘরের মত ও বহু দেবতা ও ঋষির মূর্তি। মধ্যস্থলে অক্ষয়বট একটি গাছের গোড়ায় দেখা যাইতেছে। নানা প্রকার পিত্তলের মুখ আঁকা। দেখিয়া বাহিরে আসিলাম। সম্মুখে নদীর তটে—মাঠের উপর—নানা প্রকার মাটির মূর্তি। পয়সা আদায়ের জন্য। আর একটু উপরে উঠিয়া আসিয়া টাঙ্গাযোগে ধর্মশালায় প্রত্যাগমন করিলাম। রৌদ্রের তেজ অধিক বলে দুপুরে বেশী গরম বোধ হবে মনে করিলাম। কিন্তু তাহা হয় নাই—সর্বক্ষণ বেশ শীতল হাওয়া। গরম মোটেই বোধ হয় না। দুপুর বেলা বিশ্রাম করিয়া বৈকালে বামনদাসের খোঁজে যাওয়া গেল। (বামনদাস—প্রভুপাদের দেশ ভাজনঘাটের অধিবাসী ছিলেন। এঁর জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীজগন্নাথ গুপ্ত—পুণায় River Research Institute এর Director ছিলেন।) বায়োস্কোপের কাছে টাঙ্গা ভাড়া করিয়া শহরের দর্শনীয় স্থান সকল দেখিতে যাইলাম। প্রথমে দুর্গা দেবী, গাড়ী হইতেই প্রণাম করিয়া বিন্দুমাধব দর্শনে যাইলাম। শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ। বাড়ীর ভিতরের দিকটা বেশ আশ্রমের মত নির্জন ও গম্ভীর বোধ হইল। বাহিরের দালানের সিমেন্টের বেদীর উপর গেরুয়া চাদর পাতা শয্যা বা আসন—বেশ ত্যাগীর মতই দেখাইতেছিল। সেখান থেকে নাগবাসুদেব দর্শনে। গঙ্গার উপরে মন্দির, প্রস্তরের নাগমুর্তি। সম্মুখে গঙ্গার উপর পাথর বাঁধা ঘাট, অতি মনোরম বোধ হইল। গঙ্গা পর্যন্ত ঘাটের সিঁড়ি নামিয়া গিয়াছে। এখন অনেকটা ভাঙ্গাচুরা অবস্থা। ভজনের উপযুক্ত স্থান। উপরে প্রাচীন, বৃহৎ, জীর্ণ নিম গাছ। তাহা হইতে দুইটি ডাল নূতন বৃক্ষের ন্যায় উঠিয়াছে। এইরূপ প্রায় দেখা যায় না।

পরে স্বর্গীয় পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর আনন্দভবন দেখে—ভরদ্বাজ আশ্রম দেখা হইল। শ্রীরামচন্দ্র এখানে আসিয়াছিলেন, অতএব এখানকার প্রতিটি ধূলিকণা ও পবিত্র। এখান হইতেই ধর্মশালায় সন্ধ্যার পর ফিরিয়া আসিলাম। রাত্রিতে পাকের ব্যবস্থা করা হইল। শরীর বিশেষ সুস্থ নয়।

১৬/১০/৩১ —গতরাত্রির লঙ্কার ঝোল ও কূয়ার জলে শারীরিক বিশেষ পরিবর্তন আনিয়াছে প্রাতে Wind হয়নাই। অজীর্ণ ও অগ্নিমন্দার ভাব অনেক কম। এলাহাবাদের সুন্দর হাওয়া ও কূপের জলের গুণ স্পষ্টই অনুভব করা যায়। প্রাতে খসরুবাগ দেখা হইল। বাসার খুব নিকটেই। অদ্যই সাড়ে এগারোটার গাড়ী Punjab Mail য়ে রওয়ানা হওয়া স্থির হইল। প্রাতে Cyclonic Weather শীঘ্র স্নানাদি সারিয়া Stove এ দুইটি অন্ন পাক করিয়া নেওয়া গেল। গাড়ীতে ভীড় ছিল না। বেশ আরামেই বসা গেল। প্রায় সাড়ে আট টায় Hatras Junction এ এসে সেখান হইতে প্রায় একঘণ্টা পরেই Muthura Junction এর গাড়ী পাওয়া যাইল। কিছু মুড়ি ও ছোলাভাজার সঙ্গে জ্ঞানবাবুর (ঘোষ) মিষ্টান্নের সদ্ব্যবহার করা হইল। জ্ঞানবাবুর প্রদত্ত মিষ্টান্ন যেন গোপালের দধি ভাণ্ড। ৬ জনে মিলিয়া নারকুলে সন্দেশ তিনদিনে প্রায় কিছুই শেষ করিতে পারা যায় নাই— এখনও চলিবে।

মথুরা—

রাত্রি প্রায় ১২ টার সময় Mathura Cantt'পৌঁছিয়া waiting Room এ দিব্য শয্যা পাতিয়া শয়ন করা হইল। একঘুমে রাত কাবার। রওয়ানা হইয়া পর্যন্ত ঠাকুরের কৃপায় কোথাও কোন বিশেষ কষ্ট বা অসুবিধা হয় নাই বরং এত সুবিধা ভোগে তীর্থ ভ্রমণে যেন অসুবিধাই বোধ হইতেছে। যাহা হউক শ্রীরাধারাণী যেইরূপ ব্যবস্থা করেন তাহাই হইবে বা হইতেছে।

১৭/১০/৩১ বৃন্দাবনে—

৭ টায় শ্রীবৃন্দাবনের গাড়ীতে উঠিয়া অবশেষে শ্রীধামে পৌঁছান গেল। station হইতে আসিবার পথে শ্রীনাথবাবুর কুঞ্জ দেখিয়া আসিলাম। বেশ নির্জন স্থান। ভজনে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। তাঁহার বাতের অসুখ বৃদ্ধি পাইয়াছে। —সেবাকুঞ্জের নিকটেই একটি বাসা গিরীন্দ্র ঠিক করিয়া রাখিয়াছে। ভাড়া মাত্র ৫ টাকা। দ্বিতলে একটি বড় হল ঘর। নূতন বাড়ী, সম্মুখে খোলা ছাদ। বাড়ীর কোনও অসুবিধা নাই। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। পূর্বে বড়নাল কুঞ্জ ঠিক হইয়াছিল। সেই বাড়ী পুরাতন। অনেক অসুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল বোধ হয়। কিন্তু রাধারাণীর কৃপায় এমন একটি বাসাও পাওয়া যাইল যে যাহার বিষয় ভাল ছাড়া কিছুই মন্দ বলিবার নাই। বাসায় আসিয়া ক্রমে গিরীন্দ্র দেবেন্দ্র, শচীনন্দন, ভক্তিচরণ ও তারককেও দেখিলাম। তারকের ভেক লইবার পর সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইয়াছে। চেহারা একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। ক্রমে বাবাজী মহারাজদের সঙ্গেও দেখা হইল।

সকলেই প্রীতি অভিবাদনাদি জানাইলেন। নিরঞ্জনবাবুর * গুরুপুত্র শ্যামল আসিয়া সকলকে নিমন্ত্রণ জানাইলেন। অনেক নিষেধ করা সত্ত্বেও শুনিলেন না। অগত্যা স্নানাদি সারিয়া প্রায় ১ টার সময় সকলে প্রসাদ পাইতে যাইলাম। পুরাতন যমুনার উপর দুর্গের মত প্রাচীন বাড়ী। সম্প্রতি গৃহস্বামীর কন্যাটির মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু সেজন্য বিশেষ অভিভূত দেখিলামনা। ভজনের প্রকাশ আছে। মহাপ্রভুর সেবার নিমিত্ত ১ টাকা দিলাম। বাসায় ফিরিয়া কিছু বিশ্রাম করা হইল। গিরীন্দ্র আসিলে সন্ধ্যার সময় শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথ জীউর আরতি দর্শন করিয়া বাসায় ফিরিলাম। আজ এখানেই বিশ্রাম।

১৮/১০/৩১ প্রাতে বাহির হইয়া কামিনীবাবুর পুত্র গৌরবাবুর সহিত দেখা হইল। সত্যবাবুর (গুহ) বাড়ী যাইলাম। কিন্তু অসুখ বলিয়া দেখা হইল না। বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। ৩/৪ জন বৈষ্ণব বাবাজী দেখা করিতে আসিলেন। নূতন পরিচয় হইল। আহারান্তে বিশ্রামের পর বৈকালে পুনরায় বাহির হইলাম। মাধবদাস বাবাজীর ঠোরে 'শ্রীগোপালচম্পু' পাঠ হইতেছিলেন। বৈষ্ণব সভা— অনেক বৈষ্ণব সমাগত হইয়াছেন। পাঠ শুনিবার পর পাঠক গোস্বামীর সহিত পরিচয় হইল। সত্যবাবুর ও কামিনী বাবুর সহিত দেখা হইল। মাধবদাস বাবাজী মহারাজের জ্বর আসিয়াছে। দেখা করিয়া চন্দনাদি মিশ্রের ব্যবস্থা দেওয়া যাইল। (চন্দনাদি মিশ্র—প্রভুপাদের পিতৃদেব কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বি. এ/এল. এম. এস মহোদয়ের আবিস্কৃত ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের বহুল ফলপ্রদ একটি ঔষধ।) কামিনীবাবুর সহিত গৌরবাবুর Dispensary যাইলাম। এইখানে এইবার প্রবল ম্যালেরিয়া। ডাঃ ইন্দুবাবুর ভাগবত সম্বন্ধে কথাবার্তা হইল। (ডাঃ ইন্দুভূষণ বসু—.প্রখ্যাত চিকিৎসক এবং পরমভাগবত দীক্ষান্তনাম —শ্রীল যতীন্দ্র রামানুজাচার্য। খড়দহের বিখ্যাত শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির ও শ্রীসম্প্রদায়ের বলরাম ধর্ম সোপানের প্রতিষ্ঠাতা।) কাল ৯ টায় পুনরায় যাইবার কথা রহিল। কামিনীবাবুর নাতির অসুখ সুতরাং দেখিতে যাইতে হইল। রাত্রে বাসায় ফিরিবার কালে শ্রীশ্রীরাধাদামোদরদেবের আরতি দর্শন হইল। শচীনন্দন বাবাজীর সহিত চন্দনাদির বিষয় স্থির হইল। ৫ টাকা দিলেন ও নূতন ঔষধ দেওয়া হইল। অন্যত্র ও নমুনা (Sample) প্রভৃতি দেওয়া হইল ও কথাবার্তা হইল। গৌর ডাক্তার agent হইতে চাইলেন। কাল ঔষধ দিতে হইবে। আরও ঔষধ ও sample থাকা উচিৎ ছিল।

১৯/১০/৩১ সকালে কামিনীবাবুর সহিত দেখা করিতে যাইলাম। গৌরবাবুকে agent করে বড় ও ছোট ৩ শিশি করিয়া ঔষধ দেওয়া হইল। কামিনীবাবুর পুত্র

বধূও পৌত্রের অসুখ রোগী দেখিতে হইল। Malaria. চন্দনাদিরই ব্যবস্থা করিলাম। মাধবদাসবাবাজীকেও দেখিতে যাইলাম। জ্বর কমিয়াছে। কাল বিরাম হইতে পারে। কামিনীবাবুর ভজন কুটিরে যাইলাম। প্রাচীন বৈষ্ণব সম্বন্ধে অনেক কথা হইল। তাঁহার লেখা বৈষ্ণবজীবনীর খাতা দুইখানি বাসায় নিয়া আসিলাম। ডাঃ ইন্দুবাবুর ভাগবত বাসায় দিয়া গিয়াছে। সমস্ত দুপুর বেলাটাই বসিয়া মিলাইয়া দেখিতে হইল। কর্তব্যের দায় বড় দায়। বিষয় ব্যাপার শীঘ্র সারিয়া ফেলিতে হইবে। সামনের কয়দিন কেবল পারমার্থিক বিষয় লইয়া থাকিবার ইচ্ছা। আজ রাত্রিতে চন্দনাদির জন্য যাহা কর্তব্য তাহার সব কাজ মিটাইয়া ফেলিতে হইবে। [প্রভুপাদ সেই সময় কবিরাজী চিকিৎসা ব্যবসা করিতেন] বৈকালে বাহির হইয়া শ্রীমদনমোহনজীর পুরাতন মন্দিরের নিকট দ্বাদশ-আদিত্যের টিলায় বসিয়া শ্রীব্রজধামের চিন্ময়ত্ব সম্বন্ধে অনেকক্ষণ আলোচনা করিয়া বেশ আনন্দ পাওয়া যাইল। সম্মুখে সেই প্রেমভক্তির বিজয়স্তম্ভ স্বরূপ শ্রীমদনমোহনদেবের প্রাচীন মন্দির ম্লেচ্ছগণ কর্তৃক বিধ্বস্ত হইয়া যেন একই সঙ্গে প্রবল আস্তিক্যের ও নাস্তিকতার সাক্ষ্য দিতেছে। নিম্নে যমুনার বিশাল তটভূমি বিস্তৃত দেখা যাইতেছে। অতীতের অনেক কথা মনে জাগিয়া উঠে। শ্রীমদনমোহন দেবের আরতি দর্শন করিতে যাইলাম। শ্রীমদনমোহনদেবের, বামে শ্রীরাধারাণী, তৎপার্শ্বে শ্রীললিতা ও দক্ষিণে শ্রীবিশাখা দেবী সেবাপরায়ণা। সুন্দর ত্রিভঙ্গিম বিগ্রহ। শৃঙ্গার বেশ। আরতি কালে যে মাধুর্যের বিস্তার হইতেছিল তাহা স্মরণীয় ও অনুভবযোগ্য। বাসায় ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় রাত্রি ৮ টায় শৃঙ্গারবটে দুর্গাপূজা বাড়ীতে ডাক্তার গৌরবাবুর কীর্তন শুনিতে যাইলাম। সেখান হইতে বাসায় ফিরিয়া কিঞ্চিৎ মুড়ি প্রসাদ পাওয়ার পর শয়ন। শরীর ভাল নয়।

২০/১০/৩১ —**শ্রীরাধাকুণ্ড।**

সকালে মাধবদাস বাবাজীকে দেখিতে যাইলাম। জ্বর ছাড়েনাই—১০০° ডিগ্রি পর্যন্ত। Remittent type. চন্দনাদি ৪/৫ dose খাওয়ার পর ও বিশেষ উপকার নাই। অসুখ কিছু জটিল বলিয়া মনে হইতেছে। কামিনীবাবুকে অন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে বলিলাম। তাঁহার ইচ্ছা আমিই চিকিৎসা করি। কিন্তু কাল রাধাকুণ্ডে যাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। আর এইখানে বসিয়া থাকাও চলেনা—বিশেষতঃ এখানে ধামে এসে চিকিৎসা করিবার আর ইচ্ছা নাই। নিজের হৃদয়ভরা অনেক ব্যাধি—তাহারই চিকিৎসার জন্য আসা। বিশেষতঃ বাবাজীমহারাজের অসুখ আশঙ্কাজনক ও নিরাময়ও সময় সাপেক্ষ মনে হয়। উপকার হইলে সবদিকে ভাল হইত বটে কিন্তু

কৃষ্ণের যাহা ইচ্ছা তাহাই ফল ধরে। আমার ইচ্ছা বা অনুমানে কিছু হইবেনা। কামিনীবাবুর পুত্রবধূ ও পৌত্র ঔষধ সেবনে ভাল হইয়াছেন। এটাই যা মন্দের ভাল। বাসায় ফিরিয়া স্নান ও আহারাদি সারিয়া নিলাম। শরীর খারাপ। আহারের পর বমি হইল। অন্ন একেবারে সহ্য হইতেছেনা। দুর্বলতাও বোধ হইতেছে। বৈকালে কেশব কবিরাজের সহিত দেখা করিতে যাইলাম। সম্মানাদি প্রদর্শন বৈষ্ণবজনোচিত দেখাইলেন। একটু পাণ্ডিত্য বুদ্ধি আছে। ঠাকুর কানাইকুঞ্জ বিষয়ে কথাবার্তা হইল। আশাপ্রদ নহে। পরে কালিয়দহে যাইলাম। যমুনার উপর সুন্দর বাঁধানো ঘাট। যেমন পবিত্র তেমনি গম্ভীরভাব। সন্ধ্যায় বাঁধানো ঘাটের চবুতারায় বসিয়া সকলে মিলিয়া কীর্তন হইল। সেখান হইতে শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস বাবাজীর আশ্রমে যাওয়া হইল। পূর্বেকার যাত্রায় যেমন দেখিয়াছিলাম সেই পূর্ববৎ ভাব। আসনে বসাইয়া আলিঙ্গন প্রভৃতি ও হাতে করিয়া মিষ্টান্ন খাইয়ে দেওয়া প্রভৃতি। জিনিষটা যেন একই রকম বোধ হইল। উপদেশাদি ও পূর্ববৎ একই ভাবের। সঙ্গীদের কিছু কিছু প্রণামাদি দিতে বলিলাম। আশ্রমের বাইরে তখন জ্যোৎস্না রজনী। চারিদিকে বৃক্ষরাজী তখন পরম স্নিগ্ধ সৌন্দর্য বিস্তার করিয়াছে। মাঝে মধ্যে ময়ূরের সুতীব্র কেকাধ্বনি অতিসুন্দর বোধ হইল। অনেকটা রাস্তা হাটিয়া তবে বাসায় ফিরিলাম। শরীর দুর্বল বোধ হইতেছে। রাত্রিতে শৃঙ্গার বটের গোস্বামীদের দুর্গোৎসবস্থানে "জয়দেব" অভিনয় দেখিতে যাইলাম। চন্দনাদির সমুদয় sample ও বিজ্ঞাপন সমবেত দর্শকদের মধ্যে বিলি করিয়া দেওয়া হইল। শ্যামবাবুই সব ব্যবস্থা করিলেন। একটু অভিনয় দেখিয়া বাসায় ফিরিলাম। মুড়ি ও পানিফল প্রসাদ পাইয়া শয়ন করা যাইল। এখানকার পানিফল খুব সুন্দর বস্তু।

২১/১০/৩১—**শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড।**

সকালে শ্রীরাধারাণীর নাম করিয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি জিনিসপত্র গুছাইয়া লইয়া রাধাকুণ্ডের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলাম। Bus station' যে ৩ খানা Bus এ উঠানামা করিয়া প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে বাস ছাড়ল। সাড়ে এগার টায় মথুরায় পৌঁছাইয়া রাধাকুণ্ডের বাসে উঠিয়া পুনরায় ১ ঘণ্টা প্রায় অপেক্ষা করার পর শেষ পর্যন্ত রাধাকণ্ডে রওয়ানা হওয়া যাইল। শরীর বিশেষ দুর্বল বোধ হইতেছিল। প্রায় ১ টার সময় রাধাকুণ্ডে পৌঁছাইলাম। পথের দুইপার্শ্বের দৃশ্য বাংলাদেশের মত। পীচের নতুন রাস্তা হইয়াছে। কয়দিন আগে বৃষ্টি হওয়ায় এখনও স্থানে স্থানে জল জমিয়া আছে। ফসলাদিও বেশ ভালরকমই হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল। আসিবা মাত্র পাণ্ডারদলের ঝামেলা বড়ই অতৃপ্তিকর। নিরঞ্জনবাবুর সহিত সকলেই পরিচিত। ব্রজবাসীর কৃপা ও আত্মীয়তা তিনি বেশ লাভ করিতে পারিয়াছেন। তাঁহার হৃদয়টিও

সরল ও কোমল। শ্রীগোবিন্দের বাড়ী উঠিলাম। দোতলায় বড় ঘর ও একটি ছোট ভজনের ঘর। বহু প্রাচীন। কত ভক্তবৈষ্ণব এখানে আসিয়াছেন। একজন পাণ্ডা খাতা খুলিয়া ঠাকুরদাদার নাম দেখাইলেন। পাণ্ডাটির নাম শ্যামলাল পাণ্ডা। তাহার ঠাকুর দাদা আমার ঠাকুরদাদার পাণ্ডা ছিলেন। এত বৎসর পর ব্রজের খাতায় পরলোকগত পূজ্যপাদ পিতামহের নিজহস্তের লেখা নাম দেখিয়া প্রাণের মধ্যে একটা কেমন ভাব জেগে উঠিল। স্বাক্ষরটিকে প্রণাম করিয়া সেই পাণ্ডাকেই সাদরে নিযুক্ত করিলাম। আমরা ঠাকুরদাদার হাতের লেখা একখানি চিঠিও পর্যন্ত সংরক্ষণ করিতে পারি নাই। আর ইঁহারা তিন পুরুষ ধরিয়া এই সাক্ষরটুকু যত্নের সহিত রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। শুধু এরই জন্য সামর্থ থাকিলে যথেষ্ট পুরস্কার দেওয়া উচিৎ বলিয়া মনে হইল।

অতঃপর শ্রীকুণ্ডে স্নান করিতে যাইলাম। পুজ্যপাদ শ্রীগুরুদেবের (প্রভুপাদের পিতৃদেব) দেহাবশেষের শেষ স্মৃতিটুকু যাহা এতদিন কাছে ছিল শ্রীকুণ্ডের জলে সমাধি দেওয়াই প্রশস্ত মনে করিয়া কাপড় দিয়া বুকে বাঁধিয়া 'জয়গুরু' বলিয়া কুণ্ডে নিয়া যাইলাম। কুণ্ডের কানায় কানায় জল পরিপূর্ণ। সাঁতার ভাল না জানিলেও যেন একটা নূতন শক্তি অনুভব করিলাম। গিরীন্দ্র আমার হাতটা ধরিয়া সাঁতার দিতে লাগিল। আমিও অক্লেশে প্রায় কুণ্ডের মধ্যস্থলে গিয়ে 'হরেকৃষ্ণ-জয়গুরু' বলিয়া ত্রিতাপহারী সর্বতীর্থ শিরোমণি শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডের গভীর জলে বুকের বাঁধন খুলিয়া জীবনের শ্রেষ্ঠতম সম্পদের শেষ চিহ্নটুকু চিরবিশ্রামের জন্য ডুবাইয়া দিলাম। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের চরণকমল ছায়ায় চিরবিশ্রাম করুন।

স্নান করিয়া প্রসাদ পাইয়া শ্রীগোপীনাথ মন্দিরে যাইলাম। দধি দুগ্ধ প্রভৃতি এখানে খুবই সস্তা। রাবড়ি ৩৭ পয়সা, দধি ৩১ পয়সা সের। গোপালের রাজ্যের উপযুক্তই বটে। আজ অল্প অন্ন ও দধি প্রসাদ পাইলাম। শরীর আর বিশেষ খারাপ বোধ হয় নাই। গোপকূয়ার জল মিষ্ট ও স্বাস্থ্যকর মনে হইতেছে। প্রায় ২ টার সময় প্রসাদ পাইয়া একটু বিশ্রাম করা হইল। বৈকালে নিত্যানন্দদাস বাবাজী দেখা করিতে আসিলেন। কিছুক্ষণ হরিকথায় পরস্পর সুখানুভব হইল।

গত ১৫ দিন ধরিয়া এখানে রামলীলা অভিনয় হইতেছে। আজ রাবণ বধ—শেষদিন। বৈকালে আরম্ভ হইয়াছে। আমরা দেখিতে যাইলাম। লোকারণ্য সমস্ত রাধাকুণ্ডের দোকান পাট বন্ধ। বাহিরের গ্রাম ও বহুদূর হইতেও বহু নরনারী সমাগত হইয়াছে। রাধাকুণ্ড গ্রামের প্রান্তভাগে বিস্তৃত জমির উপর রাম ও রাবণের দুইদল বসিয়া গিয়াছে। কালো পোষাক রাবণের, লাল পোষাকে রামের দল। মুখে কালি ও সর্বাঙ্গে তুলামাখা কতিপয় হনুমান সাজা মানুষও তার মধ্যে হনুমানের ন্যায়

আচরণ করিতেছে। ২ টি ছেলে রামলক্ষ্মণ সাজিয়া সিংহাসনের উপর সমাসীন। একদিকে রাবণ ও রাবণের দল আস্ফালন সহকারে ছুটাছুটি করিতেছে আর একদিকে হনুমান প্রভৃতির আস্ফালন। পরস্পর মারামারি গোলমাল, হুড়াহুড়ি—সে এক অপূর্ব ব্যাপার। এই অভিনয়ে কোন অংশগ্রহণ করা যেন খুব একটা গৌরবের ও ভাগ্যের কথা। শেষে রাবণ বধের সময় রং' এর ও ন্যাকড়ার গোলা ছোঁড়া ও লাফালাফি হুড়াহুড়ি, মারামারি দর্শকেরও ভীতিপ্রদ ব্যাপার। রাবণবধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে নিকটস্থ উচ্চ টিলার উপর কাগজ প্রভৃতি নির্মিত বৃহৎ রাবণমূর্তিতে অগ্নিসংযোগ সে এক অপূর্ব দৃশ্য। ইহা নানাপ্রকার বাজি ও আলোকমালায় পূর্ণ। মধ্যে মধ্যে বোমের আওয়াজ ও হাউই উড়া—কোন অংশেই কলিকাতার ভাল বাজিওয়ালাদের বাজি অপেক্ষা নিকৃষ্ট নয়। অভিনয় যাহাই হউক, ইহার একটা বিশেষত্ব এই যে — অভিনেতা রাম ও লক্ষ্মণকে ইহারা যেন সত্য রাম লক্ষ্মণের মতই ভক্তি করে। বড় বিভূতি মাখা জটাধারী সন্ন্যাসী ও সাধু ইহাদের পদসেবা ব্যজন প্রভৃতি ভক্তি সহকারে করিতেছেন দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। শ্রীভগবানের সম্বন্ধমাত্রেই যাঁহাদের এইরূপ অনুরাগ—যথার্থ ভক্তিলক্ষণ তাঁহাদেরই। ব্রজবাসী রমণীগণের বহুবিধ বর্ণের বস্ত্র এক দর্শনীয় বিষয়। লীলাকালের ব্রজগোপীগণও বোধ হয় এইরকম রঙীন বস্ত্রাদি ব্যবহার করিতেন এইভাব মনে জাগিয়ে দেয়। সেখান হইতে প্রথমে শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডে গিয়ে বিজয়ার শান্তি জলরূপে শ্রীকুণ্ডের জল স্পর্শ করিলাম। পরে শ্রীরাধাগোবিন্দ গোপীনাথ প্রভৃতিকে ও শ্রীপাদ গোস্বামীগণের সমাজকে বিজয়ার প্রণামরূপে প্রথমেই প্রণামাদি করিয়া তারপর বাসায় ফিরিলাম।

২২/১০/৩১—শ্রীগোবর্ধন পরিক্রমা

গোবর্ধন পরিক্রমায় বাহির হইবার সময় সকাল প্রায় ৭ টা। পথে রাজেন্দ্র সমাজ। কৃষ্ণবিরহের জীবন্ত নিদর্শন জনৈক সাধু বহুবার প্রণাম করিয়া গিরিরাজ পরিক্রমা করিতেছেন দেখিলাম। 'কষ্ট না করিলে কৃষ্ণ মেলেনা'—তাহারই দৃষ্টান্ত। মহাবীর দর্শন করিয়া কুসুম সরোবর প্রবেশ করিলাম। সরোবরের নির্জন গম্ভীরদৃশ্য। শ্রীবলদেব ও উদ্ধবজীকে দর্শন করিয়া রজনীবাবাজীর সমর্পিত কীর্তন অল্পক্ষণ শ্রবণ করিয়া রওয়ানা দেওয়া গেল। পথের বামদিকে দূর হইতে নারদকুণ্ডের স্থানদর্শন করিলাম। ভরতপুর রাজের, সমাজবাটী উপরের চাতালে নানাপ্রকার লীলাচিত্র স্বর্ণখচিত দেখিলাম।

গোবর্ধনে—

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আসন ও পরে চাকলেশ্বরে শ্রীসনাতন গোস্বামীর আসন, মানসগঙ্গা প্রভৃতি দর্শন ও দর্শনান্তে পুনরায় গমন। অতঃপর শ্রীহরিদেব দর্শন ইহা প্রাচীনতম মন্দির। মানসগঙ্গার তীরে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম ও মধ্যাহ্নের জন্য আহার্যাদির সংগ্রহ করা হইল। দাসঘাট দর্শন করিয়া গোবর্ধনের সানুদেশস্থ বালির পথ দিয়া পরিক্রমার পথ। মধ্যে মধ্যে সুন্দর ছায়াশীতল আশ্রম। একস্থানে গোবর্ধনের সানুদেশে গোচারণ দৃশ্য মনোরম ও পূর্বের লীলাকালের ন্যায় স্বাভাবিক সুন্দর বোধ হইল। সরল গ্রাম্য বালক বালিকাগণের শেঠজী বোধে পয়সা ভিক্ষা। গোবিন্দ কুণ্ডের নিকটবর্তী স্থানের প্রত্যেক বৃক্ষটি বহু প্রাচীন বলিয়াই বোধ হয়। যতীপুরা গ্রামে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের প্রতিষ্ঠিত গিরিরাজের উপর শ্রীগোপালমন্দির। নিকটেই গোবিন্দকুণ্ড। কুণ্ডের তটে বৃক্ষছায়ায় শীতলঘাট—কুণ্ডের মধ্যে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীকে গোপালকর্তৃক দুগ্ধদানের স্থান দর্শন করিয়া কিছুক্ষণ তথায় উপবেশন করা যাইল। উপস্থিত বাঁদরদের প্রচুর পরিমাণে পাণিফল প্রদান করা যাইল। পরে স্নান সমাপনান্তে ধর্মশালায় আসিয়া জলযোগান্তে প্রস্থান করিলাম। অতঃপর মনোহর দাস বাবাজীর আশ্রমে গমন করিলাম। বাবাজী মহারাজের সহিত নাম-মহিমা সম্বন্ধে কিয়ৎকাল কথোপকথন হইল। তথা হইতে বিদায় নিয়া গোবর্ধনের বিপরীত দিকের পরিক্রমা আরম্ভ হইল। পুছড়ি গ্রামে আপ্সরা ও নটনকুণ্ড দর্শন করিলাম—অতি মনোরম ও নির্জনস্থান। তথা হইতে বনপথের ভিতর দিয়া কিছুদূর আসিবার পর—রাঘব পণ্ডিতের গোঁফা গোবর্ধনের সংলগ্ন পরম রমণীয় স্থান। রক্ষক হিন্দুস্থানী বাবাজী মহারাজের সঙ্গে পরিচয় হইল। অতঃপর গোবর্ধনের ধারে ধারে পরিক্রমা—বৈকালে একদিকের প্রান্তর ও গিরিরাজের দৃশ্য অতি মনোরম। শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষশ্রেণী ময়ূর ও হরিণের ইতঃস্তত বিচরণ—নানাবিধ পক্ষীর কলরব। কিছুদূরে আসিয়া দলবদ্ধ বাঁদরের দেখা পাওয়া যাইল—একসঙ্গে প্রায় ৩/৪ শত মত হইবে। হঠাৎ প্রায় সবগুলি বাঁদর অতিদ্রুত আসিয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হইল। অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া কিছু পানিফল দিয়া তবে পরিত্রাণ পাওয়া যাইল। গোবর্ধন গ্রামে আসিয়া দুলালের সন্ধান পাওয়া যাইল। অতঃপর সকলে মিলিয়া রাধাকুণ্ডাভিমুখে গমন করিলাম। জ্যোৎস্না রাত্রিতে মাঠের শোভা মনোমুগ্ধকর হইলেও অবশেষে রাত্রি প্রায় সাড়ে সাতটায় রাধাকুণ্ডে প্রত্যাগমন করিলাম। কুণ্ড পরিক্রমান্তে ও গোপকূপের জল পান করে সুবল দাস বাবাজীর আশ্রমদর্শনে ও তথায় শ্রীনামবিষয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা করিবার পর অবশেষে বাসায় ফিরিলাম। পরিশ্রম হইলেও সকলের শরীর সুস্থই ছিল। এক সুষুপ্তিতে রাত্রি ভোর। এইরূপ সুনিদ্রা বহুদিন উপভোগ হয় নাই।

২৩/১০/৩১—প্রাতে যুগল কুণ্ডে স্নান করিয়া আহ্নিকাদির পর জলযোগ সারা হইল। এখানকার ঘৃত উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ—দুগ্ধজাত খাদ্যদ্রব্য আশাতীত সুলভ। মধ্যাহ্নে মদনমোহন মন্দিরে প্রসাদ গ্রহণের পর দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রাম। দুলালবাবাজী গোবর্ধন হইতে আগমন করায় পুনরায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার হইল। সুন্দর বৈরাগ্য ও ভজননিষ্ঠা। তাঁহার সঙ্গী অপর ২/৩ জন বাবাজী মহারাজের সহিত ও পরিচয়াদি হইল—সঙ্গে শ্রীহরিকথা প্রসঙ্গ। ৪ টার পর নিত্যানন্দ দাস বাবাজীর সাহচর্যে কুণ্ডের সমস্ত ঘাটের পরিচয়াদি সহ দর্শন সৌভাগ্য লাভ করিলাম। শ্রীজীবের ভজনকুটির ও ঘাট দেখিয়া বড়ই প্রীতিলাভ হইল। নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবগণের সহিত আলাপ ও পরমার্থ প্রসঙ্গে এবং তাঁহাদের কুটির সকল পরিদর্শনাদির মধ্য দিয়া পরম আনন্দ লাভ হইল। শান্তির নিবাসভূমি। সর্বত্রই ত্যাগের ছবি। দর্শনান্তে শ্রীদাস গোস্বামীর তিরোভাব উৎসব উপলক্ষ্যে সমস্ত বৈষ্ণবগণের সমাগম হইয়াছে। সেখানে উপস্থিত হইলে সমাগত বৈষ্ণবগণ কর্তৃক সম্মান প্রদর্শনান্তে বৈষ্ণবমণ্ডলীর মধ্যস্থলে আসনপ্রদত্ত হইল। বৈষ্ণব মণ্ডলীর মধ্যে বসিয়া কীর্তন শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করিয়া—এই অধমের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা স্মরণ করিয়া একান্ত অভিভূত হইলাম। দেড় ঘণ্টা পর উঠিয়া নিরঞ্জনবাবুর সহিত সুবল দাসবাবাজীর আশ্রমে গমন করিলাম। জ্যোৎস্নালোকে মহারাজ আসিয়া অভ্যর্থনাদি করিলেন। প্রেমের সহিত আনীত মাধুকরীর মোটারুটি প্রদান করিলেন। প্রাঙ্গণে নিরঞ্জন ও গিরীন্দ্র সহ উপবেশন করিয়া ভোজন সারা হইল। পরে বাবাজীর কুটিরে গমন করিয়া রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারটা পর্যন্ত বাবাজীমহারাজ লিখিত কৃষ্ণলীলামৃত ও সাধককণ্ঠমালা গ্রন্থ শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ হইল। সাড়ে এগারোটার পর রাত্রে বাসায় ফিরিলাম। আসিয়া দেখি রাধাকুণ্ডের মহান্ত অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহার সঙ্গে পরিচয়াদি সারিয়া—তৎপ্রদত্ত পুরি—রাবড়ি প্রভৃতি প্রসাদ গ্রহণান্তে শয়ন করিলাম। এই দিবস কতিপয় বাবাজীকে অসুস্থ ও ম্যালেরিয়া পীড়িত দেখিয়া চন্দনাদি মিশ্র বিতরণ করিয়া নিত্যানন্দ দাস বাবাজীর নিকট বিতরণের জন্য আরও ঔষধ দিয়া আসিয়াছিলাম।

২৪/১০/৩১ —প্রাতে শৌচাদি সারিয়া এক্কাযোগে গোবর্ধন আসিলাম। সঙ্গে মহান্তও আসিলেন। গোবর্ধন হইতে টাঙ্গায় দিগ্ (Deeg) আসিলাম। পথে গাঁঠ়লী গ্রাম দর্শন হইল—এইখানে ম্লেচ্ছভয়ে গোপালকে গোবর্ধন হইতে আনা হইয়াছিল। কিছুদূর যাইবার পর বেহেজগ্রাম আসিল। এইখানে টাঙ্গা হইতে নামিয়া মহান্তের বাটী দেখিতে যাইলাম। চারিদিক ফাঁকা—সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর স্থান। এখানকার ইঁদারার জল স্বাস্থ্যকর বলিয়া বিখ্যাত শুনিয়া পান করিলাম। রাস্তার পার্শ্বে বলভদ্র

কুণ্ড ও তারই তীরে শ্রীদাউজীর মন্দির। এইখানে দেবশীর্ষ ও মুনিশীর্ষ যাইবার রাস্তা। বরাবর সুন্দর বাঁধানো রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। রাস্তার ধারে বৃক্ষশ্রেণী, মাঠে জোয়ারী শস্য। ঝাউ গাছ শ্রেণীর প্রাচীনত্ব লক্ষ্য করিবার মত। আরও কিছুদূর যাইয়া ভরতপুর রাজ্যের সীমায় আগমন করিলাম। দুইটি স্তম্ভের দ্বারা রাস্তার উপর সীমানা নির্দেশ রহিয়াছে দেখিলাম। ডিগ্ গ্রামের দুর্গ চারিদিকে জলপুর্ণ খাদবেষ্টিত। প্রাচীন, হিন্দু রাজাদের পূর্ব গৌরবের কিঞ্চিৎ নিদর্শন এখনও বর্তমান। ডিগে আসিয়া এইখান হইতে মোটর ডাকগাড়ীযোগে কাম্যবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা হইল এবং প্রায় আধঘণ্টার মধ্যেই কাম্যবনে আসিয়া পৌঁছিলাম। পথে দূর হইতে পাহাড় শ্রেণী দর্শন করা গেল। গ্রামে প্রবেশ পথেই ধর্মশালা। এই ধর্মশালাতেই থাকিবার স্থান মিলিল।

জয় জগন্নাথ

শ্রীভগবানের ধাম, তাঁরই মত নির্গুণ ও চিন্ময় বস্তু। ভগবান কৃপা না করিলে কেহ যেমন তাঁকে দেখতে পায় না, তেমনি ধামের কৃপা না হ'লে, কেহ ইচ্ছা করলেই ধামে গমন ক'রতে পারে না; ধামের কৃপা বা ইচ্ছাই যে ধাম দর্শনাদির একমাত্র কারণ এ'কথা বহুবার স্পষ্টরূপে উপলব্ধি ক'রেছি। এবারও ঠিক তাই ঘটলো। শ্রীবৃন্দাবনে যাবার কথাই একপ্রকার স্থির ছিল; শ্রীমান শ্যামাপদ সিংহের আগ্রহাতিশয্যে শেষে তাঁর সঙ্গেই পুরীধামে যাওয়া সহজেই স্থির হ'য়ে গেল। তখন মনে করলাম, এই জীবাধমকে আবার প্রায় ২২/২৩ বৎসর পর কৃপা ক'রে শ্রীপুরীধাম দেখা দিতে ডেকেছেন।

২১ শে সেপ্টেম্বর ১৯৩০। রবিবার সন্ধ্যার পর পুরী এক্স্প্রেসে "জয় জগবন্ধু" ব'লে আমরা রওনা হ'লাম। শ্রীমান যোগেশ চন্দ্র দে'ও শেষ মুহূর্তে আমাদের সঙ্গী হ'লেন। বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় ও তৎপরতার সহিত আবশ্যকীয় বিষয়ের সমাধান কার্য্যে শ্রীমান্ বিশেষ সুদক্ষ; সুতরাং তাকে সঙ্গী পাওয়ায় আমাদের উৎসাহ আরও বেড়ে গেল। বাটীতে ও স্টেশনে আমাদের বিদায় দিতে যে সকল সুহৃৎ ও ভক্তগণ উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে তাঁদের শুভ ইচ্ছা গ্রহণ ও অভিবাদনাদি ক'রে আমরা গাড়ীতে নিজ নিজ স্থানে গিয়ে বসলাম। হাওড়া ষ্টেশন হ'তে গলাভাঙ্গা সুরের বাঁশী দিয়ে যথাসময়ে গাড়ী ছাড়লো। অমাবস্যার রজনী; তার উপর আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন হ'য়ে অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছিল; সুতরাং এক জমাট বাঁধা অন্ধকার ও মধ্যে মধ্যে জোনাকী পোকার মৃদু চঞ্চল আলোক ব্যতীত পথে আর বিশেষ কিছুই দেখা যায়নি। এ'দৃশ্য দেখে বোধ হ'লো,

প্রকৃতিদেবী যেন সোনালী চুমকি দেওয়া একখানি কৃষ্ণবর্ণের বসন দিয়ে আপাদমস্তক আবৃত করে ব'সে আছেন। সেই নৈশ অন্ধকারের মধ্যে সেতুর উপর থেকে রূপনারায়ণ দামোদর ও বৈতরণী প্রভৃতি বর্ষার ভরা নদী পেড়িয়ে ক্রমশঃ খড়্গপুর, কণ্টাই রোড, জলেশ্বর, বালেশ্বর, ভদ্রক ও কটক ছাড়িয়ে ঠিক ভোরের সময় গাড়ী ভুবনেশ্বর ষ্টেশনে এসে পৌছল।

২৩ শে আশ্বিন, সোমবার। শ্রীজগন্নাথাদি দর্শনের পথে ভুবনেশ্বর ও সাক্ষীগোপাল দর্শন ক'রে যা'ব এ'রূপ আমাদের সঙ্কল্প ছিল; সেইজন্য আমরা এখানে অবতরণ ক'রে গরুর গাড়ীতে দ্রব্যাদি উঠিয়ে দিয়ে পদব্রজে ভুবনেশ্বরাভিমুখে রওনা হ'লাম। কাঁঠালের আঘ্রাণে সমবেত মক্ষিকাকুলের ন্যায়; পাণ্ডাকুল দ্বারা আমরা অবরুদ্ধ হ'য়ে পড়লাম; পরে তাদের মিষ্টকথায় তুষ্ট করে ও প্রয়োজন হ'লে বাসায় উঠে তারপর পাণ্ডা ঠিক ক'রব ইত্যাদি প্রতিশ্রুতি দিয়ে তখন তাঁদের হাত থেকে নিষ্কৃতিলাভ ক'রলাম। ষ্টেশন থেকে মন্দির প্রায় ২ মাইল বা কিছু অধিক হ'বে। লাল কাঁকরের ভূমিতে স্থানে স্থানে ঠিক গেরী মাটি গোলাজলের মত জলরাশি সঞ্চিত ছিল; তবে কাঁকরের রাস্তা ব'লে কোথাও বিশেষ কাদা হ'তে দেখলামনা। রাস্তার উভয় পার্শ্বে বর্ষাস্নাত শ্যামলতরু ও তৃণরাজি ঊষার অলসে তখনও যেন নিমগ্ন হ'য়ে র'য়েছে; প্রাতঃ সমীরণের শীতল স্পর্শের সঙ্গে ঊষার স্নিগ্ধ শোভা দেখতে দেখতে আমরা অগ্রসর হ'তে লাগলাম।

ভুবনেশ্বর ভ্রমণ

২২/৭/৩০ —ভুবনেশ্বর ষ্টেশন হইয়া পদব্রজে ভুবনেশ্বরে গমন। ষ্টেশন হইতে ২ মাইলের কিঞ্চিৎ অধিক হইবে। ঊষাকালে সবুজ বৃক্ষরাজীর মধ্যে লালবর্ণের রাস্তা দিয়া গমন তৃপ্তিজনক বোধ হইল। কাঁকড়মিশ্রিত গেরিমাটির ন্যায় লালমাটি সর্বত্র। মধ্যে মধ্যে জীর্ণ প্রাচীন শিবমন্দির। অতীতের অনন্তকাহিনী লইয়া যেন জিজ্ঞাসুকে বলিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে। মন্দিরগুলির নির্মাণ কৌশল একজাতীয়। গ্রামে প্রবেশ করিবার আরম্ভেই প্রকাণ্ড দীঘি বা হ্রদের ন্যায় বিস্তৃত 'বিন্দু সরোবর'। 'সর্বতীর্থ বারি'—বিন্দু বিন্দু আনিয়া এই সরোবরের সৃষ্টি—ইহাই উহার ইতিহাস। সরোবরের মধ্যে একটি দ্বীপের ন্যায়ও গৃহ। ২/৩ ধারে আংশিক কিছু কিছু ঘাট পাথরে বাঁধানো। সম্মুখে প্রকাণ্ড দুইটি পাশাপাশি ধর্মশালা। নূতনটিতে আশ্রয় লইলাম। দোতলায় ঘরটি ভালই পাওয়া গেল। জল ও পায়খানার ভাল ব্যবস্থা

আছে। ধর্মশালায় দ্রব্যাদি রাখিয়া বিন্দু সরোবরে স্নান ও সেদিন মহালয়া থাকায় তর্পণ করিতে গেলাম। পাণ্ডা প্রভৃতির পয়সা আদায়ের গোলযোগ আছে; তবে বিশেষ পীড়াপীড়ি নাই। সামান্য কিছু দিলেই একরকম সন্তুষ্ট করা যায়। ধর্মশালায় কাপড় ছাড়িয়া শ্রীভুবনেশ্বর মন্দির দেখিতে গেলাম বিস্তৃত প্রাঙ্গণের মধ্যে উচ্চ মন্দির। চারিধারে বহু দেবদেবীর মন্দির। জগন্নাথের মন্দিরের অনুরূপ প্রায় একইভাবে নির্মিত। গঠন প্রণালীতে অনেকাংশে একই প্রকার; তবে প্রায় সকল মন্দিরের মূলদেশ হইতে চূড়া পর্যন্ত পাথরগুলি নানাপ্রকার কারুকার্য করা—বিভিন্ন চিত্রাবলী খোদিত। শিল্পীগণের শিক্ষার ও দেখিবার অনেক বস্তু আছে। মন্দিরের গম্ভীর ও পুরাতন ভাব অনুভবনীয়। মন্দিরগুলির চারিধার উচ্চ প্রস্তর প্রাচীরে বেষ্টিত—দুর্গের অনুরূপ। মূল মন্দিরের অভ্যন্তরে বৃহৎ লিঙ্গমূর্তি। উচ্চে ১ ফুটের কম হলেও বিস্তার বা ব্যাস অনেক বড়। সর্বদা জল, বিল্বপত্র, তুলসী, পুষ্প প্রভৃতি পয়সার সহিত ভক্তগণ কর্তৃক প্রদত্ত হইতেছে। অনেকটা গয়ার গদাধর দেবের পাদপদ্মের মত পূজাপ্রণালী। তবে এখানে শ্রাদ্ধাদির মন্ত্র নহে। শিবস্তোত্রাদি। এখানকার শিবপূজাদি বিষ্ণুপূজাদির সহিত মিশ্রিতভাব। প্রণাম মন্ত্র "নমঃ ব্রহ্মণ্যদেবায়—" ইত্যাদি। যেন এখানে হরিহর একাত্মা। মন্দিরে বহু দেবদেবীর মূর্তির মধ্যে গনেশ, অন্নপূর্ণা, নৃসিংহ মহাদেবের বৃষ প্রভৃতি বৃহদাকার ও প্রাচীন মূর্তি দর্শনীয়। প্রত্যেক স্থলেই পয়সার প্রার্থনা। একটা পয়সা বা আধলা দিলেই যথেষ্ট হইল। তবে কিছু দেওয়া চাই। ইহা দ্বারাই এখানকার পাণ্ডা বা অধিবাসীগণের জীবিকা চলে। দোকানপাট অতি সামান্য রকমের। হাট হয়; তাহাই এখানকার প্রধান ভরসা। দর্শন করিয়া ধর্মশালায় ফিরিয়া আসিলাম। পাণ্ডা প্রসাদ আনিয়া দিল। জগন্নাথের মত মাটির পাত্রে ঘৃতান্ন ও ২/৩ টি ব্যঞ্জন ও অড়হর ডাল। প্রসাদবুদ্ধিতে অথবা ক্ষুধিত অবস্থায় খাইলে ভালই মনে হয়। তবে সাধারণ জিহ্বার তর্পণ হিসাবে তেমন সুবিধাকর নহে। চালগুলিতে কাঁকড় প্রভৃতি যথেষ্ট। দেবতার ভোগের জন্য যতটা পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার আবশ্যক তাহা করা হয় বলিয়া মনে হইলনা। শুনিলাম এখানে ৭/৮ বার ভোগ হয়। এখানে ও প্রসাদাদির ব্যবহার জগন্নাথের ন্যায় পালিত হয়। প্রসাদ পাইয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা গেল। ৩ টার পর পুনরায় দর্শনে বাহির হইয়া প্রথমে হাট দেখিয়া পরে মন্দিরে গমন। সোম ও বৃহস্পতিবারে হাট বসে। তরিতরকারী সাধারণ রকমের। এইপথেই শ্রীমন্মহাপ্রভু সাক্ষীগোপাল দেখিয়া ভুবনেশ্বর আসিয়াছিলেন। বৈকালেও মন্দিরের শিল্পকার্যাদি কিছু কিছু দেখা হইল। মুল মন্দিরের ৩ দিকে (পশ্চাতে ও ২ পার্শ্বে) যথাক্রমে দূর্গা, বিষ্ণু ও গণেশের মূর্তি ও তৎসম্মুখে চাতাল। কালাপাহাড়ের —নির্মম হস্তের

স্পর্শের চিহ্ন, এ সমস্ত মূর্তিগুলি কিছু কিছু ধারণ করিয়া যেন বিষাদগ্রস্ত। হাত, পা, নাক, কান, প্রভৃতি ভগ্নদেহ লইয়া কত দেবতার মুর্তি রহিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই। হিন্দু জাতীয় গৌরব ও অগৌরবের নিদর্শন একত্রে বহন করিতে এই সকল ভগ্নমূর্তির মত আর কিছুই নাই। ভোগমন্দির দেখিলাম। নিভৃতে ভোগ রন্ধন হইতেছে। আবৃত পাষাণ পথের মধ্যে দিয়া ভোগ মূল মন্দিরে আসেন। রন্ধনশালার পার্শ্বে ইন্দারা। এইজলে ঠাকুরদের রন্ধন কার্যাদি হয়। ইন্দারার পার্শ্বে উঠানের পাথরের উপর মশলা বাটা হয়। তাহার গর্ত রহিয়াছে। মন্দিরের বাহিরে একটি চারিধারে পাষাণ বাঁধানো বড় পুষ্করিণী। গঙ্গার চতুর্দিকে ছোট ছোট বহু শিব মন্দির। এখানে দুর্গাদেবী কোনও অসুর সংহার করেন এইরূপ ইতিহাস। ধর্মশালায় ফিরিবার সময় অত্যন্ত বৃষ্টি। একস্থানে প্রায় ১ ঘণ্টা বসিয়া থাকিয়া পরে বাসায় আসিলাম। পাণ্ডা অন্ন প্রসাদ রাখিয়া বাসায় চলিয়া গেল। সন্ধ্যার পর বিন্দু সরোবরে যাইয়া কিছুক্ষণ সঙ্কীর্তন করা গেল। পরে তথা হইতে শ্রীভুবনেশ্বর মহাদেব দর্শনে গমন করিলাম। ৮/১০ টি ঘৃত প্রদীপ জ্বলিতেছে। মহাদেবের উপর বস্ত্র বিছাইয়া ধুতুরা পুষ্প প্রভৃতি দেওয়া হইয়াছে। রৌপ্যের অর্ধচন্দ্রাকার মুকুট দেওয়া। রাত্রে মন্দিরের বেশ গম্ভীর দৃশ্য। তথা হইতে বাসায় ফিরিয়া বিশ্রাম। রাত্রিতে কিঞ্চিৎ প্রসাদ পাইয়া শয়ন ও সুনিদ্রা। মশা প্রভৃতি নাই। এখানে হনুমান আছে দেখিলাম। তবে বিশেষ উৎপাত নাই। বৃন্দাবনের মত ছোট বানর নাই।

২৩/৯/৩০ **মঙ্গলবার ঃ**

৫ টার সময় উঠিয়া গৃহ হইতেই শিবমন্দিরের ধ্বজা দর্শন করিয়া প্রণাম ও স্তবাদি। পরে মুখ হাত ধুইয়া গৌরী কেদার নামক শ্রীমূর্তি ও তৎস্থানে পঞ্চকুণ্ড দর্শন। শ্যামকুণ্ড, দূর্গাকুণ্ড, কেদার কুণ্ড, দুগ্ধকুণ্ড প্রভৃতি। সবুজ ধান্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়া লাল কাঁকরওয়ালা পথ। বেশ নির্জনভাব স্নিগ্ধ দৃশ্য। এই স্থানে আম ও কাঁঠাল গাছ দেখিলাম। পথে যাইতে দূর হইতে ঝরণার জল ছোট খালের মত কলকল শব্দে ধানের ক্ষেত্রের ভিতর দিয়া ও ২ টি মন্দিরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। কিছুদূর গিয়া কোটিতীর্থ নামক স্থান। একটি ছোটকুণ্ড ও শিবমন্দির। এখানে চারদিকেই যেন মন্দির ছড়ানো। সবগুলিই প্রাচীন একপ্রকার গড়ন। বোতল আকৃতি। গৌরীকেদারে একটি মন্দিরে যথেষ্ট কারুকার্য খোদিত দেখিলাম। মন্দিরটি মাঝারী রকমের। তাঁহার কিছু দূরে আর একটি মন্দির বেশ একটি উঁচু জায়গার উপর। পার্শ্বে বিস্তৃত ধান্যক্ষেত্র। মন্দিরের সম্মুখের প্রাঙ্গণে নানাপ্রকার বর্ণের ঘাসজাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুল। প্রায় ২/১ টি করিয়া ১০/১৫ রকমের সংগ্রহ করিলাম।

সবগুলি একত্র করিয়া বেশ সুন্দর দেখাইল। মন্দিরের দ্বারে ২টি তুলসীগাছ রহিয়াছে দেখিলাম। স্থানটিতে বসিয়া প্রাণে একটা বেশ শান্তিরভাব জাগে। এ'রকম এখানে বসিবার মত অনেক স্থান আছে। বাঙ্গালী এখানে খুব কম। ২/৪ জনের বেশী সাক্ষাৎ হয় নাই। কাঁচকামিনীর "পরপার আশ্রম" নামক বাগান বাড়ী। বেশ নির্জন ও মনোরম স্থান বোধ হইল। এখান হইতে ধর্মশালায় ফিরিয়া আজ রন্ধনের আয়োজন করা হইল। ধর্মশালাটির বেশ সুবন্দোবস্ত পাকেরও অনেকগুলি উত্তম ঘর রহিয়াছে। দোতলায় একটি লওয়া গেল। চাল কাঁকড় মিশ্রিত। দ্রব্যাদি ভাল পাওয়া যায় না। বিন্দু সরোবরে স্নান করিয়া আহারান্তে বিশ্রাম।

৫৮৮ শকাব্দে উজ্জয়িনীর রাজা কর্তৃক বর্তমান ভুবনেশ্বরের মন্দির নির্মিত। মন্দিরের চূড়ায় লেখা আছে—

গজাষ্টে সুমিতে জ্যাতে শকাব্দে
কীর্তিবাস সঃ।
প্রাসাদম্ কৃতবান্ রাজা
ললাটত্বিন্দু কেশরী ॥

বেলা ৩ টার সময় খণ্ডগিরি দেখিতে গমন। ভুবনেশ্বর হইতে প্রায় ৪ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। ভুবনেশ্বর মন্দিরের পার্শ্ব দিয়া একটি পরিস্কার লাল কাঁকড়ের রাস্তা দিয়া কিছুদূর গিয়া একস্থানে পাথর কাটিয়া চৌকা চৌকা করা হইতেছে দেখিলাম। এখানকার বাড়ীঘর সব এই পাথরের প্রস্তুত। বড় বড় পাথর টাকায় ১২ খানা বিক্রয় হয় শুনিলাম। একটা ছোটখাট পাথরের বাড়ী করিতে ৩/৪ শত টাকা লাগে। কিছুদূর আরও গিয়া রেল লাইন পার হইয়া শ্যামল দৃশ্যের মধ্যে দীর্ঘ লাল পাথরের পথ ধরিয়া পাণ্ডার লোক ও আমরা তিনজন চলিলাম। রাস্তা ক্রমশঃ উচ্চ; প্রায় একমাইলের পরে পুনরায় রাস্তা একটু একটু করিয়া নীচু হইয়াছে। রাস্তায় সর্বোচ্চ স্থান হইতে পশ্চাতের দিকে ফিরিয়া চাহিলে দূর হইতে ভুবনেশ্বরের মন্দিরটি অতিসুন্দর দেখায়। সেখানকার দৃশ্যমান সব জিনিসের মধ্যে সেই বস্তুটিই যেন গরিমায় ও মহিমায় সবচেয়ে বড় ইহাই বোধ হইতে লাগিল। ক্রমশঃ পথের দুইধারে বনের মত বড় বৃক্ষশ্রেণী দৃষ্ট হইতে লাগিল। কুচিলা বা 'Nux Vomica'র (নাক্সভমিকা) গাছ খুব বেশী। এরূপ বিষাক্ত বৃক্ষ এত অধিক থাকা বিপজ্জনক হইলেও ইহার হাওয়ায় নাকি স্বাস্থ্যভাল হয়। ২ মাইলের কিছু বেশী পথ অতিক্রম করিয়া একটি সাঁকো দেখিলাম। নীচে দিয়া কল্‌কল্ রবে একটি ছোট পার্বত্য নদী উপলখণ্ড ও পাথরের উপর দিয়া ছুটিয়াছে। এই স্থান হইতে পাহাড় স্পষ্টরূপ আরম্ভ হইয়াছে। নিম্নে ধানের ক্ষেত দূরে পূর্বঘাট নামক পর্বতমালা বেষ্টিত ধানের

ক্ষেতের উপরে উঁচু লাল রঙের পথ, তাহার উপর উচ্চ ঢিপির মত গাছপালাময় স্থান। আরও কিছুদূর যাইয়া খণ্ডগিরিদ্বয় দেখা গেল। এইখানে শুনিলাম ১০/১৫ দিন হইতে একটি বালক সাধু এই স্থানের জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ের কোনও নির্জনস্থানে বসিয়া ভজন করিতেছেন। এই কয়েক দিনের মধ্যে কিছুই আহার করেননাই ও কোথাও উঠিয়া যান নাই। নিকটস্থ গ্রামের লোক ২/১ জন করিয়া মধ্যে মধ্যে দেখিতে যাইতেছে। আমরা ফিরিবার সময় সাধুটিকে দেখিয়া আসিব সঙ্কল্প করিয়া খণ্ডগিরি দেখিতে চলিলাম। বেলাও প্রায় চার টা হইয়াছে। আবার ৪ মাইল পথ ফিরিতে হইবে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছে। রাত্রির অন্ধকার। এইজন্য একটু তাড়াতাড়ি করিয়া পাহাড় দেখিতে গেলাম। উদয়গিরি ও অস্তগিরি পাশাপাশি ২ টি পৃথক পাহাড়। বোধহয় এইরূপ দ্বিখণ্ডিত বলিয়া খণ্ডগিরি নাম হইতে পারে। পাহাড়ের নীচেই একটি ছোট ধর্মশালা ও ডাকবাংলো। পাথরের ধাপ দিয়া কিছুদূর উঠিতেই পর্বতগাত্রে খোদিত অনেকগুলি গুহা দেখিলাম। বেশ নিরিবিলি ও নির্জন। ছোট ছোট ঘর ও কোনটি দালানের মত। ভিতরের দেওয়াল গাত্রে জৈনদের মুর্তি—দিগম্বর প্রভৃতি। ২/১ স্থানে দুর্গার মত দশভূজা মুর্তিও দেখিলাম। কোথাও কোন লোকের সাড়াশব্দ নাই। নীরব নিস্তব্ধতাময় সব। পাথরকাটা সিঁড়ি দিয়া আরও উপরে উঠিয়া একটি চাতালের মত স্থান। চারিদিকে লোহার রেলিং দেওয়া ঘেরা। মধ্যে একটি পাথরের মাঝারি রকমের গৃহ বা মন্দির। চাতালের একপাশে একটি ঝোপের ভিতর দিয়া ছোট পথ। সেইপথ সামান্যদূরে গিয়া পাহাড়ের উপর একটি মাঠের মত সমতল জায়গা সেখানে এক বা দেড় ফুট উচ্চ বহু পাথর প্রোথিত রহিয়াছে, জৈনদের সমাধি বলিয়া বোধ হইল। বহু প্রাচীনকাল হইতে সম্ভবতঃ বহু জৈন সাঁইদের সমাধি এখানে এইরূপে রক্ষিত হইয়া থাকিবে। দর্শকগণ প্রত্যেক সমাধির উপর ছোট ছোট প্রস্তরখণ্ড রাখিয়াছে। সেই প্রস্তরখণ্ডগুলি পড়িয়া যাইলেই কামনা পূরণ হইবে—বোধ হয় এইরূপ কোন প্রথা এখানে আছে। জিজ্ঞাসা করিবার একজন লোক সেখানে দেখিলাম না—আমরা ৩ জনে তিনটি ছোটপাথর —কৃষ্ণভক্তি কামনা করিয়া সেইভাবে চাপাইয়া দিয়া পুনরায় চাতালের দিকে ফিরিয়া আসিলাম। পাহাড়ের উপর হইতে বিস্তৃত সমতল ভূমির শ্যামল দৃশ্য বাস্তবিকই অনুভব করিবার বিষয়। না দেখিলে তাহার কোনও ধারণা করা যায় না। ভজনের কি সুন্দর স্থান। ভারতে ভজন স্থানের অভাব নাই অভাব এখন ভজন করিবার লোকের। স্থানটি ও প্রত্যেক গুহাগুলি অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু শ্যামাপদর শরীর অসুস্থ থাকায় ও যোগেশের মশকভীতি অতিরিক্ত হওয়ায় বিশ্রাম একটুও না করিয়া পুনরায় তখনি ফিরিতে

হইল। নচেৎ রাত্রিতে সেই ধর্মশালায় থাকিয়া পরদিন প্রাতঃকালে ভুবনেশ্বর ফিরিব এইরূপ আমার ইচ্ছা হইতেছিল। যাহা হউক খণ্ডগিরি পশ্চাতে রাখিয়া কিছুদূর আসিবার পর কয়েকটি লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া আমরা রাস্তা ছাড়িয়া বামদিকের অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। ৫/৭ মিনিট এইভাবে যাইবার পর একটি অনুচ্চ পাহাড় উল্লংঘন পূর্বক তাহার ঢালু প্রদেশে একখণ্ড বৃহৎ পাথরের পার্শ্বে সেই বালককে উপবিষ্ট থাকিতে দেখিলাম। পাথরটির পার্শ্বে সামান্য গহ্বরের মত স্থান। বালকটি তাহারই মধ্যে বসিয়া আছে। পার্শ্বে কিছু দূরে একজোড়া সাধারণ ধরণের পাম্প স্যুনিকটে ১ খানি কাপড় ও গামছা বাঁধা কোন দ্রব্য রহিয়াছে দেখিলাম। প্রথমে আমাদের সহিত কথা বলেন নাই; আকার ইঙ্গিতেই বুঝাইবার চেষ্টা চলিতেছিল। কিন্তু শেষে আমাদের বাঙ্গালী দেখিয়াই হউক বা হাতে মালা ছিল সেইজন্য শ্রদ্ধা বশতঃই হউক—নিজেই কথা কহিলেন। আমরা এযাবৎ নিরাহারে থাকিবার কারণ কি জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "আমি পূর্বেকয়দিন লেবুর রস ও চিনির জল খাইয়াছি, কেবল গত ৩ দিন হইতে কিছু খাইতেছিনা।" না খাইবার কারণ কি এবং ইহাতে ভজনের অসুবিধা হইতে পারে বলায়—বলিলেন ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমি ইহা করিতেছি, ঈশ্বর যা করান ইত্যাদি। বালকের বয়স ১৮/২০ বৎসরের মধ্যে হইবে—শ্যামবর্ণ। উপবাস দরুণ দুর্বল বোধ হইল। স্বাস্থ্যও ভাল নহে—তাহাও বলিলেন। বাড়ীঘরের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া স্পষ্ট কিছু জানা গেলনা "নিকটেই বাড়ী"এই পর্যন্তই জানিলাম। পূর্বে যে সাধনভজনে নিযুক্ত ছিলেন বা ধর্ম বিষয়ে অনুশীলন ছিল এমন বোধ হইল না। কোনও মনোবেদনায় বা সংকল্পসিদ্ধির জন্য এইরূপ সাময়িক মনোবিকার বশতঃ বালকটি এইরূপ কঠোর অনুষ্ঠান পরায়ণে কৃত সংকল্প হইয়াছে মনে হইল। খুব দৃঢ় সংকল্প না থাকিলে এরূপ নির্জন ও বিপদসঙ্কুল প্রদেশে এভাবে বসিয়া থাকা সম্ভব হয়না। শ্রীভগবানের নামাশ্রয় করাই সর্বশ্রেষ্ঠ ও কলিযুগের একমাত্র সাধন—এ বিষয়ে বলিলাম। আমি আরও বলিলাম যে আমরা পরস্পর আর কখনও কাহাকেও দেখিতে পাইব কিনা বলিতে পারিনা। আপনার দৃঢ়সংকল্প দেখিয়া আপনার সাধন ফলপ্রদ হয় ইহাই আমাদের ইচ্ছা। আপনার মত ত্যাগী সাধককে উপদেশ দিবার অধিকার আমার নাই এবং উপদেশ পাইলে যথেষ্ট উপকার হইল মনে করিতাম, এ অবস্থায় সাধুসেবা হিসাবে আপনার কোন উপকার করিবার শক্তি আমাদের নাই। তবে মনে হয় আপনার নিজ ভজনের সহিত যদি নামাশ্রয় করেন তবে আপনার অভীষ্ট নিশ্চয় পূর্ণ হইবে, আমার এই বিশ্বাসে একথা বলিয়া যাইতেছি।" ইহাতে বালকটি কিছু সন্তুষ্ট হইলেন—মনে হইল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিষয় বা নামের বিষয় বিশেষ কিছু

জানা আছে মনে হইলনা, তথাপি অনুরাগ আছে, দৃঢ় সঙ্কল্প আছে যাহা সাধনার প্রাণ তাহা যখন আছে তখন আর কিছু প্রয়োজনীয় বাকী থাকিবেনা। বালকটির সহিত অল্পক্ষণ কথাবার্তায় তাহার জন্য কেমন একটা মায়া হইতে লাগিল। বাসায় ফিরিয়া রাত্রিতে যখন প্রবল বৃষ্টিপাত হইতেছিল তখন সেই গভীর অন্ধকারে সেই নির্জন পর্বত ও অরণ্যের মধ্যে তাহার অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া বিষাদিত হইলাম। তবে ভগবানের অপেক্ষা রক্ষাকর্তা ও সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান বন্ধু আর কেহ নাই বলিয়া জানিলাম ভাবিলাম। "রাখে হরি মারে কে?" তিনিই তাহাকে রক্ষা করিবেন। বিদায় লইবার কালে বালকটিকে কিছু অর্থগ্রহণের জন্য অনুরোধ করা সত্ত্বেও অসম্মত দেখিয়া অতঃপর আমরা তথা হইতে বিদায় লইয়া সেই পূর্বোক্ত পথে প্রায় ৭ টার সময় ভুবনেশ্বরে ফিরিয়া আসিলাম। প্রায় একাদিক্রমে ৮ মাইল পথে হাটিয়া আসিবার জন্য যতটা ক্লান্ত হইবার সম্ভাবনা করিয়াছিলাম তাহার কিছুই বুঝিলাম না। বরং শরীর ভালই বোধ হইতে লাগিল। কল্য ভোর ৫/৪৯ এর প্যাসেঞ্জারে সাক্ষীগোপালদেব দর্শনে যাত্রা করিবার ব্যবস্থা করিয়া রাত্রিতে সামান্য কিছু জলযোগের পর শয়ন করা গেল।

২৪/৯/৩০ **বুধবার**

ভোর ৫ টার পূর্বেই গাড়োয়ানের ডাকে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জিনিস পত্র গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া আমরা শ্রীভুবনেশ্বর মহাদেবকে প্রণাম করিয়া ঊষাকালের স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে করিতে জয় সাক্ষীগোপাল—জয় জগন্নাথ বলিয়া স্টেশনাভিমুখে চলিলাম। ষ্টেশনে পৌছাইবার অল্পক্ষণ পরেই গাড়ী আসিল। প্যাসেঞ্জারগাড়ী হইলেও এক্স্প্রেস গাড়ীর মতই পরিষ্কার ও ভীড় মোটেই ছিলনা সুতরাং আমরা বেশ আরামেই সাক্ষীগোপাল আসিলাম। ভবপারের ষ্টেশনে যে গাড়ী আসিবে তাহাতে যদি দাঁড়াইয়া যাইবার মতও এ জীবাধমের একটু স্থান হয় তবেই বুঝিব গাড়ীর সুবিধা হইল। খুরদা ষ্টেশন ছাড়িয়া গাড়ী ক্রমশঃ দক্ষিণনাভিমুখে চলিল, মেইন লাইন বা সাধারণ পথ ছাড়িয়া এ'গাড়ির গতি ভিন্নপথে প্রধাবিত। ভাবিলাম প্রত্যহ শত শত যাত্রীকে বহন করিয়া যে গাড়ী জগৎবন্ধু নীলাচল চন্দ্রের শ্রীচরণপ্রান্তে পৌছাইয়া দিতেছে—সে গাড়ীর মহত্বসীমা কে বলিয়া শেষ করিতে পারে; —ইহাতে কৃতজ্ঞতার সহিত সহস্র প্রণাম করিলাম। ইহার মত বন্ধু কয়জন মিলে। এই অঞ্চলে নারিকেল ও সুপারি বৃক্ষের প্রাচুর্য দৃষ্ট হইল। ভুবনেশ্বর হইতে গাড়ীতে উঠিয়া ২ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা সাক্ষীগোপাল ষ্টেশনে আসিয়া পৌছাইলাম। তথা হইতে ১০/১৫ মিঃ পথ অতিক্রম করিয়া রায়বাহাদুর

বিশ্বেশ্বর দাসের ধর্মশালায় পৌঁছাইলাম। ভুবনেশ্বরে ও পুরীতে ইহার ধর্মশালা আছে। ......একটি বাগানের মধ্যে ধর্মশালা। অধিকাংশ নারিকেল গাছ। বেশ মনোরম স্থান ধর্মশালাটি অধিকাংশ একতলা। সুম্মুখ দোতলায় একটি হল ও ২ টি ঘর ও সামনে পিছনে দালান আছে। পশ্চাতদিকে দালানের উপর বিস্তৃত একতলার ছাদ। আমরা অল্পচেষ্টাতে দ্বিতলের হলঘরটি পাইলাম। ইহা সচরাচর পাওয়া যায় না—যাইলেও সাক্ষীগোপাল হরির কৃপাতেই ইহা মিলিল সন্দেহ নাই। আমরা ৩ জনে সমস্ত উপরতলাই দখল পাইলাম। শৌচাদি সমাপন করিয়া সম্মুখে চন্দন সরোবরে স্নান করিয়া আসিলাম। এই পুষ্করিণীতে সাক্ষীগোপালের চন্দনযাত্রা হয়। পুষ্করিণী নাতিবৃহৎ। মধ্যে একটি ছোট মন্দির আছে। স্নানান্তে আমরা শ্রীসাক্ষীগোপালদেব দর্শনে গমন করিলাম। পথের দুইধারে উঁচু উঁচু খড়ের ঘর—দোকান। মধ্যে চওড়া বালির ও কাঁকড়ের রাস্তা। রাস্তার ধারে গৃহগুলি বেশ সমানভাবে সংস্থিত হওয়ায় সুদৃশ্য হইয়াছে। ভুবনেশ্বরের দোকানে ঘরগুলি অপরিষ্কার রকমের হওয়ায় সেইস্থানের সৌন্দর্যের হ্রাস হইয়াছে; কিন্তু এখানে তাহা হয় নাই। ধর্মশালা হইতে ৫/৭ মিনিট যাইয়াই মন্দিরের ফটকের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। অবিলম্বেই সেই পুর্ণব্রহ্ম শ্রীহরিকে সাক্ষাৎ দর্শন করিব—"যিনি ভক্তের জন্য স্বয়ং সাক্ষী দিতে শ্রীবৃন্দাবন হইতে পদব্রজে এখানে আসিয়াছিলেন"—সেই সব কথা মনে হওয়ায় হৃদয় পুলকে নৃত্য করিয়া উঠিল। ফটকের সম্মুখে গরুড় স্তম্ভ। এরূপ স্তম্ভ ভুবনেশ্বরেও আছে, তবে ফটকের ভিতর, —মূল মন্দিরের সম্মুখে। গরুড়ের পর ফটক পার হইয়া সম্মুখের শ্রীসাক্ষীগোপালের মন্দির; মন্দির ভুবনেশ্বরের মতই তবে আয়তনে কিছু ছোট। মূল মন্দিরের সম্মুখে ও সংলগ্ন নাট মন্দির ও তৎ সম্মুখে আর একটি মন্দির। এই তিনটি মিলাইয়া—একটি মন্দির। প্রথম মন্দিরে প্রবেশ পথেই আর একটি গরুড়ের ন্যায় ছোট স্তম্ভ—কিছুদূর যাইয়া মূল মন্দিরের দরজা। ভিতরটি সব অন্ধকার। দিবসেও ঘৃতদীপ জ্বালান রহিয়াছে। শ্রীমূর্তি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর নির্মিত। পূর্ণ কলেবর। শ্বেতবর্ণের চক্ষু অঙ্কিত; অন্ধকারে থাকিলেও কৃপাদৃষ্টি যেন সর্বদাই প্রকাশিত রহিয়াছে। হাঁটু অবধি বস্ত্র; যেন রাখালেরই মত। হাতে মোহন বাঁশী, মাথায় মুকুটের মত দেখিলাম—শিখিচূড়া নহে। শ্রীমুখ প্রফুল্লিত। হস্ত ও পাদ অতি সুন্দর ও স্বাভাবিক। ত্রিভঙ্গ আকার। বিশেষতঃ চরণদু'খানি বাহ্যদৃষ্টিতে প্রস্তরময় হইলেও যেন অতি সুকোমল ও শীতল বলিয়া স্পষ্টই অনুভব হইল। পদে নূপূর অঙ্কিত দেখিলাম। গলায় কুসুমের মালা। নাসায় বেসর দুলিতেছে; ইহাই সেই ভাগ্যবতী রাণী প্রদত্ত নোলক কিনা বলা কঠিন; মোতিটি তেমন বড় বলিয়া বোধ হইলনা। পার্শ্বে প্রস্তর নির্মিত বিশাখাও ললিতার

ছোট মূর্তি ধাতু নির্মিত শ্রীরাধার পূর্ণ মূর্তি ও বামে কিঞ্চিৎ বক্রভাবে বিরাজ করিতেছেন; সুন্দর মূর্তি। ঠিক গোয়ালিনীর মতই। প্রণাম ও বন্দনাদি করিয়া মন্দির প্রদক্ষিণ পূর্বক বাসায় ফিরিলাম। এখানে অন্নপ্রসাদ হয় না। বাজার হইতে চাল ডাল আনিয়া; একজন বৈষ্ণব পাচক ব্রাহ্মণ ঠিক করিয়া পাক সমাপন করা গেল। এ সকল উদ্যোগ আয়োজনে শ্রীমান্ যোগেশের যোগ্যতা অসাধারণ। আমি সর্বত্রই স্বগৃহে অবস্থিতির মতই সুবিধা ভোগ করিয়াছি। যোগেশের চেষ্টায় বিদেশে আসিয়াছি বলিয়া অনেক সময় বুঝিতেই পারি নাই। শ্যামাপদর উদারতা, নম্রতা ও অমায়িকতা সকলেরই অনুকরণীয়। তাহার চরিত্রের মধুরতায় সম্ভ্রম ব্যবহার ঘুচাইয়া যেন পরমাত্মীয় করিয়া দেয়। তাই আজ তাহাকে বলিলাম, এই সাক্ষীগোপালের সাক্ষাৎ হইতেই তোমাকে "আপনি" প্রভৃতি স্তুতিকারক বাক্য প্রয়োগ না করিয়া আত্মীয়তাপূর্বক "তুমি" বলিয়াই আজ হইতে সম্বোধন করিব। তাহার বৈষ্ণবোচিত মধুর চরিত্র বলেই এই আত্মীয়তা অর্জিত হইয়াছে বুঝিতেছি। আহারাদির পর একটু বিশ্রাম করা গেল। প্রাতঃকাল হইতেই বৃষ্টি, নামিয়াছে। কলিকাতা হইতে বাহির হইবার পর হইতে সূর্যোদয় খুব কমই দেখিয়াছি। বৃষ্টি ও মেঘাচ্ছন্ন আকাশ প্রায় সর্বদাই। তবে কাঁকড় ও বালির দেশ বলিয়া কাদা প্রভৃতির অসুবিধা নাই। বরং রৌদ্রতাপের চেয়ে ঠাণ্ডায় বেড়ান সুবিধাজনক মনে হইতেছে। আকাশ একটু পরিষ্কার থাকায় সাড়ে চার টার গাড়ীতেই শ্রীজগন্নাথ দর্শনে বাহির হওয়াই স্থির করিয়া আমরা ধর্মশালা হইতে বাহির হইবার উদ্যোগ করিলাম। এযাবৎ সাক্ষীগোপালের প্রসাদ পাওয়া হয় নাই। হঠাৎ সেই সময় জনৈক পাণ্ডা ঠাকুরের মালপোয়া প্রসাদ আনিয়া উপস্থিত হইল। পয়সা আদায়ের উদ্দেশ্যে হইলেও আমাদের মনে হইল অধমদের প্রতি কৃপা করিয়া ঠাকুরই ইহা পাঠাইয়াছেন। প্রসাদ পাইয়া ষ্টেশনে আসিলাম। প্রায় একঘণ্টা পরে গাড়ী আসিল। সকল গাড়ী গুলিই একপ্রকার। বেশ সুবিধার সহিত পুরী আসিয়া পৌঁছান গেল। পাণ্ডাদের ঝঞ্ঝাট বেশী হইলেও কোনমতে এড়াইয়া নূতন ধর্মশালায় (দুধওয়ালার) উপস্থিত হইলাম। উপরের ঘর পাওয়া গেলনা। নূতনবাড়ী হইলেও নীচের ঘর বলিয়া যেন অসুবিধা বোধ হইল। বাসা ভাড়া পাওয়া যায় কিনা অন্বেষণ করিতে যাইয়া সুবিধা মত হইলনা। পথে এদিকে রাত্রিও হইয়া আসিল। তখন রামচন্দ্র গোয়েঙ্কার ধর্মশালার দোতলায় একটি ঘর পাওয়া গেল। ঘরটি নিতান্ত মন্দ নহে। তবে পূর্বে ভূবনেশ্বরে ও সাক্ষীগোপালে যেরূপ সর্ববিষয়ে সুবিধাজনক ধর্মশালা পাইয়াছিলাম; তাহার তুলনায় ইহা অসুবিধাকর মনে হইলেও পুরীর মত লোকবহুল স্থানে ইহাই আমরা জগন্নাথের যথেষ্ট কৃপা বলিয়া মনে করিলাম। রাত্রে সামান্য জলযোগ করিয়া শয়ন করা গেল। শরীর ক্লান্ত থাকায় সুনিদ্রাই হইল।

২৫/৯/১৯৩০ বৃহস্পতিবার

ভোর সাড়ে চার টায় উঠিয়া সমুদ্রাদিমুখে শৌচার্থে গমন। সে বিষয়ে অসুবিধা অনুভব। সমুদ্রদর্শন করিয়া পুনরায় ধর্মশালায় প্রত্যাবর্তন ও শৌচাদি ও স্নান সমাপন। তৎপরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদর্শনে গমন। ২২/২৩ বৎসর পূর্বে যেরূপ দেখিয়াছিলাম সেই স্মৃতির সঙ্গে তফাৎবোধ হইল না। প্রথমে গরুড়স্তম্ভ যেখানে দাঁড়াইয়া মহাপ্রভু দর্শন করিতেন সেইস্থান দর্শন ও প্রণামাদি করিয়া তৎপরে বাহিরের সাক্ষীগোপাল, গনেশ, বটকৃষ্ণ প্রভৃতি দর্শন। রন্ধন শালা, মশলাঘর, কাষ্ঠ ও ভাঁড়ারক্ষার ঘর, চন্দন ঘষা ঘর ইত্যাদি মহাপ্রভুর শ্রীচরণচিহ্ন দর্শন। পরে ষড়ভূজ মহাপ্রভুর মন্দিরে গমন। ইহা শ্রীরামদাস বাবাজীর অধিকারে। একজন বাবাজীর শিষ্যের সহিত আলাপ হইল। পাদপদ্মের ছাপের কথা বলিলাম। কাপড়ের উপর কেশরের ছাপ ভাল হইবে বলিলেন। কাপড় ও রঙের মূল্য দিয়া থাকিলে সম্ভবতঃ মহাপ্রভুর কৃপায় উহা সহজে পাওয়া যাইবে তাহার সূচনা করিয়া দিলেন। দর্শন করিয়া বাসায় ফিরিলাম। পথে ঘাস আদায়ের জন্য গরুর তাগাদা, পাণ্ডার মারামারি দেখা গেল। বড় রাস্তার ধারেই পুরীরাজের বাড়ী ও তৎপার্শ্বে রাণীদের বাড়ী। রাণীদের বাড়ীর সম্মুখে একটি দরজা ও জানালা নাই—ছোট ছোট ঘুলঘুলি মাত্র; তাহাও আবার তেরছ্ ভাবের —যাহাতে সূর্যালোকও প্রবেশ না করে—সাবেক ভাব ও প্রথার চূড়ান্ত নিদর্শন। সম্মুখে রাজার কাছারী বা টেম্পেল ম্যানেজারের অফিস। সম্প্রতি মন্দিরে বৈদ্যুতিক আলো হইয়াছে ভোর রাত্রিতে সিংহ দরজায় উজ্জ্বল আলোক দেখিলাম। তবে জগন্নাথের নিকট এখনও ঘৃতের আলো জ্বলে বোধ হয়। বানরের উৎপাত এখানেও নিতান্ত কম নয়। বৃন্দাবনের ন্যায় বানর ও বড় হনুমান্ উভয়ই আছে। ধর্মশালার জানালায় সব জাল দেওয়া, তাহাতেও অনেক উৎপাত হয়। ধর্মশালার চাকরেরা কিছু পাইলেই যাত্রীদের অনেক বা সবরকম কাজ করিয়া দেয়। অনেক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ধর্মশালাতেই বিক্রয় করিতে আনে। আমরা কিছু দধি কিনিলাম। প্রসাদ কিনিয়া আনিতে প্রায় ২ টা বাজিল। প্রসাদ পাইলাম। সিংহদ্বারের সম্মুখ দিয়া যে পথ কোর্টের দিকে গিয়াছে, সেই পথ ধরিয়া সমুদ্রের দিকে চলিলাম। ১৯০৭ সালে যখন পুরী আসিয়াছিলাম, সেই ২৩ বৎসরের পূর্বে এই পথ দিয়া আমি সময়ে সময়ে শ্রীজগন্নাথ দেখিতে আসিতাম। সেবার এই পথটি ছাড়া ও শ্রীজগন্নাথদেব ছাড়া আর বড় কিছু দেখা হয় নাই। তাই পূর্বের স্মৃতি অনুরূপ এই পথটি দেখিবার জন্য যাত্রা করিলাম। পথের দুই পার্শ্বের বাড়ীঘর দেখিলাম কিছুই স্মরণ নাই। কোর্টের নিকট যেখানে বাবলা গাছ আরম্ভ হইয়াছে—সেই গাছগুলি তখন ছোট ছিল এখন খুব বড় হইয়া উভয় পার্শ্বস্থ বৃক্ষগুলি পরস্পর

মিলিয়া যেন পত্রের সামিয়ানা টাঙ্গানোর মত দেখাইতেছে। কোর্টের নিকট অনেকটা পূর্ববৎই আছে দেখিলাম। ফ্ল্যাগপোষ্ট ঠিক সেইরূপ রহিয়াছে তাহার নিম্নে যে কামান ২/১ টি ছিল তাহাও সেইভাবে রহিয়াছে। ষ্টীমার ষ্টেশন "Pooree"লেখা ও ঘোরা আলো সমেত সেইরূপই ঠিক আছে। নূতনের মধ্যে সমুদ্রতীরে কয়েকটি বসিবার স্থান ও স্বর্গদ্বার পর্যন্ত একটি পাকা রাস্তা হইয়াছে অবশ্য অনেক নূতন বাড়ীও হইয়াছে দেখিলাম। "সাগরিকা" নামক যে বাড়ীতে আমরা ছিলাম তাহা দেখিবার জন্য সম্মুখে গিয়া একটু দাঁড়াইলাম। অনেক পুরাতন কথা মনে পড়িল। সে বাড়ীটা এখন দোতলা হইয়াছে 'সাগরিকা' নাম লেখা এখনও আছে তবে তখন গেটের গায়ে পাথরের লেখা ছিল কিনা মনে নাই। সমুদ্রের ধারে ধারে আমরা শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধি মন্দির উদ্দেশ্যে গেলাম। সেস্থানটা একেবারেই পরিবর্তিত হইয়াছে মনে হইল। অনেক নূতন বাড়ী হইয়াছে। এমনকি হরিদাস সমাজটি খুঁজিয়া বাহির করিতে একটু বেগ পাইতে হইল। তাহার সম্মুখে এখন বড় বড় বাড়ী হইয়া সমুদ্র ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। সমাজ মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। শ্রীরামদাস বাবাজীর হাতে আসিয়া এখন সমাজবাটীর অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। পূর্বের ছোট স্তম্ভের মত স্থানটির উপর বড় সমাজ মন্দির ও আশে পাশে নূতন ঘর দুয়ার পরিপাটীর সহিত প্রস্তুত হইয়াছে। হইলেও মনে হইল পূর্বে যে একটা জীবন্ত ভাব মনে জাগিত এখন তেমনটি হয় না। সেই শ্যাওলা লাগা নীরব নির্জন পরিপাটিশূন্য সাদাসিধে বাড়ীটিতে যে সজীবতা অনুভূত হইয়াছিল এখন বোধ হয় আর তাহা নাই। অন্ততঃ আমার এইরূপ বোধ হইল। হরিদাস ঠাকুরের সমাজ দেখিয়া আমরা গম্ভীরায় উপস্থিত হইলাম। তখন শ্রীরাধারমণদেবের আরতি হইতেছিল, আরতি দর্শন—তুলসীদেবী পরিক্রমা করিয়া আরতি—তথা হইতে গম্ভীরা গৃহে গমন প্রতিধ্বনির গম্ভীর শব্দ। মহাপ্রভুর পাদুকা, কান্থা, কমণ্ডলু ও গোবিন্দের জল পাত্র দর্শন। পাদুকা বক্ষে ও হৃদয়ে ও মস্তকে ধারণ—ইহাতেও যে হৃদয় গলিলনা—তাহা পাষাণ হইতেও কঠিন মনে হইল। পাদুকা যুগল ও একটি ছোট কাঁচের আধারে শ্রীঅঙ্গের কান্থা বাহিরের গৃহে পুজারী আনিয়া দেখাইলেন। মৃৎ কমণ্ডলু অর্ধভগ্ন অবস্থায় ও অত্যন্ত জীর্ণ বলিয়া বাহিরে আনা হইল না। তাহা ক্ষুদ্র গবাক্ষ দিয়া দর্শন করিলাম—তথা হইতে সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বাটী বা গঙ্গামাতার বাটী। গমন করিলাম। এখানে সার্বভৌমের সহিত মহাপ্রভুর বিচার হইয়াছিল। সার্বভৌমের আসন—মেঝের সহিত গাঁথা—অল্প উচ্চ; মহাপ্রভুর আসন কাষ্ঠের—প্রায় ১ হাত উচ্চ। দেওয়ালের গায়ে অঙ্কিত অনেক লীলাচিত্রাদি। আসনের কাছে সার্বভৌমের ছবি অঙ্কিত—সম্মুখের দেওয়ালে মহাপ্রভুর ষড়ভূজ

মূর্তি খোদিত। এই ঘরের বিপরীত দিকে —মধ্যে শ্রীগোবিন্দ ও উভয় পার্শ্বে শ্রীরাধাললিতা প্রভৃতি রহিয়াছেন। বস্ত্রাঞ্চলে যেন গোবিন্দকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছেন। প্রথমে উড়িয়াদের বাংলাকীর্তন হইল। মহাপ্রভুর উড়িয়া ভক্তগণ গৌড়ীয়াদের মতই গুণসম্পন্ন। টানা পাখা টানিয়া আনন্দ পাইলাম। আরতি দর্শনান্তে সাড়ে ৯ টার পর বাসায় ফিরিয়া সামান্য কিছু জলযোগের পর শয়ন করা গেল—একঘুমে রাত্রি ভোর হইয়া গেল।

২৬/৯/১৯৩০ শুক্রবার

৫ টার সময় উঠিয়া শৌচাদি সমাপনান্তে গুণ্ডিচাবাড়ী দর্শন ও ইন্দ্রদ্যুম্ন নামক সরোবরে স্নান করিবার উদ্দেশ্যে আমরা বাহির হইলাম। সিংহদ্বারের সম্মুখ হইতে এই সুবিস্তৃত রাস্তাটি আরম্ভ হইয়া গুণ্ডিচা পর্যন্ত গিয়াছে। এইপথে জগন্নাথ রথারোহনে যাত্রা করেন; বহু জনতা হইয়া থাকে এইজন্য এইরাস্তাটি এত অধিক বিস্তৃত। এখন রাস্তার উভয় পার্শ্বে ছোট ছোট অস্থায়ীভাবে যে সকল দোকান রহিয়াছে রথের সময় তাহা উঠাইয়া দেওয়া হয় সুতরাং তখন রাস্তা আরো বিস্তীর্ণ হইয়া থাকে। প্রতিবৎসর নূতন করিয়া যে রথ প্রস্তুত হয় তাহার একখানি এখনও রহিয়াছে দেখিলাম। বহু চক্র। অস্থায়ীভাবে প্রস্তুত বলিয়া দেখিতে তেমন সুন্দর হয় না। এই পথ ধরিয়া আমরা গুণ্ডিচাবাড়ী চলিলাম। মধ্যরাস্তা পর্যন্ত জগন্নাথের উচ্চমন্দির স্পষ্টরূপে দেখা যাইতে ছিল কিন্তু আর একটু অগ্রসর হইতেই রাস্তার বেঁকের জন্যই বোধ হয় মন্দির সম্পূর্ণ অদৃশ্য হইল। গুণ্ডিচাবাড়ীর ফট্‌কপর্যন্ত তাহা আর দেখা গেলনা পরে গুণ্ডিচার সম্মুখভাগ ছাড়াইতেই পুনরায় পূর্ববৎ দেখা গেল।

গুণ্ডিচা দর্শন ইন্দ্রদ্যুম্নে স্নান—কোটি ধেনুদান ও অশ্বমেধ যজ্ঞস্থল—আহ্বানে কচ্ছপের আগমন ও খাদ্য গ্রহণ...........মন্দিরস্থ দেবদেবী। গুণ্ডিচাবাড়ীর বর্ণন—দেখিয়া প্রত্যাবর্তন পথে দশ অবতার দর্শন। নরেন্দ্র সরোবর দর্শন—বাসায় আগমন—জলযোগান্তে হরি দাসের স্থান দর্শন—সিদ্ধ বকুল—মহান্তসহ কথোপকথন—প্রসাদ আনাইয়া গ্রহণ— ৩টার পর বিদায় ও কল্যকার নিমন্ত্রণ গ্রহণ—তথা হইতে শঙ্কর মঠে। শ্রীকৃষ্ণ ও মহাদেব ও বহু শালগ্রাম। শঙ্করের আসন। রাস্তায় সুন্দর দৃশ্য—বালির পাহাড়—টোটা গোপীনাথদর্শন—গোপীনাথের সৌন্দর্য—দুইপার্শ্বে রাধা ও ললিতা —যমেশ্বর টোটা। তথা হইতে সমুদ্রের পথে—সমুদ্রধার দিয়া ....এ আগমন—গাঁথা বেঞ্চে উপবেশন —সমুদ্র দর্শনও শোভা বর্ণন। ৭ টার পর —জগন্নাথ দর্শন—আরতি ঐশ্বর্যভাব ষড়ভূজ গৌরাঙ্গ আরতি দর্শন—মালতী মালা প্রদান—সেবাইতের সহিত আলাপন—পুনঃ প্রসাদ খরিদ—বাসায় সাড়ে নয় টায় আগমন—প্রসাদ গ্রহণ শয়ন।

২৭/৯/১৯৩০

প্রাতে উঠিয়া শৌচাদি সারিয়া আঠারনালা দর্শনে গমন—পথে ঝুলানো মণ্ডপ নামক —স্নান দর্শন জগন্নাথ বল্লভ নাম—বৃহৎ বাগান—নিতাই ও মহাপ্রভুর মূর্তি ও ষড়ভূজ—অঙ্কিত—ম্যানেজারের সহিত কথোপকথন নাম ক্ষেত্রমোহন মাহিতী। উদ্যানের ভিতর গমন ও রায় রামানন্দের গোঁফার সন্ধান—তাহা নষ্ট হইয়াছে। তথা হইতে আঠারনালা দর্শনে গমন—১৮টি খাটাল ওয়ালা সাঁকো। এখান হইতে জগন্নাথ মন্দির দেখা যায়—সাঁকোর উপর বসিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম—তথা হইতে নরেন্দ্র সরোবরে গমন ও স্নান—ইন্দ্রদ্যুম্ন হইতেও অনেক বড় পুষ্করিণী—জল ভাল। স্নানান্তে বাসায় প্রত্যাগমন—জলযোগ ও বিশ্রামান্তে সিদ্ধবকুলতলায় শ্রীহরিদাস ঠাকুরের মঠের মহান্তের নিমন্ত্রণ রক্ষায় গমন। মহান্তটি বেশ ধীর প্রকৃতির ও সুসিদ্ধান্তবিৎ বলিয়াই মনে হইল—নাম মহান্ত বলভদ্রদাস গোস্বামী—শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিত গোস্বামীর পরিবার। বেশ যত্নের সহিত প্রসাদ পাইতে দিলেন। প্রণামী ও দেওয়া হইল। তথা হইতে ধর্মশালায় আসিয়া কিছু বিশ্রাম করা গেল। নিয়ম অনুসারে অদ্য ৩ দিন পূর্ণ হওয়ায় ধর্মশালা ত্যাগ করিতে হইবে—এইজন্য বৈকালে আর একটি বাসার সন্ধানে বাহির হওয়া গেল। বাসা অনেক পাওয়া যায় কিন্তু পায়খানা বড়ই অপরিষ্কার ষ্টেশন দেখিয়া চক্রতীর্থে গমন—পথে ও বেলাভূমির অপূর্ব শোভা—প্রকৃতির সৌন্দর্যে তৎস্রষ্টার অনুভব। চক্রতীর্থে গমন—সোনার গৌরাঙ্গ—হনুমান—চক্র নারায়ণ—নিকটে প্রাচীন গোফা ও চক্রতীর্থ দর্শন—বেলাভূমের উপর খরস্রোতা নদীর সাগর সঙ্গম—সুন্দর দৃশ্য —নদী পারে স্রোতবেগ অনুভব। সমুদ্রতীর দিয়া flag.....'এ আগমন ও রাত্রি প্রায় ৮ টা পর্যন্ত সমুদ্র তীরে উপবেশন চন্দ্রালোকে সমুদ্রের শোভা। তথা হইতে মন্দিরে গমন-শ্রীজগন্নাথ দর্শন বাসায় প্রত্যাগমন—রাত্রিতে প্রসাদ পাইয়া শয়ন। ও সুনিদ্রা।

২৮/৯/১৯৩০

সকালে উঠিয়া নূতন বাসস্থানান্বেষণে গমন—যোগেশের চেষ্টায় নূতন ধর্মশালায় স্থান লাভ। বাসাটি অপেক্ষাকৃত নিরিবিলি ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। আজ বাসা পরিবর্তন গোলমালে প্রাতে বাহির হওয়া হইল না। কূপোদকে স্নান করিয়া বিশ্রাম—বেলা ৩ টায় প্রসাদ আনাইয়া ভোজন। অল্প বিশ্রামের পর বাহির হইয়া গোয়েন্‌কা ধর্মশালায় গিয়া গোকুলের পত্র ও সিদ্ধ বকুলে মহান্তের দেখা করিবার সংবাদ প্রাপ্তি। সিদ্ধবকুলে গমন। পথে দুর্গামূর্তি দর্শন—উড়ীয়া দুর্গা। মহান্তের দেখা না পাইয়া সমুদ্রের দিকে স্বর্গদ্বার দিয়া গমন—flag staff ঘাটে ৮ টা পর্যন্ত নীরবে বসিয়া

সিন্ধুর রোদ খেলা দর্শন—সমুদ্রকুলে বহুলোকের সমাবেশ—তথা হইতে বাসায় আসিয়া তখনি শ্রীজগন্নাথ দর্শনে গমন—রাত্রিতে জগন্নাথের রাজোপচারে সেবা। চারিদিকে 'জয় জগন্নাথ স্বামীকি জয়' ধ্বনি। সেবকগণ তৎপর হইয়া নানা প্রকার সেবায় নিযুক্ত—চারিদিকে আলোক মালা দান। শ্রীবিমলাদেবী দর্শন—৩ দিন দুর্গা পূজা ব্যাপার। শ্রীলক্ষ্মীদেবী দর্শন করিয়া ষড়ভূজ গৌরাঙ্গ দর্শনে গমন—পূজারী কর্তৃক প্রসাদ দান। প্রসাদ ক্রয় করিয়া রাত্রি ১১টায় বাসায় প্রত্যাগমন—আহার ও সুনিদ্রা।

২৯/৯/১৯৩০

প্রাতে উঠিয়া শ্রীজগন্নাথের চক্রদর্শন করিয়া শয্যাত্যাগ প্রাতকৃত্যে সমুদ্র স্নানে গমন—এবার এই প্রথম সমুদ্রস্নান—যাহা কঠিন মনে হইয়াছিল অভ্যাস দ্বারা তাহা সহজ বোধ হইল। এখন প্রত্যহ সুবিধা হইলে ২ বার স্নান করিবার বাসনা। ফিরিবার কালে পথে কাছারীর দুর্গোৎসব দর্শন আজ সপ্তমী পূজা বাংলাদেশ উৎসব মাতা—এখানেও কল্য হইতে বহুলোক আসিয়াছে। রাস্তায় বহু বাঙ্গালীর সমাগম। জগন্নাথদর্শনে গমন—মন্দিরে লোকভীড়। ষড়ভূজ গৌরাঙ্গ মন্দিরে গমন।

শ্রীরামদাস বাবাজীর শিষ্যের সহিত দেখা করিয়া চরণ চিহ্নের জন্য খদ্দর ও ১ টাকা প্রদান। তৎকর্তৃক জগন্নাথবল্লভ মন্দিরে—শ্রীনিত্যানন্দ দাস নামক প্রাচীন উড়িয়া ভক্তের সহিত সাক্ষাতের উপদেশ। তৎস্থানে গমন। নিরাপরাধ নাম লইতে উপদেশ দিলেন। একাদশী নিরম্বু হওয়া উচিৎ ও স্ত্রীসঙ্গাদি বৈরাগীর নিষিদ্ধ বলিলেন। বেশ সাদাসিধা বৈষ্ণব। তথা হইতে ১১ টায় বাসায় প্রত্যাগমন। বেলা ৩ টার পর প্রসাদ পাইয়া সমুদ্রতীরে গমন। কাছারীর রাস্তা দিয়া গমন—কাছারীর পর—বালির পাহাড় ছাড়াইয়া ১২/১৪ টি কুঞ্জাকৃতি ঝাউগাছ। অবিরত সমুদ্রের দক্ষিণা হাওয়ায় উত্তরে হেলিয়া গাছগুলি এখন উত্তর দিকে মাথা করিয়া রহিয়াছে—অভ্যাস যোগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সমুদ্রতীরে সিদ্ধবকুল মঠের মহান্তসহ সাক্ষাৎ ও ভ্রমণ করিতে করিতে কথোপকথন—কলিকাতায় যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রাত্রিতে সমুদ্র কূলে নামকীর্তন ও সেইভাবে প্রত্যাবর্তন । কাছারীর মাঠে শ্রীদুর্গাদর্শন করিয়া বাসায় প্রত্যাগমন।

৩০/৯/১৯৩০

প্রাতে উঠিয়া সমুদ্রে স্নান—বাসায় প্রত্যাগমন—শ্রীজগন্নাথ দর্শনে গমন—লোকের ভীড়—বাহির হইতে দর্শন—ষড়ভূজ মহাপ্রভুর পূজারী কর্তৃক মহাপ্রভুর চরণচিহ্ন প্রদান। চৈতন্যভাগবত পাঠ শ্রবণ—বাসায় প্রত্যাবর্তন ৩ টার সময় প্রসাদ পাইয়া

সমুদ্র গমনের উদ্যোগ। সিদ্ধবকুলের মহান্তের আগমন—তাঁর সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে সমুদ্রতট দিয়া হরিদাসের সমাধি মঠে গমন ও শ্রীল শ্যামদাসবাবাজীর দর্শন। মঠের প্রাঙ্গণে বসিয়া—কথা শ্রবণ। রাধাকান্তমঠের মহান্তগণের সমাধি গৃহে প্রণাম। সমুদ্রতীরে উপবেশন—রাত্রিতে শ্রীদুর্গাদর্শনান্তে বাসায় প্রত্যাবর্তন—জলযোগ—শয়ন।

১/১০/১৯৩০

প্রাতে সমুদ্রে স্নান। বাসায় প্রত্যাগমন। প্রাতে বৃষ্টি আরম্ভে অসুবিধা। জগন্নাথদর্শনে গমন—ভিতরে যাইয়া সুন্দরভাবে দর্শন ও আত্মনিবেদন দণ্ডবৎ প্রণাম ও ভূ-লুণ্ঠনাদি তথা হইতে মার্কণ্ডেয় সরোবর দর্শনে গমন। জল স্পর্শাদি। গোশালা দর্শন। মন্দিরের পশ্চাৎ দিকে ফটক দিয়া প্রবেশ ও উদ্যান দর্শন বহুবিধ ফুলের গাছ। স্থাবর হইলেও ধন্য ইহারা জীবন জগন্নাথ সেবার জন্য। বারোভাই সহ হনুমূর্তি দর্শন ষড়ভূজ দর্শন করিয়া বাসায় প্রত্যাগমন। বেলা ৩ টার পর প্রসাদ গ্রহণ। সল্প বিশ্রাম। সমুদ্রতীরে গমন—করৌলীর রাণীর সমুদ্রস্নান—মহান্ত (সিদ্ধ বকুল) সহ সমুদ্রতীরে বসিয়া কথোপকথন। বাসায় প্রত্যাগমন। প্রসাদ গ্রহণ —শয়ন।

2nd October

প্রাতে সমুদ্রস্নান। বাসায় প্রত্যাবর্তন —শ্রীজগন্নাথদর্শন চক্ষুর উপর আলোকস্ফুরণে ভিন্নাকারে দর্শন। জয়পুরবাসী রমণীগণের ঠাকুরের সম্মুখে নৃত্যগীত। অক্ষয় বটের নিকট মন্দিরের উপর বসিয়া জপ। পরে মণিকর্ণিকায় কপালমোচন শিবলিঙ্গ দর্শন। গর্তের ভিতর মন্দির মাথায় সর্প। তথা হইতে টোটা গোপীনাথ দর্শন—সুললিত সালঙ্কৃত ভুজযুগল। পরম রসশেখর মূর্তি—পার্শ্বে ললিতাও শ্রীরাধা। তথা হইতে যমেশ্বর টোটায় শিব ও পার্বতী দর্শন। এখানে মহাপ্রভু ও সনাতন গোস্বামীতে সাক্ষাৎ হয় ও মর্য্যাদা বিষয়ে আলোচনা হয়। তথা হইতে সিংহদরজা হইয়া বাসায় প্রত্যাবর্তন। প্রসাদ পাইয়া মধ্যাহ্নে বিশ্রাম। বৈকালে সমুদ্রতীরে গমন। সন্ধ্যার পর দেবী বিসর্জন দর্শন। পরে জগন্নাথ দর্শনে-দর্শন-মালাপ্রদান-স্তম্ভে আলোক দান। সমস্ত দেবতা প্রণাম। মহাপ্রভুকে প্রণামান্তে বাসায় প্রত্যাবর্তন।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধাম ভ্রমণ

১। কালনা

২। কাটোয়া

৩। যাজিগ্রাম

৪। শ্রীখণ্ড

৫। শ্রীনবদ্বীপ

১১ ই পৌষ ১৩৩১ ইং ২৭ শে ডিসেম্বর ১৯৩০। শনিবার। হাওড়া হইতে ১/৫ মিনিটের ট্রেনে রওয়ানা। সঙ্গী নিরঞ্জন বাবু, শ্যামাপদ, তারকবাবু, যোগেশ, রাধাশ্যামবাবু, স্বামীজী, হরিমোহন বাবু চুঁচুড়া হইতে উঠিলেন। যথা সময়ে কালনা স্টেশনে পৌঁছাইয়া ঘোড়ার গাড়ী পাইতে কিছু বিলম্ব। পরে শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের শ্রীপাটে। শীতঋতুতে পল্লী দৃশ্য। ম্যালেরিয়া প্রকোপের নিদর্শন। আমলিতলা। মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ দর্শন। পার্শ্বেই গৌরীদাস পণ্ডিত, জগন্নাথ, রাধাগোবিন্দ প্রভৃতি শ্রীবিগ্রহ। প্রাচীন মন্দির প্রাঙ্গণ নাটমন্দির। বলাই মল্লিকের নির্মিত মন্দিরের দুর্দশা। বৃদ্ধ গোস্বামীজী-প্রাচীন ভাবাপন্ন বৈষ্ণব। 'কানুপ্রিয়' নাম কাগজে পড়িয়া নামরক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধার কথা জানাইলেন। কানুপ্রিয় বলিতে তিনি প্রিয়া বা ৭/৮ বৎসরের গোপবালিকার ধারণা হয়—ইত্যাদি অনেক ভাবের কথা বলিলেন। বৈঠকখানা ঘরে স্থানলাভ। অসুস্থতা সত্ত্বেও ছোট গোস্বামী আমাদের সহিত অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাবার্তা। রাত্রিতে লুচি প্রভৃতি প্রসাদ প্রেরণ। সন্ধ্যায় আরতি দর্শন। ঘরে বসিয়া ১ম কীর্তন আহারান্তে ২য় কীর্তন। চৌকির উপর শয়ন—কোনও অসুবিধা বোধ হয় নাই বরং বেশ সুবিধাই হইয়াছিল।

রবিবার

ভোরে উঠিয়া কীর্তন করিয়া পরে তথা হইতে আমলীতলায় গমন ও প্রদক্ষিণ সং কীর্তন ও নর্তন। শৌচে গমন—দেবদারু কুঞ্জ-নিভৃত স্থান ও পুষ্করিণী।

গোঁসাইজীর উপদেশ মত অন্যান্য শ্রীবিগ্রহাদি দর্শনে গমন। শ্রীসূর্যদাস পণ্ডিতের পাট দর্শন। —নিতাইগৌরাঙ্গ বিগ্রহ। নাটমন্দির। বাঁধান কুলতলা—নিত্যানন্দ বিবাহস্থান বলে। বসুধা, জাহ্নবাসহ সূর্যদাস পণ্ডিতের মূর্তি। তথা হইতে মদন গোপাল দর্শনে গমন। ছোট সুন্দর বিগ্রহ। অদ্বৈতপুত্র শ্রীকৃষ্ণমিশ্র নিজ কন্যাকে শান্তিপুরের মদনগোপালের অনুরূপ বিগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহা সেই শ্রীবিগ্রহ। কৃষ্ণমিশ্র কন্যার শ্বশুরবাড়ী। পার্শ্বেই মিশ্র ও মিশ্রকন্যা বা শ্রীঅদ্বৈত-সীতার মূর্তি। সেবার বিশৃঙ্খলতা । তথা হইতে বর্ধমান রাজের ১০৮ শিবলিঙ্গ দর্শন ও প্রত্যেকটিকে প্রণাম। দর্শনীয় স্থান ১ টি সাদা ও ১ টি কাল লিঙ্গ মুর্তি—প্রত্যেকটির ধীরে ধীরে দিক পরিবর্তন। বর্ধমানরাজের ঠাকুর বাড়ী। ১ম রাধালালচাঁদজীর দর্শন। শ্যামসুন্দর দর্শন। পুরাতন ভাঙ্গা ঝাড়লণ্ঠন সাজানো নাট মন্দির। গোবর্ধন গিরিরাজের আকৃতি বিশিষ্ট একটি দালানঘর। পার্শ্বে একটি ঘরে বহু বহু শালগ্রাম ও ৭ জোড়া রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ। তথা হইতে অপর প্রাচীর বেষ্টিত শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও শ্রীরামসীতা মুর্তি হনুমান ও লক্ষ্মণাদি ভ্রাতাগণ পরিবেষ্টিত। অন্যত্র প্রাচীন বর্ধমান রাজা ও রাণীর সমাধিভবন। সমাধির মধ্যেও বিলাস সম্ভারে গৃহ সজ্জিত। তাহা হলেও এতগুলি দেবমন্দিরাদির প্রতিষ্ঠাতা যিনি তাকে ভাগ্যবান ও ভক্ত বলতেই হবে। রাজবাড়ীই কালনার যাহা কিছু দর্শন। তথা হইতে সিদ্ধ ভগবানদাস বাবাজীর আশ্রম দর্শনে গমন। রৌপ্য নির্মিত "নামব্রহ্ম" নীচে শ্রীরাধাকৃষ্ণ মূর্তি। পশ্চাতের দিকে বাবাজী মহারাজের সমাজ। নামব্রহ্ম মন্দিরে সম্মুখে নাটমন্দির তাহার পার্শ্বে ইন্দারা—ইহারই জল বাবাজী ব্যবহার করিতেন। সিঁড়ি দিয়া ভিতরে নামা যায়। তিনি পদস্পর্শের ভয়ে গঙ্গায় যাইতেন না। সাধু ব্যবহৃত পবিত্র জল স্পর্শ করিলাম। তথা হইতে বাজার দেখিয়া ঠাকুর বাড়ী প্রত্যাবর্তন। পরে স্নানে গঙ্গায় গমন ও স্নান। পাঁক ও জনশূন্যতা। প্রত্যাবর্তন। আরতি দর্শন—মহাপ্রভু প্রদত্ত বৈঠা ও গীতার পুঁথি স্পর্শ। পুঁথির কিয়দংশ শ্রবণ। একটি কাঁচের বাক্সে রক্ষিত হইয়াছেন। সম্মুখে নাটমন্দিরে প্রসাদ গ্রহণ। অন্ন ও কিঞ্চিৎ ব্যঞ্জন—পায়স। চিন্ময় প্রসাদ—অমূল্য বস্তু। চূণিলাল গোস্বামী উপস্থিত থাকিয়া ভদ্র ব্যবহার করিলেন। শ্রীনকুল ব্রহ্মচারীর পাট দর্শনে গাড়ীর সুবিধা না পাওয়ায় বঞ্চিত। দর্শনীয় পাঠ শুনিলাম। ভাগ্যে থাকিলে বারান্তরে চেষ্টা করিতেই হইবে। জিনিসপত্র বাঁধিয়া আহারান্তে কাটোয়ার উদ্দেশ্যে প্রস্থান। চূণীগোস্বামীর জন্য ম্যালেরিয়ার ঔষধ কলিকাতায় গিয়া পাঠাইবার কথা হইল। সংবাদপত্রে নাম প্রভৃতি দর্শন করায় কিছু বেশী আদর-অভ্যর্থনা। কাটোয়ার পথে গাড়ীতে পাটুলীর নিকটে সূর্যাস্তের সুন্দর দৃশ্য। সন্ধ্যায় কাটোয়া ষ্টেশনে পৌছিয়া ঘোড়ার গাড়ী যোগে কালীবাড়ীর ধর্মশালায়

পৌঁছান গেল। অদ্বৈত বংশীয় বাবাজী নির্দিষ্ট—উদ্ধবদাস বাবাজীর খোঁজ করিয়া তিনি দেহরক্ষা করিয়াছেন জানা গেল। তাঁহার আখড়াবাটীও অজয় নদী গর্ভে স্থান লাভ করিবার অপেক্ষা করিতেছে। কালীবাড়ীর ধর্মশালায় রাত্রিতে সকলে মিলিয়া কীর্তন............করা গেল। মুড়ি ও মিষ্টাদি আনিয়া রাত্রিতে খাওয়া হইল। ভোরে উঠিয়া মধুর কীর্তন। বেশ আনন্দজনক হইল। উপরের ঘর দুইটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—থাকিবার কোনই অসুবিধা হইলনা।

সোমবার—

প্রাতে শৌচাদি সারিয়া দর্শনে বাহির হওয়া গেল। প্রথমে মহাপ্রভুর শ্রীচিকুরের সমাধিস্থান—একটি চতুষ্কোণ চাতালের ভিতর বেদী। একই স্থানে গদাধর দাসের সমাজ বিদ্যমান। সম্মুখে একটি নবীন অশ্বত্থ বৃক্ষের মূলে কেশ মুণ্ডনের স্থান। পার্শ্বেই একটি প্রাচীর ঘেরা ছোট স্থান—মধ্যে মহাপ্রভু ও ঈশ্বরপুরীর গাঁথা আসন। সম্মুখে ক্ষৌরকারের সমাধি। এইস্থানে সন্ন্যাসদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। একটু পশ্চাতে কেশবভারতীর ভজনস্থান। একটি বেদীর উপর চাতালে গাঁথা। পার্শ্বের বড় ফটক দিয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলে মহাপ্রভুর মন্দির—সম্মুখে নাটমন্দির মহাপ্রভুর নটনমূর্তি—একহস্ত ঊর্দ্ধ-চরণভঙ্গী নৃত্যশীলের ন্যায়। পার্শ্বে ছোট নিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীমূর্তি। দর্শন করিয়া আমরা নিকটেই একটি বাড়ীতে মদনগোপাল দর্শন করিলাম—সেবাইত বলিলেন ইহা অদ্বৈত প্রভুর স্থাপিত। বেশ বড় মূর্তি—শ্যামসুন্দর উপবিষ্ট—বামে শ্রীরাধা ও দক্ষিণে ললিতা—রাসশ্রান্ত মূর্তি। আর একটি বাড়ীতে নৃত্যপরায়ণ মহাপ্রভু দর্শন করিলাম। সেখান হইতে গঙ্গা দর্শনে যাইয়া—বিস্তৃত বেলাভূমি ও তার একপ্রান্তে ক্ষীণকায়া অল্পসলিলা গঙ্গা প্রবাহিতা। অজয় সঙ্গম। বাজার দেখিয়া ধর্মশালায় ফিরিলাম। পরে স্নান করিতে গঙ্গায় সকলে মিলিয়া যাইলাম। অল্পজল হইলেও স্নান করিয়া বেশ তৃপ্তি লাভ হইল। কিন্তু কর্ম দুর্বিপাকে এক ভীষণ বিপদ উপস্থিত হইল। রাধাশ্যাম স্নানের পর হঠাৎ বসিয়া পড়িল—পরে বালির উপর শুইয়া কাঁপিতে লাগিল। প্রথমে মাথা ঘোরা প্রভৃতি মনে হইল। পরে হাত দেখিয়া যখন নাড়ী পাওয়া গেলনা তখন failure of heart (হৃদযন্ত্রের অচলতা) বুঝা গেল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকিতে বলিলাম। শ্যামাপদ ও যোগেশ ছুটাছুটি করিয়া ডাক্তার আনিয়া.........ইনজেকশন করিয়া ও.....ঔষধ.......খাওয়াইয়া অতিকষ্টে একটু নাড়ী পাওয়া গেল। এক মোক্তার Easy chair (ইজিচেয়ার) দিলেন। ২টি মুটে ডাকিয়া ও সকলে ধরাধরি করিয়া ১২ টার সময় ধর্মশালায় আনা হইল। ইহা তাহার পুণর্জন্ম বলিতে হইবে। আমাদেরই দুর্দৈবের জন্য বিপদ আসিয়াছিল—সমূহ বিপদ ঘটিবার সমস্ত সম্ভাবনাই ছিল, কিন্তু

কেমনভাবে সব যোগাযোগ হইয়া বিপদ গায়ে লাগিলনা ইহা সুস্পষ্টরূপে মহাপ্রভুর দয়াই বুঝিলাম। এই বিপদোদ্ধার স্মরণে রাখিবার মত বিষয়। ১ টার সময় মহাপ্রভুর বাড়ী প্রসাদ পাইয়া ধর্মশালায় ফিরিয়া একটু বিশ্রাম করিয়া বৈকালে উদ্ধবদাস বাবাজীর আখড়াবাড়ীতে গেলাম। বৈষ্ণবের ভজনাশ্রমের মতই স্থান। কুটিরের সম্মুখের অংশ নদীর কবলে নিপতিত। সম্মুখের ঘর প্রত্যেক মূহূর্তে ভাঙ্গিয়া পড়িবার অবস্থায় রহিয়াছে। সম্মুখের অর্ধভগ্ন রোয়াকে বসিয়া গঙ্গার সহিত অজয়সঙ্গম ও দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তর ও বেলাভূম ও রবিশস্যপূর্ণ ক্ষেত্র। দেখিবার বটে। কুটিরে ঠিক গভীর নিম্নতলেই অজয় নদীর শেষসীমা আসিয়া থামিয়া গিয়াছে। নদীর চরে সন্ধ্যাগমের দৃশ্য দেখিবার জিনিস। গরুর সারি গৃহে প্রত্যাবর্তন ও নিথর নৌকায় বিশ্রাম এবং রাখাল ও খেয়াঘাটের লোকের সুস্পষ্ট কোলাহল বা চীৎকার বেশ অনুভবনীয় বস্তু। গঙ্গা এইস্থান হইতে জয়দেবকে ধন্য করিতে গিয়াছিলেন। এই আখড়ায় কিশোরা কিশোরীর সমাজ ও অদ্বৈতবংশীয় বড়গোঁসাই বা জগদ্বন্ধু গোস্বামীর সমাজ। সন্ধ্যার পর মহাপ্রভুর আরতি দর্শন করিয়া বাজারে জলযোগের দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া ধর্মশালায় প্রত্যাবর্তন। এইদিন মধ্যাহ্নে শ্রীখণ্ড যাইবার কথা ছিল কিন্তু রাধাশ্যামের অসুখের দরুণ বন্ধ করা হইল। কল্য ভোর ৫টার গাড়ীতে রাধাশ্যামকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া আমরা বরাবর শ্রীখণ্ডে (৭ জন) যাইব এই ব্যবস্থা ঠিক করিয়া রাত্রিতে জলযোগান্তে শয়ন করিলাম।

মঙ্গলবার

ভোর ৫ টায় রাধাশ্যামের নাড়ীর অবস্থা অনেক ভাল দেখিয়া আমরা সকলে ২ খানি ঘোড়ার গাড়ী করিয়া স্টেশনে রাধাশ্যামকে গাড়ীতে উঠাইয়া শ্রীখণ্ডের উদ্দেশ্যে রওনা হইলাম। কাটোয়া হইতে শ্রীখণ্ড প্রায় ৫/৬ মাইল পথ। প্রাচীন বর্ধমান— কাটোয়ার কাচাপথ দিয়া গাড়ী মন্থর গতিতে চলিল। রাঢ়ভূমির শূষ্কভাব ঊষার সময় বিস্তৃত প্রান্তর সকল বেশ লাগিতেছিল। গাছপালা খুব কম। এখন ধানকাটা হওয়ায় মাঠ সব ফাঁকা। কাটোয়া হইতে প্রায় ২ মাইল পরে যাজিগ্রাম—এইখানে শ্রীনিবাস আচার্য প্রভু বাস করিতেন। রেললাইনের ধারে একখানি ঠাকুরঘর ও তৎ সম্মুখে রামদাসবাবাজী কর্তৃক নবনির্মিত একটি সামান্য রকমের নাট মন্দির। পার্শ্বে একটি প্রাচীন পুষ্করিণী এখন ডোবা। পশ্চাতের দিকে সেবায়েতদিগের বাসস্থান। মন্দিরে মহাপ্রভু নিত্যানন্দের শ্রীবিগ্রহ ও গতিগোবিন্দ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত রাধাকৃষ্ণ ও অপর কতিপয় মূর্তি। স্থানটি বেশ পবিত্র ও নির্জন। সেবাইত বলিলেন চোরের বেশী উপদ্রব থাকায় এখানে বড় কেহ থাকেন না। প্রাঙ্গণে আচার্য প্রভুর ভজনস্থান। একটি ছোট কুঠারীর মধ্যে চরণচিত্র সমেত। প্রাঙ্গণে বেল, নিম্ব, বকুল,

তমাল ও বটবৃক্ষ যথাক্রমে পর পর অবস্থিত নিম্ববৃক্ষটি আচার্যপ্রভুর দাঁতন হইতে জন্মিয়াছে। বকুল বৃক্ষমূলে নরোত্তমঠাকুর ও তমালমূলে বীরচন্দ্র প্রভু বসিয়াছিলেন। বটবৃক্ষমূলে স্বয়ং মহাপ্রভু বসিয়াছিলেন শুনিলাম (এক একটি বৃক্ষপত্র সংগ্রহ করিলাম) বট বৃক্ষ খুব প্রাচীন বোধ হইল। ইহার একটি বড় শাখা মূলবৃক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া শূন্যে রহিয়াছে ও তাহা হইতে একটি বড় ও স্বতন্ত্র রোয়া নামিয়াছে—একটু অস্বাভাবিক রকমের দৃশ্য। স্থানটি অর্দ্ধঘণ্টা আন্দাজ দেখাশুনা করিয়া আমরা গাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। ও তথা হইতে শ্রীখণ্ডে রওয়ানা হইলাম। প্রায় ৮ টার সময় শ্রীখণ্ডে পৌঁছাইলাম গ্রামে প্রবেশ করিবার পথেই মহাদেবের ৩ টি পাশাপাশি মন্দির গ্রামখানি বড় ও ঘেঁসাঘেসি অনেক বাড়ী বৃহৎ প্রাসাদতুল্য গৃহ হইতে পর্ণকুটির পর্যন্ত সকলপ্রকার ঘর দেখিলাম। অধিকাংশই খড়ের ঘর। দোতলা খড়ের ঘরও আছে। স্থানটি মন্দ নয়। তারকবাবুর পরিচিতা বিনোদমোহিনী ঠাকুরাণীর অতিথিরূপেই আমরা প্রথমে উঠিলাম। ঠাকুরবাড়ীর মধ্যে একটি একতলা ছোট রকমের ঘর পাইলাম। স্ত্রীলোকটি বেশ অতিথি পরায়ণা ও মিষ্টভাষিণী। আমরা তাহার সাহায্য পাইয়া কোন অভাব অনুভব করি নাই। নামিবার সময় দ্বারিকানন্দ ঠাকুরের সঙ্গে প্রথমেই দেখা হইয়াছিল। আমি ভাবিয়াছিলাম পরিচয় না দিয়া ১ দিন থাকিয়াই চলিয়া আসিব। কিন্তু উক্ত ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হওয়ায় সে সুযোগ নষ্ট হইল। আমরা দ্রব্যাদি পূর্বোক্ত গৃহে রাখিয়া বড়ডাঙ্গা দেখিতে গেলাম। প্রায় ১ মাইল মাঠের মধ্য দিয়া পথ। স্থানটি বড়ই পবিত্র ও নির্জন মনে হইল। একটি পুষ্করিণী—২ টি বাঁধা ঘাট। ইহাই গঙ্গা বলিয়া এখানে বিবেচিত হয়। মধ্যে একটি প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ। ইহার মূলেই সরকার ঠাকুর ভজন করিতেন। সিদ্ধ ভগবানদাস বাবাজী ও এখানে ৫ বৎসর ভজন করেন। বটবৃক্ষের নীচে উচ্চ অঙ্গন বিশিষ্ট মন্দির। এইস্থানেই সরকার ঠাকুরের আসন ছিল। তৎ সম্মুখে বামদিকে রঘুনন্দনের সহিত অভিরামের মিলনস্থান। বেদী গাঁথা—দক্ষিণ দিকে মুকুন্দের ভজনস্থান —বেদী গাঁথা। কিছুদূরে শ্রীখণ্ডের ঠাকুরদের ফুলসমাজ গৃহ। উৎসবের সময়কার চারিদিকে বড় বড় উনান এখন ভস্মপূর্ণ রহিয়াছে। স্থানটি ভাবুক ও ভক্তের বিশেষ প্রীতিকর। বৈষ্ণবদের বাসোপযোগী নবনির্মিত গৃহ (২ টি) রহিয়াছে, ইহা ভাণ্ডার ও ভিয়ান ঘর। বড়ডাঙ্গায় স্নান আহ্নিকাদি সারিয়া ফিরিয়া আসিয়া মহাপ্রভুর প্রসাদ পাওয়া গেল। অনেক প্রকার অন্নব্যঞ্জনাদির ব্যবস্থা আছে দেখিলাম। দ্বারিকাঠাকুর ও গৌর গুণানন্দ ঠাকুর দেখা করিতে আসিলেন—পরস্পর মিষ্ট ব্যবহার হইল। বৃন্দাবনের সঙ্গে দেখা (নির্মলদার ভাগিনেয়) বিশেষ আগ্রহ করিয়া আমাদের ভালবাসাবাটী দিল ঘেঁটুদার জামাইয়ের বৈঠকখানায়। বেশ সুন্দর

দ্বিতল প্রাসাদ। ঘেঁটুদার জামাই আসিয়াও দেখা করিয়া গেল। বৈকালে জলযোগের ব্যবস্থা করান। তার সঙ্গে বৈকালে বড়ডাঙ্গায় গেলাম। সন্ধ্যা অবধি তথায় বসে নাম করা গেল। বেশসুন্দর স্থান—প্রাণ শীতল হয়। সন্ধ্যায় ফিরে এসে—ঠাকুর বাড়ীতে দর্শনে গেলাম। তখন আরতি কীর্তন হচ্ছিল। গৌরগুণানন্দ ঠাকুর "রূপানুরাগ" একপালা কীর্তন শুনালেন। খাঁটি কীর্তন—অপূর্ব। কলিকাতার লোকে এসব বড় একটা শুনতেই পায়না। শ্রীখণ্ডে ইনি কীর্তন সম্পদ বজায় রেখেছেন সন্দেহ নেই। রাত্রিতে বিনোদ মোহিনী ঠাকুরাণীর গৃহে লুচি প্রভৃতি কিছু প্রসাদ পেলাম। কীর্তন প্রায় ১১ টা পর্যন্ত হলো। কীর্তন শেষে গজদিদি ও বলায়ের মার সঙ্গে দেখা হলো। বৃন্দাবন ও কল্য আর কেহ কেহ নিমন্ত্রণ করলেন। সকলেই বেশ আদর আপ্যায়িত করছে। আমাদের জন্য একটু স্বতন্ত্র খাতির হলেও এরা সকলেই বেশ অতিথি পরায়ণ একথা স্বীকার করতে হবে। রাত্রি —১১ টার পর কীর্তন করে বাসায় এসে শয়ন করা গেল। সঙ্গীগণ সকলেই এদের খাতির যত্ন দেখে সন্তুষ্ট।

বুধবার

আজ একাদশী। ভোর ৫ টা হতে সকলে মিলে ঘরের মধ্যে কীর্তন করা গেল—৭ টা পর্যন্ত। পরে সকলে বড়ডাঙ্গায় গেলাম। যাবার সময় বৃন্দাবনকে—অদ্যই দুপুরের গাড়ীতে নবদ্বীপে যাবার কথা জানালাম। তাদের সকলের ইচ্ছা দ্বাদশীর প্রসাদ পেয়ে যাওয়া। তাহলে নিমন্ত্রণের ভীড় হবে বুঝে —অদ্যই যাওয়া সঙ্গত মনে করলাম। খাওয়া দাওয়া নিয়ম সব উল্টোপাল্টা হয়ে গেছে। —তার উপর আবার নিমন্ত্রণের মধ্যে প্রবেশ ক'রলে একেবারে ষোলআনা পূর্ণ হয়ে উঠে। এইসব ভেবে দৃঢ়ভাবেই আজ যাবার কথা বৃন্দাবনকে জানিয়ে বড় ডাঙ্গায় গেলাম। সেখানেই বেশী থাকলে ভাল লাগে। শৌচ ও স্নানাদি সেরে মন্দিরের রোয়াকে বসে তিলক ও আহ্নিকাদি সেরে নিয়ে ১১ টায় বাসায় ফিরলাম। বলায়ের মা তার বাপের বাড়ী দেখালে। কাল খাবার জন্য বললে। অসম্মত হয়ে বাসায় গেলাম। মহাপ্রভু প্রভৃতি দর্শন করে গৌরগুণানন্দ ও দ্বারিকানন্দ ঠাকুরের বাড়ী গিয়ে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাতাদি করে বিদায় নিলাম। দ্বারিকা ঠাকুর প্রবন্ধ পাঠাতে বল্লেন। ব্যবহার ভালই। বৃন্দাবনের গরুর গাড়ীতে জিনিস বোঝাই করে স্টেশনে পাঠানো হলো। পরে বৃন্দাবন তার বাড়ীতে আমাদের নিয়ে গিয়ে জলযোগ করালে। অনেক আয়োজন করেছে বেচারা। তার আয়োজন দেখে সঙ্গীগণ সকলেই তুষ্ট হ'লো। এখানে গজদি ও বলায়ের মাও এসেছিল আহারান্তে ষ্টেশনের দিকে রওনা হলাম। সঙ্গে বৃন্দাবন অনেকদূর এলো। শরবৎদার নাতি (দৌহিত্র?) ষ্টেশন পর্যন্ত

এলো। ধান কাটা হয়েছে—মাঠে ধান বোঝাই রয়েছে। এখন সকলেই সেজন্য ব্যস্ত। মাঠে বহুলোক। দর ১.৷৷ আনা—৷৷৯. মন। রাঢ়ের মাঠের শোভা একরকম শুকনা ভাব। ষ্টেশনে গাড়ী এলো। ছোট ষ্টেশন—ছোটগাড়ী। কাটোয়ায় যাবার পথে লইনের ধারেই যাজিগ্রামের শ্রীনিবাসাচার্য প্রভুর পাঠ আবার গাড়ী থেকে দেখে প্রণাম করলাম। কাটোয়ায় এসে প্রায় এক ঘণ্টা নবদ্বীপের গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করলাম। বৈকালে নবদ্বীপ ষ্টেশনে নেমে ২ খানি ঘোড়ার গাড়ী যোগে ধর্মশালায় পৌঁছানো গেলো। গঙ্গা দূরে সরে গেছে। বিস্তীর্ণ চড় ভূমি পড়ে রয়েছে। সন্ধ্যা পর্যন্ত ধর্মশালায় ঘাটের বাঁধানো বেঞ্চে বসে সন্ধ্যাদৃশ্য দেখতে লাগলাম। পরকালের কথা মনে জাগিয়ে দিতে এমন দৃশ্য আর নাই। সম্মুখের ভাল ঘর দুইটি পাওয়া গেল। এখন ধর্মশালায় লোকও নাই। আকাশ আজ মেঘাচ্ছন্ন। শীত সেইজন্য খুব কম বোধ হচ্ছে। যোগেশের জ্বরভাব। তার জ্বর হলে অসুবিধা অনুভব করতে হবে। ক্ষীরোদবাবুর দোকান থেকে চন্দনাদি ছোট শিশি আনিয়ে সকলে খেলে। মহাপ্রভু এবারেও দর্শন হবে কিনা সন্দেহ। এখনও অঙ্গ সংস্কার হয়নি শুনা গেল। বিশেষ সংবাদ জানবার জন্য সকলে গেল। আমি একা ধর্মশালায় বিশ্রাম করতে লাগলাম। সকলে ফিরে এসে বললে—এখনও মহাপ্রভু ৭/৮ দিন অদর্শন থাকবেন। আমাদের একান্তই দুর্ভাগ্য মনে হলো। রাত্রিতে কিছু জলযোগ করে ও কীর্তনাদি সেরে শয়ন। মেঘলা ও অল্পবৃষ্টি। সুনিদ্রা।

বৃহস্পতিবার

প্রাতে কীর্তন করে উঠা গেল। সকালেও মেঘলা। সকালেই একা গঙ্গায় স্নান করে এলাম—গঙ্গাতটে প্রভাত দৃশ্য বড়ই মনোরম। স্নান করতে গিয়ে আজ খুব ঠাণ্ডা লাগলো। বাতাস প্রবল ছিল। ধর্মশালায় এসে নিজে আজ পাক করলাম। প্রায় একটার সময় মহাপ্রভুকে নিবেদন করে নিয়ে সকলে মিলে খুব পরিতোষ সহকারে প্রসাদ পাওয়া গেল। আহারান্তে কিছু বিশ্রাম করে শ্রীযুত ব্রজমোহন দাসের সঙ্গে দেখা করতে প্রাচীন মায়া পুরে গেলাম। শীতকালে বৈকালের শুষ্ক মাঠের দৃশ্য ভালই লাগলো। বাবাজী এখন বেশ সুস্থ আছেন দেখে সুখী হ'লাম ৪টাকা তাঁকে দেওয়া হলো। সেখান থেকে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। জ্যোৎস্নাবিধৌত প্রান্তর পথে আমরা ফিরে এলাম। সেখান থেকে শ্রীরাধাগোবিন্দদেব দর্শন করতে গেলাম। ঠাকুরের সুন্দর দর্শন। নাটমন্দিরে বসে বিদগ্ধ মাধব ব্যাখ্যা শুনলাম আধঘণ্টা। এত সাধারণ স্ত্রীপুরুষের মধ্যে এরূপ গ্রন্থের আলোচনা উপযুক্ত মনে হ'লোনা। সেখান থেকে পোড়ামাতলায় ক্ষীরোদবাবুর দোকানে গেলাম। কর্মচারীর সাক্ষাৎ না পাওয়ায় ধর্মশালায় ফিরে এলাম। রাত্রিতে কিছু জলযোগের পর শয়ন।

রাত্রিতে হঠাৎ গায়ে বেদনা ও কিঞ্চিৎ জ্বর অনুভব করলাম—এইজন্য শান্তিপুর দর্শন স্থগিত রাখা হলো।

শুক্রবার

প্রাতে শরীর খারাপ। আজ স্নান করলাম না। সকালে ললিতাসখী দাসীর সঙ্গে রাধারমণ আশ্রমে দেখা করতে গেলাম। আমি আসিয়াছি শুনে তিনি খোঁজ করেছিলেন। বেশ বিনয় নম্র ব্যবহার। স্বতন্ত্র আসন ও প্রণামাদি করলেন। কিছুক্ষণ আলাপ করে রামদাসবাবাজীর গৃহে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তখন তিনি ভজনে আছেন জেনে তখন আর বিরক্ত না করে তাঁকে আমাদের আগমন সংবাদ জানাতে বলে সেখান থেকে প্রাণগোপাল গোস্বামীর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তিনিও শুনলাম ভজনে আছেন। যাই হোক আমাদের নাম শুনে খুব আগ্রহ সহ এসে আমাদের ডেকে নিয়ে গেলেন ও সেদিন প্রসাদ পাবার নিমন্ত্রণ করলেন। আমরা আজই দুপুরবেলা কলিকাতায় যাব জানাইয়া নিরস্ত করলাম। কিছুক্ষণ আলাপ করে বিদায় নিলাম। রসিক মোহন বিদ্যাভূষণ লিখিত "নিত্যানন্দ বংশ" প্রবন্ধ সম্বন্ধে উল্লেখ করলেন। আমিও সে প্রবন্ধ দেখেছি বললাম। তাঁর শিষ্য সম্পাদিত কাগজে ইহা প্রকাশ হওয়া উচিৎ হয়নি। ধর্মশালায় এসে আহ্নিকে বসবার উদ্যোগ করছি এমন সময় রামদাস বাবাজী দেখা করতে এলেন। nervous....break down য়ে ভুগছেন। বল্লাম "আপনি নামকীর্তনে জগতের ভয় দূর করছেন—আপনার আবার কিসের ভয়?"—কিছুক্ষণ আলাপ করে আশ্রমে গেলেন। আহারান্তে ২ খানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করে 'জয় মহাপ্রভু' বলে আমরা স্টেশনে এলাম—অল্পক্ষণ পরেই গাড়ী এল। আবার কলির রাজ্য কলিকাতাভিমুখে চল্লাম আমরা। বৈকাল ৫ টায় বাসায় এসে পৌঁছলাম। আবার সেই সংসার সংগ্রাম৷



ভক্তবৃন্দসহ প্রভুপাদ

দাঁড়িয়ে—সুরেন সাহা, শ্যামাপদ সিংহ, যোগেশ দে,
অশ্বিনী ঘোষ, নন্দলাল রায়।

বসে—গোকুলানন্দ গোস্বামী অজ্ঞাত, প্রভুপাদ কানুপ্রিয়
গোস্বামী, নিরঞ্জনবাবু, রমানাথ গোস্বামী

মাটিতে—শৈলেনবাবু, জ্ঞানবাবু

৭। পত্রাবলী

পরমভাগবত শ্রীল যদুনন্দন সহায়জীকে (ফতেপুর) লিখিত পত্র

পরম ভাগবতবরেষু—

আপনার ২৪/২ তারিখের পত্রে, আপনার জ্যেষ্ঠ জামাতার অকস্মাৎ অকালে পরলোক গমনের দুঃসংবাদ অবগত হইয়া মর্মান্তিক বেদনা অনুভব করিলাম। এই নিদারুণ আঘাত যে আপনার ও আপনার পরিবারবর্গের পক্ষে কতদূর সাংঘাতিক হইয়াছে, তাহা আমার নিজ অন্তরের জ্বালার তুলনায় বুঝিতে পারিতেছি। এই দুঃসহ শোকাবহ অবস্থায় আপনাদের যে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব, তাহার ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছিনা। একমাত্র মঙ্গলময় শ্রীভগবানই আপনাদের অন্তরের এই শোক সন্তাপ বিমোচন করিয়া হৃদয়ে শান্তিদান করিতে সমর্থ। তাই নিজের এই অসমর্থতায় ও অসহায় অবস্থায় একমাত্র শ্রীগৌরচরণে সকাতর প্রার্থনা করি। তাঁহার যথার্থ ভক্ত ও আশ্রিত আপনারা, —তিনি অন্তর্যামীরূপে আপনাদের অন্তরে সান্ত্বনা ও শান্তিধারা প্রেরণ করুন।

আপনি শ্রীশ্রীগৌর গোবিন্দের শ্রীচরণাশ্রিত পরম ভাগবত। পারমার্থিক সকলতত্ত্বই সুবিদিত। সুতরাং আপনাকে মাদৃশ ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে কিছুই বুঝাইবার আবশ্যক হইবে না। তাই আশাকরি নিজ বিবেক বিবেচনা দ্বারাই এই দুঃসহ শোক পরিহার পূর্ব্বক, পরিজনগণকেও প্রবোধ দানে সমর্থ হইবেন। আপনার উক্ত পত্র হইতে আপনার হৃদয়ের স্থৈর্য্য ও সর্ব্বাবস্থায় অবিচলতার যথেষ্ট প্রমাণ পাইলাম। পত্রের প্রথম অংশে আপনার কর্ত্তব্য কর্মনিষ্ঠার পরিচয় ছাড়া পরবর্তী দুঃসংবাদের লেশমাত্রও প্রকাশ নাই; সদ্যপ্রাপ্ত এই দুঃসংবাদের পরক্ষণেও যিনি শ্রীভগবৎ নিয়োজিত কর্ত্তব্য সম্পাদন বিষয়ে অসীম ধৈর্য্যের সহিত এতাদৃশ মনোবল পোষণ করিতে পারেন, তিনি যে শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দে দৃঢ় বিশ্বাস ভক্তির প্রকৃষ্ট অধিকার অর্জ্জন করিয়াছেন, ইহাই আপনার উক্ত হর্ষবিষাদময়ী পত্রিকা হইতেই সুস্পষ্ট পরিচয়

পাওয়া যায়। অতএব আপনার ন্যায় স্থিতধী ভক্তজন যাঁহারা এই মর জগতের জীবগণকে পরমাশান্তির সন্ধান ও অমৃতত্ব দান করিবার ব্রত লইয়া জগতে আগমন ও অবস্থান করেন, এতাদৃশ বিপদ সত্বেও তাঁহাদের পক্ষে যে কোনও সান্ত্বনা বাক্যের আবশ্যক হইতে পারে ইহা মনে হয় না।

শ্রীভগবৎচরণে ও তদীয় সেবাকার্য্যে আপনার এই সুদৃঢ় নিষ্ঠা অবিচলিত বিশ্বাস ভক্তির পরিচয় পাইয়া, আমার অন্তরে কেবল এই কথাই উদয় হইতেছে যে অনিত্য ও জন্ম মৃত্যু জরা দুঃখবহুল এই মরজগতে বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক স্থায়ী সুখ শান্তি ভোগের আবাস নির্মান জন্য কেবল অবিবেকী ভিন্ন ভক্তিমানজন কখন আগ্রহ বা আশা পোষণ করেন না। তাই অনিত্য ক্ষণভঙ্গুর সংসার সুখে আসক্তি ও বিশ্বাস না করিয়া, সত্বর শ্রীহরিভজন দ্বারা এই মরজগৎ অতিক্রম পূর্ব্বক অমৃতলোকে স্থায়ীবসতি করিবার জন্য শ্রীভগবান স্বয়ংই সকলকে আহ্বান করিতেছেন; —"অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রা প্য ভজস্ব মাম্।" এমনকি নিজে পরমানন্দ ও অমৃত স্বরূপ এবং মায়াধীশ হইয়াও মায়িক সংসারের অসারতা ও দুঃখবহুলতা যে অবশ্য ভোগ্য, ইহা জীবকে শিক্ষা দিবার ছলে, লীলায় নিত্যসিদ্ধ নিজ পরিকরগণকে নিমিত্ত করিয়া উহার অভিনয় করাইয়াছেন। তাই শ্রীভগবানের নিত্যা জননী হইয়াও যখন শ্রীদেবকী মাতাকে বহুবার পুত্রশোক গ্রহণ করিতে হইয়াছে। কংস কারাগারের বিভীষিকায় সন্ত্রস্থা হইতে হইয়াছে; জগজ্জননী শ্রীশচীমাতাকেও যখন সন্তান ও পতি বিচ্ছেদ দুঃখে দগ্ধ হইতে হইয়াছে, —তখন মায়ামুগ্ধ সংসারচক্রে ভ্রাম্যমান জীবের পক্ষে জগতের দুঃখশোক যে অবশ্যই ভোগ্য, ইহার অধিক উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং এই মরজগতে আসক্তির ঘর বাঁধিয়া দুঃখ শোক ও মৃত্যুকে অতিক্রম করিবার কেহই আশা করিতে পারে না। ইহার একমাত্র উপায় শ্রীভগবান্ নিজেই উপদেশ করিয়াছেন জীবজগৎকে —"জিত্বা সুদুর্জ্জয়ং মৃত্যুমমৃতত্বায় মাং ভজ।" ভাঃ (৩/২৪/৩৮) অর্থাৎ সুদুর্জ্জয় মৃত্যুকে জয় করিয়া অমৃতত্বলাভের জন্য একমাত্র আমারই ভজনা কর।

এই হেতু মর জগতে অমৃতলোকের যাত্রী ও পথপ্রদর্শক হইতে হয় যাঁহাদের,— এই অনিত্য সংসারের ক্ষণভঙ্গুর সুখে আসক্ত ও দুঃখে বিরক্ত না হইয়া —উভয়কেই চরণে দলিয়া অবিচলিতভাবে যাত্রা করিতে হয় তাঁহাদের—ধ্রুবতারার মত স্থিরলক্ষ্য রাখিয়া শ্রীহরি পাদপদ্মে। প্রকৃষ্ট ভগবৎ সেবক হইবার জন্য তাই ভক্তগণকে সংসার পথের এই অভিযানে অম্লানবদনে সহ্য করিতে হয়—বহুল বাধা-বিঘ্ন বিপদের ঘাত প্রতিঘাত। ইহার জন্য অনুমাত্রও অবসাদগ্রস্ত বা বিচলিত হয়েন না তাঁহারা "ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাৎ লবনিমিষার্দ্ধমপি স বৈষ্ণবাগ্রগণ্যমঃ"।

"শ্রেয়াং বহু বিঘ্নানি" অর্থাৎ শ্রেয়ঃ লাভের পথ বিঘ্ন সঙ্কুল জানিয়া, ভক্তগণের এই অভিযান পথে সমাগত বিঘ্ন বিপদে ভীত বা বিরক্ত না হইয়া, ভগবৎপ্রেরিত সম্পদরূপে —তাঁহারা উহা বরণ করিয়া লইতে পারেন বলিয়াই, বিপদ সকল তাঁহাদের পক্ষে অমৃত লোকের সোপানরূপেই পরিণত হইয়া, মরলোক অতিক্রম করাইয়া দেয় তাঁহাদের। সুবর্ণ যেমন স্বর্ণকারের বারম্বার হাতুড়ির আঘাত ও অগ্নির দহন সহ্য করিয়াই বিশুদ্ধ হইয়া অলঙ্কারে পরিণত হয় ও তখন যেমন আর প্রয়োজন হয় না—দহনাদি পরিশুদ্ধির, সেইরূপ সংসার দহণকে ভক্তগণ পরিশুদ্ধির নিমিত্তই বোধ করিয়া, সাগ্রহে উহা গ্রহণ করিয়া থাকেন। শুদ্ধ কণকের মত তাঁহাদের ভগবৎবিশ্বাস সংসার তাপে আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠে; কিন্তু মেকী বা অশুদ্ধ সোনার মত অভক্ত বা সকাম জীবের কৃত্রিম বিশ্বাস সেই অনলে ভষ্ম হইয়া যায়।

সুতরাং মরজগত অতিক্রম করিয়া অমৃতলোকের অভিযান পথ, কুসুমস্তবকে আচ্ছাদিত নহে; ইহা বিঘ্ন বিপদ—সঙ্কুল প্রস্তরখণ্ডে সমাচ্ছন্ন। যে মহা অভিযান পথে ভক্তমহারাজ যুধিষ্ঠির, ভীমাদি প্রিয় পরিজনের একে একে দেহপাত ঘটিতে থাকিলেও পশ্চাতের পথের দিকে ফিরিয়াও দেখেন নাই একবার। তাই জয় করিতে পারিয়াছিলেন অজিত শ্রীভগবানকে। যে পর্য্যন্ত বিপদকে ভয় করিয়া চলিব আমরা সাধনপথে, সে পর্য্যন্ত 'বিপদ' বিপদ হইয়াই দেখা দিবে আমাদের সম্মুখে। যখন বন্ধুর পথে বিপদকে আহ্বান করিব নির্ভয়ে, তখন সেই বিপদ হইতেই পরম সম্পদ স্বরূপ বিপদভঞ্জন শ্রীভগবৎচরণকমলে সুদর্লভ প্রেমভক্তির বিকাশ হইবে; আমাদের অন্তরে। যাহার ফলে, যে দেশে আসিলেই যাইতে হয় সকলকেই, সেই মরজগৎ-আসা যাওয়ার দেশ অতিক্রম করিয়া যে দেশে যাইলে আর আসিতে হয়না,—সেই নিত্যানন্দময়ের নিত্যানন্দ ধামে—অমৃতলোকের চির আশ্রিত হওয়া যায়। ("যদগত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।)—(গীতা, ১৫/৬) তাই শ্রীকুন্তিদেবী শ্রীভগবানের নিকট বিপদই প্রার্থনা করিয়াছিলেন—পরম সম্পদ রূপে। ("বিপদঃ সন্তু—ভাঃ ১/৮/২৫) তাই অশেষ নির্য্যাতন ও দুঃখদহনের ভিতর দিয়াই ভক্তরাজ প্রহ্লাদের আবির্ভাব হইয়া, ত্রিতাপ দগ্ধ অনন্ত জীবকে অমৃতের সন্ধান দিয়াছে। অনিত্য বস্তুতে মমতা পরিহার পূর্ব্বক, একমাত্র শ্রীভগবানে যে মমতা তাহারই নাম 'প্রেমভক্তি'। ("অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেম সংপ্লুতা।")— (নারদ পঞ্চরাত্র)

শ্রীভগবানের শ্রীমুখকমল প্রসন্ন দেখিতে পাইলেই, জাগতিক কোন দুঃখশোক ভক্তগণের হৃদয় স্পর্শ করেনা। তাই শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর সঙ্কীর্তনানন্দের বিঘ্ন হইবার আশঙ্কায়, মহাভাগবত শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত সদ্যমৃত পুত্রকে বস্ত্রাচ্ছাদিত রাখিয়া, মহোল্লাসে যোগ দিয়াছিলেন শ্রীমহাপ্রভুর কীর্ত্তনে। অন্তর্যামী মহাপ্রভু দুর্ঘটনার বিষয়

জানিতে পারিয়া উহা জিজ্ঞাসা করিলে—"শ্রীবাস কহেন প্রভু তার কোথা দুঃখ। যার গৃহে সুপ্রসন্ন তোমার শ্রীমুখ।" কেবল প্রকৃষ্ট ভক্তচরিত্রেই সুখে দুঃখে সমভাব সম্ভব হয়। যাহা শ্রীভগবৎ কৃপালাভের কারণ হইয়া থাকে।

বিশেষতঃ পতিপরায়ণা নারীদিগের পক্ষে পতিদেবতার বিচ্ছেদ দুঃখ সর্ব্বাধিক মর্মবিদারক হইয়া থাকে এই জগতে। ইহার সান্ত্বনা এই যে সর্ব্বান্তর্যামীরূপে সকলের ও সকল পতির অন্তরে অবস্থিত সেই এক জগৎপতি—শ্রীগোবিন্দই। ('গোপীনাং তৎপতিনা' -ভাঃ ১০/৩০/২৫)

সর্ব্বেষামেব দেহিনাম্—"ইত্যাদি তাঁহারই আংশিক সেবা, "পতিসেবা " রূপে জগতে পরিচিত। সমুদ্রের তরঙ্গ যেমন সমুদ্র হইতে উঠিয়া, তাহাতেই লীন হইয়া যায়—একটি জলকণারও বিনাশ নাইসেইরূপ শ্রীহরি হইতে সকলই ব্যক্ত হইয়া বিলীন হইয়া থাকে তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া। কেহ বা কিছু হারাইয়া যায়না। ইহা কেবল ভক্তগণের অনুভূতি ভিন্ন, বহির্ম্মুখজীব সাধারণের বোধগম্য নহে। বিশেষতঃ শ্রীগৌরাঙ্গ-গুরু চরণাশ্রিত হইয়া যাঁহারা সাধু বৈষ্ণব সেবা ও তদানুগত্যে জীবসেবা পরায়ণ, তাঁহাদের অবস্থান ইহ বা পর উভয় লোকেই শ্রীভগবানের শ্রীচরণকমলের শান্তিময়ী সুশীতল ছায়ায়। সুতরাং এতাদৃশ ভক্তপরিবারে কোন পতিহারা নারী সর্বভাবে সেই জগৎপতি শ্রীগৌর চরণারবিন্দে একনিষ্ঠ ভজন দ্বারা তদীয় অমৃত লোক প্রাপ্ত হইলে, নিজ পতির সহিত সকল হারান প্রিয়বস্তুই তাঁহার শ্রীচরণতলে সন্ধান পাইবেন অবশ্যই। সেই শুভক্ষণের প্রতীক্ষায় পতিরূপে জগৎপতির সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াই তাঁহারা মরজগতের সকল দুঃখশোক অতিক্রম করিয়া, অমৃতলোকে অমৃতময় হইয়া শ্রীহরিচরণস্থিত প্রফুল্লিতা কমলের মতই শোভিতা হয়েন।

শ্রীগৌর-গোবিন্দ সেবা সংরত জীবহিতৈক ব্রত ভাগবত পরিবারেই এতাদৃশ গুণগরিমা পরিদৃষ্ট হইবার যোগ্য। তাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

খণ্ডং খণ্ডং ত্যজতিন পুনঃ স্বাদুতায় ইক্ষুদণ্ডম্ ।
দগ্ধং দগ্ধং ত্যজতিন পুনঃ কাঞ্চনং কান্তিবর্ণং ॥
ঘৃষ্টং ঘৃষ্টং ত্যজতিন পুনশ্চন্দন চারু গন্ধম্ ।
প্রাণান্তেঽপি প্রকৃতি বিকৃতিং জায়তে নোত্তমানাম্ ॥

এই আকস্মিক বিপৎপাতের অগ্নিপরীক্ষায় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর আপনাদের অন্তরে শান্তিদান করিয়া বিশ্বাসভক্তিসমুজ্জ্বল করুন, ইহাই একান্তভাবে প্রার্থনা করি তদীয় শ্রীচরণকমলে। ইতি—

শুভার্থী

শ্রীকানুপ্রিয় গোস্বামী

॥ শ্রীগৌরহরি ॥

নবদ্বীপ
১৫/১১/৬৪

[শ্রীল যদুনন্দন সহায়জীকে লিখিত পত্র]

ভাগবতবরেষু

আপনার ১০/১০/৬৪ তারিখের কৃপালিপি পাইয়া তদুত্তরে নিম্নোক্ত বিষয় সকল আপনার অবগতির জন্য নিবেদন করিতেছি।

(১) 'ভক্তিরহস্য কণিকা' গ্রন্থের হিন্দী অনুবাদের দ্বিতীয় খণ্ড (2nd Part) সম্বন্ধে যে সকল উদ্ধৃত শ্লোকের reference ও অন্য বিষয়ে জানিতে চাহিয়াছেন, এ সম্বন্ধে আমার পক্ষে বর্তমানে অসুবিধার কথা হইতেছে এই যে প্রথমতঃ বিশেষ সময়াভাব। দ্বিতীয়তঃ আমার গ্রন্থাদি প্রায় সমস্তই কলিকাতায় এবং এখানে খুব অল্প গ্রন্থই থাকায়, উহা দেখিয়া দিবারও সুবিধা নাই। তৃতীয়তঃ যে সকল শ্লোকের references উহাতে দেওয়া হইয়াছে, উহা বাঙ্গলাদেশে মুদ্রিত গ্রন্থের সহিত ঠিকই আছে ইহাই বিশ্বাস। তবে গীতা প্রেসের গ্রন্থের সহিত মিলাইয়া দেখিবার কোন প্রয়োজন হয় নাই। যদি আপনি মনে করেন ইহা হিন্দী জানা মহলে আদৃত হইবার জন্য গীতা প্রেসের গ্রন্থ অনুসারে references দেওয়া প্রয়োজন, তাহা হইলে উহা আপনি স্বচ্ছন্দে সংযোগ করিতে পারেন। তৎস্থলে "গীতা প্রেস সংস্করণ" বা ইহার সঙ্ক্ষেপে "গীঃ সং" —এইরূপ দেওয়া যাইতে পারে।

(২) আমার বিবেচনায় lst Part যখন সংশোধনাদিও দেখাশুনা শেষ হইয়া গিয়াছে—ইহাই প্রথমে ছাপাইবার ও Publicity র জন্য কর্তব্য। কারণ আপনার প্রস্তাবমত কুম্ভমেলার পূর্বে যাহাতে উহা প্রকাশিত হয়, এবং সেই মেলায় বিক্রয়ের সুযোগ পাওয়া যায়, তাহার জন্য চেষ্টিত হইতে হইলে এখন অন্য বিষয়ে সময়ব্যয় না করিয়া সত্বর lst Part এর ছাপা বিষয়েই উদ্যোগ আয়োজন করিবার প্রয়োজন। কারণ lst Part এর ছাপা প্রকাশের সার্থকতার উপর অবশিষ্ট খণ্ড মুদ্রিত হওয়া না হওয়া সমস্তই নির্ভর করিতেছে। যদি শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় lst Part প্রকাশ করিয়া উহা সাফল্য মণ্ডিত হয়; তখন 2nd Part ও অবশিষ্ট খণ্ডের references প্রভৃতিও আমার বিবেচনায় আরও যে সকল সংশোধন যোগ্য বিষয় আছে, তৎসম্বন্ধে আমিও পুনরায় দেখিবার জন্য উৎসাহশীল হইতে পারিব।

এইজন্য আমার মনে হয় পুস্তক যদি Print করাই স্থির হইয়া থাকে তবে বিলম্ব না করিয়া উহা প্রেসে দেওয়া আবশ্যক। 'ভূমিকা' 'নিবেদন' ও Cover প্রভৃতি

শেষের দিকে ছাপান যাইতে পারে, যদি গ্রন্থ (mainbody) ছাপাইবার মধ্যে শ্রীঅভিরামদাস জীর লিখিত 'ভূমিকা' না পাওয়া যায়, তবে 'ভূমিকা' ব্যতীত উহা ছাপাইলেও চলিবে। শুধু "নিবেদন" টি থাকিলেই হইবে। আর যদি উহার মধ্যে তিনি 'ভূমিকা' পাঠাইয়া দেন, উহা সময়মত পৌঁছাইলেই ছাপাইতে পারিবেন।

(৩) উক্ত গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কনের জন্য যে অর্থব্যয় হইবে আপনার লিপি অনুসারে উহা শ্রীবিহারীদাসজী কিম্বা আপনার পুত্র শ্রীগৌরাঙ্গদাসজী অথবা উভয়েই যদি প্রদান করেন, তবে উভয়েরই এই বদান্যতার কথা "নিবেদনে" অবশ্যই উল্লেখ থাকিবে। উভয়ই শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর ও বৈষ্ণবজগতের আশীর্বাদ ভাজন হইবেন। এই বিষয়ে তাঁহাদের উৎসাহজনক যাহা কিছু লেখা প্রয়োজন হয়, আপনিই উহা আমার পক্ষে নিবেদনে সংযোগ করিয়া দিবেন। তাহা হইলেই আমি অধিকতর সুখী হইব। 'নিবেদনে' কেবল অনুবাদ বিষয়েই নহে, এই গ্রন্থ প্রকাশ বিষয়ে যাহা কিছু কৃতিত্ব তাহা আপনারই সহায়তা, পরিশ্রম ও চেষ্টার ফল—এইভাবেই লিখিত হইয়াছে মনে হয়। ইহার Translator হিসাবে যদি আরও কিছু সংযোগ করিবার প্রয়োজন থাকে আপনি নিবেদনে তাহা সংযোগ করিয়া লইতে কোন সঙ্কোচ করিবেন না।

(৪) Original গ্রন্থের Publisher রূপে যে নাম ও ঠিকানা ছাপান আছে, এই অনুবাদ গ্রন্থেও তাহাই থাকিবে। কেবল Press ও Printer এর নাম ঠিকানা—Original গ্রন্থে যাহা আছে, তাহা পরিবর্তন করিয়া তৎস্থলে যেখানে ইহা ছাপানো হইবে সেই Press ও Printer এর নাম ঠিকানা ইহাতে সংযোগ করা হইবে। এ বিষয়ে পূর্বে সমস্ত জানাইয়াছি। গ্রন্থের যেখানে "সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত" এইরূপ মুদ্রিত আছে সে স্থলে "All rights Reserved by the Author" এইরূপ লিখিত হইবে। গ্রন্থের কোন স্থানে "Sole distributor in U.P" ছাপাইয়া তাহার সহিত আপনার বা আপনার মনোনীত কোন ঠিকানা ও নাম সংযোগ করিয়া মুদ্রিত করিবেন।

(৫) গ্রন্থের Cover এর জন্য আমি কলিকাতায় একজন বিশিষ্ট Block maker কে একটা ভাল Design করিয়া দিবার জন্য বলিয়াছি। যদি উহা পাওয়া যায়, আপনার নিকট ডাকে পাঠাইয়া দিব। ইহা উপযুক্ত বিবেচিত হইলে ইহা দেখাইয়া স্থানীয় Block maker এর দ্বারা Cover এর Block প্রস্তুত করাইয়া লইতে পারিবেন। তবে উহা পছন্দ না, হইলে আপনার Choice অনুরূপ Design করাইয়া লইতে পারিবেন।

আমার বিবেচনায় এখন Ist Part প্রকাশ ও প্রচারের বিষয়েই একান্তভাবে মনোযোগ দেওয়া উচিৎ। Ist Part এর প্রকাশ Successful হইলে তখন অবশিষ্ট Part এর Correction প্রভৃতি বিষয়ে মন সংযোগ করিতে পারা যাইবে। যাঁহারা

এই Ist Part এর সমুদয় ব্যয়ভার বহন করিতেছেন, যে পর্য্যন্ত ইহার বিক্রয়লব্ধ অর্থে অন্ততঃ তাঁহাদের সমুদয় অর্থ পরিশোধ না হয়, সে পর্যন্ত আমি নিশ্চিন্ত মনে এই গ্রন্থ প্রকাশ বিষয়ে কোন আনন্দ অনুভব করিতে পারিব না। যে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গের প্রেরণায় ও কৃপায় এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, একমাত্র তাঁহারই কৃপায় ইহার উৎসাহজনক পরিণতি হওয়া সম্ভব, নচেৎ আমাদের নিজ চেষ্টা দ্বারা কোন সুফল হইবার আশা করা অনুচিত মনে হয়। বিশেষ কথা এই যে, Ist Part মুদ্রাঙ্কিত হইয়া যদি আশানুরূপ বিক্রয় বা সাফল্যমণ্ডিত না হয় তাহা হইলে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে উহা উপহারস্বরূপ আপনি বিতরণ করিয়া দিবার প্রস্তাব পূর্ব্বেই জানাইয়া রাখিয়াছেন, সেরূপ ক্ষেত্রে ইহাই উত্তম ব্যবস্থা মনে করি। তবে মুদ্রিত Ist Part এর পরিণাম সেরূপ হইলে ইহা অবশিষ্ট Parts মুদ্রিত করিবার--কিম্বা আর কোন অনুবাদ কার্যের জন্য অযথা পরিশ্রম ও সময় ব্যয় করিবার যে কোনও প্রয়োজন থাকিবে না ইহার উল্লেখ করাই বাহুল্য মনে করি। অতএব—

"One thing at a time & that done well" এই নীতি অবলম্বনে এখন কেবল প্রথমখণ্ড বিষয়েই সমস্ত যত্ন চেষ্টা, পরিশ্রম ও মনঃসংযোগ একত্র করাই কর্তব্য মনে করিয়া আপনাকে সেজন্য অনুরোধ জানাইতেছি। এই কার্য কেবল শ্রীভগবৎ প্রেরণায় আপনার অদম্য উৎসাহ, চেষ্টা ও পরিশ্রম দ্বারাই সমারব্ধ হইয়াছে। তাই আশা করি আপনার সেই উৎসাহ, প্রচেষ্টা, তাঁহারই কৃপায় পরিণামেও ইহা সার্থকতা লাভ করিবে। নচেৎ কেবল জনকল্যাণ সাধিত হউক—এই কামনা ছাড়া আমার বর্তমান জীবন সন্ধ্যায় অপর কোন বিষয়ে বা কোন কার্য্যে লেশমাত্রও উৎসাহ ও প্রয়োজন বোধ নাই—ইহার উল্লেখই অনাবশ্যক মনে করি।

সশ্রদ্ধ শুভেচ্ছা ও আশীর্ব্বাদ জানাইতেছি।

ইতি শুভার্থী শ্রীকানুপ্রিয় গোস্বামী

॥ জয় শ্রীশ্রীগৌররায়হরি ॥

শ্রীপ্রশান্ত রায়কে লিখিত পত্র—

(শ্রীনবদ্বীপ ১/১২/৬৯)

পরমকল্যাণীয়েষু—

শ্রীমান প্রশান্ত, তোমার ১৭/১১/৬৯ তারিখের লিখিত পত্রখানি পাইয়া ও উহাতে তোমার আন্তরিক ভক্তি প্রবণতা পরিস্ফুটাকারে প্রকাশ রহিয়াছে দেখিয়া

বিশেষ আনন্দলাভ করিলাম। উচ্চশিক্ষা ও উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়া এবং আমেরিকার ন্যায় আধুনিক শ্রেষ্ঠতম ভোগৈশ্বর্যপূর্ণ ও বিলাসবহুল স্থানে অবস্থান করিয়া, সেই বিরুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যেও তুমি ও শ্রীমান্ কল্যাণ উভয়েই যে অটুট রাখিতে পারিয়াছ তোমাদের ভক্তিমান্ পিতা ও পিতৃপুরুষগণ হইতে প্রাপ্ত এই ধর্মবিশ্বাস— ইহা তাঁহাদিগের আশীর্বাদের ফল বলিয়াই মনে করিতেছি। উজ্জ্বল ভবিষ্যতময় তোমাদের এই কর্মজীবন পথের প্রতি জয়যাত্রার মধ্যে শ্রীভগবানের চরণে এই ভক্তিবিশ্বাস—ইহা জয়পতাকারূপে যেন সতত উড্ডীন থাকে তোমাদের হৃদয়াকাশে ইহাই শ্রীগৌরচরণে সতত প্রার্থনা এবং তোমাদের প্রতি ইহাই আমার আশীর্বাদ। শ্রীভগবৎসম্বন্ধের সংযোগেই নশ্বর জাগতিক সমস্ত কিছুই জয়যুক্ত হয়; বিয়োগে বিলীন হয়—চিরবিস্মৃতিময় অজানার অন্ধকারে। তোমাদের পূর্বপুরুষগণ স্থাপিত শ্রীবৃন্দাবনের কুঞ্জভবনে আমি কিছুদিন বাস করিয়াছিলাম। তৎকালে তোমার ভক্তিময় পিতামহ মহোদয়ের সাক্ষাৎলাভ করিয়া খুব প্রীতি লাভ করিয়াছিলাম, তদীয় বৈষ্ণবোচিত সৌজন্যে।

আমেরিকায় অধুনা অনেক ভারতীয় ধর্ম প্রতিষ্ঠানের প্রচারকার্য্য চলিতেছে, ইহা শুনিয়াছি। সকল ধর্মই সত্য ও শুভকর। নিজ নিজ ধর্মমত সকলের নিকটে শ্রেষ্ঠতমবোধ হওয়া স্বাভাবিক। তথাপি প্রথমে কোন ধর্মমতে প্রভাবান্বিত না হইয়া, নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখিতে পারিলে তন্মধ্যে তারতম্য উপলব্ধি হইতে পারে। তাই শ্রীচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে,—"যার যেই ভাব—তার সে-ই সর্বোত্তম। তটস্থ হইয়া বিচারিলে আছে তরতম।" সেই নিরপেক্ষ বিচারে বুঝা যায়, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তিত শ্রীনাম ও প্রেমধর্মই সমস্ত সনাতন হিন্দুধর্ম ও দর্শনের চরম ফল বা পরিসীমা। তোমাদের ভাগ্যবান পিতৃপুরুষগণ সেই ধর্মেই আশ্রিত ছিলেন এবং তাহাই তোমাদের জীবনেরও আশ্রয় ও আদর্শ হউক।

আমার গ্রন্থ কয়খানায় উক্ত বৈশিষ্ট্য ও সনাতন হিন্দুধর্ম ও দর্শনের মুখ্য অভিপ্রায় ও সারসিদ্ধান্ত প্রদর্শন করাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

আমেরিকায় বর্তমান প্রচাররত কোন ধর্ম সম্প্রদায়ের মাধ্যমে আমার গ্রন্থ সম্বন্ধে কোন সহায়তা গ্রহণ করিতে যাওয়া সমীচীন হইবে না মনে করি। কারণ তাহারা নিজ নিজ মতবাদেই প্রভাবান্বিত। মৌখিক কিছু উৎসাহ হয়ত' দেখাইলেও আন্তরিকভাবে সেরূপ আনুকূল্য কিছু না হইয়া বরং প্রাতিকূল্যই সাধিত হইতে পারে—এইরূপ আমার ধারণা। সুতরাং তাহাদের মাধ্যমে এ বিষয়ে কোনরূপ চেষ্টা না করাই কর্তব্য মনে করি।

যদি শ্রীভগবৎ প্রেরণায়, কোন সূত্রে তোমার এ'রূপ কোন আমেরিকান মনীষীর

সহিত পরিচয় হয়—যিনি ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রেও সুপণ্ডিত এবং শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত ধর্ম বিষয়ে—অন্ততঃ ভারতীয় ধর্ম-সম্বন্ধে আগ্রহশীল এবং বিশেষভাবে বাঙ্গলা ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ এবং আমেরিকার উক্ত ধর্ম প্রতিষ্ঠান সকলের সহিত সংশ্লিষ্ট বা উহা দ্বারা প্রভাবান্বিত নহেন,—এইরূপ নিরপেক্ষ অথচ সত্যসন্ধিৎসু সুধী ব্যক্তিকে আমার গ্রন্থ কয়টি পড়িতে দিবার কোন সুগোগ পাইলে ও তাহার অভিমত সংগ্রহ করিতে পারিলে এবং উহা যদি বিশেষ অনুকূল হয়, তাহা হইলে তাঁহার সহায়তায় উক্ত গ্রন্থ হইতে অংশ বিশেষের ইংরাজী অনুবাদ করাইয়া উহা স্থানীয় সাধারণ ধর্মবিষয়ক পত্রিকায় প্রকাশ করিবার কোন সুযোগ উপস্থিত হইলে, ইহাই আমার ঠিক অভিপ্রেত বিষয় হয়।

কিন্তু এরূপ যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া সহজ সাধ্য নহে। তবে ইহাও মনে হয় যে শ্রীভগবানের ইচ্ছা হইলে সকল অসম্ভব ও অচিন্ত্য বিষয়ও সম্ভব হইতে পারে অপ্রত্যাশিতরূপে। আর যদি তাহা না হয় তবে এরূপ প্রচারের উদ্দেশ্যও অনাবশ্যক বুঝিতে হইবে।

অতএব এরূপ কোন Chance আসিবার অপেক্ষা করিয়া, পুস্তক দুইখানা এখন কিছুদিন তোমার নিকট রাখাই সঙ্গত মনে করি। পাঁচ ছয় মাস পর্যন্ত দেখিয়া যদি শ্রীভগবানের ইচ্ছায় সেরূপ কোন Chance আসে ভালই নচেৎ ৬ মাস পরে বই দুইখানা Chicago তে কোন প্রসিদ্ধ Library তে—যেখানে বাঙ্গলা পুস্তকও রাখা হয়, সেখানে present করিয়া দিবে। অন্য কোন ধর্মপ্রচার সম্প্রদায় বা তাঁহাদের পত্রিকায় মুদ্রিত বা সমালোচনার জন্য এই গ্রন্থ দিবার আবশ্যক নাই।

"জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম" পুস্তকের "মুখবন্ধ"টি, ইংরাজী অনুবাদ করিয়া উহাই কোন American Magazine 'এ প্রকাশ করা যায় কিনা সে বিষয়ে শ্রীরাধাশ্যামবাবু তোমাকে জানাইয়াছিলেন, কিন্তু যে ব্যক্তি উহা অনুবাদ করিয়া পাঠাইয়াছেন, উহা কেহ কেহ বলিতেছেন ঠিক হয় নাই—মূল বিষয়ের সহিত। আমি নিজেও ইংরাজী ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। এই হেতু আপাততঃ উক্ত প্রস্তাব স্থগিত রাখা হইল। প্রবন্ধ আকারে উহার ইংরাজী অনুবাদের নাম দেওয়া হইয়াছিল—"বিশ্বশান্তি ও উহার প্রয়োজনে ভারতীয় ঋষিগণ চিন্তিত সাম্যবাদ"—("জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম" গ্রন্থের অংশ বিশেষ হইতে ইংরাজী ভাষায় অনূদিত)। তবে যদি উহা স্থানীয় বিশেষজ্ঞ কাহারও দ্বারা ইংরাজী অনুবাদ করাইয়া কোন নিরপেক্ষ ধর্ম পত্রিকায় প্রকাশ করার সুযোগ হয়, সে বিষয়ে চেষ্টা করিতে পার,—তোমার নিজের কাজের কোন ক্ষতি না করিয়া। তুমি যে দুইজন আমেরিকান ভদ্রলোকের ভারতে আসিলে আমার সহিত সাক্ষাতের বিষয় বলিয়াছ, উহার অসুবিধা এই যে আমি মোটেই ইং

রাজী জানিনা। অতএব এই সাক্ষাৎকার কোন পক্ষেই লাভজনক হইবেনা। মধ্যে সস্ত্রীক একজন আমেরিকান আমার নিকট আসিয়াছিলেন। তাহার ৬/৭ মাস পূর্বে অপর একজন আসিয়াছিলেন। প্রথম ব্যক্তি এখানে কোন বৈষ্ণবের নিকট দীক্ষিত। তাঁহার স্ত্রী শাড়ী ও সিন্দুর পরা। উভয়েই বাঙ্গলা ভাষায় অভিজ্ঞ। দ্বিতীয় ব্যক্তিগেরুয়া পরা ও গলায় তুলসী মালা। এই উভয় ক্ষেত্রেই আমার কথাবার্তা বা ধর্মালোচনার কোন অসুবিধা হয় নাই। কিন্তু তোমার লিখিত উক্ত দুই ব্যক্তির বাঙ্গলা জানা না থাকিলে এবং কোন ধর্ম সম্প্রদায় বিশেষ কর্তৃক প্রভাবান্বিত থাকিলে এই উভয় কারণে আমার সহিত সাক্ষাতে কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। এইজন্য যদি পুনরায় তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তবে উক্ত বিষয় জানাইয়া এ বিষয়ে নিষেধ করিবে।

শ্রীযুক্ত রাধাশ্যামবাবু গতকল্য কলিকাতায় গিয়াছেন। চক্ষু operation করাইয়া পুনরায় ২/৩ মাস পরে এখানে আসিবেন। তাঁহার ভজন বিষয়ে মনোবলের সীমা নাই। কিন্তু দেহ দুর্ব্বল ও অপটু। তুমি আমার পুস্তকাদি বিষয়ে তোমার মূল্যবান সময় অপচয় করিয়া যেটুকু চেষ্টা করিয়াছ, তাহার জন্য তোমাকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও আশীর্বাদ জানাইতেছি। বার্দ্ধক্যজনিত কারণে শরীর সুস্থ নহে।

তোমাদের উভয় ভ্রাতাকে পুনরায় শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ জানাইতেছি।

ইতি শুভার্থী
শ্রীকানুপ্রিয় গোস্বামী

জয় শ্রীশ্রীগৌররায়হরি

শ্রীনবদ্বীপ ১০/৪/৭২

"…..বর্ত্তমানে তোমাদের পক্ষে এদিকের কোন অর্থাদি সম্বন্ধে চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই। তুমি সস্ত্রীক ও শ্রীমান্ কল্যাণ এখন কেবল একনিষ্ঠ হইয়া কর্মজীবনের আরও উন্নতির চেষ্টা ও ধর্ম জীবন গঠনের উপাদান সংগ্রহে যত্ন কর। বিশেষতঃ তুমি এখন, ভগবৎকৃপায় তোমার নবপরিণীতা সহধর্মিণীর সহায়তা লাভ করিয়া উভয়ে একমতে ও একপথের সহযাত্রী হইতে পূর্ব্বপেক্ষা বহু সামর্থ্য লাভ করিতে পারিবে, ইহাই বিপুলভাবে আশা ও শ্রীগৌরচরণে প্রার্থনা করি। তিনিও প্রকৃষ্ট সহধর্মিণীরূপে তোমার ভজন পথে সহায়ক হইবেন, যাহা পতিসেবার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্যবোধ শূন্যা হইয়াই আধুনিক পত্নীগণ আলেয়ার আলোকের মত বিপদ ও বন্ধনের পথেই পতিকে পরিচালন করিয়া থাকেন। তুমি বৈষ্ণবগণের

কৃপায় ও শ্রীনামাশ্রয়ের প্রভাবে সকল অমঙ্গল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া তোমরা মঙ্গলের পথেই অগ্রসর হইবার সকল আনুকূল্যই প্রাপ্ত হইবে ইহা দৃঢ়বিশ্বাস।

ধর্মানুশীলন বিষয়ে তোমাকে ও শ্রীমান কল্যাণকে পূর্বেই সমস্ত দিকদর্শন করাইয়াছি। বর্ত্তমানকালে কলিপ্রভাবে সর্ব্বত্রই শ্রীগৌরাঙ্গের নামপ্রেমধর্মের ভিত্তির উপর স্বকল্পিত নিজ নিজ মতপ্রচারেরই বাহুল্য দৃষ্ট হইতেছে। তোমরা একনিষ্ঠভাবে কোন মতের প্রভাবে না পড়িয়া, কেবল পূর্ব্বপুরুষগণের আচরিত ধর্মপথকেই অবলম্বন করিয়া উহার অনুকূল শিক্ষাই লাভ করিবে। যথাকালে প্রকৃষ্ট পথে চালিত হইবার সময় আসিলে, এখন হইতে সে বিষয়ে তোমাদের প্রস্তুতি, তৎকালে প্রকৃষ্ট পথের অনুসন্ধানকার্য বহুজনের উপকারে লাগিবে—শ্রীগৌরপ্রবর্তিত নাম ও প্রেমধর্মের যথার্থ পথে চালিত হইবার জন্য। ইহার জন্য তোমাদের প্রয়োজন হইবে—নামাশ্রয়ে থাকা ও উক্ত গ্রন্থগুলি অবকাশমত অনুশীলন করা ....(অসম্পূর্ণ)

॥ শ্রীগৌররায়হরি ॥

শ্রীনবদ্বীপ ১৬/১২/৭২

পরমকল্যাণবরেষু

শ্রীমান প্রশান্ত, তোমার লিখিত বিজয়ার পত্রের পর, ২৬/১১ তারিখের পত্রও যথাসময়ে পাইয়াছি। পূজার পর হইতে আমার শরীর বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়ায় প্রায় শয্যাশায়ী হইতে হইয়াছিল. সেই সময় দেবুর উপর কাজের চাপ অত্যধিক থাকায় তোমার প্রথম পত্রের উত্তর দিবার জন্য চেষ্টা সত্ত্বেও সময়াভাবে তাহা সম্ভব হয়নাই। পরে দেবু কিছুদিন বিশ্রামের জন্য তাহার দাদা নিমাইর নিকট দুর্গাপুরে গিয়াছিল। বর্তমানে আমি কিছুটা সুস্থ হইয়া উঠিলেও আগতপ্রায় Winter season টাই আমার স্বাস্থ্যের পক্ষে Crisis স্বরূপ। ভবিষ্যৎ শ্রীগৌররায়জীর ইচ্ছায় যাহাই হউক—উপস্থিতে তোমার পত্রের উত্তর দিবার মত অবস্থা হইলেও —দেবুর ফিরিয়া আসিবার অপেক্ষায় ছিলাম বলিয়া, উহারও কিছু বিলম্ব হইয়া যাওয়ায় দুঃখিত। দেবু গত ৪/১২ তারিখে এখানে আসিয়াছে। তোমাদের পত্র পাইতে ওতোমাদের পত্র লিখিতে তাহার খুব আনন্দ হয়। এই পত্রে তাহারও কিছু লেখা থাকিল।

শ্রীগৌরগোবিন্দচরণে তোমাদের পক্ষে শুদ্ধভক্তি লাভ করা সহজ ও স্বাভাবিক হইবে। তাহার কারণ তোমাদের পরমভক্ত পিতৃপুরুষগণের রক্তধারা তোমাদের শরীরে প্রবাহিত রহিয়াছে—ভক্তিপ্রবাহস্বরূপ। ইহা অপর সাধারণ হইতে তোমাদের

পক্ষে বিশেষ অনুকূল। তাহার উপর রহিয়াছে তাঁহাদের ও অপর ভক্তগণের আশীর্ব্বাদ। এই হেতু ভক্তিলাভ বিষয়ে তোমার নিশ্চিন্ত থাকিতে পার। তবে ইহার উদ্দীপনার জন্য প্রয়োজন হইবে নিত্য নিয়মিত ভজন নিষ্ঠা; এবং সর্বোপরি শ্রীনামাশ্রয়ে নামকীর্তন। তৎসহ সুযোগমত কিছু কিছু মূল ভক্তিগ্রন্থানুশীলন। আপাততঃ আমার গ্রন্থগুলি অবকাশ মত স্থিরভাবে অনুশীলন করিলেও চলিতে পারে। তবে তোমাদের কর্মজীবনের কোনরূপ ক্ষতি না করিয়া। ইহা দ্বারাই তোমরা ভক্তির সর্ব্বোজ্জ্বল সর্ব্বমঙ্গল পথে অগ্রসর হইয়া যাইতে পারিবে—সহজে ও স্বচ্ছন্দে।

কল্যাণীয়া বধূমাতা স্বহস্তে পাক করিয়া ঠাকুরের ভোগ দিয়াছিলেন জানিয়া বিশেষ সুখী হইলাম। সততঃ শ্রীঠাকুরকেও পরিবারভুক্ত একজন মনে করিয়া তাঁহার সেবার আগ্রহ থাকিলে ইহাও ভক্তিলাভের একটি বিশেষ লক্ষণ বুঝিতে হইবে। তবে আগ্রহের সঙ্গে আচার পালনেরও বিশেষ আবশ্যক হয়। নিরামিষাশী গৃহ না হওয়া পর্যন্ত অন্নব্যঞ্জন ভোগ না দিয়া, ফলমূল, মিষ্টান্নাদি দ্রব্য স্বহস্তে পাক করিয়া ভোগ দিলে কোনরূপ অনাচার হয়না এবং ইহাতেও শ্রীভগবৎসেবার জন্য সমান আগ্রহই প্রকাশ পায়। যাহা হউক তাঁহার সেবার জন্য প্রাণের ব্যাকুলতাই প্রধান উপকরণ। ইহাই যাহাতে তোমাদের সকলের বর্দ্ধিত হয়, শ্রীগৌরচরণে তাহারই প্রার্থনা করি।

শ্রীমান্ কল্যাণ এই বৎসরের শেষের দিকে আসিবে এবং শ্রীযুক্ত রাধাশ্যামবাবুকে লইয়া তীর্থভ্রমণে যাইবার ইচ্ছা আছে ইহাই তাঁহার পত্রে জানিয়া সে বিষয়ে তাহাকে পত্র দিয়াছিলাম। হঠাৎ জানিলাম রাধাশ্যামবাবু বলাই (শীল) বাবুকে লইয়া শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় বলাইবাবু চলিয়া আসায় তিনিও বলাইবাবুর সঙ্গে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার নিয়মসেবামাস সম্পূর্ণ থাকিবার ইচ্ছা ছিল। বলাইবাবুও তাহার থাকিবার সকল রকম সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বলাইবাবুকে ছাড়িয়া থাকিতে ইচ্ছা না করায় বলাইবাবু তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিয়াছেন। ....(অসম্পূর্ণ)

॥ শ্রীগৌরহরি ॥

নবদ্বীপ ১০/৬/৭৩

পরমকল্যাণবরেষু—

শ্রীমান্ প্রশান্ত, তোমার ২০/৫/৭৩ তারিখের Regd পত্র ও তাহার সহিত প্রেরিত ৭০ ডলার মূল্যের একখানা চেক পাইয়াছি যথাসময়ে। পূর্ব্বে সম্প্রতি তুমিও

কল্যাণ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া, প্রীতি ও আগ্রহের সহিত যে অর্থ পাঠাইয়াছ আমাকে, উহাতে প্রায় দুইখানা গ্রন্থের সম্পূর্ণ মুদ্রণব্যয় সঙ্কুলান হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু নানাকারণে ও বিশেষভাবে সময়াভাবে নূতন লিখিত গ্রন্থকয়খানা শেষ করিয়া উঠিতে পারিতেছিনা—কলিকৃত বিরুদ্ধ প্রভাবে। সুতরাং তোমাদের উভয় ভ্রাতা কর্তৃক এই বিপুল অর্থ সাহায্যের প্রতিদানে আমি তোমাদের কিছুই দিতে পারিতেছিনা, এইজন্য অস্বস্তিবোধ করিয়া থাকি প্রচুরভাবে।

তোমাদের উভয় ভ্রাতার পারমার্থিক কল্যাণের জন্য শ্রীগৌররায়হরির শ্রীচরণে প্রার্থনা জানাইলেও, আমার ইচ্ছা তোমাদের কোন সুযোগমত এখানে আগমন হইলে, ভজন বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা সাধ্য সাধনতত্ত্ব বিষয়ে যাহা গ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া অধিক সময়সাপেক্ষ ও সহজসাধ্য হয় না, সেই বিষয়গুলো সংক্ষেপে ও সহজভাবে তোমাদের সহিত মৌখিক আলোচনা করিতে পারিলে উহা তোমাদের ন্যায় মেধাবীজনের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। এই আশা পোষণ করিয়া শ্রীমান কল্যাণের সম্প্রতি ভারতে আগমনের অপেক্ষায় ছিলাম। কিন্তু কলিপ্রভাবে এবার তাহার কোন প্রকার সুযোগ পাওয়া যায় নাই,—এই বিষয়ে সমস্তই অবগত আছ। শ্রীমান কল্যাণের পুনরায় দুই বা তিন বৎসর পরে ভারতে আগমন যদি সম্ভব হয়, আমার পক্ষে সে পর্যন্ত জীবিত থাকিবার কোন আশা করিতে পারিনা। সুতরাং তাহার সহিত উক্ত বিষয়ের আলোচনায় তৃপ্তিলাভ করিবার বিশেষ সম্ভাবনা নাই।

এখন তোমার পক্ষে যদি দুই এক বৎসরের মধ্যে ভারতে আগমন ঘটে, তাহা হইলে, তোমার পক্ষে যতটা অধিকসময় নবদ্বীপে থাকা সম্ভব হয়, আমার বাসনা সেই পর্যন্ত তুমি একা আশ্রমেই থাকিয়া আমার সহিত এই সকল বিষয় আলোচনায় যে অভিজ্ঞতা লইয়া যাইতে পারিবে, তোমার নিকট উহা শ্রবণে, কল্যাণের ও তোমার, উভয়েরই পরমার্থ পথে পরিচালনে যথেষ্ট আলোক সম্পাত করিবে। যাহা তোমাদের কর্মজীবনের উন্নতি অব্যাহত রাখিয়া ধর্মজীবন গঠনের পথেও অনেকটা আনুকূল্য বিস্তার করিবে, ইহাই আমার বিশ্বাস।

সেইরূপ কোন একটা সুযোগ শ্রীগৌররায়হরির কৃপায় না আসা পর্যন্ত তোমার নিকট উক্ত ঋণভার , আমার পক্ষে অতিরিক্ত হইয়া পড়িতেছে বলিয়া অস্বস্তিবোধ করিতেছি উহার প্রতিদান উক্তপ্রকারে সম্পাদিত না হওয়া অবধি।

কর্মজীবনে তোমাদের ন্যায় ও তদপেক্ষাও অধিকতর উন্নত অনেকলোক থাকিলেও, মনুষ্যজীবনে অর্জন করিবার সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান ও নিত্যসম্পদ যাহা, সেই শ্রীহরিভক্তিময়—ভক্তজীবন পরিগঠনের মত কোন লক্ষণ-বিশেষ কোথাও দেখা যায় না, —বিশেষতঃ আজিকার এই ঘোরতর কলিপ্রভাবকৃত বহির্মুখতার মধ্যে।

দৈন্য, বিনয়, নিরভিমানিতা, জাগতিক ভোগসম্পদে অপ্রীতি ও সর্ব্বোপরি শ্রীহরিভজনের অভিলাষ প্রভৃতি যে সকল সদ্‌গুণ ভক্তজীবনের শ্রেষ্ঠ উপাদান, তোমাদের অন্তরে উহার বিদ্যমানতার পরিচয় পাইয়া থাকি বলিয়াই, ইচ্ছা হয়, ভক্তিপথে পরিচালিত হইবার উপযুক্ত যথার্থ আলোক তোমরা প্রাপ্ত হইলে, কর্মজীবনের মত ও তাহা হইতেও অধিক—ধর্মজীবনেও তোমরা যথেষ্ট উন্নত হইতে পার। বিশেষতঃ তোমাদের ভক্ত পিতৃদেব ও পূর্বপুরুষগণের আশীর্বাদ দ্বারা অভিষিক্ত তোমরা। অতএব তোমাদের অজস্রদানের উক্তপ্রকারে প্রতিদান দিতে না পারা পর্যন্ত —আমি পরিতৃপ্ত হইতে পারিতেছিনা—অপর কোন প্রকারেই। সুতরাং এখন আর কোনও আর্থিক সাহায্যের আবশ্যক হইবেনা জানিবে। এ যাবৎ যাহা পাঠাইয়াছ তোমরা তাহার জন্য আন্তরিক আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা জানাইতেছি তোমাদের অজস্রভাবে।

শ্রীযুক্ত রাধাশ্যামবাবু নবদ্বীপে আসিয়া ভজন করিবার ইচ্ছা জানাইয়াছেন। শ্রাবণ বা ভাদ্রমাসে বন্যা আসিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এইজন্য আশ্বিনমাসে তাঁহাকে আসিবার কথা জানাইয়াছি—যদি বন্যা না হয়।

পুনরায় বৌমাকে ও তোমাকে আশীর্বাদ জানাইয়া শ্রীগৌররায়হরির চরণে তোমাদের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল প্রার্থনা করিতেছি।

ইতি শুভার্থী শ্রীকানুপ্রিয় গোস্বামী

পুঃ এখনকার Bank এর খাতায় কেবল আমাদের নাম আছে। কল্যাণের ও তোমার প্রেরিত cheque 'এ "Srimat" এবং "Mr" থাকায় Bank উহা লইতে কিছু গোলমাল করিলেও পরে লইয়াছে। যাহা হউক উহা Cash হইয়া আসিলে তোমাদের জানাইব।

॥ শ্রীগৌররায় হরি ॥

শ্রীনবদ্বীপ ২৭/৯/৭৩

"......শ্রীভগবানকে পাইবার লালসায়, তাঁহার ভজনের জন্য দৈন্য ও আর্তিপূর্ণপ্রাণের যে ব্যাকুলতা, ইহা ব্যবহার জগতে খুবই দুর্লভ বস্তু। তোমার ও কল্যাণের অন্তরে সুস্পষ্টরূপে সেই দুর্লভ লালসার বিকাশ দেখিয়া—ইহা শ্রীভগবান ও তদীয় ভক্তগণের বিশেষ কৃপার নিদর্শন বলিয়াই মনে করি—তোমাদের উপর। এই লালসাকেই অমূল্য শ্রীভগবানকে প্রাপ্তির একমাত্র মূল্য বলিয়াই উক্ত হইয়াছে শাস্ত্রে। "লৌল্যমপিমূল্যমেকলম্"।

এই দুর্লভ বাসনাটি লাভ করা সাধারণতঃ খুবই কঠিন হইলেও ইহাকে আজীবন সংরক্ষণ করা আরো কঠিন ব্যাপার বিশেষতঃ অকালে বিদায়োন্মুখ বর্তমান রুষ্ট কলির ঘোরতর প্রভাব সর্ব্বত্র সর্ব্বভাবে পরিলক্ষিত হইলেও, ভজন সংকল্প যাঁহাদের অন্তরে কিছুমাত্র বিকাশ পাইয়াছে,—নানা কৌশলে নামাপরাধ সৃজন ও সঞ্চার করাইয়া, উহা অন্তর্হিত ও বিষয়বাসনাকে জাগরিত করিয়া দেওয়াই কলির অন্যতম প্রভাব। কলির এই মহাচক্রান্ত হইতে বর্তমানে ভজনেচ্ছুজনের একমাত্র প্রধান কর্তব্য হইতেছে,—'নামাপরাধ' বর্জ্জন বিষয়ে সঙ্কল্প রাখিয়া-একান্তভাবে কেবল নামাশ্রয়ে অবস্থান করা। এ বিষয়ে পূর্বপত্রেও জানাইয়াছি। উহা স্মরণের জন্য ভক্তিরহস্য কণিকা পুস্তকের শেষ পরিচ্ছেদটা সুযোগমত একটু চিন্তার সহিত পাঠ করিয়া দেখিবে।

সূর্যোদয়ের আলোকই আলোকপ্রিয় পতঙ্গের পক্ষে যথার্থ মঙ্গল ও আনন্দের বিষয় হয়। কিন্তু তাহার উদয়াপেক্ষায় অধৈর্য্য হইয়া, যাহারা দীপালোকে ধাবিত হয়, তাহারাই অমঙ্গলের সহিত ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই হেতু বর্তমানে এই কলির ....তোমাদের পক্ষে উক্ত দুর্লভ বাসনাকে বজায় রাখিয়া মঙ্গলের পথে চালিত হইতে হইলে বর্ত্তমানে যাহা কর্তব্য, অতি সংক্ষেপে তাহার কিছু দিগ্‌দর্শন করা যাইতেছে।

বর্ত্তমানে তোমাদের কর্ম্মজীবনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য সুষ্ঠু ভাবে চেষ্টা রাখিয়া ও উহাতে অনাসক্ত থাকিয়া অন্তরে উন্নত রাখিবে ভজন বাসনা। এখন কেবল নামাশ্রয়ে থাকিতে পারিলেই কলির প্রভাব পরাহত হইবে এবং অঙ্গী শ্রীনামের কৃপায় যথাকালে সাধুসঙ্গ গুরুপাদাশ্রয়, শ্রীধামে বাস প্রভৃতি ভজনের অঙ্গসকল উদয় হইবে প্রকৃতরূপেই। কলি এখন সাধু, গুরু, ধাম সর্ব্বত্রই সঞ্চারিত। ধামে বাস করিয়াই ভজন করিতে যাইলে, কলিকৃত বহু অনাচার চোখে পড়িয়া অপরাধ সৃজন করিবে। কিন্তু যেখানেই থাক্; শ্রীনামগ্রহণ বা কীর্তনের সময় শ্রীধাম অন্তরে চিন্তা করিলে সেই স্মরণে যথার্থ ধামে বাসের মঙ্গলফল উদয় করিবে, অথচ কোন অপরাধ সৃজনের সম্ভাবনা থাকিবেনা। সেই রূপ সাধুসঙ্গ করিতে যাইলেও তাহাতে অনেক মতভেদ আদি কলিকৃত বহু অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা। কিন্তু ভক্তিগ্রন্থস্বরূপ সাধুসঙ্গ করিলে তাহা হইতেই সাধুসঙ্গের সকল ফল লাভ হইবে। গুরুতেও যে পর্যন্ত মনুষ্যবুদ্ধি থাকে, সে পর্যন্ত নামাশ্রয়েই থাকিয়া দীক্ষাবাসনা পোষণ করাই মঙ্গল। যথাকালে এরূপ গুরু শ্রীনামের কৃপায় লাভ হইবে এবং নামের প্রভাবেই গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি কিম্বা কোন দোষদর্শন ঘটিবেনা। কিন্তু গুরুকরণের পর যদি তাঁহাতে মনুষ্যবুদ্ধি ও দোষদর্শন ঘটে, ইহা "গুরুর অবজ্ঞা" রূপ নামাপরাধ। যাহার ফলে

শ্রীনামের অপ্রসন্নতা ঘটিবে। সুতরাং মন্ত্র বা দীক্ষালাভের পূর্বে—মহামন্ত্র শ্রীনামাশ্রয়েই থাকা আবশ্যক। শ্রীনামই যথাকালে,—দীক্ষা ও সদগুরুর ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। অবশ্য কুলগুরুই প্রশস্ত। অতএব ভক্তিলাভের উক্ত উপায় সকলের জন্য এখন অধৈর্য্য না হইয়া পরম উপায় শ্রীনামাশ্রয়ে থাকাই এখন কর্তব্য।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অপ্রকটের পর চারিশত বৎসর হইতে কলির প্রভাব আরম্ভ হইয়া অপ্রকটের পাঁচশত বৎসরে উহা শেষ হইয়া যাইবে। সে হিসাবে কলি বিদায় লইতে আরও ১৩/১৪ বৎসর মাত্র অবশিষ্ট আছে। এই শেষ সময়টা বিদায়োন্মুখ কলির আক্রমণ যে দিন দিন কিরূপ ভীষণতর হইবে, তাহা ধারণা করা অসম্ভব। ইহার পর হইতে সমস্ত জগতে শ্রীচৈতন্যের নাম প্রেমধর্ম প্রবর্তিত হইয়া সারাজগতে পরাশান্তির উদয় করিবে। এখন অনেক দেশে অন্য অনেককিছু সংযোগ করা হইতেছে।

—ঐ সকল মতবাদের মধ্যে আরও অধিক প্রবেশ করিতে যাইলে—শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত ধর্মের অনেক বিরুদ্ধ আচার গ্রহণ করিতে হয়। বর্তমানে কলির প্রভাবকৃত বহু উপধর্মের আবির্ভাব ঘটিয়া ধর্ম্মান্বেষী জনকে মূলধর্ম্মপথ হইতে বিচ্যুত ও বিভ্রান্ত করিয়া দিতেছে। সুতরাং এ বিষয়ে সতর্ক থাকা আবশ্যক। অতএব এখন ধৈর্যের সহিত নামাশ্রয়ে থাকিয়া উপস্থিত চিত্রপটে অর্চ্চনাদি যাহা যাজন করিতেছ সেইভাবে চলিতে থাকিলে, শ্রীনামের কৃপায় বিশুদ্ধ মত ও পথেই তোমরা অবস্থান করিতে পারিবে। যখন তোমরা কর্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া দেশে আসিবে তখন জগতের সুমঙ্গল দিনেরই উদয় হইবার সম্ভাবনা। তৎকালে সঞ্চিত বাসনা অনুসারে প্রকৃষ্ট ভজনের অবকাশ পাইবে শ্রীনামেরই কৃপায়, ইহাই আশা করি যথেষ্ট রূপে।

তুমি আগামী ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতে আসিতে পারে জানাইয়াছ। তবে আমার বর্ত্তমান বয়স ও শারীরিক অবস্থায় সে পর্য্যন্ত থাকিবার আশা কম হইলেও, শ্রীগৌররায়জীর অচিন্ত্য কৃপায় তা সম্ভব হইতে পারে। সুতরাং তাহার ইচ্ছা ও কৃপা হইলে আমার ক্ষুদ্র সামর্থ্য অনুসারে তৎকালে ভজন বিষয়ে সমস্ত জ্ঞাতব্য যাহা, তাহার আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। পত্রে উহার আলোচনা কোনরূপেই সম্ভব নহে।

কলির প্রভাবে—কলিকাতার প্রায় সমস্ত ছাপাখানাবন্ধ, ছাপার কাগজের অভাবে। ইহার কোন প্রতিকার না হইলে, গ্রন্থমুদ্রণের কোন আশা করা যায় না। শ্রীগৌররায়হরির চরণে তোমাদের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া পুনরায় তোমাদের, শুভেচ্ছা ও আশীর্ব্বাদ জানাইয়া এইখানেই পত্র শেষ করিতেছি।

ইতি শুভার্থী শ্রীকানুপ্রিয় গোস্বামী।

॥ শ্রীগৌরহরি ॥

শ্রীনবদ্বীপ ১৭/৬/৭৪

পরমকল্যাণ বরেষু—

শ্রীমান্ প্রশান্ত তোমার ২৯/৫ তারিখের লিখিত পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। তোমার office ৭০০ মাইল দূরে চলিয়া যাইতেছে ও তোমাকেও শীঘ্র সপরিবারে সেখানে গিয়া স্থায়ীভাবে থাকিতে হইবে জানিলাম। সেখানে তোমার একটি নিজস্ব বাড়ী কিনিবার ইচ্ছা করিয়াছ এবং শ্রীগৌররায় কৃপায় এই ইচ্ছা পূর্ণ হইয়া তথায় সপরিবারে তোমরা যাহাতে শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের শ্রীচরণ ও তদীয় শ্রীনাম আশ্রয় করিয়া ও তদীয় ভজনের সহিত নির্ব্বিঘ্নে ও শান্তিতে থাকিয়া সাংসারিক কর্তব্য কর্মে স্থির থাকিতে পার, শ্রীগৌররায় চরণে ইহাই প্রার্থনা জানাইতেছি অন্তরের সহিত।

সূর্য্যের কিরণ যে পর্যন্ত উজ্জ্বল থাকে, সে পর্য্যন্ত নিশাচর হিংস্রপ্রাণী কর্তৃক আক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। শ্রীভগবৎ ভক্তির কিরণালোকে অন্তর উজ্জ্বলিত থাকিলে সংসারারণ্যে প্রবেশ ও ভ্রমণ করিলে, ষড়্‌ঋপুর আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে না। ভক্তির আলোকশূন্য হৃদয়ই যাহাদের লক্ষ্যবস্তু ও নিবাসস্থল। বহুল পরিমাণে প্রগাঢ় জড়ের সংস্পর্শে আসিয়াও তোমাদের হৃদয়ে ভক্তিভাব ও ভজন লালসা যখন সমুজ্জ্বল রহিয়াছে, তখন তোমাদের জীবনের পরিণতি অমৃতপ্রসূই হইবে— পরমশ্রেয় বা মঙ্গল লাভ করিয়া, ইহাই আশা করিতেছি এবং শ্রীগৌরচরণে সেইরূপ প্রার্থনাও জানাইতেছি। পরম কল্যাণীয় শ্রীমান সুদীপকে শ্রীগৌররায়জীর শ্রীচরণতুলসী ও শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রসাদ দিয়া শ্রীগৌরগোবিন্দের চরণে সমর্পণ করিয়াছ জানিয়া বিশেষ সুখী হইলাম। যাহা হইতে অধিকতর মঙ্গলময় আশ্রয় আর কিছুই নাই। তাহার সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করি। এখানে সমাগত বৈষ্ণবগণের মধ্যে তোমাদের কথা আলোচিত হইয়া থাকে এবং সকলেই তোমাদের কুশল কামনা করেন আন্তরিকভাবেই।

আমার বর্ত্তমান শারীরিক অবস্থার যদিও কোন ভরসা নাই, তথাপি শ্রীগৌররায়জীর ইচ্ছায় ও কৃপায় তোমার সহিত আর একবার সাক্ষাৎ হইবে ইহাই বিশ্বাস। সেই সময় সকল পারমার্থিক বিষয় তোমার সহিত বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিবার সুযোগ পাইব। গ্রন্থ ছাপাইবার এখন বহুবিধ অসুবিধা। এইজন্য গ্রন্থগুলি যাহাতে সম্পূর্ণ করিয়া রাখিয়া যাইতে পারি—পরে সুদিন আসিলে ইহা ছাপা হইতে পারিবে ইহাই অভিপ্রায়। এ বিষয়ে শ্রীমান নিমাইয়ের অনেকটা সাহায্য পাইব শ্রীগৌরকৃপার ব্যবস্থায়, ইহাই মনে হইতেছে। সুদীপকে বধূমাতাকে ও তোমাকে

অশেষ শুভেচ্ছা ও আশীর্ব্বাদ জানাইতেছি। অদ্য শ্রীমান কল্যাণের পত্র পাইলাম। তাহার পত্রের উত্তর শীঘ্রই দিবার ইচ্ছা রহিল। ইতি—

শুভার্থী শ্রীকানুপ্রিয় গোস্বামী

পূঃ তোমার নূতন স্থানের ঠিকানা জানাইবে।

শ্রীকল্যাণ রায়কে লিখিত পত্র—

শ্রীশ্রীগৌররায়হরি

শ্রীনবদ্বীপ

মঙ্গলাষ্পদেষু,

পরম কল্যাণীয় শ্রীমান কল্যাণ

নূতন বাড়ীতে শ্রী গোপালজীকে লইয়া তোমরা সকলে কুশলে ও আনন্দে আছ জানিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিলাম। "সারা দুনিয়া গোপালজীকো"—শ্রীগোপালজীরই সমস্ত ইহা জানিয়া ও নিজ প্রভুত্ব ত্যাগ করিয়া সর্বভাবে তাঁহার অধীন হইয়া তদীয় দাসবোধে, সংসারধর্ম নির্বাহ করিতে পারিলে তাহাতে ঘটেনা সংসার বন্ধন। শ্রীভগবানের সম্বন্ধশূন্য হইয়া, নিজেকে কর্তা বা প্রভুবোধে সংসারে যে কর্ম তাহাই জীবের কর্মবন্ধন সৃজন করে, যাহার ফলে চৌরাশী লক্ষ জন্ম মৃত্যুরূপ সংসার ভ্রমণ। শাস্ত্রোক্ত কর্মমার্গের এই সারমর্ম শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় ভক্তজনের কৃপায় তোমরা যে অন্তরে অনুভব করিতে পারিয়াছ প্রকৃষ্টরূপে, ইহাই অনুভব করিতে পারিতেছি তোমাদের (তোমার ও প্রশান্তের) প্রতি পত্রে। উচ্চ হইয়াও আন্তরিক দৈন্য, বিনয় ও নিরভিমানিতা প্রভৃতি সদগুণ সকল উহার পরিচায়ক। গীতোক্ত এই কর্মযোগের যথার্থ আদর্শ তোমরা কর্মজীবনের আচরণ দ্বারা বিদেশে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, শ্রীভগবানের আশীর্বাদ ভাজন হইতে পারিবে, ইহাই আশা করিতেছি—তোমাদের মধুর আচরণে।

আবার যাহা কর্মজীবনের মুকুটমণি সেই ধর্মজীবন পরিগঠনের জন্য—বর্তমান কলি প্রভাবান্বিত বাহ্য জাঁকজমকপূর্ণ বহু উপধর্মের জালে জড়াইয়া না পড়িয়া সর্বশাস্ত্রসার শ্রীচৈতন্যের নামপ্রেমধর্মপথেই একনিষ্ঠ থাকিয়া, সুদক্ষ নাবিক দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের প্রতি একলক্ষ্য রাখিয়া যেমন বিপদ সঙ্কুল সমুদ্র পথের, সকল সঙ্কট অতিক্রম

করিয়া গন্তব্যস্থলে উপনীত হইতে সক্ষম হয়—সেইরূপ তোমাদের (তোমার ও প্রশান্তের) ধর্মজীবন গঠনের পথে দিকও ঠিক হইয়া গিয়াছে—আর কোনপ্রকারেই তোমরা—প্রকৃষ্ট গন্তব্যপথ হইতে বিচ্যুত হইবেনা—ইহাও তোমাদের প্রতিপত্রেই অনুভব করিয়া আমি এখন উক্ত বিষয়েও সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি।

শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ ও তদীয় ভক্তজনের, এবং ভক্ত পূর্বপুরুষগণের আশীর্বাদে 'পথ' সুনির্ণীত হইয়া যাইলে, তখন গন্তব্যস্থল বিষয়ে আর অধিক কিছু উপদেশের আবশ্যক হয় না। অগ্রসরণের সঙ্গে সঙ্গে নিজেই সমস্ত দেখিয়া ও বুঝিয়া লওয়া যায়। এই ভরসায় ও তোমাদের আচরণে সেই লক্ষণের প্রকাশ অনুভব করিয়া আমি সে সকল বিষয়ে তোমাদের আর কোন উপদেশের প্রয়োজন আছে মনে করি না। আমি পূর্বে যে সকল পত্রে উক্ত বিষয় সকল তোমাদের জানাইয়াছি, তাহা একত্র করিলে একখানা গ্রন্থ হইয়া যায়। উহাতে আমার বক্তব্য প্রায় সকল কথাই বলা হইয়াছে—ধর্মজীবন গঠন বিষয়ে—আজিকার কলিকৃত অন্ধকার সৃজনের মধ্যে। এখন মধ্যে মধ্যে দেবুর সহিত পত্রের আদানপ্রদানে, তোমাদের কুশল সংবাদাদি জানাইতে ও এদিকের সংবাদ জানিতে পারিবে। বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় জানাইবার আবশ্যক থাকিলে, আমাকে জানাইলেই আমি উহার উত্তর দিব। সুতরাং এখন আমি নিশ্চিন্ত মনে এই শেষ জীবনের যে কয়দিন অবশিষ্ট আছে, কেবল পরলোকের কিঞ্চিৎ পাথেয় সংগ্রহের চেষ্টায় এবং অবকাশকালে, অসম্পূর্ণ গ্রন্থগুলি সম্পূর্ণ করিবার কাজে নিযুক্ত থাকিবার জন্যই সংকল্প করিয়াছি—শ্রীগৌররায়জীর কৃপাভিন্ন কিছুই সিদ্ধ হইবে না, ইহা জানা থাকিলেও।

শ্রীগৌররায়জীউর কৃপার স্পষ্টতঃ অনুভব হইয়াছে তোমাদের জীবনে অনেক ঘটনায়। সুতরাং তোমরা স্বতঃই তাঁহার প্রতি ভক্তিমান। স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে তোমরা তাঁহার সেবার জন্য পূর্বে অনেক কিছু করিয়াছ। যে স্বতঃস্ফূর্ত সেবার মধ্যে কোন দাবী-দাওয়া, অনুরোধ-বিরোধ বা দেনাপাওনার কোন "সম্বন্ধ বা সংস্পর্শ না থাকিয়া, কেবল "ভক্তি-অর্ঘ" রূপে তাঁহাতে অর্পিত হয়, উহাই শুদ্ধ সেবা। সুতরাং এইভাবে তদীয় সেবার আনুকূল্য ভবিষ্যতেও তোমাদের সুযোগ সুবিধামত যখন যাহা কিছু প্রেরিত হইবে উহা সানন্দে গৃহীত হইয়া, তদ্বিষয়ে ব্যয়িত হইবার পক্ষে কোন বাধা হইবেনা জানিবে। গ্রন্থ প্রকাশ বিষয়ে এখন কলিকৃত নানা প্রকার দুর্যোগও অস্বাভাবিকতা চলিতেছে। সুতরাং উপস্থিত সে বিষয়ে কোন প্রশ্নই উঠে না। মুদ্রণের সুযোগ আসিলে, পরে যথাকালে উহা তোমাকে জানান হইতে পারে।

শ্রীযুক্ত রাধাশ্যামবাবু এখানে একপ্রকার ভালই আছেন। আশ্রমে প্রত্যহ সন্ধ্যার পর আসিয়া কীর্তনে যোগদান করিয়া আনন্দলাভ করিয়া থাকেন। তবে নিয়মসেবার

পর কলিকাতায় যাইবেন, এইরূপ স্থির করিয়াছেন। তিনি পত্রে তোমাকে সকল বিষয় জানাইয়াছেন বলিলেন।

শ্রীশ্রীগৌররায়জীর চরণে তোমাদের সর্বাঙ্গীন কুশল প্রার্থনা করিয়া এইখানেই এইপত্র শেষ করিতেছি। ইতি

শুভার্থী

শ্রীকানুপ্রিয় গোস্বামী

জয় শ্রীগৌররায়হরি

মঙ্গলাস্পদেষু শ্রীনবদ্বীপ ১০/৯/৭০

পরম কল্যাণীয় শ্রীমান প্রশান্ত ও শ্রীমান কল্যাণ তোমাদের উভয় ভ্রাতার লিখিত পত্র পাইয়া এবং শ্রীমান কল্যাণের, শ্রীগৌররায়জীউর কৃপায় নির্বিঘ্নে U.S.A. পৌঁছান সংবাদ জানিয়া নিশ্চিন্ত ও বিশেষ আনন্দিত হইলাম। তোমাদের উভয় ভ্রাতার দায়িত্বপূর্ণ কার্যভার ক্রমশঃ অভ্যস্ত হইয়া, কিছু লঘু হইয়া আসায় তৎসহ অপর কাজ করিবার মত কিছু কিছু অবসর পাইতেছ, এ সংবাদে সুখী হইলাম। তোমাদের নিজ কাজ ছাড়া অপর একটি বড় কাজের প্রশস্ত ক্ষেত্র ওখানে রহিয়াছে—তাহা হইতেছে,—সম্প্রতি হিন্দুধর্মে, বিশেষভাবে শ্রীচৈতন্যপ্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মবিষয়ে আমেরিকাবাসীর উন্মুখতা ও তৎবিষয়ে বিশেষ সংবাদ অবগত হইবার আগ্রহ। ইহা তোমাদের কুলধর্ম বলিয়া তোমাদের পক্ষে আমেরিকায় এই কার্যভার যথাসম্ভব গ্রহণ করিবার সামর্থলাভ করিতে পারিলে তোমাদের উভয় দিকেই মঙ্গল লাভ করিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা—শ্রীগৌরকৃপায়। তোমরা যেমন ব্যবহার কর্মে—অনিত্যের পথে কৃতিত্ব লাভ করিতেছ ও আরও করিবে, তেমনি পরমার্থ বা নিত্যের পথেও বিপুল কৃতিত্ব অর্জন করিয়া নিজেদের পরম মঙ্গলের সহিত তদ্দেশবাসীদিগেরও পরম উপকার সাধন করিয়া শ্রীভগবানের পূর্ণ আশীর্বাদভাজন হইতে পারিবে, ইহাই বিশ্বাস। ধর্মপ্রচারের অপর অনেক প্রকার ব্যবস্থা থাকিলেও কলিপ্রভাবে শ্রীগৌরপ্রবর্তিত প্রেমধর্মের সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ভাবে প্রচারের অভাব রহিয়াছে এবং যে ধর্ম প্রচারিত হইতেছে, তাহা প্রায়শঃ মিশ্রিত ও অভিপ্রায়মূলক। তোমরা যদি উহা বিশুদ্ধ ও নিঃস্বার্থ ভাবে প্রচারের চেষ্টা কর, তাহা হইলে ইহা যতই অসম্ভব মনে হউক, শ্রীগৌরকৃপায় সম্ভব হইয়া যাইবে, যেহেতু তাঁহার কৃপা ও ইচ্ছা অচিন্ত্য।

ইহার জন্য প্রথমে প্রয়োজন, উক্ত শাস্ত্র গ্রন্থ অনুশীলন করা ও উহার সারমর্ম নিজেদের আয়ত্ত্ব করা। এ বিষয়ে প্রাথমিক অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য আমার প্রেরিত গ্রন্থগুলি স্থিরভাবে চিন্তার সহিত অধ্যয়ন করিতে পারিলে উক্ত কাজের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইবে মনে করি। এ বিষয়ে আয়ত্ত্ব হইলে, তখন আগ্রহশীল অপরের সহিত আলোচনায় তাঁহারা ইহাতে উপকৃত হইয়া তোমাদের নিকট কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন, ইহাই বিশ্বাস। শ্রীভগবানের কৃপা ও ইচ্ছা হইলে এদিক দিয়াও তোমরা ঐ স্থানে একটা বিরাট কর্মক্ষেত্র গড়িয়া তুলিতে পারিবে, যাহা দৈহিক মানবের জন্য নহে—বিশ্ব-মানবাত্মার প্রকৃষ্ট কল্যাণ বিধানের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। আমার গ্রন্থ কয়খানা প্রথমে তোমরা উভয়েই অবসর মত আদ্যন্ত চিন্তার সহিত পাঠ করিয়া উহার মর্মগ্রহণ করিতে চেষ্টা করিবে। শ্রীগৌরকৃপায় তোমাদের এই উদ্যম অবশ্যই সফল হইবে ইহাই আশা করি। পরে এই বিষয়ে আগ্রহশীল জনের সন্ধান পাইলে তাঁহাদের সহিত আলোচনা করিবে। এইভাবে ক্রমশঃ তোমাদের U.S.A. অবস্থানকালব্যাপী এই কাজ চলিতে পারিবে।

সেই অবকাশে, শ্রীগৌরইচ্ছায় যদি সেরূপ কোন সুযোগ্য, আগ্রহশীল ও ক্ষমতাসম্পন্ন যোগ্য ব্যক্তির সহযোগিতা মিলিয়া যায় ও তদ্দ্বারা উক্ত গ্রন্থগুলির ইংরাজী অনুবাদ (পূর্বপত্র লিখিত শর্তে) বিদেশে মুদ্রিত ও প্রচার সম্ভব হয়, সে কাজটিও সাধিত হইতে পারিবে—তোমাদের এই একই সাধন পথে।

কোন মণীষীকে অভিমতের জন্য পুস্তক দিতে হইলে একসময়ে কোন একখানি গ্রন্থের অধিক দিবার আবশ্যক নাই। উৎসাহ ব্যাঞ্জক পত্র পাইলে, তখন অপর একখানি দেওয়া যাইতে পারিবে। কোন ক্ষেত্রেই পুস্তক ফেরৎ চাওয়া হইবেনা। সকলকেই Present করা হইবে।

শ্রীমান প্রশান্তের পত্রে, জাহাজের ডাকে প্রেরিত গ্রন্থগুলির পৌঁছান সংবাদ জানিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

শ্রীমান কল্যাণ যে ২ সেট পুস্তক লইয়া গিয়াছে উহা আমেরিকার ২ টি বড় শহরের প্রসিদ্ধ Library, যেখানে বাঙ্গলাগ্রন্থ রাখা হয়, তোমাদের অবসর মতো যত শীঘ্র সম্ভব Present করিয়া দিবে। এই সংবাদ এবং পুস্তক সম্বন্ধে বিশেষ কোন সংবাদ থাকিলে আমাকে জানাইবে। অপর ধর্মসম্প্রদায়ের প্রচারিত মতে অভিভূত না হইয়া শ্রীগৌরচরণে ও তৎপ্রবর্তিত "নাম ও প্রেমধর্মে" একান্ত ভাবে নিষ্ঠিত থাকিবে ইহাই তোমাদের কুলধর্ম ও বেদাদি শাস্ত্র সম্মত। শ্রীমান কল্যাণের প্রেরিত ফটো পাইয়া দেবুর আনন্দে সীমা নাই। তাহার গোপালদেবের ফটো আমেরিকা হইতে আসিয়াছে ইহাই অনেককে জানাইতেছে। এখানকার ভক্তরা

অনেকেই তোমাদের আন্তরিক আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা জানাইয়াছেন। আমিও সেই সঙ্গে উহা তোমাদের জানাইতেছি শ্রীগৌররায় চরণে...............।

ইতি শুভার্থী শ্রীকানুপ্রিয় গোস্বামী

পুঃ বর্তমানে নবদ্বীপ বন্যায় প্লাবিত। আমরা তাহার মধ্যেই এখন রহিয়াছি। শ্রীগৌররায়ের কৃপায় এখনও বিশেষ অসুবিধা হয় নাই।

জয় শ্রীশ্রীগৌররায়হরি

পরমকল্যাণবরেষু— শ্রীনবদ্বীপ ১১/০২/৭১

শ্রীমান কল্যাণ, তোমার ৫ই জানুয়ারী,'৭১ তারিখের পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। বিদেশ হইতে লিখিত পত্রে তোমাদের উভয় ভ্রাতার যথার্থ বৈষ্ণবোচিত ভক্তি প্রাণতার পরিচয় পাইয়া বড়ই আনন্দলাভ করিয়া থাকি। কলিকৃত এই ঘোরতর নাস্তিকতা ও বহির্মুখতার দিনে, America-র মত ভোগৈশ্বর্যপূর্ণ দেশে তোমরা উচ্চপদ মর্যাদা প্রাপ্ত হইয়া যে, শ্রীভগবদ্ভক্তির সুনির্মল ও সুমঙ্গল পথ অবলম্বন করিয়া কর্মক্ষেত্রে চলিতেছ, ইহা তোমাদের উপর শ্রীগৌরগোবিন্দের বিশেষ করুণা ও কৃপাশীবাদের নিদর্শন। আশা করি আজীবন এই সৌভাগ্য ও শ্রীভগবৎ আশীর্বাদ হৃদয়ে বহন করিয়া চলিবে। তাহা হইলে কেবল ব্যবহার পথেই কৃতিত্ব নহে—পরমার্থ পথেও যথেষ্ঠ কৃতিত্ব অর্জনে—জীবনে যথার্থ মণিকাঞ্চন—সংযোগ হইবে। তোমাদের স্বধর্মে প্রগাঢ় নিষ্ঠার সহিত উহার আচার ও প্রচারের নিমিত্ত যাহা কর্তব্য—পূর্বপত্রসকলে তাহা বিস্তারিত ভাবে জানাইয়াছি। শ্রীগৌররায়জীর চরণে প্রার্থনা করি, তোমাদের সেই প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায় যেন তদীয় কৃপায় সার্থক হয়।

তুমি যে বিশেষ আগ্রহের সহিত চেষ্টা করিয়া আমার গ্রন্থের একসেট California University র Library তে Present. করিয়াছ এবং তাঁহারা উহা আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন, তোমার পত্রে এই সংবাদ জানিয়া বিশেষ সুখী হইলাম। আর একসেট্ পুস্তক তোমার সুযোগ ও সুবিধামত অপর কোন প্রসিদ্ধ University র Library তে Present করিতে পারিলেই, আপাততঃ এই কাজটি তোমার দ্বারা সুসম্পন্ন হইয়া যায়। শ্রীগৌররায়জীর ইচ্ছা ও কৃপা হইলে তোমাদের সকল প্রচেষ্টাই সার্থক হইবে, নচেৎ কোন চেষ্টাই সফল হইবে না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রবর্তিত 'শ্রীনাম ও প্রেমধর্ম' জগতের প্রকৃষ্ট শান্তির নিমিত্ত যে সর্বত্র ব্যাপ্ত ও প্রচারিত হইয়া অত্যাগ্রহের সহিত গৃহীত হইবে। তদীয় এই ভবিষ্যদ্বাণী অদূর ভবিষ্যতেই সার্থক হইবে ইহা তাহার সূচনা মাত্র। তবে ইহার বর্তমান প্রচারকগণ ইহাকে নিজ কৃতিত্ব বলিয়া মনে করিলেও এবং গ্রাহকগণও তাহাই বুঝিয়া প্রচারকগণের অধীন হইয়া পড়িলেও ইহার যথার্থ কারণ সম্বন্ধে উভয় পক্ষই অজ্ঞাত। 'নামাপরাধ' বিদ্যমান না থাকিলে যে কোন ব্যক্তি কর্তৃক যে কোনভাবে শ্রীনাম প্রদত্ত ও গৃহীত হইলেই তৎক্ষণাৎ শ্রীনামের অচিন্ত্য শক্তি প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহা শ্রীনামেরই প্রভাব। প্রচারক বা অপর কাহারও কৃতিত্ব নহে। তবে অন্য কিছু প্রচার না করিয়া শ্রীনামসঙ্কীর্তন প্রচার করিতে যাওয়া—ইহাই প্রচারকের কৃতিত্ব বলা যাইতে পারে। অন্ততঃ উক্ত বিষয়টি তুমি অবকাশকালে "মহৎসঙ্গ প্রসঙ্গ" নামক আমার পুস্তকের পরিশিষ্ট অংশটি যদি ভাল করিয়া চিন্তার সহিত পাঠ করিয়া বুঝিয়া লইতে পার, তাহা হইলে, নিরপেক্ষ ও অনুসন্ধিৎসু বিদেশীয় ব্যক্তিদিগকে উত্তমরূপেই ইহার কারণ বুঝাইয়া দিতে পারিবে, যাহার জন্য তাঁহারা উপকৃত বোধ করিয়া তোমাদের প্রতি আকৃষ্ট ও উক্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে আগ্রহশীল হইতে পারেন। এইরূপ অপর গ্রন্থগুলির মধ্যে অপর অনেক বিষয়েরই সুসমাধান পাইবে—ধৈর্য ও চিন্তার সহিত পাঠ করিতে পারিলে।

শ্রীগৌরহরি

শ্রীনবদ্বীপ
১/৫/৭৩

পরমকল্যাণবরেষু

শ্রীমান কল্যাণ, নবদ্বীপ হইতে যাইবার পর তোমাদের কোন সংবাদ না পাইয়া চিন্তিত ছিলাম। পরে কিছুদিন পূর্বে তোমার দাদার পত্রে তোমাদের নির্বিঘ্নে U.S.A পৌঁছান সংবাদে নিশ্চিন্ত হইয়াছি। পরে তোমাদের ১৬/৪ তারিখের Regd পত্র পাইয়া সবিশেষ সংবাদ অবগত হইলাম।

তোমার ভারতে আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম প্রায় ২ বৎসর হইতে। তুমি আসিলে অন্ততঃ ১০/১৫ দিন আশ্রমেই থাকিয়া, তোমার সহিত পরমার্থ বিষয়ে আলোচনা করিতে পারি ইহাই ছিল আমার একান্ত বাসনা। যাহা সাক্ষাতে আলোচনা ব্যতীত দূর হইতে পত্রালাপে সম্ভব হয় না। কিন্তু সদুদ্দেশ্য যেখানে, সেখানেই কলিকৃত বিরোধিতা অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে—বিশেষতঃ বর্তমানে প্রায় সর্বত্রই।

তাই উক্ত উদ্দেশ্য লইয়া তোমরা এখানে আসিলেও যাহাতে একটি দিনও আশ্রমে অবস্থান করা না হয়, কলিকৃত সেই ঘটনা দেখিয়া আমি মর্মাহত। ভজনাদি বিষয়ে আলোচনা দূরে থাক, এবার তোমাদের কাহাকেও শ্রীঠাকুরের এক গেলাস প্রসাদী জল পর্যন্ত দিবার অবসর পাইলামনা, ইহার জন্য বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়াছি—আমরা আশ্রমের সকলেই—কলির এই অদ্ভুত চক্রান্তের কথা ভাবিয়া। আর যে তিন বৎসর পরে তোমার সহিত সাক্ষাতের জন্য বিদ্যমান থাকিব, ইহার কোন আশা নাই। তবে শ্রীগৌররায়হরির ইচ্ছা স্বতন্ত্র।

বর্তমান সময়ে যে কোন সাধুসঙ্কল্পে কলিকৃত বাধাবিঘ্ন সৃজনের চক্রান্ত, ইহার অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে পারিয়াছ এবার বিশেষ ভাবেই,—পূর্বোক্ত তোমাদের নবদ্বীপ আগমনের ঘটনা হইতেই। কেবল এখানেই নহে, প্রকৃত ধর্মানুষ্ঠানের প্রয়াস বা সঙ্কল্প যেখানে—সেখানেই কলির এই প্রতারণা। সুতরাং এখন পরমার্থ পথে অগ্রসর হইতে হইলে, প্রতি পদক্ষেপে ধীর স্থিরভাবে সকল দিক চিন্তা করিয়া অগ্রসর হওয়া আবশ্যক। তাড়াতাড়ি মনের আবেগে কিছু করিতে যাইলেই প্রায় উহার বিপরীত ফল হইবার সম্ভাবনা। তোমার পত্রে এবার শ্রীবৃন্দাবনে ভজনেচ্ছা প্রভৃতি বিষয়ে যাহা লিখিয়াছ, উহা আত্মীয় পরিজনের নিকট হইতে সুদূরদেশে যাইবার পর এইরূপ মানসিক অবস্থা স্বাভাবিক ও সাময়িক হইলেও, দৈন্য বিনয়াদি বৈষ্ণবোচিত সদ্‌গুণ সকল, উক্ত পূর্বপুরুষগণের আশীর্বাদে তোমাদের অন্তরে বিদ্যমান থাকায় ইহাতে কেবল শ্রীনামাশ্রয়ের সংযোগ হইলেই, যথাকালে প্রকৃষ্ট বৈরাগ্যাদির উদয়ে উক্ত বাসনা পূর্ণ হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। শ্রীভগবানের নামকে ভগবান হইতে অভিন্ন জানিয়া সকল ভজনাঙ্গের শ্রীনামকেই 'অঙ্গী' বোধে সর্বশ্রেষ্ঠ বুঝিয়া নামে সর্বসিদ্ধিলাভ হইবে, ইহাই বিশ্বাস করিয়া যে নামগ্রহণ,—ইহাকেই নামাশ্রয় কহে। সাধ্য সাধন যাহা কিছু সাধনপথের মঙ্গল সমস্তই শ্রীনাম হইতে উপস্থিত হইবে। শ্রীনামই সকল সাধনমধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। নামের সমান বা অধিক অপর কিছুই নাই—এই বিশ্বাসে নামগ্রহণীয় হইলে—সেই আশ্রিত জনের 'নামাপরাধ' ঘটিবারও সম্ভাবনাও থাকে না। নামের সর্বশ্রেষ্ঠতা বিষয়ে তাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি—"সাধ্য সাধনতত্ত্ব—যা কিছু মঙ্গল। কৃষ্ণনাম সংকীর্তনে মিলিবে সকল ॥"—উপস্থিত অপর কোন ভজনের জন্য সচেষ্ট না হইয়া, কেবল অবকাশমত,—নামকীর্তন, সময় সুযোগমত নামগ্রহণ বা স্মরণ করিতে পারিলেই শ্রীনামের কৃপায় যথাক্রমে সকল অভীষ্ট পূর্ণ হইবে। তোমার কয়টি প্রশ্নের উত্তরেও এইসঙ্গে সংক্ষেপে কিছু ইঙ্গিতমাত্র করা হইল। বিস্তারিত আলোচনা পত্রে সম্ভব নহে।

শ্রীনাম হইলেন, 'মহামন্ত্র'। দীক্ষায় যাহা পাওয়া যায়—তাহার নাম 'মন্ত্র'। মন্ত্র

হইতেও যে মহামন্ত্র বড় তাহা সহজে বুঝা যায়। আপাততঃ এই মহামন্ত্র আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারিলে নামের কৃপায় যথাকালে সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় সম্ভব হইবে। ভক্তিমান কুলগুরু হইলেই সর্বোত্তম। তাই নামের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"দীক্ষা পুরশ্চর্যাবিধি অপেক্ষা না করে। জিহ্বাস্পর্শে আচণ্ডাল সবারে উদ্ধারে ॥"—নামগ্রহণ, দীক্ষার অপেক্ষা করেন না। দীক্ষা নামগ্রহণের অপেক্ষা করেন। অর্থাৎ নামগ্রহণের ফলে যথাকালে সদ্‌গুরু মিলিয়া যায়। তাহার পূর্বে তাড়াতাড়ি গুরুকরণে—বিশেষতঃ কলিপ্রভাবের মধ্যে গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি প্রভৃতি ঘটিয়া নামাপরাধের সৃজন করে—কলির চক্রান্তে। এই হেতু এখন স্থিরভাবে থাকিয়া কেবল নাম গ্রহণাদি ও তৎসহ—চিত্রপটের উৎসবাদি, সৎগ্রন্থ পাঠাদি যাহা তোমাদের নিয়ম আছে, তাহা পালন করিয়া যাইবে। এখন কীর্তনাদি ভজনের সময়ে শ্রীবৃন্দাবন মানসে চিন্তা করিলেই চলিবে। —বৃন্দাবনধামে এখন বাস করিতে যাইলে তাহারমধ্যে কলিকৃত নানা অনাচার দর্শনে শ্রদ্ধা হ্রাস হইবার সম্ভাবনা। শ্রীধামস্মরণে তাহা হইতে রক্ষা পাওয়া যায় ও তৎফলও শুভ হয়।

পরমার্থ বিষয়ে যাহা লিখিত হইল,—তাহার অনুকূলতা হিসাবে তোমাদের কর্মজীবনের কর্তব্য সম্বন্ধে—কিছুমাত্র উদাসীন না হইয়া উহাকে ভগবানের দান মনে করিয়া—নিষ্ঠার সহিত উহার উন্নতি বিষয়ে সর্বভাবে সচেষ্ট হইবে। উহার অবকাশে সুযোগমত ধর্মজীবন পরিগঠনের চেষ্টা করিবে। "যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ—অনাসক্ত হইয়া ॥" ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্দেশ। কর্মজীবনের কর্তব্য পালন করিলেও উহাতে আসক্তি পোষণ না হয়। আপাতত ইহার অধিক আর কিছু লিখিবার সুযোগ ও নাই; প্রয়োজনও মনে করিনা। শ্রীগৌররায়জীর চরণে তোমাদের মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া—এখন এইখানেই—পত্র শেষ করিলাম। তোমাদের সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ জানাইতেছি।

ইতি—

শুভার্থী শ্রীকানুপ্রিয় গোস্বামী

পুঃ মিছরি পিত্ত নাশের ঔষধ। পিত্তরোগে মিছরি তিক্ত লাগিলেও উহা না ফেলিয়া খাইতে খাইতে যেমন মিষ্ট লাগে সেইরূপ নাম লইতে প্রথমে রুচি না হইলেও উহা বন্ধ না করিয়া চালাইয়া যাইতে যাইতে ক্রমে রুচি ও পরে আসক্তি জন্মিয়া প্রেমোদয় করে। এই পত্রের উপদেশ গুলি তোমাদের উভয়ভ্রাতার উদ্দেশ্যেই।

৫। শ্রীগৌররায় হরি

শ্রীনবদ্বীপ
২১/৯/৭৩

পরমকল্যাণবরেষু—

শ্রীমান কল্যাণ, বিজয়ার শুভেচ্ছাসহ আশীর্বাদ জানাইতেছি—বধূমাতা ও তোমার কন্যার সহিত তোমাকে। এই পত্র তুমি বিজয়ার পরে পাইবে, ইহাই অনুমান করিয়া পূর্বেই জানাইয়া রাখিলাম।

তোমার ৯/৯/৭৩ তারিখের পত্রে, তোমাদের কুশল সংবাদসহ তোমার দৈন্য ও নির্বেদ মধ্যে শ্রীহরিভজন বাসনার উপলব্ধিতে পূর্বপত্র সকলের মতই প্রীতিলাভ করিলাম বিশেষ ভাবে। বিষয়ের বিরুদ্ধভাবের মধ্যেও যে তোমার এই সুদুর্লভ ভাবটি সমভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহা কোন অতিভাগ্য সাপেক্ষ মনে করি। সতত বিষয় বাসনা দুষ্ট জীবহৃদয়ে, হরিভজনের বাসনা, কিম্বা ভজনের আনুকূল্য না পাইবার জন্য যে নির্বেদ বা খেদ, ইহা মহৎকৃপাসাপেক্ষ। আমার মনে হয় তোমার ভক্তিমান পিতৃদেব ও বিশেষভাবে শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ চরণাশ্রিত তোমাদের পূর্বপুরুষগণের অলক্ষ্য আশীর্বাদ হইতে ইহা সম্ভব হইতে পারে, বিষয়ের মধ্যে থাকিয়াও, শ্রীবৃন্দাবনে কুঞ্জস্থাপন করিয়া যাঁহাদের ভজনেচ্ছা ছিল প্রবল। আমি তোমাদের সেই কুঞ্জে কিছুদিন বাস করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলাম। তৎকালে সেই শ্রীবৃন্দাবনেই তোমার পিতামহ ও পিতামহীর ভক্তিভাব ও দৈন্য বিনয়াদি দর্শনে বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছিলাম—এখনও উহা কিছু স্মরণে রহিয়াছে। স্বাতীনক্ষত্রের দুর্লভজল পতনে ক্বচিৎ কোন কোন শুক্তির বুকে মুক্তার সঞ্চারের ন্যায়, সম্ভবতঃ তাঁহাদের কাহারও কৃপাশীর্বাদ ভায়েদের মধ্যে তোমাদের কয়েকজনের হৃদয়ে সম্পৃক্ত হইয়া থাকিবে।

সে যাহা হউক প্রাণের এই দুর্লভ ভজন বাসনাটি জিয়াইয়া রাখিতে পারিলে, তোমাদের ব্যবহার জীবনের উন্নতির মধ্যেও পারমার্থিক কল্যাণ পূর্ণরূপেই লাভ করিবার সম্ভাবনা। তবে অকালে বিদায়োন্মুখ কলির প্রভাব এখন পূর্ণরূপে চলিতেছে সর্বত্রই। তন্মধ্যে ভজনশীল বা ভজনেচ্ছুজনের উপর নামাপরাধ সঞ্চার করিয়া। নামাপরাধ রূপ কলিকৃত বিষবাষ্প সঞ্চারিত বা প্রযুক্ত হইলে, অন্তরের ভজন বাসনা বিদূরিত হইয়া, বিষয় বাসনার উদ্রেক হইয়া থাকে। এই অনর্থ হইতে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় একান্তভাবে নামাশ্রয়ে থাকিয়া—শ্রীনামকীর্তনাদি! "নামাশ্রয়" বিষয়ে পত্রে অল্পকথায় বুঝাইয়া দেওয়া সম্ভব নহে। তোমার দৈনিক কাজকর্মের অবসর কালে, ভক্তিরহস্য কণিকা গ্রন্থের অন্ততঃ শেষ পরিচ্ছেদটা একটু মনোযোগের সহিত

পড়িলেই ইহা বুঝিয়া লইতে পারিবে। বর্তমানে অফিসের কাজকর্মের উন্নতির চেষ্টার সহিত তদ্বিষয়ে অনাসক্ত থাকিয়া,—ভজনবাসনাকে তন্মধ্যে উন্নত রাখিতে হইবে। বর্তমানে নামাশ্রয় দুর্গে অবস্থান ব্যতীত কলির আক্রমণ ও তৎপ্রযুক্ত নামাপরাধ অস্ত্র হইতে পরিত্রাণের অন্য কোন উপায় নাই। এখন কেবল নামাশ্রয়ে থাকিয়া, অবসর সময়ে নামকীর্তন বা গ্রহণসহ শ্রীগৌর গোবিন্দাদির চিত্রপট অর্চন ও গীতা ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থ পাঠ-প্রভৃতি যেভাবে ভজন করিতেছ ঐরূপ করিয়া যাইলেই, কলি নির্গত হইবার সূচনা হইলে এই অতি অল্পই অবশিষ্ট কাল (১৪/১৫ বৎসর) অতিক্রম করিতে পারিলেই সর্বজগতে প্রকৃষ্টরূপে শ্রীচৈতন্যের নাম ও প্রেমধর্মের অভ্যুদয় হইয়া কলির সকল প্রভাবের সহিত নামাপরাধও আর থাকিবে না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর ৫০০ বৎসর অতিক্রান্ত হইলে কলির নির্গমন সম্পূর্ণ হইবে। তোমাদের কার্য হইতে অবসর গ্রহণের পর সেই অনুকূল সময়ে—দেশে ফিরিয়া আসিলে, শ্রীনামের কৃপায় তখন দীক্ষাদি গ্রহণের পর (কুলগুরুর নিকট) শ্রীধামবৃন্দাবনে গিয়া নিজভজনবাসনা পূর্ণ করিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইবে, সন্দেহ নাই। এখন কেবল মনের উক্ত বাসনাটি জীবিত রাখিয়া উক্ত উপায়ে চলিতে পারিলেই যথাকালে শ্রীনামের কৃপায় সর্বাভীষ্টপূর্ণ হইবে। যেহেতু—

"সাধ্য-সাধনতত্ত্ব যা কিছু মঙ্গল।
কৃষ্ণনামসঙ্কীর্তনে মিলিবে সকল॥"

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে মহাপ্রভুর এই উক্তি।

৬। শ্রীগৌররায় হরি

শ্রীনবদ্বীপ ৬/১১/৭৩

পরমকল্যাণবরেষু

শ্রীমান কল্যাণ, তোমার ২২/১০/৭৩ তারিখের লিখিত পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। তুমি সপরিবারে কুশলে আছ এবং সম্প্রতি একটি বাড়ী ক্রয় করিয়াছ জানিয়া বিশেষ সুখী হইলাম। বিষয়মাত্রেই 'বিষ' রূপেই পরিণত হয় তাহাদের, যাহারা "আমি কর্তা", "আমি ভোক্তা" ইত্যাদি প্রকার বোধ করিয়া, উহা ভোগ করিবার ইচ্ছা করে। তোমাদের (প্রশান্ত ও তোমার) অন্তর ভক্তিভাবাপন্ন। ভজন বাসনাই নিহিত রহিয়াছে অন্তরে বাহিরে কর্মরত থাকিয়াও। সুতরাং বাড়ী, ঘর, পুত্র-কলত্রাদি বিষয়সম্পদ সমস্তই যিনি অখিল জগতের স্রষ্টা সেই শ্রীকৃষ্ণেরই জানিয়া, নিজেকে তাঁহারই দাসভাবে, তাঁহারই নিযুক্ত ঐ সকলের কেবল পাহাড়াদার

বোধে যে অনাসক্ত বিষয়সঙ্গ, উহাতে কোন বন্ধন হয়না। চিত্ত শুদ্ধ হইয়া "শ্রীভগবানের ভজনকেই মুখ্য কর্তব্য জীবনের", এই বোধ জাগিয়া থাকে প্রাণে। শ্রীহরি ও তদীয় ভক্তজনের কৃপায় তোমাদের কর্মজীবনের মধ্যেও উক্তবোধ প্রাণে জাগিয়া থাকিবে যাহার ফলে, কর্মজীবনের অবসরে যখন স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া ভজনেই সম্পূর্ণ রূপে নিযুক্ত থাকিবার সৌভাগ্য পাইবে, অভিলষিত শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিয়া, ইহাই অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস। শাস্ত্র অনুসারে আর ১৩ বৎসর গত হইলে কলির বিদায় পর্বের সূচনা হইয়া উহা পূর্ণতা পাইবে। শ্রীচৈতন্যের অপ্রকটকালের ৫০০ বৎসর পূর্ণ হইলে। কলি অন্তর্হিত হইয়া যাইবে, তাহার সকল প্রভাবের সহিত। তৎস্থলে আসিবে এক জগৎব্যাপী সুমঙ্গলযুগ,—সত্যযুগ হইতে যাহা পরমোত্তম। যখন কলিকৃত 'নামাপরাধ' না থাকায় নামগ্রহণ মাত্রেই প্রেমোদয় হইয়া, সকল জগতে সার্বজনীনভাবে শ্রীগৌরপ্রবর্তিত শ্রীনাম ও প্রেমধর্মের অভ্যুদয় সূচনা আরম্ভ হইবে। সুতরাং তৎকালে তোমাদের ভজন, সর্ববিধ আনুকূল্য প্রাপ্ত হইয়া সহজেই সিদ্ধ হইবে।

বর্তমান এই কলির ....১৩ বৎসর হইতে বিদায়োন্মুখ কলির বিরুদ্ধ প্রভাব দিন দিন বৃদ্ধি হইয়া উঠিবে এতই অধিকরূপে যাহা ধারণার অতীত। তন্মধ্যে খাদ্যসমস্যাও একটি প্রধান। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, এই সময় সভ্যতাহারা মনুষ্য সমাজ—পশুবৎ আচরণ করিয়া বনের পাতালতা খাইয়া জীবনধারণ করিবে। বর্তমানে অন্ততঃ বাঙ্গলাদেশে সর্বাধিক মূল্য দিয়াও অনেক খাদ্যদ্রব্য মিলিতেছেনা। আরও ১২ বৎসরের মধ্যে কী হইতে পারে, এখনই তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে। এই প্রচণ্ড কলির শেষ প্রভাব উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র উপায়—নামাশ্রয়ে অবস্থান করা। নচেৎ সকলকেই কলির জালে পড়িতে হইবে। নামাপরাধ বিষয়ে পূর্বপত্রে ইঙ্গিত করিয়াছি। আশা তৎ বিষয়ে অবহিত আছ তোমরা।

শ্রীশ্রীগৌররায়হরি

শ্রীনবদ্বীপ
১৭/৩/৭৪

গত শীতের শেষদিকে আমার স্বাস্থ্যের অবস্থা সহসা বিশেষ খারাপ হইয়া পড়ে। সেই সময়ে heart-এর দুর্বলতা দেখা দেওয়ায় চিকিৎসক বিশেষ আশঙ্কা প্রকাশ করেন—যাহা পূর্বে কখন দেখা যায় নাই। তদবস্থায় আমার অবর্তমানে শ্রীগৌররায়জীর সেবা ও আশ্রমের পরিচালনা বিষয়ে কিছুটা চিন্তাগ্রস্ত হইয়া পড়ি।

সেই সময় তোমাকে লিখিয়াছিলাম আমার পূর্বপত্রখানা, কিন্তু তাহাতে আমার অসুস্থতার বিষয় কিছু জানাই নাই।

শ্রীগৌররায়জীর অশেষ অচিন্ত্য কৃপা বহুবার বহুক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়াও যে আমাদের বিশ্বাস কোন কোন অবস্থায় বিচলিত হইয়া পড়ে,—ইহাই হয় তাঁহার চরণে অপরাধ। তথাপি তদীয় আশ্রিত-বাৎসল্য গুণে তিনি উহা উপেক্ষা করিয়া, নিজ কৃপা মহিমাই প্রকাশ করেন,—সর্বভাবে।

চিকিৎসকেরা যাহা আশা করিতে পারেন নাই,—বর্তমানে গরম পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে আমি অনেক পরিমাণে সুস্থ বলিয়া মনে করিতেছি নিজেকে। এখন সেই আশু মৃত্যুর আশঙ্কা কাটিয়া গিয়া মনে আশা জাগিতেছে যে—আমার নূতন লিখিত অসম্পূর্ণ গ্রন্থগুলিকে সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারিব এবং আমার নির্বাণোন্মুখ জীবন-প্রদীপে, সহসা যে এই কৃপা-তৈলের সংযোগ ইহা সেই গৌররায়জীর অহৈতুকী অচিন্ত্য করুণারই অপর একটি বিশেষ নির্দশন।

সুতরাং এখন আশ্রমের ভবিষ্যৎ বিষয়ে আমার আর কোন চিন্তা নাই। যথাসময়ে তাঁহারই মঙ্গলময়ী ইচ্ছায় ও প্রেরণায় উহার কোন একটা সুব্যবস্থা হইয়া যাইবে ইহাই মনে হইতেছে,—যাঁহার ইচ্ছার আভাসমাত্রে অনন্তব্রহ্মাণ্ড চালিত হইয়া থাকে। অবশ্য তুমি আমার পূর্বপত্রের উত্তরে যাহা জানাইয়াছ, তাহা যথেষ্ঠ মনে করিয়া, সেজন্য তোমাকে অশেষ আশীর্বাদ জানাইলেও, বর্তমানে এ সম্বন্ধে আমাদের আর কোন চিন্তা বা আলোচনা অনাবশ্যক।

জয় শ্রীগৌররায়হরি

শ্রীনবদ্বীপ
৪/৭/৭৪

শ্রীগুরুপূর্ণিমা

পরমকল্যাণবরেষু—

শ্রীমান কল্যাণ, তোমার ৮/৬/৭৪ তারিখের (Postal date) পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। কিন্তু কলিপ্রভাবকৃত নানা ঝঞ্ঝাট অতিক্রম করিয়া উহার উত্তর দিতে বিশেষ বিলম্ব হওয়ায় দুঃখিত। সেজন্য অন্য কিছু মনে করিবে না।

সংসারের যাহা কিছু কাম্য, তাহা প্রাপ্ত হইয়াও তাহাতে অতৃপ্ত হইয়া, উহার আত্মার বন্ধন স্বরূপ বিবেচনায় যাহারা উহা হইতে মুক্ত হইবার কামনা করে; শ্রীভগবানের সেবা ও তদীয় ভক্তজনের সঙ্গ ও কৃপাকেই যথার্থ মঙ্গল ও সুখময়

জীবন গঠনের প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া যাহাদের স্থির বিশ্বাস;—এই অনিত্য বা মরজগতে তাঁহাদের জীবনই যথার্থ সার্থক। যেহেতু শ্রীভগবানের বিশেষ কৃপা ও মহৎগণের আন্তরিক আশীর্বাদ ভিন্ন কাহারও হৃদয়বীণার বিবেকতন্ত্রী বাজিয়া উঠিতে পারে না—এই প্রকারে। তোমাদের উভয় ভ্রাতার লিখিত পত্রের প্রতি ছত্রে—সেই সুদুর্লভ বিবেকবাণীর সাড়া পাওয়া যায় প্রচুরভাবে। যাহার অনুভবে, অশেষ প্রীতিলাভ করিয়া থাকি আমরাও।

যে ভক্তসেবার মাধ্যমে ভগবৎসেবার প্রকৃষ্ট উপায়—সাংসারিক জীবের প্রকৃত শ্রেয়োলাভের পক্ষে,—সেই ভক্তসেবার নিমিত্ত তোমার আন্তরিক আগ্রহ উৎসাহ ও ত্যাগ, ইহাও কলিকৃত বর্তমান বহির্মুখ জগতের শিক্ষণীয়। তোমার পূর্বপত্রোক্ত এই সাধু সংকল্পের সমাধান জন্য, আশ্রমে অনুষ্ঠিত আগামী জন্মাষ্টমী উৎসবে শ্রীঠাকুরের ভোগরাগের সমুদয় ব্যয় এবার তোমার প্রেরিত চেকের টাকা হইতে নির্বাহ করা হইবে,—যাহা সম্প্রতি কয়েকদিন হইল ব্যাঙ্ক হইতে পাওয়া গিয়াছে। ঐ দিন আশ্রমে কিছু অধিকসংখ্যক গৃহীভক্ত ও নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের সমাগম হয়। তোমাদের ঐহিক ও পারমার্থিক মঙ্গলের উদ্দেশ্য জানাইয়া, সেই ভোগের প্রসাদ সজ্জনগণের মধ্যে বিতরণ করা হইবে, ইহাই আমার অভিপ্রায় রহিয়াছে।

ভক্তপ্রবর ডঃ মণীন্দ্র কুমার সিংহকে লিখিত পত্র—

শ্রীগৌরহরি

পরম মঙ্গলাষ্পদেষু— শ্রীনবদ্বীপ ২১/৩/৬৯

ডাক্তারবাবু, আপনার ১৭/৩ তারিখের লিখিত পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। আপনি সপরিবারে শ্রীধামে আসিতেছেন জানিয়া সুখী হইলাম। তবে আপনি একা আসিলে এই আশ্রমেই কয়েকদিন থাকিবার পক্ষে কোন অসুবিধা হইতনা, অধিকন্তু আপনার মধুর সঙ্গ লাভ আমাদের সকলেরই আনন্দের কারণ হইত। কিন্তু এই আশ্রমে মায়েদের থাকিবার নিয়ম বা ব্যবস্থা না থাকায়, আপনাকে যে, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে থাকিবার ব্যবস্থা করিতে হইতেছে, ইহার জন্য দুঃখিত হইলেও ইহার প্রতিকারেরও কোন ব্যবস্থা পাইতেছিনা। যাহা হউক, সেখানে থাকিবার ব্যবস্থাদি কিরূপ আছে, আমার জানা নাই। যদি তাহাদের কর্তৃপক্ষের সহিত আপনার পরিচয়

থাকে তাহা হইলে সম্ভবতঃ সমস্ত সুব্যবস্থা হইতে পারিবে। সেখানে যদি নিজেদের রন্ধনাদি করিয়া প্রসাদ পাওয়া হয়—তাহাতে বোধ হয় অনেকটা অসুবিধা হইবে, "গোবিন্দ বাড়ীতে" সকালে ৭-৮ টার মধ্যে গিয়া জানাইয়া আসিলে সেখানে ভাল প্রসাদ পাইবার সুবিধা আছে শুনিয়াছি। যাহা হউক এ'বিষয়ে যাহাতে কোন অসুবিধা না ঘটে, তদুপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকিলে ছেলেমেয়েদের ক্লেশ পাইবার সম্ভাবনা। আশা করি শ্রীগৌরধামে যখন প্রাণের আবেগ লইয়া আসিতেছেন—শ্রীধামেশ্বরই আপনাদের সংরক্ষণ করিবেন। যদি সেবাশ্রমে তেমন কোন অসুবিধা বুঝেন, তবে "রামকানাই ধর্ম্মশালা" নামে আর একটা ধর্ম্মশালা এখানে আছে—সেখানে কিরূপ ব্যবস্থা, দেখিতে পারেন। রিক্‌সাওয়ালারা উহা সকলেই চেনে। সাক্ষাতে অপর বিষয় শুনিব ও বলিব।

আপনার পত্রের উত্তর দিতে কয়দিন বিলম্ব হইবার জন্য দুঃখিত। গত মঙ্গলবারে আমার Blood Pressure সহসা বৃদ্ধি পাইয়া ২২০/১১০ হয়। স্থানীয় ডাক্তারদের চিকিৎসায় ২/৩ দিন থাকিবার পর উপস্থিত উহা normal হইয়াছে। এখন একপ্রকার সুস্থই আছি জানিবেন এবং এজন্য কোন চিন্তার কারণ নাই।

আপনাদের আগমনের প্রতীক্ষায় থাকিলাম। আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা জানাইতেছি। ইতি—

শুভার্থী
শ্রীকানুপ্রিয় গোস্বামী

শ্রীশ্রীগৌরহরি

পরমমঙ্গলাষ্পদেষু শ্রীনবদ্বীপ ৬/৮/৬৯

আপনার ২৯/৭ তারিখে পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি, কিন্তু বিশেষ সময়াভাবে উত্তর দিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হওয়ায় দুঃখিত।

শ্রীনাম গ্রহণের সহিত 'স্মরণ'—ইহাই ছিল শ্রীগৌরপ্রকটকালে সকল শ্রীগৌরগণের ভজনরীতি। শ্রীনাম বিযুক্ত বর্তমানের যে স্মরণরীতি ইহা পূর্বাচার্যগণের অনুমোদিত বলিয়া মনে হয় না। শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন, —"নাম সংকীর্ত্তনঽপরিত্যাগেণ স্মরণং কুর্যাৎ।" অর্থাৎ শ্রীনামজপ বা সংকীর্তন পরিত্যাগ না করিয়াই "স্মরণ" করা কর্তব্য।

আপনার ভজনরীতি যাহা জানাইয়াছেন ইহা সম্পূর্ণ ভাবে শাস্ত্র ও পূর্বাচার্যগণের

রীতির অনুমোদিত দেখিয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিলাম। সর্বভাবে শ্রীনামাশ্রয়ে থাকিয়া—এই নিয়মেই ভজন করিয়া যাইলে নিত্যসেবা লাভের অভীষ্ট অবশ্যই পূর্ণ হইবে; যাহা ব্যতীত মনুষ্যজন্মের অপর সমস্ত বৈভব ও কৃতিত্ব—সকলই ক্ষণভঙ্গুর ও কর্মবন্ধনের হেতু। একমাত্র এই ভজন প্রভাবে সমস্ত কর্ম বন্ধনাদি বিমুক্ত করিয়া মুখ্য ফলে শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও তৎ মিলিত তনু শ্রীগৌরকৃষ্ণপদে প্রেমোদয় হইবে। নিত্যসেবাপ্রাপ্তিই যাহার চরম ফল।

আপনি যে যথানিয়মে শ্রীনামের সেবার সহিত রাগানুগাভজনের সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ স্মরণের সুষ্ঠুভাবে অনুশীলন করিতে সমর্থ হইতেছেন,—ইহা আপনার প্রতি শ্রীনামেরই বিশেষ কৃপার নির্দশন বুঝিতে পারিয়া অধিকতর সুখী হইলাম। যেহেতু সাধ্য সাধন যাহা কিছু অন্যস্থান হইতে উহার শিক্ষালাভ হউক বা না হউক শ্রীনামের কৃপায় চালিত হইলে—ভজন পথের যাহার পর যাহা প্রয়োজন সমস্তই যথাকালে ও যথাক্রমে সমুপস্থিত হইয়া থাকে শ্রীনামেরই ব্যবস্থায় ও প্রেরণায় আপনার বিশেষ সৌভাগ্য সেই ভাবেই ভজন চলিতেছে ইহা খুবই আনন্দের কথা। শ্রীগৌররায় চরণে প্রার্থনা করি আপনার ভজন পথ নির্বিঘ্ন থাকিয়া আপনাকে অভীষ্ট স্থানে গমনের সর্বভাবে সহায়তা করুন।

আধুনিক জড়বাদী অনেকেরই ধারণা এই যে, কোন বিষয় মনঃকল্পিত হইয়া উহা স্মরণে, তদ্বিষয় কখন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ছিন্ন কাঁথায় শুইয়া লাখ টাকার স্বপ্ন দেখিলে তাহা কখন সত্য হয়না সেইরূপ যথাবস্থিত দেহে ব্রজের লীলা স্মরণে উহা প্রাপ্তির কী সম্ভাবনা আছে? ইত্যাদি তাহাদের যুক্তি।

অপ্রাকৃত চিন্ময়বস্তু সম্বন্ধে লৌকিক যুক্তি বিচার তর্কের কোনও স্থান থাকিতে পারে না। যেহেতু অপ্রাকৃত বিষয়, মায়িক মন বুদ্ধির অগোচর ও অপরিমেয়। তথাপি কৃপাময় শ্রীভগবান নিজেই নিম্নোক্ত শ্লোকটিতে ইহার মীমাংসা দেখাইয়া দিয়াছেন—

যথা সঙ্কল্পমেদ্বুদ্ধ্যা যথা বা মৎপরঃ পুমান্ ।
ময়ি সত্যে মনো যুঞ্জংস্তথা তৎ সমুপস্থিতে ॥

(ভাগবতে—১১/১৫/২৬)

অর্থাৎ শ্রীভগবান বলিতেছেন—সত্যস্বরূপ যে আমি আমাতে মনের সংযোগ রাখিয়া বুদ্ধি দ্বারা যাহা কিছু সঙ্কল্প (কল্পনা) করা যায় কিম্বা মৎপর হইয়া (অর্থাৎ কেবলই আমার প্রীতি ও সেবার নিমিত্ত—যাহা সঙ্কল্প (স্মরণাদি দ্বারা) করা যায়,—তাহাই লভ্য হইয়া থাকে।

ইহার তাৎপর্য এই যে,—প্রাকৃত মায়িক বিষয় কেবল মায়িক মন বুদ্ধির কল্পনা দ্বারা ভাবনা করিলে তাহা না পাওয়া যাইবারই কথা; কিন্তু চিন্ময় অপ্রাকৃত বিষয়ের

সঙ্কল্পপূর্বক স্মরণ—বিশেষতঃ সত্যস্বরূপ যে শ্রীভগবান—শ্রীকৃষ্ণ—তাঁহাতে চিত্তের সংযোগ করিয়া সত্যস্বরূপের সংযোগহেতু—কল্পনা হইলেও সেই লীলা স্মরণাদি সমস্তই সত্যে পরিণত হইয়া থাকে—ইহা সুনিশ্চয়।

যেমন সাধারণ কোন বৃক্ষতলে কোন বিষয় কামনার সঙ্কল্প লইয়া বসিয়া থাকিলে কোনদিন তাহা পূর্ণ হয়না সত্য; কিন্তু 'কল্পতরু' মূলে বসিয়া যাহা চিন্তা করা হয়, তাহাই যেমন প্রাপ্ত হওয়া যায়,—সেইরূপ মায়িক সঙ্কল্পাদি সমস্তই মিথ্যা হইতে পারিলেও সত্যের সত্যস্বরূপ যিনি সেই শ্রীগোবিন্দের আশ্রয়ে মন, বুদ্ধি, দেহেন্দ্রিয়াদি সমর্পণ করিয়া তদীয় চিন্ময় লীলাদি স্মরণ, ইহা সেই সত্যস্বরূপের সংযোগ মহিমাতেই সত্য হইয়া যায়, ইহা কখনও ব্যর্থ হইতে পারে না।

অতএব এই স্মরণ শ্রীনামের কৃপায় যতই একাগ্র হইয়া গাঢ়তা প্রাপ্ত হইবে, যখন ইহা 'সমাধি' বা ধ্যেয় মাত্র স্ফুরণে পরিণত হইবে, তৎকালেই প্রেমোদয় অবশ্যম্ভাবী। নামাপরাধের সংযোগ না হইলে এই শুভ পরিণতি অনিবার্য্য।

যাহা হউক, আপনি আপনার এই ভজনরীতি যথানিয়মে পরিচালন করিয়া যান। ইহার সর্বোত্তম শুভ ফলোদয় বিশেষভাবে আশা করিতেছি।

আপনার ভক্তিমতী সহধর্মিনীর ভজন আশাকরি শ্রীনামের কৃপায় কুশলেই পরিচালিত হইতেছে।

শ্রীগৌররায়জীর চরণে আপনাদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ জানাইতেছি। অপর সংবাদ এক প্রকার মঙ্গল। ইতি—

শুভার্থী শ্রীকানুপ্রিয় গোস্বামী

পুঃ বিশেষ তাড়াতাড়ি পত্রখানা লিখিত হওয়ায় পড়িবার পক্ষে অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা। একটু স্থিরভাবে দেখিবেন। শ্রীযুক্ত অহীন্দ্রবাবুর পত্র পাইয়া তাহার উত্তর দিয়াছি। আশা করি তিনি উহা পাইয়াছেন।

জয় শ্রীগৌররায়হরি

শ্রীনবদ্বীপ ১৯/৪/৭০

শ্রীনামজপ ও কীর্তনের সময় বিশেষ ভাবে জপকালে শ্রীব্রজলীলা কুঞ্জসেবা যথাসম্ভব স্মরণের অভ্যাস রাখিতে চেষ্টা করিবেন। শ্রীনামের সংযোগে বা পক্ষাচ্ছাদিত হইয়াই স্মরণ পুষ্ট হইয়া থাকে। যেমন পক্ষীর পক্ষাচ্ছাদিত হইয়াই ডিম্ব পুষ্ট হয়। উহার অভাবে ডিম্ব নষ্ট হইয়া যায়। তদ্রূপ স্মরণ অঙ্গই রাগভক্তির

মুখ্য সাধন হইলেও উহার অঙ্গী বা প্রাণদাতা হইতেছেন শ্রীনাম। তাই শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন—"নামসংকীর্ত্তনম্‌পরিত্যাগেণ স্মরণং কুর্যাৎ।" কিন্তু আজকাল অনেকেই শ্রীনামবিহীন স্মরণে"—প্রবৃত্ত হয়েন। ইহা কলিরই প্রভাব।

মুখে শ্রীনামের সহিত বুকে যদি শ্রীনামই এই যুগের সর্বোপরি শ্রেষ্ঠতম অঙ্গী এই বোধ সুদৃঢ় থাকে তাহা হইলে কলির প্রভাব পরাস্ত হয়; এবং নামাপরাধ হইতে শ্রীনামপ্রভুই আশ্রিতকে সর্বভাবে রক্ষা করেন। নামাপরাধ মুক্ত হইবার অথবা মুক্ত থাকিবার ইহাই শ্রেষ্ঠ উপায় এবং শ্রীনামে এতাদৃশ আদরবুদ্ধিই 'নামাশ্রয়'।

অপর যাহা কিছু সাধ্য সাধন ও তৎবিষয়ে জ্ঞাতব্য, শ্রীনামপ্রভু প্রসন্ন থাকিলে তাঁহার কৃপায় উহা জানিতে ও পাইতে কোনও অভাব হয়না।

এ সমস্তই আপনি অবগত আছেন। যত দৃঢ় নামাশ্রয় হইবে, ভজন পথের সকল শ্রেয়ই সমাগত হইবে শ্রীনামের কৃপায় ও নিরঙ্কুশ মহিমায়। শ্রীনাম সর্বনিরপেক্ষ; কাহারও অপেক্ষা করেন না নিজ মুখ্যফল দানে। অপর সমস্ত সাধনাই শ্রীনামের মুখাপেক্ষী। শ্রীনামের সংযোগ ব্যতীত অপর কাহারও কোন ফলদানে সামর্থ্য নাই। যেখানে শ্রীনামকে সমতাবোধে কিম্বা গৌণবোধে যে কোন সাধনভজন,—তাহা কেবল কলির প্রতারণাই জানিতে হইবে। তাহা হইতে সর্বভাবে দূরে থাকা প্রয়োজন।

শ্রীশ্রীগৌরহরি

শ্রীনবদ্বীপ ১৮/৪/৭১

পরমমঙ্গলাস্পদেষু

প্রিয় মণীন্দ্র বাবু, নববর্ষের শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ জানাইতেছি—আপনাকে, আপনার ভক্তিমতী সহধর্মিনীকে ও সন্তানগণকে। আপনার ১৫/৪ তারিখের পত্র পাইয়া এবং আপনারা যে বর্তমান দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যেও শ্রীনামাশ্রয়ে থাকিয়া যথানিয়মে ভজননিষ্ঠা অব্যাহত রাখিতে পারিয়াছেন জানিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিলাম। ইহা একমাত্র শ্রীনামেরই কৃপা বলিয়া মনে করি।

কলিকৃত চরম ও শেষ প্রভাব সারাজগতের উপর বিশেযতঃ ভারতে ও সর্বাধিক বঙ্গদেশে শ্রীগৌরের আবির্ভাব স্থলেই—প্রচণ্ডরূপে দেখা দিয়াছে। অবশ্য ইহার পরেই সকলজগতে পরাশান্তি ও শ্রীগৌর প্রবর্তিত শ্রীনাম ও প্রেমধর্মের উদয় হইয়া কল্পকাল মধ্যে সর্বাপেক্ষা মঙ্গলের দিন সমাগত হইবে—অদূর ভবিষ্যতেই।

তথাপি, এই চরম অশুভ ও চরমশুভের সন্ধিকাল উত্তীর্ণ হওয়া বড়ই কঠিন সমস্যা। এ সময় প্রকৃষ্ট ভজনশীল সাধুগণেরও ভীষণ অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়াই চলিতে হইবে—শ্রীগৌরপ্রবর্তিত শ্রীহরিনামেরই অচিন্ত্য শক্তির উপর নির্ভর করিয়া।

আসল সুবর্ণ না হইলে মেকীসোনা যেমন অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যায়, সেইরূপ এই যুগসন্ধিকালে,—একনিষ্ঠ ও প্রকৃষ্ঠ সাধন না হইলে—এই কলিকৃত ঘোরতর দুর্দিনের ও উৎপাতের মধ্যে—কাহারও সত্তা বজায় রাখা সম্ভব হইবেনা। এখন সকল জগতই সম্ভাব্য ধ্বংসের মুখে। এ'সময় ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দের চিন্তা নিরর্থক। সমষ্টির বিনাশে, ব্যষ্টি রক্ষিত হইতে পারেনা। এই হেতু এখন প্রকৃষ্ট ভজননিষ্ঠ ব্যক্তিকে নিজের উদ্ধারের জন্য নহে—কলির আক্রমণ ও তাহার মূল কারণ—জীবের বহির্মুখতা ঘুচাইয়া—জগতের পরমাশান্তি ও সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম সম্পদ—শ্রীনামপ্রেমময় নবযুগের সত্বর আবির্ভাবের জন্য একান্তভাবে প্রার্থনা করাই প্রথম প্রয়োজন হইবে।

আপনাদের ভজন নিষ্ঠা অবিচলিত আছে যাঁহার কৃপায়—সেই শ্রীনামপ্রভুর চরণে—সমষ্টি জীবের কল্যাণ ও সম্ভাব্য ধ্বংস হইতে জগৎ রক্ষার জন্য আন্তরিক প্রার্থনা করিবার প্রয়োজন হইবে নিজের মঙ্গল কামনা হইতে অধিকরূপে। সংখ্যায় অত্যল্প হইলেও—একান্ত ভক্তগণের প্রার্থনা শ্রীভগবান চিরদিনই অনুমোদন করিয়া থাকেন—তাঁহার ইচ্ছা যাহাই থাকুক—তাহার প্রতিকূল হইলেও।

সাংসারিক বিষয়ে 'স্বপ্ন' মিথ্যারই দৃষ্টান্ত। "স্বপ্নবৎ মিথ্যা" বলা হয়। কিন্তু শ্রীভগবৎসম্বন্ধীয় ও ভজনাদি অপ্রাকৃত বিষয়ের স্বপ্ন—ইহা পরম সত্য ও বহুভাগ্য ও কৃপাসাপেক্ষ বলিয়া শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন। স্বপ্নে শ্রীরাধামদন মোহনের প্রসাদ পাওয়ার অর্থই তাঁহার প্রসাদ বা কৃপালাভে ধন্যাতিধন্য হওয়া। তদীয় এই কৃপা ও করুণা নির্দশন যখন পাইয়াছেন,—উৎসাহ ও অধিকতর নিষ্ঠার সহিত ভজনপথে অগ্রসর হইতে থাকুন আপনারা—আপনাদের সাধনায় জগতের মঙ্গল হইবে অবশ্যই।

বর্তমান অবাঞ্ছিত ও চরম কলিগ্রস্ত জগতের অবস্থার মধ্যে আর প্রবেশ করিবার মোটেই ইচ্ছা ছিলনা—জীবনের এই শেষ বয়সে। শারীরিক অবস্থাও আমার ইচ্ছার অনুকূল হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু কেন জানিনা শ্রীগৌররায়জী আবার মরণোন্মুখকে জীয়াইয়া তুলিলেন। তাঁহার ইচ্ছা অচিন্ত্য কিছুই বুঝিতে পারিনা আমরা। তবে যাহাই করুন তিনি সমস্তই মঙ্গলপ্রদ—এই পর্যন্ত বলা যায়। পুনরায় শ্রীগৌরচরণে আপনাদের ভজনকুশলের জন্য প্রার্থনা জানাইতেছি। আপনার সহধর্মিনীর শ্রীনাম ও ভজন নিষ্ঠা পরম সৌভাগ্যের পরিচায়ক। পুনরায় আপনাদের সকলকে আশীর্বাদ জানাইতেছি। আমার ভ্রাতা শ্রীমান রমানাথ আপনার সহিত শীঘ্রই সাক্ষাৎ করিবার কথা আছে। তাহার নিকট হইতে অপর সমস্ত সংবাদ অবগত হইতে পারিবেন।

ইতি শুভার্থী শ্রীকানুপ্রিয় গোস্বামী

পুঃ শ্রীযুক্ত অহীন্দ্রবাবুকেও পৃথক পত্র দিলাম।

শ্রীশ্রীগৌরহরি

পরমমঙ্গলাস্পদেষু শ্রীনবদ্বীপ ৭/১০/৭১

প্রিয় মণীন্দ্রবাবু, বিজয়ার শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ জানাইতেছি—আপনাকে আপনার শ্রীনামপরায়ণা সহধর্ম্মিনীকে ও পুত্রকন্যাদিসহ পরিবারবর্গকে। আপনার পূর্বপত্র যথা সময়ে পাইয়াছি এবং আশীর্বাদের সহিত উহার প্রাপ্তি সংবাদ আপনাকে জানাইবার জন্য শ্রীমান রমানাথকে লিখিয়াছিলাম। আশা করি তাহাদের নিকট হইতে ঐ সংবাদ জানিয়া থাকিবেন। আপনারা উভয়ে শ্রীশ্রীগৌররায়হরি ও শ্রীকিশোরগোপালজীর দর্শনে গিয়াছিলেন ও দর্শনে পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন জানিয়া সুখী হইলাম। জীবাত্মার প্রসন্নতা বা পরিতৃপ্তিই ভক্তির ফল। দেহেন্দ্রিয়ের ক্ষণিক তুষ্টি ও পুষ্টি ইহাই অনাত্ম বিষয় ভোগের ফল। আত্মার পরিতৃপ্তিই যথার্থ সুখ; কিন্তু অনাদি কাল হইতেই সেই প্রকৃষ্ট সুখের সহিত সংযোগ ও সন্ধান হারা জীবের পক্ষে—অনাত্ম বিষয় ভোগ হইতে প্রাপ্ত দুঃখের ক্ষণিক নিবৃত্তিকেই 'সুখ' বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। প্রকৃষ্ট সুখের মুখ কখন হরিবহির্ম্মুখ জীবের দেখা না থাকায় সংসারের স্বধর্ম—নিরন্তর ত্রিতাপরূপ দুঃখভোগ করিয়াও তন্মধ্যে কর্মফল লভ্য উহার সাময়িক প্রতিকার বা নিবৃত্তিকেই 'সুখ' বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে—'দুঃখ' তাহার উপর দুঃখনিবৃত্তি ও তাহার উপর সুখপ্রাপ্তির যে সুখ একমাত্র চিদবস্তু বা আত্মবস্তুরই ধর্ম, উহা তদ্বিপরীত অনাত্ম বা জড় বস্তুর ধর্ম নহে। সুতরাং দুঃখময় জড়বিষয় হইতে উহার সাময়িক কিঞ্চিৎ নিবৃত্তিলাভকেই গৃহমেধী জীব সাধারণের 'সুখ' বলিয়া বোধ হয়। তাই শ্রীভাগবতে উক্ত হইয়াছে "কুর্ব্বন দুঃখ প্রতিকারঃ সুখবৎ মন্যতে গৃহী।" তদীয় চিদানন্দময় জগৎ বা রাজ্যসহ শ্রীভগবান, চিন্ময়বস্তু; জীব ও অণুচিদবস্তু; উভয়ের মধ্যে সংযোগ সূত্র 'ভক্তি'ও চিন্ময়ী বা আত্মবস্তু। নির্মল নির্বাধ নিত্যসুখ—যাহা, তদ্‌বহির্মুখ জীব, অনাদিকাল হইতেই অন্বেষণ করিয়া—তৎবিরোধী জড় জগতের কোথাও পাইতেছে না। সকল অনাত্ম সম্বন্ধ পরিহার করিয়া—উক্ত ত্রিবিধ আত্ম বা চিদবস্তুর একত্র সন্মিলন হইতেই জীবাত্মার সর্বদুঃখনিবৃত্তি ও পরানন্দের অনুভূতি হইয়া থাকে। সুতরাং প্রকৃষ্ট আনন্দ, ইহা কেবল নির্গুণা ভক্তি রাজ্যেই শ্রীভগবৎ চরণকমলের উৎস হইতেই নিঃসৃত হইয়া থাকে এবং অনাত্ম বা জড় সম্বন্ধ মুক্ত জীবাত্মার পক্ষে

নিত্য আস্বাদনীয় হইয়া থাকে। অন্তরে ভক্তির সূত্রের সংযোগ ব্যতীত—উহার সহিত সংযোগ স্থাপনের অপর কোন উপায় নাই।

আপনারা যে শ্রীগৌররায়জীর দর্শনে আনন্দ পাইয়াছেন—উহা আপনাদের অন্তরে শুদ্ধাভক্তির বিকাশ হেতুই বুঝিতে হইবে। অবশ্য উহা ক্রমশঃ সঞ্চার অনুসারে অল্পাধিক হইতে পারে। কেবল প্রেমোদয়েই উহার পূর্ণতা ঘটিয়া থাকে। তথাপি যে পরিমাণে উহা যাহার অন্তরে সঞ্চারিত,—তাহার পক্ষে সেই পরিমাণে উহা অনুভূত হয়। নচেৎ শ্রীবিগ্রহদর্শনে সাধারণের পক্ষে উহা কেবল ধাতু, দারু, মৃন্ময় বা চিত্রপট মাত্র রূপেই বিবেচিত হইবার কারণ হইয়া থাকে।

উক্ত পরানন্দের সংযোগ ঘটাইবার বর্তমানযুগে পরম উপায় শ্রীনাম সংকীর্তন। এক শ্রীনাম সঙ্কীর্তনের হৃদয়ে আবির্ভাব হইতেই ব্রজের যুগলিত ও নদীয়ার সম্মিলিত—পরতত্ত্ব সীমা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ—অর্থাৎ সাক্ষাৎ নামীর সহিত পরাভক্তি উদয়ে জীবাত্মার পক্ষে পরমানন্দের অধিকারলাভ হইয়া থাকে। যাহা হইতে অধিক সাধ্য—অপর কোন সাধন-কল্পনাও করিতে পারে না। এই কলিযুগের ভাগ্যে শ্রীশ্রীগৌর প্রবর্তিত শ্রীশ্রীনামসংকীর্তন ব্যতীত উহা অপর কোন সাধনেই সাধ্য হয় না।

আপনারা যে একান্তভাবে সেই শ্রীনামের আশ্রয়ে থাকিয়া প্রকৃষ্ট ভজন পথে চালিত হইতেছেন ইহা আপনাদের প্রতি সেই শ্রীগৌররায়হরিরই অহৈতুকী কৃপাবিশেষ মনে করিয়া খুব আনন্দ লাভ করিয়া থাকি। তদীয় চরণতল হইতেই সমস্ত অভীষ্ট পূর্ণ হইতে পারিবে ইহাই বিশ্বাস—আপনাদের পূর্বোক্ত যে নির্দেশ প্রদান করিয়াছি—ইহাও তাঁহারই প্রেরণা জানিবেন। এলোমেলো অনেক কথাই লিখিয়া ফেলিলাম। একটু চিন্তা করিয়া পাঠ করিলে, তাঁহারই প্রেরণায় বুঝিতে পারিবেন—আমি পরিস্কাররূপে বুঝাইতে না পারিলেও শ্রীগৌরচরণে আপনাদের সর্বাঙ্গীন কুশল প্রার্থনা করি। আমার এখন কোন নির্দিষ্ট ঠিকানা না থাকায়, চিঠিপত্র সমস্ত ঠিকমত না পাইবারই সম্ভাবনা। কলিকাতার বাসা হইতেই সকল সংবাদ জানা যাইবে। শ্রীযুক্ত অহীন্দ্রবাবু আশা করি শ্রীগৌর ও তন্নামের কৃপায় কুশলেই আছেন। তাঁহাকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাইবেন।

ইতি শুভার্থী শ্রীকানুপ্রিয় গোস্বামী

শ্রীগৌরহরি

পরমমঙ্গলাস্পদেষু শ্রীনবদ্বীপ ২৭/৩/৭২

প্রিয় মণীন্দ্র বাবু, আপনি আমার স্বাস্থ্যের বিষয় শ্রীমান রমানাথের নিকট প্রায়ই অনুসন্ধান করিয়া থাকেন এবং আমাকে একবার দেখিয়া চিকিৎসাদি বিষয়ে সুব্যবস্থা করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত—এ সংবাদ রমানাথের নিকট হইতে আমি প্রায়ই জানিয়া থাকি। সেজন্য শ্রীশ্রীগৌররায়হরির চরণে আপনার জন্য মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া থাকি। গত কয়েকদিন পূর্বে রমানাথকে লিখিত আপনার পত্র পাইয়াও পরে রমানাথের পত্রে, আপনি আগামী Good Friday (৩১/৩) তারিখে এখানে আসিবার স্থির করিয়াছেন এইরূপ সংবাদ জানিলাম। ইহার জন্য একরাত্রি এখানে থাকিয়া, পরদিন সকালের 1st Train'এ ফিরিয়া যাইবার স্থির করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে আপনার একটি সম্পূর্ণ দিনের ক্ষতিই শুধু নয়,—সেই রাত্রিতে আপনার Chamber'এ সমাগত রোগীদিগের পক্ষেও আপনার সাক্ষাৎ না পাইয়া বিশেষ অসুবিধাভোগের কারণ হইবে এই বিবেচনায় আমি এতদিন যাবৎ আপনাকে আসিয়া আমাকে দেখিয়া যাইবার জন্য জানাইতে পারি নাই। আমার জন্য অন্ততঃ একটি রোগীরও কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হইলে, আমি উহাকেই বিশেষ দুঃখের বিষয় মনে করি। সে যাহাই হউক, আপনি যখন নিজ হইতেই উক্ত ব্যবস্থা স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন, তখন ইহা শ্রীগৌররায়জীউর প্রেরণায় কৃত বলিয়া মনে করিতেছি। তাহা হইলেও আপনাকে ঐদিনও রাত্রিটি এখানে থাকিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিতে হইবে। আমার এখন যিনি চিকিৎসা করেন, সেই Dr.Bhowmik যাহাতে আপনার সহিত ঐদিন পরামর্শ করিতে পারেন, তাহার জন্য পূর্ব হইতেই ব্যবস্থা করিয়া রাখিতে হইবে। তিনি বৈকালে ৪-৬ টার সময় আমাকে দেখিতে আসেন, ইহা ছাড়া তাঁহার সময় হয়না এবং ঐ সময় আমার পক্ষেও সুবিধা হয়। আপনি যখন রাত্রিতে এখানে থাকিবেন তখন বৈকালে ঐ সময় তিনি আসিলে আপনার সহিত পরামর্শ করিবার পক্ষে তাঁহার কোন অসুবিধা হইবে না। বৈকালের train'এ আপনি ফিরিয়া যাইলে সে সুবিধা পাওয়া যাইতনা। যাহা হউক আমি তাঁহাকে বিশেষ ভাবে বলিয়া রাখিব, যাহাতে ঐদিন বৈকালে তিনি অবশ্যই আসিয়া এবং আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া চিকিৎসা বিষয়ে পরামর্শ করিতে পারেন, এ বিষয়ে এখানেই সব স্থির হইয়া থাকিল। আপনার আগমন প্রতীক্ষায় থাকিলাম জানিবেন।

ইহা ব্যতীত এই শ্রীগৌরগঙ্গার প্রসিদ্ধস্থানে সুরধুনী স্নানান্তে শ্রীগৌরদর্শন ও পরে শ্রীগৌররায়হরির চরণে আপনাদের ভজনকুশল কামনা প্রভৃতি আপনাদের অভীষ্ট বিষয়ের নিমিত্ত, আপনি একা বা সস্ত্রীক আসিবেন, যখনই ইহার সুযোগ উপস্থিত হয়। ইহার জন্য আমার অনুমোদনের কোনও আবশ্যক হইবেনা। ইহা সর্বদা আমার অনুমোদিত বিষয়ই জানিবেন। ইহার জন্য পূর্বে আমাকে সংবাদ দিয়াও আসিবার প্রয়োজন হইবেনা। গতবৎসর যেমন সস্ত্রীক আসিয়া ছিলেন, সেইরূপ ভাবে যখনই সুবিধা পান তখনই আসিবেন। কেবল দেবুর এখানে উপস্থিতি সংবাদটা জানিয়া আসিলেই চলিবে—যতদিন দেবু এখানে থাকিবে, শ্রীগৌররায়জীউর সাধারণ প্রসাদান্ন যাহা প্রত্যহ ভোগ হয়, আপনারা তাহাই পাইয়া বৈকালে ৩ টার গাড়ীতে যদি নাও হয়, তাহার পর ২/৩ টা train আছে, যাহাতে আপনারা ৮/৯ টার মধ্যে কলিকাতায় পৌছাইতে পারিবেন। আশ্রমে মেয়েদের পক্ষে রাত্রিতে থাকার নিয়ম না থাকায় আপনার স্ত্রীর পক্ষেও সন্ধ্যার মধ্যে কোন train'এ ফিরিয়া যাইতে পারিলেই সে অসুবিধা থাকিবে না। আপনার Chamber'এ সমাগত রোগীরাও ঐ রাত্রে আপনার সাক্ষাৎ পাইতে পারিবে। সুতরাং উক্ত উদ্দেশ্যে আপনার নবদ্বীপ আসিবার পক্ষে কোনদিকেই কোন অসুবিধা থাকিতেছেনা। সুতরাং উহা না হইলে, সময়াভাবই বুঝিতে হইবে—উক্ত উদ্দেশ্যে আপনাদের পক্ষে নবদ্বীপ আসিবার দরজা সবটাই মুক্ত থাকিল জানিবেন, ইহার জন্য কোনরূপ সংকোচের কারণ থাকিলনা।

তবে আমাকে দেখিবার উদ্দেশ্যে এ'যাত্রায় আপনি একা আসিলেই সুবিধা হয় রাত্রিতে থাকিতে হইবে বলিয়া।

অপর সংবাদ সাক্ষাতে বলিব ও শুনিব। আপনাদের সকলকে আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা জানাইতেছি। আশা করি শ্রীযুক্ত অহীন্দ্রবাবু ভজনকুশলেই আছেন। ইতি—

শুভার্থী শ্রীকানুপ্রিয় গোস্বামী

পুঃ অসুখের জন্য শরীরের ন্যায় মস্তিষ্কের দুর্বলতা বোধ করি, যাহার ফলে চিঠিপত্র ও সরলভাবে লিখিত পারিনা। দীর্ঘ ও জটিল হইয়া পড়ে। সুতরাং পত্রখানা একটু স্থিরভাবে বুঝিয়া পড়িবেন। ইহার সারমর্ম হইতেছে ১) আপনি আগামী Good Friday এর দিন সকালের গাড়ীতে অবশ্য আসিবেন ও রাত্রিতে থাকিয়া পরদিন 1st train এ ফিরিয়া যাইবেন, সমস্ত এই ব্যবস্থা থাকিল। ২) আপনি পরে যখন তীর্থ দর্শনাদির সুযোগ হয় তখনই সস্ত্রীক আসিতে পারিবেন। ইহার জন্য পূর্বে কোনও পত্র দিয়া জানাইবার আবশ্যক হইবেনা। কেবল দেবুর

এখানে থাকার সংবাদটা কলিকাতা হইতে জানিয়া আসিবেন। ৩) আপনার স্ত্রীর পক্ষে যদি এই শুক্রবারেই আসিবার সুবিধা হয় ও পরে আসিবার সুযোগ না হয় তবে তাহাকে সঙ্গে আনিতে পারেন। রাত্রিতে আপনাদের থাকিবার ব্যবস্থা আশ্রমের নিকট রমানাথদের বাড়ীতে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। আর পরে আসিলে কোন অসুবিধা না হইলে তাহাই করিবেন।

শ্রীশ্রীগৌরহরি

শ্রীনবদ্বীপ ২২/৪/৭৩

পরমমঙ্গলাস্পদেষু

নববর্ষের শুভেচ্ছাসহ আশীর্বাদ জানাইতেছি—আপনাকে, আপনার ভক্তিমতী সহধর্মিনীকে, এবং পুত্রকন্যাদি সহ বাড়ীর অপর সকলকে। শ্রীগৌররায় হরির চরণে আজ প্রার্থনা জানাই,—অনিত্য সংসারের মধ্যে সর্বসার সত্য যাহা,—সেই শ্রীহরিভজনের সর্বোত্তম উপায় শ্রীনামপ্রভুর চরণে একান্ত অনুরাগ ও আশ্রয় হউক আপনাদের সকলের।

নববর্ষ উপলক্ষ্যে আপনার ১৭/৪ তারিখের পত্র পাইয়া আনন্দ লাভ করিলাম প্রচুরভাবে। আপনি সর্বোৎকৃষ্ট রাগানুগা ভক্তির ভজন রহস্যের সকল বিষয়ে সম্যক্ সচেতন আছেন—এইজন্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তৎপরিকর বৃন্দাবনের জগৎপূজ্য গোস্বামীগণের প্রকটকালে শ্রীবৃন্দাবনের ভজনশীল বৈষ্ণববৃন্দ—সকলেই যে একমত ও একপথ অবলম্বিত ছিলেন, এবং সেই ভজনের মুখ্য বিষয় ছিল শ্রীনামাশ্রয়তা একথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের নিম্নোক্ত উক্তি হইতেও জানা যায়;

"বৃন্দাবনে বৈসে যত বৈষ্ণবমণ্ডল। কৃষ্ণনামপরায়ণ পরমমঙ্গল ॥"—তাঁহাদিগের ভজনের প্রথম পরিচয় ছিল—নামপরায়ণ অর্থাৎ শ্রীনামকেই পরমাশ্রয়রূপে গ্রহণ করা। যাহা সকল মঙ্গলেরও মঙ্গল। স্মরণাঙ্গ ভজনে শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর ভজনরীতি ছিল আদর্শ। তাঁহার সেই—স্মরণের ও প্রাণরূপে দেখা যায়, শ্রীনাম কীর্তন উহার 'অঙ্গী' রূপে তৎসহ 'নিরন্তর বিদ্যমান; যথা—

"সার্দ্ধ সপ্তপ্রহর যায় স্মরণে-কীর্ত্তনে।" নামকীর্তনসহ স্মরণ। শ্রীনামকীর্তনে যতই অধিক আবেশ জন্মে—যতই অধিক ঘন হইয়া উঠে, স্মরণে ততই অধিক

নিবিষ্টতা আসে। কিন্তু কলিপ্রভাবে; আজিকার তথাকার স্মরণাঙ্গ ভজনে নামকীর্তনের কোন স্থান নাই; বরং উহা স্মরণের প্রতিকূল বিবেচিত হয়।

শ্রীমৎরূপ গোস্বামীপাদের ভজনরীতিতেও দেখা যায়—"রাত্রিদিনে কৃষ্ণসেবা (শ্রীবিগ্রহ অর্চনে ও অবশিষ্ট কাল স্মরণে) চারিদণ্ড শয়নে। নামসঙ্কীর্তনে সেহো নহে কোনদিনে।" অর্থাৎ এমন কী মাত্র চারিদণ্ড বিশ্রামের সময় তাহার মধ্যে চলিয়াছে অবিচ্ছিন্ন অঙ্গী' নাম সঙ্কীর্তন।

'অঙ্গী' হীন যেমন কোনও অঙ্গের বিকাশ সম্ভব হয় না; হইলে উহাকে কাল্পনিক বুঝিতে হইবে। সেইরূপ বর্তমান সময়ে শ্রীনামকে অঙ্গীরূপে আশ্রয় না করিয়া যেখানে যতকিছু ভজনাঙ্গ দৃষ্ট হইবে—তাহাকে কাল্পনিক বলিয়াই বুঝিতে হইবে। শ্রীনামকীর্তনের মাধ্যমেই ও কীর্তনের আবেশের গাঢ়তার মধ্যেই ব্রজলীলার সর্বসার কুঞ্জলীলার স্মরণ সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইবার কথাই জানা যায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলার মধ্যেও। শ্রীবাস অঙ্গনে ভক্তগণ সহ মহাপ্রভুর সঙ্কীর্তন রাস চলিতেছে। কেবল নামকীর্তন ছাড়া আর কিছুই নাই। অথচ তাহার প্রগাঢ় আবেশের মধ্যে সকলেরই শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণ লীলা অর্থাৎ কুঞ্জলীলার প্রত্যক্ষ আস্বাদন;—"প্রভুর আনন্দে পূর্ণ ভাগবতগণ। কৃষ্ণপরিপূর্ণ দেখে সকলভুবন ॥ নিরবধি সভার—আবেশ, নাহি বাহ্য। সঙ্কীর্তন বিনা আর নাহি কোন কার্য্য ॥" (শ্রীচৈতন্য ভাগবতে) নাম সঙ্কীর্তন ছাড়া অপর কিছুই শ্রুত বা দৃষ্ট হইতেছে না। তন্মধ্যে সকলেই—শ্রীকৃষ্ণের মধুর কুঞ্জলীলায় অথবা রাসলীলায় আবিষ্ট। 'অঙ্গী' শ্রীনামের কৃপায় রাগভক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ স্মরণাঙ্গেরও বিকাশ হয় প্রকৃষ্টরূপে। তাই শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ লিখিয়াছেন তদীয় রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা গ্রন্থে—

"অত্র রাগানুগায়াং যন্মুখ্যস্য তস্যাপি স্মরণস্য কীর্ত্তনাধীনত্বমবশ্যংবক্তব্যমেব। কীর্ত্তনস্যৈব এতদ্‌যুগাধিকার ত্বাৎ সর্ব্বভক্তিমার্গেষু সর্ব্বশাস্ত্রৈস্তস্যৈব সর্ব্বোৎকর্ষ প্রতিপাদনাচ্চ।" ইহার সংক্ষেপে অর্থ এই যে,—রাগানুগা ভজনের যাহা মুখ্য অঙ্গ, সেই স্মরণেরও নামকীর্ত্তনাধীনত্ব অবশ্য স্বীকার্য। বর্তমান কলিযুগধর্মরূপে নামকীর্তনেরই একমাত্র অধিকার থাকায়—বর্তমান কলিযুগের সমস্ত ভক্তির সাধনমার্গে সর্বভক্তিশাস্ত্র কর্তৃক শ্রীনামকীর্তনেরই সর্বোৎকর্ষ প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং অঙ্গীকে বর্জন করিয়া কিম্বা অঙ্গীকে অঙ্গসহ সমান মনে করিয়া বর্তমানে সকল সাধন ভজনই বিফল। তাই হরের্নামৈব কেবলম্ শ্লোকের মহাপ্রভুকৃত ব্যাখ্যাই বর্তমান ভজন পথের ধ্রুবতারা। আজীবন সেই শ্রীনামের আশ্রয়ে থাকিলেই সর্বশুভেচ্ছা সুনিশ্চিত। পুনরায় আপনাদের শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ জানাইয়া পত্র এইখানেই শেষ করিতেছি। ইতি—

শুভার্থী শ্রীকানুপ্রিয় গোস্বামী

পুঃ গোকুলের পায়ের অবস্থা এখন প্রায় স্বাভাবিক হইয়া আসিয়াছে। ডাঃ ভৌমিকের চিকিৎসাধীনে থাকিলেও তিনি আপনার ব্যবস্থাপিত প্রায় সমুদয় ঔষধই রাখিয়াছেন। গোকুলের পত্রে সবিশেষ জানিবেন।

শ্রীগৌররায়হরি

শ্রীনবদ্বীপ ২৭/৪/৭৫

পরমমঙ্গলাস্পদেষু—

ডাক্তারবাবু, আপনার কলিকাতা রওনা হইবার পর আপনার ১লা বৈশাখ লিখিত নববর্ষের অভিবাদন পত্র পাইয়া ও উহা পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। আপনি যে বর্তমান এই কলি উৎপীড়িত কালে শ্রীনামাশ্রয়ের মহিমা প্রকৃষ্টরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন ইহা আপনার পত্রের প্রতিছত্রে অভিব্যক্ত হইতে দেখিয়া আপনার ভজন বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম। ইহাও আমার অসুস্থ অবস্থায়—বহুল পরিমাণে শান্তি দায়ক হইয়াছে। বর্তমান সময়ে শ্রীনামকেই সকলভজন সাধনের 'অঙ্গী' ও পরম উপায় জানিয়া যতই শ্রীনামে নিষ্ঠা দৃঢ় হইবে শ্রীনামের কৃপায় ততই ভজনাঙ্গের বিকাশ হইয়া, ভজনকে সার্থক করিয়া তুলিবে। ইহা ছাড়া ত্রিসত্য—নাস্ত্যেব গতিরন্যথা। আপনি একান্তভাবে এই পথ ও এই মত ধরিয়া থাকিবেন—আমি থাকি বা না থাকি। শ্রীনামের কৃপায় আপনার সকল উদ্যম ও প্রচেষ্টাই প্রকৃষ্ট পথে পরিচালিত হইবে। তদ্ভিন্ন অপর সাধারণ ভজনপথের সকল যাত্রীকেই কলিহতজন বলিয়া জানিতে হইবে। "সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞে করে কৃষ্ণ আরাধন। সেই তো সুমেধা—আর কলিহত জন ॥"

শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র বাবুর সহিত ও শ্রীনামের অঙ্গীত্ব ও নামাশ্রয় বিষয়ে আলোচনা করিবেন। তিনি নিজেই শাস্ত্রদর্শী ও উক্ত বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ। সুতরাং তাঁহার ভজন সম্বন্ধেও আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি।

আমার আরোগ্য বিষয়ে আপনি এখনও যেরূপ ব্যাকুল ভাবে চেষ্টা ও চিন্তা করিতেছেন, সেজন্য আপনাকে অশেষ আশীর্বাদ জানাইতেছি। তবে সর্বোপরি এই কথাই বিশেষ রূপে স্মরণ রাখিবেন যে,—আমার জীবন মরণ সমস্তই এখন একমাত্র শ্রীগৌররায়জীর ইচ্ছার অধীন। সুতরাং এ বিষয়ে সকলেই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন।

শ্রীনামের ইচ্ছা হইলে গুরু ও সিদ্ধ প্রণালীও মিলিয়া যাইবে। এ বিষয়ে আমি দেবুকে সমস্ত নির্দেশ দিয়া রাখিয়াছি। ইহার জন্য কোনরূপ ব্যস্ততার প্রয়োজন নাই।

আপনাদের ব্যবস্থা অনুসারে এখনও ঔষধ সেবন চলিতেছে। ভালর মধ্যে এখন Tempareture—৯৬ ॥ মধ্যেই আসিয়াছে। পূর্বে প্রায় সকল সময়ে ৯৮°-৯৯° ॥ থাকিত। অপর অবস্থা একরূপ। অরুচির জন্য দুর্বলতাটা দিন দিন বেশিই হইয়া পড়িতেছে। শ্রীগৌররায়জীর চরণে আপনাদের ভজনের ও অপর সর্বাঙ্গীণ কুশল প্রার্থনা করি। ইতি শুভার্থী

শ্রীকানুপ্রিয় গোস্বামী

॥ শ্রীগৌরহরি ॥

শ্রীগৌররায় গোস্বামীকে লিখিত পত্র—

শ্রীনবদ্বীপ রবিবার

পরম কল্যাণীয়েষু

স্নেহের নিমাই, তোমার পত্র পাইয়া ও তোমার শরীর এক প্রকার ভালই আছে জানিয়া বিশেষ সুখী হইলাম। তোমার সর্দির ধাত। তাহার উপর নানা প্রকার অনিয়ম ও ঠাণ্ডার মধ্যে শরীর অসুস্থ হইবার খুব আশঙ্কা ছিল। কিন্তু শ্রীগৌররায় জীউর কৃপায় তুমি কুশলেই আছ—ইহাই বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। কলিকাতায় নিয়মের মধ্যে থাকিয়াও যে তোমার অসুখ হইত। সর্বভাবে ঠাকুরের কৃপার মহিমা অনুভব করিতে সচেষ্ট হইবে। তুমি good friday 'এর ছুটিতে এখানে আসিতে পারিবে জানিয়া আরও সুখী হইলাম কয়দিন ছুটি পাইবে জানাইও। ঠাকুর সেবার জন্য তোমার টাকার বিষয় আমি যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা সাধারণ বিবেচনার কথা। ভবিষ্যতে যখন তোমাদেরই ঠাকুরের সমস্ত সেবাই করিতে হইবে এবং এখন একভাবে চলিয়া যাইতেছে—তখন বর্তমানের জন্য উহা না দিতে পারিলে তোমার মনে যদি বেদনা লাগে, তাহা হইলে তুমি এ বিষয়ে যেরূপ ভাল বিবেচনা কর তাহাই করিও, ইহাতে আমার কোন অমত নাই। দেবুর Temp সমভাবেই চলিতেছে বলিয়া তোমার বাবা তাহাকে লইয়া মাঘমাসের প্রথমেই নবদ্বীপে আসিবেন লিখিয়াছেন। স্থান পরিবর্তনে উপকার হইবার সম্ভাবনা। আমি তাহাকে আনিবার

জন্য লিখিয়াছি। এখনও দিন ঠিক হয় নাই। আসিলে জানিতে পারিবে। আমার শরীর তেমন কিছু খারাপ হয় নাই। কাজকর্ম চলিয়া যাইবার মত শরীর ঠিকই আছে। তারপর ঠাকুরের যেমন ইচ্ছা। গোকুলও ভাল আছে। এখানে শীত মাঝারী রকম। এখনও তেমন বেশী নহে। মাঝে মাঝে তোমার কুশল সহ বিস্তারিত সংবাদ জানাইবে। আশীর্ব্বাদ জানিবে।

ইতি—আশীর্ব্বাদক
বড় জ্যোঠামহাশয়।

॥ শ্রীগৌরহরি ॥

পরম মঙ্গলাষ্পদেষু— শ্রীনবদ্বীপ ২২/৩/৭৪

স্নেহের নিমাই, তোমার পৌঁছান পত্র পাইবার পর অদ্য তোমার ২৫/৩ তারিখের পত্র পাইলাম। আমার ধারণা ছিল, তোমার বাবা কিম্বা দেবু তোমাকে ইহার মধ্যে অবশ্যই পত্র দিয়াছে। কিন্তু তাহা না হওয়ায়, তোমার চিন্তার কারণ হওয়া স্বাভাবিক। সে যাহা হউক, এখানকার উপস্থিত সমস্ত কুশল। আর সংক্ষিপ্ত সংবাদ হইতেছে— তোমার মা ও সঞ্জয় তাহার ছেলেমেয়ে লইয়া গত ১২/৩ তারিখে কলিকাতায় গিয়াছে। নেপুরা তুমি যাইবার পরেই গিয়াছে। তোমার মা এখানে অনেকটা সুস্থ থাকিলেও, কলিকাতা ছাড়িয়া তাহাদের অন্যত্র থাকিবার ভরসা হয়না; সুতরাং নিরূপায়। তোমার বাবা এখানেই আছে ও একপ্রকার ভালই আছে। সকাল — ১২ টার মধ্যে রমেনের সাহায্যে নীচের ঘরে, রসা ও অন্ন নিজেই করিয়া লইয়া খাইবার ব্যবস্থা চলিতেছে। উপরের ভোগ হইতে ২/৩ টার পূর্ব্বে হয় না। এইজন্য তোমার বাবার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দেবু, আগামীকল্য তাহার ৪/৫ জন বন্ধুসহ ভাজনঘাট বেড়াতেই যাইবে। সোমবার ফিরিবার কথা। পুনরায় আমাকে ও তোমার পা ভাঙ্গা ছোট জ্যেঠাকে কোনরূপে এই কয়দিন চালাইয়া লইতে হইবে। কলিপ্রভাবে মানুষের চারিত্রিক পরিবর্তন সহ যড়্ঋতুর বিপর্য্যয় ঘটিয়েছে। গ্রীষ্ম না পড়িতেই বর্ষা আসিয়া উপস্থিত। গত ৪/৫ দিন মেঘও বৃষ্টি ও মাঝে মাঝে ঝড়ো হওয়া চলিতেছে। কবে বন্ধ হবে কে জানে? অপর সংবাদ একই প্রকার। তোমাদের বাসায় হরিসভা স্থাপিত হইয়া শ্রীহরিকথা আলোচনার

সুযোগ হইয়াছে জানিয়া সুখী হইলাম। বর্ত্তমান কলিকৃত মহা দুর্যোগের প্রতিকার স্বরূপ আন্তরিকভাবে শ্রীনামসঙ্কীর্তন ও হরিকথার শ্রবণাদিই একমাত্র উপায়—যদি উহার মধ্যে যশঃ বা প্রতিষ্ঠাদি লাভের কোন উদ্দেশ্য না থাকে। তোমার বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ব্যানার্জ্জীবাবু ভক্তিধর্ম্ম প্রচার বিষয়ে সুযোগ্য ব্যক্তি বলিয়াই মনে হইতেছে। তাঁহার সহায়তা পাইয়া তোমার যথেষ্ট উপকারই হইবে মনে করি। তিনি আগ্রহ করিয়া গ্রন্থ ক্রয় করিয়াছেন জানিলাম। গ্রন্থগুলি চিন্তার সহিত আদ্যন্ত পাঠ করিতে পারিলেই এই আগ্রহ ফলপ্রসূ হইবে। তোমার গ্রীষ্মাবকাশে এখানে আসা হইলে তিনি সেই সময় আসিলেই সকলদিকে সুবিধা হইবে মনে করি। বর্তমানে নানাকারণে আশ্রমের এলোমেলো অবস্থা চলিতেছে। দেবুও বিশেষ চঞ্চল হইয়া পড়িতেছে। প্রশান্তকে পত্র দিয়াছ জানিলাম। অনুকূল উত্তর পাইলে তাহার সহিত পত্রালাপ চালাইবে, নচেৎ প্রয়োজন নাই। আশা করি বৌমার শরীর সুস্থ আছে এবং স্নিগ্ধার পরীক্ষা ভালভাবেই শেষ হইয়াছে। তোমাদের সকলকে আশীর্বাদ জানাইতেছি।

ইতি আঃ
বড় জ্যেঠামহাশয়

॥ শ্রীগৌরহরি ॥

শ্রীনবদ্বীপ ২৩/৫/৭৪

পরমকল্যাণবরেষু

স্নেহের নিমাই, তোমার ১৮/৫ তারিখের পত্র গতকল্য পাইয়াছি এবং তুমি June মাসের প্রথমেই এখানে ২/১ দিনের জন্যই আসিতে পারিবে জানিয়া সুখী হইলাম এখানে এখন রাত্রিতে পাহাড়ার ভাল ব্যবস্থা থাকায় অরাজকতা ও উৎপাত প্রভৃতি বিশেষ কিছু ঘটে নাই সুতরাং তোমার স্নিগ্ধা ও বৌমাকে লইয়া এখানে আসিয়া কিছুদিন থাকা যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে ভাল হয়। তবে Bus এর ভীড় ও ট্রেনের অভাব প্রভৃতি অন্যান্য কারণে যদি ইহাদের আসিবার পক্ষে অসুবিধা থাকে সে বিষয় তুমি নিজে বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া যাহা করিলে ভাল হয়, সেইরূপ ব্যবস্থা করিবে। যদি সকলকে লইয়া আসাই ভাল মনে কর তাহাই করিও, নচেৎ তোমার একা আসিতে হইলে তোমার অনুপস্থিতি কালে অন্ততঃ ২/৩ দিনের জন্য উহাদের দেখাশুনা করিবার সুব্যবস্থা করিয়া আসিবে। যেভাবেই হউক, তোমার June মাসের প্রথম সপ্তাহের প্রথমদিকে অবশ্যই একবার আসিবার প্রয়োজন। আমি

এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিলাম এই পত্র পাইয়া যদি সময় থাকে তোমাদের বা তোমার আসিবার দিন ও সময়—সম্ভব হইলে জানাইয়া পত্র দিবে। এখানে ও খুব গরম চলিতেছে। তবে বৃষ্টি হইলে কিছু কম হইয়া পুনরায় গরম হয়। তোমার বাবা এখানেই আছে শরীর একপ্রকার ভালই যাইতেছে। গরমের জন্য অসুবিধাবোধ করিলেও, দেবু ভালই আছে শারীরিক। অপর সংবাদ একপ্রকার। তোমরা সকলে আশীর্বাদ জানিবে। ইতি

শুভার্থী বড় জ্যেঠামহাশয়

পুঃ তোমাদের হরিসভা প্রভৃতি অপর সংবাদ সাক্ষাতে শুনিব। Train বন্ধ থাকা প্রভৃতি গোলযোগের জন্য তোমার প্রেরিত M.T.এর টাকা এখনও এখানে আসেনাই। সম্ভবতঃ এই সপ্তাহের মধ্যে আসিতে পারে। Bank এর লোক বলিল।

॥ শ্রীগৌরহরি ॥

পরমকল্যাণবরেষু,— শ্রীনবদ্বীপ ১০/৪/৭৫

স্নেহের নিমাই, ১/৪ তারিখে লিখিত পত্র ৭/৪ তারিখে পাইয়াছি। শ্রীঠাকুরের কৃপায় তোমরা মঙ্গলমত পৌঁছাইয়াছ জানিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। তোমার কলিকাতা হইতে প্রেরিত টাকা পাইয়াছি ও যেরূপ দিতে বলিয়াছ দেওয়া হইয়াছে। আমার শরীরের অবস্থা একই অবস্থায় চলিতেছে। তবে দুর্বলতা কিছু কিছু বাড়িয়া যাইলেও এখন নিয়মিত সকল কাজ বিলম্ব হইলেও শ্রীঠাকুর চালাইয়া লইতেছেন। স্নিগ্ধার গ্রীষ্মের ছুটিতে তোমরা যদি আসিয়া কিছু দিন থাকিতে পার ভালই হয়। অনেক কথা বলিবার আছে মনে করি কিন্তু বলিবার লোক পাইনা। গত ৮/৪ তারিখে সন্ধ্যার পর শ্রীমৎ তিনকড়ি প্রভু সহসা আশ্রমে আমাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। তিনি গোপনে আসিবার চেষ্টা করিলেও সন্ধান জানিয়া সঙ্গে ৫০/৬০ জন লোক আসিয়াছিল। হঠাৎ হৈ হৈ ব্যাপার যাহা হউক তাঁহার সহিত বসিয়া কিছুক্ষণ কথা বলিবার ও শুনিবার অবকাশ পাইয়াছি। বলিলেন, "আপনাকে এখন জগতের মঙ্গলের জন্য অন্ততঃ দশবৎসর থাকিতেই হইবে।" আমি বলিলাম আর থাকিবার ইচ্ছা না হইলেও আপনার আদেশ পালন করিব। অপর সকল কথা ও হইয়াছে। দেবুর নিকট পরে শুনিবে। তোমার বাবা আগামী রবিবার আসিবেন। খুব গরম পড়িয়াছে। Fan না থাকিলে তোমাদের কষ্ট হইবে। এবার শরীরের দুর্বল অবস্থায়

মহাপ্রভু দর্শনে যাওয়া সম্ভব হইবে না। সময়াভাবে ইহাই কলির প্রধান প্রভাব। লেখা কিছুই হইতেছেনা। সর্বদা যথানিয়মে ভজনে নিরত থাকিবে।

ইতি শুভার্থী বড়জ্যেঠামহাশয়।

॥ শ্রীগৌর হরি ॥

পরমকল্যাণবরেষু শ্রীনবদ্বীপ ১৭/৪/৭৫

স্নেহের নিমাই, স্নিগ্ধাকে, বউমাকে ও তোমাকে নববর্ষের শুভেচ্ছার সহিত অশেষ আশীর্বাদ জানাইতেছি। শরীরের অবস্থা প্রায় অচল। আর সেবা পূজা চালাতে পারি মনে হয় না। আহারে অরুচি হওয়ায় দুর্বলতা খুব বেড়ে গেছে। তোমরা স্নিগ্ধার ছুটি হইলে আসিবার চেষ্টা করিও। যদি সে পর্যন্ত শ্রীগৌররায় রাখেন। গ্রন্থাদির কাজ সব বাকী পড়ে থাকল। তোমার বাবা এখানে। পূর্ব্বে একখানা পত্র দিয়াছি পেয়ে থাকবে। আর চিঠি লিখিবার শক্তি নাই। কোনরূপে তোমাদের এই নববর্ষের আশীর্বাদ জানালাম। তোমার বাবা ও দেবুর পত্রে অতঃপর সবিশেষ সংবাদ জানিবে। পুনরায় তোমাদের আশীর্বাদ জানাইতেছি। গ্রন্থানুশীলন ও নিয়মিত ভজনাদি ঠিক রাখিয়া চলিবে।

ইতি আঃ বড়জ্যেঠামহাশয়।

পুঃ তোমার ১৪/৪ তারিখের পত্র পাইয়াছি। তোমার টাকা পাইবার কথা পূর্বপত্রে জানাইয়াছি।

॥ শ্রীগৌরহরি ॥

[শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়কে লিখিত পত্র]

নবদ্বীপ

পরম মঙ্গলাষ্পদেষু ১লা মাঘ, রবিবার (রাত্রি)

আপনার ১১/১/৬১ তারিখের লিখিত পত্র পাইলাম। আমার পূর্বপত্র ও তৎসহ প্রেরিত Book post যথাসময়ে পাইয়াছেন জানিয়া তদ্বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইলাম। আমি আন্তরিকভাবে পূর্ণ সহযোগিতা সম্পন্ন হইলেও তদ্বিষয়ে যে দৈহিক বিশেষ কোন

সহায়তা করিতে পারিতেছিনা, সেজন্য দুঃখিত। তাহা না পারিবার প্রধান কারণ দুইটি। প্রথমটি হইতেছে—অবিশ্বাস্যভাবে সময়াভাব। দ্বিতীয়টি—শারীরিক অসুস্থতা। ঠাকুর সেবাপূজাদি কার্য্যে—আমি ও গোকুল উভয়ে মিলিয়া ভোর ৫ টা হইতে রাত্রি ১০ টা পর্যন্ত—আমাদের কাহারও পক্ষে অপর কোন কার্য্য করিবার জন্য ৫ মিনিটও অবকাশ থাকে না। কোন পত্রাদি লিখিতে বা দেখিতে হইলে, বা গ্রন্থাদি পড়িতে হইলে—রাত্রি দশটা বা সাড়ে দশটার পর যতক্ষণ পারা যায়, উহাই সময়। অবশ্য শরীর সুস্থ থাকা পর্যন্ত প্রায় রাত্রি ১২ টা বা ১টা পর্যন্ত লেখাপড়ার কার্য করিতে সমর্থ হইয়াছি। কিন্তু বর্তমানে অসুস্থতা বশতঃ অধিক রাত্রি জাগরণে অসুবিধাই বোধ করিয়া থাকি। এখন অল্প জ্বর প্রায় সর্ব্বক্ষণই আছে। তাঁহার উপর Blood Pressure ও heart এর ও গোলযোগ। ডাক্তার দেখাইয়াছি শেষের দুইটি পীড়া বিষয়ে কিছুটা উপকার পাওয়া গিয়াছি। কিন্তু ডাক্তার আমাকে বিশ্রাম লইতে ও যেরূপ নিয়মে ঔষধ পথ্যাদি ব্যবহার করিতে বলেন,—তাহা আমার নিত্য নিয়মিত কাজ চালাইয়া—তদবস্থায় সম্ভব হয় না বলিয়া উপযুক্ত চিকিৎসাদিরও কোন ব্যবস্থা হয় না। তথাপি ভালর মধ্যে ইহাই যে শ্রীগৌররায়জীর অশেষ কৃপায় এই অসুস্থতার মধ্যে একদিনের জন্য আমাকে সেবাদির কার্য্য ত্যাগ করিয়া শয্যাশায়ী অবস্থায় থাকিতে হয় নাই। উক্ত কারণে আমার নিজের গ্রন্থাদি লেখার কার্য্যে কিছুমাত্র অগ্রসর না হইলেও, সেবার কার্য্য যে বন্ধ হয় নাই—ইহাই আমার পক্ষে এখন আনন্দের বিষয়। এখন আমার বাঁচা বা মরা—সমস্ত ভার ঠাকুরের উপরই সম্পূর্ণ সমর্পণ করিয়া দিয়া—ভৃত্য যেমন প্রভুর আহ্বানের প্রতীক্ষায় উৎকর্ণ হইয়া থাকে—সেইরূপ তদীয় আহ্বান কালের অপেক্ষা করিয়াই রহিয়াছি। "কালমেব প্রতীক্ষেয়ং নিদেশং ভৃতকো যথা।"

সে যাহা হউক, যেভাবে আপনি আপনার এই গ্রন্থখানি আমাকে দেখিয়া দিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়া পত্র দিয়াছেন, ইচ্ছা থাকিলেও উক্ত কারণে আমি যে ঠিক সেরূপভাবে —এই কার্যে সহযোগিতা করিতে পারিতেছিনা সেজন্য বিশেষ দুঃখানুভব করিতেছি। অবশ্য আপনার লিখিত অপর যে কোন গ্রন্থাদি বিষয়ে,—কাহারও সাহায্যের যে কোনই অবকাশ নাই ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য। সুতরাং, আমার পক্ষে ইহা চিন্তা করিতেই পারা যায় না। তবে বর্তমান এই গ্রন্থখানি আমাদের বংশ সম্বন্ধে হওয়ায়, তৎবিষয়ে হয়তো কিছু কিছু Suggestion দেওয়া যাইতে পারে—সহযোগিতার কথা লিখিলাম। নচেৎ আপনার অন্য কোন গ্রন্থ সম্বন্ধে মুদ্রিত হইবার পূর্বে উহা দেখিবার আমার কোন প্রয়োজন হইতে পারেনা—ইহা আমার ধারণার অতীত। এই কারণে কেবল এই গ্রন্থখানি প্রেসে দিবার পূর্ব্বে একবার

দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া আপনাকে জানাইয়াছিলাম। কিন্তু, একসঙ্গে বহু পত্রিকাদির সম্পাদন ও গ্রন্থাদি প্রণয়ন কার্যে পূর্বে আপনাকে ব্যস্ততার সহিত নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছে বলিয়া সেই অভ্যাসবশতঃ আপনি যে এই গ্রন্থখানির প্রকাশ বিষয়ে দ্রুততা অবলম্বন করিয়াছেন তাহাও বুঝিতে পারিতেছি। আবার খুব মৃদুগতিতে কার্য্যকরাই আমার স্বভাব। এইজন্য আমার দ্বারা খুব অল্পকাজই সাধিত হয়। তবে এই গ্রন্থখানির সমগ্র পাণ্ডুলিপি যদি আগে প্রস্তুত করিয়া ও উহা ২/৩ বার ভালরূপে ও স্থিরভাবে দেখিয়া প্রেসে দেওয়া হইত, তাহা হইলে বর্তমান অবস্থায় আমার পক্ষে উহা ভাল করিয়া দেখিবার সুবিধা হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু এখন তাড়াতাড়ি করিয়া আমার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব হইতেছেনা। অতএব উক্ত গ্রন্থের প্রুফ বা কপি যাহা তাড়াতাড়ি দেখিয়া পাঠাইবার প্রয়োজন সেরূপ কিছু আমার আমার নিকট না পাঠাইয়া—যেমন যেমন ছাপা হইবে উহার ফাইল একখানা পাঠাইয়া দিবেন। যদি উহাতে সামান্য সংযোগ বিয়োগ করিবার থাকে, আপনাকে জানাইলে, —গ্রন্থের শেষে একটা শুদ্ধিপত্রের মত কিছু ছাপাইয়া তাহাতেই উহার উল্লেখ করিলেই চলিতে পারিবে। যখন আপনার লেখা তখন উহা নির্ভুলভাবেই সম্পন্ন হইবে ইহাই আমার বিশ্বাস। ত'বে যদি জরুরী কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে, আমাকে পত্র দ্বারা জানাইলে,— আমার জানা থাকিলে উহার প্রত্যুত্তর শীঘ্র দিতে চেষ্টা করিব।

আপনার অন্যগ্রন্থ কিম্বা শ্রীদেবকীনন্দনকৃত বৈষ্ণব বন্দনা বা তাহার সমালোচনা প্রভৃতি আমার দেখিবার কোন প্রয়োজন হইবেনা। তদ্বিষয়ে আপনি যাহা কিছু লিখিবেন,—তাহাই সমীচীন ও সুসিদ্ধান্তপূর্ণ হইবে, ইহাই আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস। সুতরাং ঐরূপ গ্রন্থ ছাপা হইলে তাহাই একখানা আমার নিকট পাঠাইলেই সুখী হইব। অবশ্য ইহার মধ্যে যে পাঠাইয়াছেন Proof টা তাহা পাইলে দেখিয়া আপনার নিকট পাঠাইতে চেষ্টা করিব। ইহার পর হইতে কেবল ছাপা ফাইলই এক কপি করিয়া পাঠাইলেই চলিবে। আপনার পত্রে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি যাহা যাহা লিখিয়াছেন,—আপনার প্রদত্ত সংখ্যা অনুসারে নিম্নে সেই বিষয়গুলি যথাক্রমে জানাইতেছি।

(১) গ্রন্থের নাম সম্বন্ধে—বিশেষ পরিবর্তন না করিয়া কেবল 'চিত্র' কথাটি ও তারকার পূর্বে 'শ্রী' টি উঠাইয়া দিয়া,—'বিশিষ্ট তারকাত্রয়',—লিখিলেই সবদিক ঠিক হইয়া যাইবে। গ্রন্থ মধ্যে 'চিত্র' বিষয়ে সামান্যই উল্লেখ আছে। তাহা উঠাইয়া দিলে ক্ষতি হইবেনা। 'তারকা' বিষয়ে অনেক কথাই আছে। এইহেতু নামে 'তারকাত্রয়' কথাটি থাকা প্রয়োজন। 'শ্রী' শব্দ বাদ দিলেও 'চৈতন্য চন্দ্রোদয়ে" এই কথার পূর্বে যখন দুইটি 'শ্রী' আছে—তাহাতেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

(২) "বন্দে অন্নিত্যমিদ্ধান"—ইত্যাদি শ্লোক দেওয়া ঠিকই হইয়াছে। কেবল তন্মধ্যে উক্ত "চৈতন্যচন্দ্রে" এবং "তারকাখ্যান্"—এই দুইটি কথা আর একটু বড় Type এ হইলে ভাল হয়।

(৩) ২য় ফর্ম্মা যতটুকু দেখিতে পারিয়াছি তাহাতে সংশোধনের বিশেষ কিছু নাই। কেবল ২২ পৃষ্ঠায় ৩ লাইনে 'মঞ্জরীভাবানুরূপ সিদ্ধ প্রণালী' এই কথাটি একটু বড় Type হইলে ভাল হইত মনে করি। তবে ২৪ পৃষ্ঠায় "যদুনাথ প্রাণবল্লভের নিয়মিত সেবায় নিযুক্ত ছিলেন" "যদু নাথের অপ্রকটের পর কানুঠাকুর প্রাণবল্লভকে খড়দহে লইয়া আসেন।"—এই কথাগুলি আপনি কিভাবে জানিয়াছেন তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। পূর্বে যদুনাথের নাম পর্যন্ত আমাদের কাহারও জানা ছিলনা। বৈদ্যকুলপঞ্জিকায়, উহা সর্ব্ব প্রথম দেখিয়া কানুতত্ত্ব নির্ণয়ের কেবল বংশলতার সহিত উহা সংযোগ করিয়া দেওয়া হয়। তদ্ভিন্ন 'যদুনাথ' সম্বন্ধে কোন কথা কানুতত্ত্ব নির্ণয়ে বা অপর কোন গ্রন্থে দৃষ্ট হয়না। এমত অবস্থায় আপনি যদি কোন বিশেষ প্রমাণ পাইয়া উহা লিখিয়া থাকেন তাহা আপনার গবেষণার সুফল বলিতে হইবে। এবং তাহা জানিতে পারিলে সুখী হইব। তবে যদি বিনা প্রমাণে কেবল কাহারও মনঃকল্পিতও কথার উপর নির্ভর করিয়া উহা লিখিয়া থাকেন তবে এইরূপ অপ্রামাণ্য বিষয়ের সংযোগ দ্বারা গ্রন্থের গৌরব হ্রাস করা হইবে। মনে হয়। 'জনশ্রুতি' প্রমাণরূপে গ্রাহ্য হইলেও, উহা বহুজনের কথিত ও শ্রুত বিষয় হওয়া চাই। ২/১ জনের কথাকে কল্পনা মাত্র জানিয়া উহা বর্জন করাই আবশ্যক। এ বিষয়ে পূর্বে আপনাকে জানাইয়াছিলাম। যাহা হউক এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য জানিবার অপেক্ষায় রহিলাম।

(৪) কপিতে **প্রভুপাদ লিখিত কতিপয় পত্রাবলী** (৬), (৭), (৯), (১১), (১৬), (২৭) পৃষ্ঠা দেখিয়া তদ্বিষয়ে সংযোগাদি যেমন করিতে হয় করিবেন। কেবল উহাতে একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় লিখিতে ভুল হইয়াছে, তাহা জানাইতেছি। শ্রীঠাকুর কানাইপ্রভুর সিদ্ধ নামের সহিত "কেলিমঞ্জরী বা রসকেলি মঞ্জরী'—এইরূপ লিখিত হইয়াছে উহা পরিবর্তন করিয়া সর্বত্রই কেবল 'রসকেলি মঞ্জরী' বলিয়াই লিখিতে হইবে। 'কেলিমঞ্জরী' লেখায় ভুল হইবে। ইহা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

(৫) ১ম ফর্মার ১২ পৃষ্ঠার foot note এ ডাঃ নাথ সম্পাদিত চরিতামৃতে কংসারি সেনকে সদাশিবের পিতা বলিয়া উল্লেখ বিষয়টির সংযোগ করিয়া দিবেন। আমিও ঐ স্থানে ছাপা ফর্মার পাশে লিখিয়া দিলাম।

(৬) শ্রীকৃষ্ণকমল গোস্বামীপ্রভুর নামেই যেন গ্রন্থখানি উৎসর্গ করা হয়। এই

গ্রন্থের মধ্যে কোথাও কৃষ্ণকমলের লিখিত গান বা নিত্যগোপাল প্রভুর লিখিত চরিতাদি কোন বিষয়ের সংযোগ অনাবশ্যক। ইহা কেবল 'তারকাত্রয়েরই' বিষয়ের গ্রন্থ, ইহাই মনে রাখিতে হইবে। গ্রন্থ সর্বসাধারণের আদরণীয় হয় ইহাই বাঞ্ছনীয়। তবে উৎসর্গপত্রে কৃষ্ণকমলের গুণাবলী ও রচিত গ্রন্থাদির খ্যাতি প্রভৃতি বিষয়ে যেরূপ ভাল ও প্রয়োজন বুঝিবেন তাহার উল্লেখ করিতে পারেন। গ্রন্থমধ্যে যেখানে তাঁহার নামের উল্লেখ আছে তাহার সহিত তাঁহার রচিত গ্রন্থ কয়খানির নামও সংযোগ করা যাইতে পারে।

(৭) গ্রন্থের ভূমিকা আপনার বিশেষ ভাবে পরিচিত কোন খ্যাতনামা বৈষ্ণব ধর্মে আস্থাবান ব্যক্তির দ্বারা লিখিত হওয়াই প্রয়োজন। আমার পরিচিত —এখন আর বিশেষ কেহ নাই—যাঁহাকে আমি বলিতে পারি। কারণ 'out of sight out of mind'—আমি এখন জন সমাজ হইতে দূরে অজ্ঞাত হইয়াই রহিয়াছি। অতএব এ বিষয়ে আপনার প্রভাব দ্বারা যাহা হয় তাহাই করিবেন। তবে যিনি সম্মানের সহিত ভাল করিয়া লিখিবেন, এমন লোকের দ্বারা লিখিত হওয়া চাই। আপনিই নির্বাচন করিয়া সুবিধা হইলে তাঁহার নামটি আমায় জানাইবেন।

(৮) শ্রীদেবকীনন্দনের বৈষ্ণববন্দনার Press copy ও শ্রীপুরুষোত্তম দাস ঠাকুর বিষয়ক প্রবন্ধ Regd ডাকে আমার নিকট পাঠাইয়াছেন জানিলাম। অদ্য রবিবার এইজন্য বোধ হয় আগামীকল্য সোমবারে উহা পাইব। পাইলে ঐ 1st Proofটি যতটুকু পারি দেখিয়া শীঘ্রই পাঠাইব। তবে বর্তমান গ্রন্থের proofবা copy আর আমার নিকট পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। এ বিষয়ে এই পত্রের পূর্বে লিখিয়াছি। কেবল মুদ্রিত ফাইল ১ খানি করিয়া অতঃপর পাঠাইলেই চলিবে। দেবকীনন্দনকৃত বৈষ্ণববন্দনা বা আপনার লিখিত অপর কোন গ্রন্থ ছাপাইবার পূর্বে আমার দেখিবার কোন আবশ্যক হইবে না। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় ও প্রেরণায় ঐ সকল বিষয়ে আপনি যাহাই লিখিবেন তদ্দারাই সত্যের প্রকাশ হইবে ইহাই আমার সুস্থির বিশ্বাস। যাহা হউক এবার দেবকীনন্দনের বন্দনা গ্রন্থ যথাশক্তি কিছু দেখিয়া পরে সময়মত পাঠাইব জানিবেন। অতঃপর এরূপ প্রয়াস অনাবশ্যক। দেবকী নন্দনের বন্দনা শ্রীনিত্যগোপাল প্রভুর নামে উৎসর্গ করিবেন।

(৯) গুরুপ্রণালী বা ঐ বংশধারা সম্বন্ধে আপনার মনে যেরূপভাবেই থাক, উহা অন্তরেই সন্নিবদ্ধ রাখিয়া বাহ্যে লোক ব্যবহার সঙ্গত কার্য্যই করা আবশ্যক। এইজন্য গ্রন্থে প্রকাশিত বংশধারাটি যাহা দিয়াছেন, উহাতে কেবল আপনার গুরুবংশের ধারাটিই মুদ্রিত করিবেন এবং আমাদের যে ধারাটি দেওয়া হইয়াছে—উহা লোকচক্ষে অপ্রাসঙ্গিক বোধ হইবে এবং বংশীয় অপরের নিকট তাঁহাদের ধারার অনুল্লেখ দেখিয়া

অপ্রীতির কারণ-হইবে; এইজন্য উহা উঠাইয়া দিয়া কেবল আপনার গুরুবংশীয় ধারাটিই প্রকাশ করিবেন। গ্রন্থখানির প্রকাশ দ্বারা যাহাতে সকলের প্রীতিকর হয় সেদিকে সর্বভাবে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

(১০) শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর, শ্রীজাহ্নবা মাতাঠাকুরাণীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ বিষয়ে কানুতত্ত্ব নির্ণয়ে যাহা লিখিত হইয়াছে, বাঘনা পাড়ার 'রামাইঠাকুর সম্বন্ধেই উক্ত ঘটনা বলিয়া তাহাদের কোন পুস্তক লিখিত আছে, দেখিয়াছি। 'বীরচন্দ্র চরিত' গ্রন্থখানার আবিস্কার হইলে, উক্ত ঘটনার সত্যতা জানা যাইত। বীরচরিত গ্রন্থ না দেখা পর্যন্ত ঐ ঘটনা ঠাকুর কানাই সম্বন্ধে না লেখাই সমীচীন মনে করি। প্রমাণাভাব বিষয়ের বর্ণনায় লোক উপহাসের সুযোগ দেওয়া হয়।

এই পত্রের সহিত পৃথক Book post ডাকে (unregist) ১ ও ২ ফর্মার সংশোধন করা ফাইল পাঠাইলাম। ইহার প্রাপ্তি সংবাদ পোষ্টকার্ডে ২/১ লাইন লিখিয়া পাঠাইলেই চলিবে। গ্রন্থের 2nd proof যাহা পাঠাইয়াছেন, উহা পাইলেই শীঘ্র মোটামুটি দেখিয়া Regd ডাকে পাঠাইব। বৈষ্ণববন্দনার সমালোচনা পরে অবকাশ মত দেখিয়া পাঠাইব জানিবেন।

ইতি শুভার্থী
শ্রীকানুপ্রিয় গোস্বামী

পূঃ কানুতত্ত্ব নির্ণয়ে 'গুরুপ্রণালী' যাহা বর্ণিত হইয়াছে—উহা যদি আপনার গ্রন্থে উদ্ধৃত হয় তবে কেবল আপনার গুরুপ্রণালীর ধারাটিই দিলেই চলিবে। উহা অসম্পূর্ণ লেখা।

শ্রীগৌরপূর্ণিমার জয় হউক

[ভক্তপ্রবর শ্রীদুলাল মুখার্জীকে লিখিত প্রভুপাদের ভবিষ্যদ্বাণী সমৃদ্ধ পত্র]

"প্রভু কহে—আমি বিশ্বম্ভর নাম ধরি।
নাম সার্থক হয়—যদি প্রেমে বিশ্বভরি ॥

সর্বাবতারী—শ্রীশ্রীগৌরহরির এই ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হইবার দিন সন্নিকটবর্তী। কল্পকাল মধ্যে এই শ্রীগৌর প্রকটিত কলিকালের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে, —কলি তাহার অপূর্ণ প্রভাব প্রদর্শন করাইয়া, অকালে অন্তর্হিত হইলেই, উহার অবশিষ্ট কাল, সারাজগতে সমুদিত হইবে—শ্রীচৈতন্যের 'প্রেমযুগ'—যাহা সত্যযুগজনের পক্ষেও বরণীয় হইবে। জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্বমানব, দেহ-দৈহিক ধর্ম্ম ও তৎসম্বন্ধ ভুলিয়া সমবেত হইবে শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত শ্রীনাম ও প্রেমধর্ম্মের

পতাকাতলে, যাহা সর্ব্বোৎকর্ষ আত্মধর্ম্মরূপে অত্যাদরে গৃহীত হইবে, —প্রত্যেক 'দেহী' বা জীবাত্মাকর্তৃক সর্ব্বাপেক্ষা সৌভাগ্যের সম্পদরূপে। দেহে দেহে ভেদ আছে। আত্মায় আত্মায় কোন ভেদ নাই। সকল জীবাত্মার এক সম্বন্ধ—এক পরিচয়; —পরমাত্মার পরমস্বরূপ শ্রীহরিদাস—শ্রীকৃষ্ণদাস। শাস্ত্রশিরোমণি শ্রীভাগবতোক্ত,—"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং —"—(১১/৫/৩২) শ্লোকে, বর্ত্তমান কলিযুগের মুখ্য উপাস্য ও তৎপ্রবর্তিত শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তনকে তদীয় মুখ্য উপাসনা বলিয়া নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে, অনধিককাল মধ্যেই, সর্ব্বলোক তদীয় কৃপায় "সুমেধা" হইয়া, আগতপ্রায় প্রেমযুগের সেই মুখ্য উপাস্য ও শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনরূপ মুখ্য উপাসনাকে আশ্রয় করিয়া জীবনকে ধন্যাতিধন্য করিতে পারিবেন,—যাহা হইতে আর অধিক লাভ আর কিছুই নাই। ("নহ্যতো পরমো লাভো—" ভাঃ ১১/৫/৩৭)

কলি, যেরূপ দ্রুগতিতে জগতে ঘনান্ধকার সৃজন করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাইতেছে, তাহাতে শ্রীচৈতন্যাপ্রকটের পাঁচশত বর্ষ পূর্ণ হইলেই কলির সম্পূর্ণ নিষ্ক্রমণ ও জগৎব্যাপী প্রেমযুগের অভ্যুত্থান অনুমান করা নিতান্ত কল্পনাপ্রসূত নহে। তবে বিদায়োন্মুখ রুষ্টকলির এই শেষ ও সুতীব্র প্রভাব উত্তীর্ণ হইয়া সেই আগতপ্রায় সুদিনে পৌঁছাইতে হইলে—কেবল 'নামগ্রাহী' না হইয়া একান্তভাবে 'নামাশ্রয়ী' হইয়া অবস্থান করিবার জন্য শাস্ত্র উপদেশ করিয়াছেন। তৎসহ কলিসৃজিত 'নামাপরাধ' হইতে সতর্ক থাকিবার জন্য তদ্বিষয়ে আচার্য্যপাদগণের নিকট হইতে উহা বিশেষভাবে অবগত হওয়া কর্ত্তব্য—সকল নামাশ্রয়ীর পক্ষেই। কলিকৃত দুর্দ্দিনের এই ঘনান্ধকারে ভীত হইবার কারণ নাই। যেহেতু এই অন্ধকারের প্রান্তসীমায় প্রেমযুগের ক্ষীণ অলোকরেখাও দৃষ্টিগোচর হইতেছে—দিক্‌চক্রবালে।

"॥ জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম ॥ "

৮। পরিশিষ্ট

অতঃপর প্রভুপাদের গ্রন্থ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনার অন্তে এই নিবন্ধের সমাপ্তি টানা যেতে পারে। প্রভুর প্রকটকালে তিনটি মাত্র গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল—(১) জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম (২) শ্রীশ্রীনামচিন্তামণি (১ম কিরণ) (৩) শ্রীশ্রীভক্তিরহস্য কণিকা।

পরে শ্রীশ্রীগৌররায়জীউর অচিন্ত্য ও অহৈতুকী কৃপায় প্রভুপাদের অন্তিম ইচ্ছানুসারে সাধুভক্ত ও অনুরাগীবৃন্দের আগ্রহাতিশয্যে ও অনুকূলতায় আরও পাঁচ খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হন। প্রকাশ কাল অনুযায়ী সেগুলোর নাম (১) শ্রীশ্রীনামচিন্তামণি (২য় কিরণ) (২) পথের গান (৩) বৈজয়ন্তী প্রবন্ধমালা (৪) শ্রীশ্রীনামচিন্তামণি (৩য় কিরণ) এবং (৫) শ্রীশ্রীরাগভক্তিরহস্য দীপিকা।

প্রথম তিনটি গ্রন্থসূত্রে ও তৎকালীন ভক্তি সাময়িকী পত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত প্রবন্ধ ও বিভিন্ন হরিসভায় তাঁর পাঠবক্তৃতার মাধ্যমে প্রভুপাদ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে নেন এবং তাঁহার খ্যাতি ভক্ত সমাজে সুদূর প্রসারী হয়।

তৎকালীন ভক্তিসাময়িকীগুলোর মধ্যে (১) সাধনা (২) শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর (৩) সোনার গৌরাঙ্গ (৪) দামোদর (৫) সঙ্কর্ষণ প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। প্রভুপাদের গ্রন্থ ও নিবন্ধগুলো সম্বন্ধে এটুকু দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলা চলে এগুলো পাঠের অন্তে যদি কোন পাঠক ষড়গোস্বামী বা বিশ্বনাথ চক্রবর্তী পাদকৃত আকরগ্রন্থগুলো আস্বাদন করেন তবে রসগ্রহণে কোন বাধা বা অসুবিধা হয়না বা সিদ্ধান্ত গ্রন্থগুলোর দূরূহতত্ত্ব সমূহ বুঝতে সুবিধা হয়।

তাঁর প্রথম গ্রন্থ "জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম" প্রথমে ধারাবাহিক ভাবে প্রবন্ধাকারে শ্যামসুন্দর পত্রিকায় ভাদ্র ১৩৩৮ সাল থেকে প্রকাশিত হয়। পরে ১৩৪০ সালে প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

যে কোন ধর্মীয় সিদ্ধান্ত বা অনুশাসন গুলো প্রধানতঃ মুনি ঋষি ও মহৎগণের সুচিন্তিত দার্শনিক অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে রচিত হয়। একটি ধর্মমতের দার্শনিক ভিত্তি মূলতঃ চারিটি বিষয় নির্ভর (১) বিষয় (২) সম্বন্ধ (৩) প্রয়োজন (সাধ্য) ও (৪) অভিধেয় (সাধন)। এ'জগতের সর্বকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চ দার্শনিক সিদ্ধান্তনির্ভর গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মও এই চারিটি তত্ত্বের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীল জীবপাদের ষট্‌সন্দর্ভ ও ক্রমসন্দর্ভ এর সর্বপ্রধান আকর গ্রন্থ। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃত শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে যা কথঞ্চিৎ সহজভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী প্রভুর "জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম" কে উক্ত আকর গ্রন্থের অর্থপুস্তক বা সংক্ষিপ্তসার ধরা যায়। এর ভাষা প্রাঞ্জল সিদ্ধান্তগুলিও সহজবোধ্য উদাহরণ সহযোগে পরিস্ফুট। গ্রন্থ সকলে প্রভুপাদ প্রদত্ত উদাহরণ গুলি একটি সম্পদ বিশেষ ও মৌলিকতা ও সৌন্দর্যে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী এতে কোন গ্রাম্যতা দোষ নেই—এক কথায় 'অনবদ্য'।

গ্রন্থ ও গ্রন্থকার সম্বন্ধে প্রখ্যাত শতঞ্জীব বৈষ্ণব আচার্য শ্রীমৎ রসিকমোহন বিদ্যাভূষণকৃত ভূমিকালিপিতে এ সকল বিষয় অতি মনোজ্ঞভাবে আলোচিত হয়েছে। এই গ্রন্থে সন্নিবদ্ধ অবতরনিকা প্রবন্ধটি 'বিশ্বশান্তি ও সাম্যবাদ" নামে ১৩৫৭ সালে (ইং ১৯৫৩ সালে) 'সঙ্কর্ষণ' নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। এতে মৌলিক যুক্তিধারা দ্বারা বর্তমান 'কমিউনিজম্' এর ভুল সিদ্ধান্ত গুলি দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরা হয়েছে পরিবর্তে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত ভারতীয় আর্য ঋষিগণ আবিষ্কৃত প্রকৃষ্ট সাম্যবাদ যা তাই "বিশ্বজনীন আত্মধর্ম" রূপে বিজ্ঞাপিত হয়েছে—তা বিশেষ প্রণিধান যোগ্য।

এই গ্রন্থটি প্রভুর অল্পবয়সের লেখা হলেও সিদ্ধান্ত বা ভাষা শৈলীর দিক থেকে পরবর্তী কালে বা সংস্করণে কোনরূপ পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভব করেননি। ভজনেচ্ছু জনমাত্রেরই একটি একটি অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ বলে মনে করি।

প্রভুপাদ তাঁর সারাজীবনব্যাপী কি আচরণে কি উপদেশের ক্ষেত্রে সর্বসময়ে শ্রীনামের কথাই বলেছেন। যে কারণে বিশিষ্ট লেখক বৈষ্ণব ভক্ত ও দার্শনিক সুপণ্ডিত শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদজী বহুজনের উপস্থিতিতে তাঁকে "শ্রীশ্রীনামবিজ্ঞানাচার্য" উপাধিতে ভূষিত করেন। শ্রীনাম তত্ত্বের উপর প্রভুর তিনখানি গ্রন্থই তার অবিসম্বাদিত নিদর্শন।

শ্রীনামের স্বরূপ লক্ষণ বা নাম নামীর অভিন্নত্ব বিষয়ে তাঁর একান্ত মৌলিক গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত সমন্বিত শ্রীশ্রীনামচিন্তামণি (প্রথম কিরণ) গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা আলোড়ন পড়ে যায়। বহু জ্ঞানী, গুণী, মণীষী পণ্ডিত ও ভক্তজন তাঁকে এজন্য অশেষ সাধুবাদ জানান। গ্রন্থশেষে সংযুক্ত কয়েকটি মাত্র অভিমত পত্রই তার প্রমাণ। ১৩৪৯ সালে গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়। "জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম" এবং শ্রীশ্রীনামচিন্তামণি ১ম কিরণই প্রচুর তত্ত্ব ও তথ্য সমন্বিত এই গ্রন্থটি আস্বাদন করার পর পণ্ডিত শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদজীর পারমার্থিক জীবনে একটি পরিবর্তনের সূচনা হয়। তাঁর রচিত

সুমহান গ্রন্থ "শ্রীশ্রীনামচিন্তামণি কিরণ কণিকা" এর ভূমিকায় তাঁর গ্রন্থকে "শ্রীশ্রীনামচিন্তামণি"-র অর্থপুস্তক বলে বর্ণনা করেছেন।

এই গ্রন্থ রচনাকালেই শ্রীশ্রীনামের মহিমা (বা তটস্থ লক্ষণ) বিষয়ে এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে (বর্তমান কলির প্রভাবকৃত নামাপরাধ রূপ ঘোর অনর্থকারিতার মধ্যে আপন ভজন রক্ষার বিষয়ে সাবধান করার জন্য) নামাপরাধ দর্পণ' প্রকাশিত হবে এরূপ পূর্বাভাস দেন। সেখানে শ্রীশ্রীনামসঙ্কীর্তনই একমুখ্য সাধন বলে সেই ভগবান কর্তৃক নির্দেশিত।

কিন্তু একান্ত সময়াভাব, কলিকৃত বাধাপ্রদান পরিশেযে আপন ভজন নিষ্ঠা ও বার্ধক্য জনিত অসুস্থতা নিবন্ধন এই গ্রন্থ পরিকল্পিত সময়ে প্রভুপাদের প্রকটকালে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। তাঁরই নির্দেশমতে পরবর্তীকালে দ্বিতীয় কিরণে নামাপরাধদর্পণ প্রকাশ করে পরে মধুরেণ সমাপয়েৎ রূপে শ্রীশ্রীনাম মহিমাব্যঞ্জক তৃতীয় কিরণ (শ্রীশ্রীভগবন্নাম মাহাত্ম) প্রকাশ করা হয়।

কলির বৈরিতা ও নামাপরাধের প্রবল অনর্থকারিতার বিষয় উপলব্ধি করে এর গুরুত্ব যে অপরিসীম তিনি প্রায়ই তা বলতেন এবং গ্রন্থের অগ্রগতি না হওয়ায় খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন।

শ্রীধাম নবদ্বীপের আশ্রম প্রাঙ্গণে সমাগত ভক্তবৃন্দের মধ্যে প্রতি মঙ্গলবারের হরিসভায় প্রভুপাদ নিয়মিত ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে বিশেষ করে শ্রীনাম সম্বন্ধে সন্ধ্যাকালে এক-দেড় ঘণ্টা আলোচনা করতেন। প্রত্যহের একটুকরা কাগজে বক্তব্য বিষয়ের পয়েন্টস্ (সূত্র বা নির্দিষ্ট বক্তব্যের সার) টুকে রাখতেন—পাঠে বসার আগে তা বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিতেন। আমি মাসে ২/১ বার নবদ্বীপ এসে তা সংগ্রহ করে নিয়ে যেতাম।

এ সময়ে আমি তাঁকে অনুরোধ করতাম—"বড় জ্যেঠা মহাশয়, আপনি 'নামাপরাধ' বিষয়ে পুনরায় ধারাবাহিক আলোচনা করুন (আমি ইতিপূর্বে এ বিষয়ে শুনিনি এ কারণে) এবং পাঠের জন্য আপনি যে পয়েন্টস্ লিখে রাখেন তা একটা ভাল খাতায় একটু বিস্তারিত ভাবে লিখে রাখলে ভবিষ্যতে সময় সুযোগমত আপনি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রচনা করতে ইচ্ছা করলে অনেক সুবিধা হবে।" —তিনি বললেন—'তুমি মন্দ কথা বলনি। এটা আমি আগে ভাবিনি। যা হোক এটা করলে আমি না পারলেও তুমি হয়তো কখনও গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পারবে।" তদবধি তিনি সেরূপ ভাবে খসড়া রচনা রূপে 'নামাপরাধ' বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে নোটস্ রাখেন। তাঁর শেষ রোগশয্যায় অপ্রকটের মাত্র ২/৩ দিন আগে নামাপরাধের ভূমিকা ও ইতিহাস' বিষয়ের শেষাংশ আমাকে মুখে বলেন ও আমি তা লিখে নিই।

তাঁর অপ্রকটের পর শ্রীশ্রীগৌররায়জীউর কৃপা ও বড় জ্যেঠামহাশয়ের আশীর্বাদ নির্ভর করে অনেক পরিশ্রমে "শ্রীশ্রীনামচিন্তামণি (২য় কিরণ)" বা 'নামাপরাধদর্পণ" গ্রন্থ প্রকাশিত হন। গ্রন্থ স্বপ্রকাশ তাই নিজ মহিমায় বিকশিত হয়েছেন এই বিশ্বাস। এই গ্রন্থ প্রকাশকালীন আমার মানসিক অবস্থার বিষয় ও ভগবৎ কৃপা ও শ্রীগুরুকৃপার নিদর্শনের বিষয়, মৎকৃত অধুনা প্রকাশিত "বৈদুর্য্য প্রবন্ধমালা" গ্রন্থে 'গ্রন্থ গ্রন্থণার কাহিনী'তে অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে।

মঙ্গলবারের হরিসভায় এই গ্রন্থ বিষয়ে আলোচনাকালে প্রায়ই নানাবিধ বাধাবিপত্তির সূচনা হতো। হয় কালি পড়ে লণ্ঠনের আলো নিষ্প্রভ হয়ে গেল নয়তো প্রবল ঝড় বৃষ্টিতে শ্রোতারা আসতে না পারায় সভা বন্ধ হয়ে গেল কিংবা হঠাৎ অসুস্থতার ফলে প্রভু আর পাঠেই বসতে পারলেন না। প্রভু বলতেন, "দেখ, আমি কলির বিরুদ্ধে প্রচার করছি বলে কলি আমাকে যেমন ভাবে পারে বাধা দিচ্ছে। কিন্তু আমিও শ্রীশ্রীগৌররায়জীউর বলকে ভরসা করে কলির অস্ত্র নামাপরাধের বিরুদ্ধে প্রচার করবই।"

ইতিপূর্বে আমি তখন দুর্গাপুরে রাজ্যবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে কর্মরত। সেখান থেকে মাঝে মধ্যে নবদ্বীপ আসি শ্রীশ্রীগৌররায়জীউর দর্শন ও প্রভুপাদের স্নেহসান্নিধ্য লাভের লোভে। সে সময় কখনও কখনও মঙ্গলবারের হরিসভার আলোচনা শোনার সৌভাগ্য হয়। একবার রাত্রে শ্রুতবিষয়ের সংক্ষেপ সার লিখে নিয়ে গেলাম। পরের বার আসার সময় তা প্রবন্ধাকারে লিখে নিয়ে এলাম ও বড় জ্যেঠামহাশয় কে পড়ে শোনালাম। সেদিন সভার শেষে তিনি পণ্ডিতজী (শ্রীল কানাইলাল অধিকারী), বাবা ও মণিবাবুকে তাঁর ঘরে ডেকে আমাকে প্রবন্ধটি পড়ে শোনাতে বললেন। পড়া শেষ হ'লে প্রভু বললেন, "দেখুন, কি সুন্দর প্রবন্ধ লিখেছে। ও বৈষ্ণবদর্শন পড়লো কবে? আমরাতো ৫০ বছর ধরে এসব নাড়াচাড়া করছি। সিদ্ধান্তগুলি বেশ প্রাঞ্জলভাবে বুঝিয়েছে।" তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন—"আমার একটা চিন্তা ছিল আমার অসম্পূর্ণ গ্রন্থগুলি বোধ হয় পড়েই থাকবে। এখন মনে হচ্ছে শ্রীশ্রীগৌররায়জীউ একে উপলক্ষ্য করে আমার গ্রন্থগুলি সম্পূর্ণ করাবেন—এবার আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারলাম।" উপস্থিত সকলেই প্রভুর কথা সমর্থন করলেন। আমিতো লজ্জায় ও আনন্দে অধোবদন মনে হ'ল চরিতামৃতের উক্তি, "ভক্ত বাড়াইতে প্রভুর পরম উল্লাস।"

তারপর দুর্গাপুর ফিরে প্রভুর বক্তৃতা (notes) থেকে "মহৎ সঙ্গ প্রসঙ্গ" (নামকরণ প্রভুরই দেওয়া) ক্ষুদ্র গ্রন্থটি সম্পূর্ণ করলাম। প্রভুকে পাণ্ডুলিপি দিলে তিনি শুধু তা সংশোধনই করে দিলেন না—নিজে খরচ দিয়ে গ্রন্থ ছাপিয়ে দিলেন। বললেন,—

'যাও। আজ থেকে তুমি লেখক বা গ্রন্থকর্তা হ'য়ে গেলে।" আমি তাঁকে প্রণাম করতে তিনি আশীর্বাদ করে বললেন, "ভক্তিসিদ্ধান্তের 'তোমার মধ্যে স্ফুরণ হোক।"

"মহৎসঙ্গ প্রসঙ্গ" গ্রন্থটি ক্ষুদ্র হ'লেও এতে সাধুসঙ্গের মহিমা ও সাধুর স্বরূপ লক্ষণ বিষয়ে সুবিন্যস্ত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে—শাস্ত্র প্রমাণাদি সহ। একাধারে ভক্ত ভক্তি ভগবান এই তিনের একত্র সমাবেশে যে 'সাধু'—তদুত্থিত হরিকথা কীর্তন ও সাধকের পক্ষে তৎ শ্রবণের মাধ্যমে নির্গুণা ভাগবতী বৃত্তির সঞ্চার ও যাদৃচ্ছিক মহৎসঙ্গ দুর্লভ হ'লেও অমোঘ ও অব্যর্থ এ সকল নিগূঢ় বিষয় আমরা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করতে পারি।

১৯৫৫/৫৬ সালের কোন সময় প্রভু তাঁর শিষ্যভক্ত পশ্চিবঙ্গ সরকারের পূর্তবিভাগের অতিরিক্ত চীফ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ গুহ মহাশয়ের পাণিহাটীর বাড়িতে কিছু দিন অবস্থান করছিলেন। সেই সময় মণিবাবু শ্রীঅচিন্ত্য গোবিন্দজী নামে গৌড়ীয় মঠের একজন বৈষ্ণব বাবাজীকে দিয়ে বিভিন্ন ভক্তিসাময়িকীতে প্রকাশিত প্রভুর প্রবন্ধগুলির সংকলন প্রকাশের উদ্দেশ্যে প্রেসকপি তৈয়ারী করাচ্ছিলেন—জানিনা কি কারণে সেটা বন্ধ হয়ে গেল। আমি বড় জ্যেঠামহাশয় ও ছোটজ্যেঠা মহাশয়কে দেখতে মাঝে মাঝে কলেজ ছুটি হলে পাণিহাটী যেতাম সপ্তাহে একবার—তখন বিষয়টা আমার নজরে এসেছিল।"

বহু পরে ব্যাবকক্‌সের কন্সট্রাকশনের কাজ ছেড়ে ১৯৬২ সালে দুর্গাপুরে কাজ নিয়ে এলাম—তখন অবসরের নিঃসঙ্গতা আমাকে পেয়ে বসল। শিল্পনগরীর যান্ত্রিক পরিবেশ এবং প্রতিবেশী ও সহকর্মীদের পেশাভিত্তিক সামাজিকতা বিনোদনের অন্তরায় ছিল। তখন হঠাৎ মনে পড়ল প্রভুর গ্রন্থের কথা। একে একে পড়তে লাগলাম গ্রন্থগুলি। সেইসূত্রে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধগুলি সংগ্রহ করে তার প্রেসকপি তৈরী করে; ফাইলবন্দী করে নিয়ে গিয়ে বড় জ্যেঠামহাশয়কে দিলাম। তিনি কিছুটা বিস্মিত হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "এটা কি?" আমি অচিন্ত্য গোবিন্দজীর প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করে পাণ্ডুলিপি তৈরীর কথা বললাম। প্রভু খুশী হয়ে আশীর্বাদ করলেন ও বললেন—'যা' হোক তোমার লেখাগুলি পড়া হ'লো? বুঝতে পেরেছ সব? আমার চলে যাওয়ার পর যদি কখনও সুযোগ আসে তখন এগুলি প্রকাশ করতে পার। পরে ভবিষ্যত গ্রন্থের নামকরণ করলেন, ''বৈজয়ন্তী প্রবন্ধমালা'। নামাপরাধদর্পণ প্রকাশের পর ভক্তানুকূল্যের ফলে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৮১ সালে। প্রবৃত্ত সাধকগণের পক্ষে বা গৌড়ীয় ধর্ম সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু জনের পক্ষে প্রাথমিক পর্যায়ে এই গ্রন্থটির উপযোগিতা অনস্বীকার্য। এতে প্রকাশিত পরপারের পাথেয়, অভক্তের ভগবান,

ভক্তের ভগবান এবং ধর্ম বিষয়ক প্রবন্ধ চারিটি রত্ন বিশেষ।' ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের প্রচলিত ধারণাকেই যেন কত সহজে বদলে দিয়ে নূতন অনুভবের সৃজন করে। অপর একটি প্রবন্ধ পরতত্ত্বসীমা মাত্র বত্রিশ পৃষ্ঠার। এটিকে উপজীব্য করে প্রখ্যাত পণ্ডিত শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদজী তাঁর প্রায় সাতশত পৃষ্ঠার অধিক "পরতত্ত্ব সীমা" গ্রন্থটি রচনা করেন। এই গ্রন্থটিও উক্তসমাজে খুবই সমাদৃত হয়েছে। আমার অনুজ (শ্রীমান কিশোর রায় গোস্বামী) কোন সময়ে বিভিন্ন ভক্তি সাময়িকীতে প্রকাশিত প্রভুর কবিতাগুলি একটা খাতায় সংকলন করে রেখেছিল। একবার শীতকালে প্রভু আশ্রমের রান্নাঘরের সামনে চেয়ারে বসে জপ করছেন, আমি দেবুর লেখা খাতাখানি এনে তাঁকে দেখালাম। তিনি বললেন, "ওগুলো আমার তরুণ বয়সের লেখা—আমার পথ চলার গান।" আমি বললাম, 'বড় জ্যেঠামহাশয়, আপনি এখনও কবিতা লিখতে পারেন?' —'কবিতা যে লেখে সে কি তা ভোলে? একটু চুপ করে থেকে বললেন, যাও, একটা কাগজ কলম নিয়ে এস।' আমি নিয়ে এসে বসলাম। প্রভু চোখ বুজে জপ করতে করতে বলে যেতে লাগলেন—আমি লিখে নিলাম। লেখা শেষ হ'লে বললেন, 'পুরোটা পড়ে শোনাও।' আমি পড়লাম। দেখলাম প্রভুর চোখের কোণে জল চিক্ চিক্ করছে—বললেন, কবিতার নাম লেখ। 'শেষ মিনতি'—এটা আমারও শ্রীশ্রীগৌররায়জীউর চরণে 'শেষ মিনতি'। আর কোন কবিতা নয়। আমার অপ্রকটের পর তোমরা ইচ্ছা করলে এগুলো ছাপাতে পার।"

পরে প্রভুর কবিতার সঙ্গে দেবুর কিছু কবিতাও একসঙ্গে 'পথের গান ও লালসামুকুল' নামে প্রকাশিত হল। বহু পরে প্রভুর আরও পাঁচটি কবিতার সন্ধান পাওয়া যায় প্রভুর পুরাণো খাতায়।

পূর্ব সংস্করণ গুলি শেষ হওয়ায় সম্প্রতি 'ভক্তিকাব্য সংকলন'-এ আমার পিতামহ, প্রভুপাদের অপ্রকাশিত ৫টি কবিতাসহ পথের গান ও শ্রীমান কিশোর রায়ের আরও দুটি কাব্যগ্রন্থ লালসা মুকুল ১ম ও ২য় স্তবক ও লীলামাধুরী সবগুলি একত্রে প্রকাশিত হয়েছে ভক্ত ও রসিক পাঠকবৃন্দের আস্বাদনের নিমিত্ত।

শ্রীনাম মহিমা বিষয়টি সাধু শাস্ত্রমুখে বহুশ্রুত ও সর্বাধিক আলোচ্য বিষয়। তথাপি সেই শ্রীনামমহিমা কথনের ক্ষেত্রে অপর সকল বিষয় ও পদ্ধতি পরিহার করে শ্রীশ্রীগৌরহরির প্রেরণায় তদীয় শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকটিকেই প্রকৃষ্ট নামমহিমা বলে উল্লেখ করে স্বয়ং শ্রীনামীকৃত উল্লিখিত হওয়ায়, তারই ব্যাখ্যাদিরূপ" শ্রীনাম মাহাত্ম্য বা শ্রীশ্রীনামচিন্তামণি ৩য় কিরণ" গ্রন্থটি লিখিত হয়। এটা তাঁর অনন্য সাধারণ মৌলিকতার নিদর্শন। এ'গ্রন্থের অবতরণিকা অংশে প্রকাশিত অনবদ্য প্রবন্ধটি

ইতিপূর্বে শ্রীগৌরাঙ্গ সেবক পত্রিকায় নাম মাহাত্ম্য নামে প্রভুপাদের যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল—তা প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেকার ঘটনা। গ্রন্থশেষে "শ্রীশ্রীকৃষ্ণনামমহিমাকীর্তন" সংকীর্তনটি মদীয় অন্যতম জ্যেষ্ঠতাত শ্রীমৎ গোকুলানন্দ গোস্বামী রচিত। শিক্ষাষ্টক শ্লোকের পদ্য ভাবানুবাদ মদীয় পিতামহ ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী রচিত। সম্পূর্ণ গ্রন্থটি প্রভুপাদের বক্তৃতার নোট্‌স্ ও উজ্জীবন পত্রিকায় একদা প্রকাশিত আমার "ধর্মের ক্রমোৎকর্য ও পরিসীমা" নামক প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত।

বারানসী নিবাসী মহামহোপাধ্যায় ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ এম.এ.ডি. লিট মহোদয় প্রভুপাদের 'ভক্তিরহস্য কণিকা' গ্রন্থ সম্বন্ধে লিখিয়াছে—"আপনার গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছি। ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে সুসম্বদ্ধ বিস্তারিত আলোচনাত্মক একখানা গ্রন্থের নির্মাণ ও প্রকাশন বহুদিন হইতেই ভক্তসমাজ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। জগতের বর্তমান পরিস্থিতিতেও উহার একান্ত অভাব অনুভূত হইতেছিল। শ্রীভগবান আপনাকে নিমিত্ত করিয়া এতদিনে ঐ অভাব দূর করিলেন। গ্রন্থখানা যদিও বঙ্গীয় বৈষ্ণব সাধকের দৃষ্টিকোণ হইতে সংকলিত হইয়াছে—তথাপি ইহাতে ভক্তিতত্ত্বের মুখ্য মুখ্য প্রায় সকল রহস্যই সর্বজন পরিগৃহীত শাস্ত্র ও মহাজন বাক্যের আধারে আলোচিত হইয়াছে বলিয়া ইহা সকল ভক্ত সম্প্রদায়েরই শ্রদ্ধা ও সমাদর আকর্ষণ করিবে। ইহাতে আপনার যে অপূর্ব পাণ্ডিত্য, পরিশ্রম, লিপিকৌশল ও বিবেচনা প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে তাহার জন্য আপনাকে ভূয়োভূয়ঃ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। ভক্তি ও নামমাহাত্ম্য প্রচার করিয়া আপনি যুগোপযোগী জীবসেবা কার্য্যই করিয়াছেন। আশা করি আপনার সুখস্বপ্ন অদূর ভবিষ্যতে কার্য্যে পরিণত হইবে এবং শ্রীভগবৎ-প্রেমের বন্যায় সমগ্র বিশ্ব প্লাবিত হইবে। (ইং ১৮/১/১৯৬০)

গোবর্ধন নিবাসী পণ্ডিত শ্রীমৎ অদ্বৈতদাস বাবাজী মহারাজ, লিখিয়াছিলেন—'আপনার প্রণীত শ্রীশ্রীভক্তিরহস্য কণিকা' আস্বাদন করিয়া বুঝিলাম ইহা কণিকা নহে, কৌস্তভমণি। বাঙ্গলা ভাষায় এমন গ্রন্থ আমি আজ পর্যন্ত কোথাও পাই নাই। উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্বতা প্রভৃতি ইহার সর্বত্র সর্বোৎকর্ষের অনুভাব পাইয়াছি। শ্রীনাম মহিমা বহুজন বর্ণন করিয়াছেন; কিন্তু ইহাতে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে তাহা—'কোহপি অর্নিবাচ্যতম। শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী কৃত বিদগ্ধ মাধবের (১৩৩) তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং—(পূ ১৫/৬৭) 'শ্রব্যাণাং স্বাদসারং—

ইত্যাদি শ্লোক আস্বাদন করিয়া যেরূপ আনন্দমূর্ছায় হৃদয় দ্রব হইয়াছিল—আজ আপনার এই শ্রীগ্রন্থাস্বাদন করিয়া তদ্রূপ উল্লাস ও আনন্দানুভব করিলাম।

প্রীতিগন্ধ শূন্য বজ্রাদপি কঠোর হৃদয়ও আপনার 'শ্রীভক্তিরহস্য কণিকা' আস্বাদে দ্রব হইয়া বিচিত্রগুণ লীলার্ণবে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইবে,—এইতো গ্রন্থের মহিমা!

গ্রন্থাস্বাদনে আমার মত্ততা এখনও নিবৃত্তি হয় নাই। শান্ত হইলে লিখিব আশা করিয়া অনেকদিন চলিয়া গেল। শান্ত হইয়াছে ভাবিয়া এই পত্র লিখিতে বসিলাম। লিখতে গিয়া গ্রন্থমাধুরী আবার পাগল করিয়া তুলিল। কি লিখিতে কি লিখিলাম জানিনা। তাই মনে হইতেছে, আপনার গ্রন্থের মহিমা আমার দ্বারা বর্ণিত হওয়া সম্ভব নহে।"

বিগত দিনে সত্যনিষ্ঠা একান্তীভক্তি, মহত্ত্ব ও উদারতার পরিবেশ যখন বর্তমানের মত ব্যাপকভাবে লোপ পায়নি সেই সময়ে বাংলার বাইরে প্রতিষ্ঠিত স্বনামখ্যাত দুই মহৎ জনের যে গ্রন্থ সম্বন্ধে এমন সহজ ও পরম উপলব্ধির কথা ব্যক্ত হয়েছে কোনরকম পরোক্ষতার আবরণ না রেখে বলি—সেই গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনার কোন ধৃষ্টতা আমার নেই। এটা সম্পূর্ণরূপে পাঠকগণের নিজ আস্বাদনেরই বিষয়।

এই গ্রন্থটি রচনার সূত্রপাত প্রভুর কলিকাতায় অবস্থান কালে এবং সমাপ্তি এই নবদ্বীপ আশ্রমে। এই সময়ে একযোগে গ্রন্থরচনা সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই গ্রন্থের ছাপার কাজ শুরু হওয়ায় একদিকে গ্রন্থলিখন, ছাপার কাজের নির্দেশাদি দান, প্রুফ সংশোধন প্রভৃতি কাজের গুরুদায়িত্ব নিজ দৈনন্দিন সেবা পূজাদির উপর পড়ায় প্রভুকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছিল। রাত্রে প্রসাদ পাওয়ার পর পরের দিন কলকাতায় প্রুফ পাঠানোর প্রয়োজনে প্রুফ সংশোধনে বসে সারারাত্র কোথা দিয়ে অতিবাহিত হয়ে গেছে তা প্রভু টেরও পাননি। প্রত্যূষে গোপাল ভক্ত আশ্রমবাটির দরজা খুলতে গিয়ে দেখেন দোতলার বারান্দায় চেয়ারে বসে লণ্ঠনের আলোয় তখনও প্রুফ দেখছেন। বিস্মিত গোপালদার ডাকে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে প্রভু বলেন—"ও! গোপাল এই হয়ে গেছে—এবার শুতে যাব।" পরে চারদিকে তাকিয়ে অপ্রতিভ-ভাবে হেসে বলেন, 'ও! সকাল হয়ে গেছে—তাহলে আর কি হবে। এবার নিত্যকর্মে লাগি। এমন ঘটনা বেশ ২/৩ দিন হয়েছিল। গ্রন্থে সংযোজিত বেদের বিভাগের তালিকাটি প্রভুর সম্পূর্ণ মৌলিক চিন্তাধারা প্রসূত। বেদের "ত্রয়ী" নামের যথার্থ তাৎপর্য শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণভক্তি ও শ্রীকৃষ্ণভক্ত এই ত্রিতত্ত্বের মধ্যেই সীমাপ্রাপ্ত। এই ত্রিতত্ত্ব স্বতন্ত্ররূপ যখন লীলাপরায়ণ হন তাকেই বলে ব্রজের শ্রীকৃষ্ণ লীলা এবং ত্রিতত্ত্ব যখন একীভূত হয়ে গৌরস্বরূপে অদ্বৈত লীলাময় ব্রহ্মরূপে নবদ্বীপে বিরাজমান থাকেন, তাকেই বলে গৌরলীলা। এই গ্রন্থে শুদ্ধাভক্তিবিষয়ে সুবিস্তৃত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, রাগভক্তি, শ্রীশ্রীনাম মাহাত্ম্য, ও শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর পরতত্ত্বসীমা বিষয়ে প্রভুর সিদ্ধান্ত ও বিশ্লেষণ অনন্য চিন্তাধারা অনুসারী। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর বিষয়ে বহু প্রাচীন 'নারদ পঞ্চরাত্র' থেকে প্রমাণ শ্লোক উদ্ধার

প্রভুপাদের এক বিস্ময়কর অবদান। ষড়্‌গোস্বামী রচিত গ্রন্থাদিতে কোথাও এই প্রমাণ শ্লোক উদ্ধৃত না হওয়ায়—মনে হয় সাক্ষাৎ শাস্ত্রমূর্তি স্বরূপ এই সকল গৌরপরিকর এবং পরবর্তী কালে শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্তী পাদ ও শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি তদানুসারী হওয়ায় তাঁরা যে ইচ্ছাকৃত ভাবেই তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণকারী এই ভজনশীল মহাত্মা যে নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ ও শ্রীশ্রীচৈতন্য চিহ্নিত পুরুষ, তা প্রমাণের জন্য তা করেননি। এই গ্রন্থ এসব নিগূঢ় তত্ত্বের সাক্ষী স্বরূপ।

ভক্তিরহস্য কণিকার পরিশিষ্ট ভাগ—'শ্রীশ্রীরাগভক্তিরহস্য দীপিকা'—এই গ্রন্থটি তাঁর শেষজীবনের একান্ত সাধনলব্ধ বস্তু। একান্ত সময়াভাবের মধ্যে কখনও কখনও সকালে স্নানের পর এবং প্রায় প্রত্যহ সান্ধ্যকীর্তনকালে প্রভু নিজ প্রকোষ্ঠের এককোণে নিবিষ্টভাবে এই গ্রন্থটি রচনা করতে থাকেন। পণ্ডিতজী একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—'প্রভু, সংকীর্তনের এই উচ্চরোলের মধ্যে আপনার লেখার কোন অসুবিধা হয়না?" প্রভু বললেন, "ঠিক উল্টো। কীর্তন না হ'লে আমার লেখায় স্বতঃস্ফূর্ততা আসেনা সংকীর্তন ধ্বনি যত উচ্চ হবে আমার লেখায় অভিনিবেশ ও তত ঘন হবে।" —বাস্তবিকই তাই ছিল।

তাঁর শেষ শয্যার শেষের দিকে একদিন দুপুরে প্রভুকে বললাম, 'বড় জ্যেঠামহাশয়, আপনার রাগভক্তি রহস্য দীপিকার বিষয় কি হবে।' প্রভু ম্লান মুখে বললেন, 'ওটা আর শেষ করা গেলনা।

তবু যতটা লেখা হয়েছে—তার প্রত্যেক অধ্যায় স্বতন্ত্র প্রবন্ধরূপে প্রকাশ করতে পার কোন অসুবিধা হবেনা। —মনে পড়ে গেল একদিন প্রভু লিখছেন বাইরে সান্ধ্যকীর্তন চলছে—আমি তাঁর লেখার টেবিলের কাছে সরু একটা কাঠের আলমারীর গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছি প্রভুর লেখার দিকে তাকিয়ে। হঠাৎ কলম ফেলে দিয়ে একটু বিরক্তভাবে বললেন—'ঘাড়ের কাছে কেউ দাড়িয়ে থাকলে লেখা যায়। যাও কীর্তনে গিয়ে বস।"—আমি অপ্রতিভ হয়ে সরে এসে কীর্তনে বসলাম।

পরে ভক্তবৃন্দ সব প্রণাম ও কুশলাদি সেরে চলে গেলে আমাকে ডাকলেন। বাবাও সেসময় ঘরের মধ্যে ছিলেন। বললেন, 'বুঝতে পারিস? আমি বললাম, 'হ্যাঁ, তবে সব জায়গায় নয়। তিনি বললেন, 'কোনটা বুঝিসনি—আমি আগের কপির (পাতার) ২/১ জায়গায় দেখালাম—উনি বললেন 'এইসব তোর পড়া হয়ে গেছে? কখন পড়লি? আমি বললাম 'আপনি যখন স্নান করতে যান তখন।

বাবার দিকে তাকিয়ে বললেন,—তোমার তো কেউ ঘেঁস দাও না ও কিন্তু লেগে থাকে। তাই অসুবিধা হলেও বোঝাতে হয় বলতে হয়। বলে পরম স্নেহে সুন্দরভাবে বিষয়গুলো বুঝিয়ে দিলেন সহজ করে। সেদিন প্রভুর রাত্রের পূজায় যেতে প্রায় ৪৫ মিঃ দেরী হয়েছিল।

পরে অন্যান্য গ্রন্থের কাজ শেষ হলে একদিন 'রাগভক্তি'র পাণ্ডুলিপি নিয়ে বসলাম। দেখলাম ৭ম উদ্ভাসন পর্যন্ত লেখা সম্পূর্ণ রয়েছে। অষ্টম উদ্ভাসনের কেবল (Heading) শিরোনামটুকু লেখা আছে। আবারও মনে পড়ল—প্রভু একদিন আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন—এ গ্রন্থের ১৮টি উদ্ভাসন হবে। এ'প্রসঙ্গে তিনি গীতার ১৮টি অধ্যায় অষ্টাদশ পুরাণ, কুরুক্ষেত্রের ১৮ দিন ব্যাপী যুদ্ধ প্রভৃতির উল্লেখ করে অষ্টাদশ সংখ্যাটির বৈশিষ্ট্য বুঝিয়েছিলেন। সব এখন আর মনে নেই।

তারপর অনেক ভয়, দ্বিধা, সঙ্কোচ প্রভৃতি কাটিয়ে অষ্টম অধ্যায়ের শিরোনাম ধরে লিখতে আরম্ভ করলাম—প্রভুর বক্তৃতার notes ও অন্যান্য লেখা প্রভৃতির সাহায্য নিয়ে। ধীরে ধীরে একটা ঘোরের মধ্যে দিয়ে লেখার কাজ এগিয়ে চলল। পরে অষ্টম উদ্ভাসন শেষ করে দেখলাম—তা সম্পূর্ণ গ্রন্থের অর্ধেকেরও বেশী। আর লেখার মতও কিছু নেই। খুবই মুস্কিলে পড়া গেল। দুর্গাপুর থেকে নবদ্বীপে এসে পণ্ডিতজীর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার অন্তে ঐ অষ্টম উদ্ভাসনটিকে মোট ৩টি উদ্ভাসনে ভাগ করে মোট দশটি উদ্ভাসন করে গ্রন্থ শেষ করা হল। আঠারো উদ্ভাসনের আর কোন উদ্দেশ্য রইলনা। তা প্রভুপাদের চিন্তাধারার সঙ্গে বিলীন হয়ে গেল।

এই গ্রন্থটিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সুগোপ্য মঞ্জরীভাবের ভজন পদ্ধতি ও আদর্শের দিকে আলোকপাত করা হয়েছে—যে বিষয়ে ইতিপূর্বে শ্রীগোপাল গুরুর' গ্রন্থে নরোত্তম ঠাকুরের স্বাভীষ্ট লালসা'শীর্ষক কবিতায়, রঘুনাথ দাস গোস্বামী পাদের "স্তবকুসুমাঞ্জলী" প্রভৃতি অল্প সংখ্যক গ্রন্থেই গোপনীয়তা হেতু সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে—কারণ ইহা কেবল রাগমার্গের সুযোগ্য গুরুশিষ্য পরম্পরায় প্রাপ্ত ঐশ্বর্য বিশেষ—সর্বসাধারণে আলোচ্য নয়। বর্তমান গ্রন্থ মঞ্জরী ভাবের সাধন পদ্ধতির কোন গুটিকা নয়—এতে উক্ত ভজনের কেবল দার্শনিক দিকটিই তুলে ধরা হয়েছে।

এই গ্রন্থের দশম উদ্ভাসনে শ্রীনাম ও স্বয়ং নামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর অসাধারণ অবদান বৈশিষ্ট্য বিষয়ে যে পাঁচটি দিগদর্শন করা হয়েছে তাকে অনন্য সাধারণ ও অভূতপূর্বই বলা চলে। তাই এই গ্রন্থ বিশেষ প্রকার অনুশীলন ও অনুভববেদ্য বলে মনে হয়।

পূর্বাপর কয়েকটি গ্রন্থের নূতন সংস্করণাদি প্রকাশের পরও, মদীয় অনুজের কৃত "ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি" "ভক্তিকুসুম পরাগ" প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশনা ও 'এক গৌড়ীয় ভক্তের প্রতি এক মহাত্মার পত্র' প্রভৃতির প্রকাশনা শ্রীশ্রীগৌররায়জীউ ও প্রভুপাদ শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামীর কৃপা সাপেক্ষেই সম্ভব হয়েছে বলে মনে করি। ভক্তবৃন্দের শুভেচ্ছা আন্তরিকতা ও আনুকূল্যও এর অপর কারণ। আর তাঁরই কৃপাকরুণার স্পর্শে—"বৈদুর্য্য প্রবন্ধাবলীর" মত ভক্তিগ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনা সম্ভব হয়েছে।

৯। সূচক কীর্তন

শ্রীমৎ সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর সূচক

ভুবনেতে অবতরি সপার্ষদে গৌরহরি
জগভরি বিতরিলা
নাম প্রেমধন।
ধন্য কলিযুগ ধন্য অবতীর্ণ শ্রীচৈতন্য
চরণপরশে ধন্য
এ বিশ্বভূবন ॥
কল্পতরু ভক্তগণ তাঁরা সব মহাজন
জনে জনে শক্তি ধরে
জগৎ তারণ।
শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র বেড়ি তারা সম তাঁরা ঘেরি
প্রভুর আনন্দে করে
নামসঙ্কীর্তন ॥
(শ্রী) সদাশিব, পুরুষোত্তম শ্রীঠাকুর কানাই নাম
এই তিন মহাজন
শ্রীগৌরাঙ্গের গণ।
এইবংশে কতজন প্রসিদ্ধ সাধক হন
সমাজে বিদিত তাঁরা
মহান সজ্জন ॥
এই বংশের শ্রীপাটে নদীয়া ভজন ঘাটে
শ্রীমনোহর প্রভুবর
করিতেন বাস।
সদাশয় সজ্জন পরম ধার্মিক হন
মিষ্টভাষী সরলতা
সুদৃঢ়বিশ্বাস ॥
তাঁর পুত্র গুণমণি বিদ্যা, দয়া, ভক্তিখনি

গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথ
চরিত্র উদার।
বহুগ্রন্থ রচনা করি জগৎ সম্মুখে ধরি
জীবের হিতের লাগি
করিলা প্রচার ॥
আয়ুর্বেদ চিকিৎসাগ্রন্থ স্বদেশ সামাজিক কত
ধর্মগ্রন্থ মীরাবাঈ
রূপ-সনাতন।
আরও কত লেখা তাঁর ভাষা নাই বলিবার
কবিতা ছন্দ যে কত
করেছে লিখন ॥
গরীবের প্রতি হয় দয়ালুতা অতিশয়
দয়াল হাকিম তাই
বলিত সকলে।
সকল ধর্মের লোক করিত যে উপভোগ
মহান আনন্দ সুখ
ধর্মালোচনাকালে ॥
রসরাজ গৌরহরি দর্শনে আনন্দ ভারী
স্থাপন করিলা তাঁরে
কবে পুণ্য দিনে।
'গৌররায়' দিলা নাম নবল কিশোর ঠাম
গোপবেশবেণুকর
হরে মন প্রাণে ॥
রামানন্দ করে দর্শন উজ্জ্বল গৌরবরণ
রসরাজ মহাভাব
দুই একরূপ।
রায়ের ধ্যানের মূর্তি এই তাঁর 'ইষ্ট' স্ফূর্তি
বিশেষ কলিতে এই
গৌরকৃষ্ণ স্বরূপ ॥
দিবানিশি একমনে রহিতেন তাঁর ধ্যানে
নিজহাতে অর্চনা

করিতেন বসি।
অচিন্ত্য ঘটনা সব করিতেন অনুভব
নিজজনে সেই সব
কহিতেন হাসি ॥
পুত্ররূপে যাঁর ঘরে শ্রীকানুপ্রিয় প্রভুবরে
আসিলেন আলো করে
কুলের তিলক।
ইষ্ট গৌররায় হরি পুত্রে সমর্পণ করি
কহিলেন গৌররায়ের
হইও সেবক ॥
এনার আশ্রয়ে থেক অভিভাবক মনে রেখ
এই মোর সম্পদ
করিনু অর্পণ।
জগৎ পালক তিনি তোমায় পালিবে ইনি
আপনারে তাঁর পায়ে
কর সমর্পণ ॥
তেরশ' পঁচিশ সনে (মাঘী) শুক্লা চতুর্দশী দিনে
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম
করিয়া স্মরণ।
অনিত্য জগৎ ছাড়ি ইষ্ট গৌররায় হরি
অপ্রাকৃত নিত্যধামে
করিয়া গমন ॥
হাহা প্রভু সুরেন্দ্র নাথ কর শুভদৃষ্টিপাত
অধম পতিত আমি
বড় অভাগিয়া।
পিতামহ পরমগুরু তুমি বাঞ্ছাকল্পতরু
কিশোরের কেহ নাই
দাও পদছায়া ॥

শ্রীশ্রীনামবিজ্ঞানাচার্য প্রভুপাদ শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী

আবির্ভাব—১৬ ই কার্তিক, রবিবার (অমাবস্যা, কালীপূজা)
বাংলা ১২৯৮ সাল ইংরেজী ১৮৯১ সাল
তিরোভাব—১৫ই শ্রাবণ, শুক্রবার (কৃষ্ণানবমী তিথি)
বাংলা ১৩৮২ সাল/ইং ১ লা আগষ্ট ১৯৭৫

সপার্ষদে গৌরহরি ভুবনেতে অবতরি
নাম প্রেম করে বিতরণ।
এক এক গৌর পরিকরে জগৎতারিতে পারে
বন্দি আমি সবার চরণ ॥
পরিবারগণ মাঝে তিন মহাশয় রাজে
শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত রসপুর।
কবিরাজ সদাশিবসুত শ্রীপুরুষোত্তম পূত
তাঁর পুত্র কানাই ঠাকুর ॥
নিত্যানন্দ কৃপাপাত্র মাতা জাহ্নবা পালিত
শিশু কৃষ্ণদাস নাম যাঁর।
তাঁ সবার শ্রীচরণ মস্তকে করি ধারণ
কুলের প্রদীপ যে আমার ॥
এই বংশের শ্রীপাটে নদীয়া ভাজনঘাটে
জনমিলা কত মহাজন।
গোস্বামী সুরেন্দ্র নাথ শ্রীকানুকুলেতে জাত
সমাজে প্রসিদ্ধ একজন ॥
কানুপ্রিয় প্রভুবর পুত্ররূপে যাঁর ঘর
আলো করি হইলা উদয়।
কানুঠাকুর কৃপাধন্য নহেন তিনি সামান্য
যে পেয়েছে তাঁর পরিচয় ॥
শ্রীগুরু করুণাময় কানুপ্রিয় মহাশয়
হরিনামে প্রেমের মূরতি।

রূপানুগ ভক্তিমূর্তি হরিকথা সদা স্ফূর্তি
ভজন প্রভাবে অঙ্গে জ্যোতি ॥
অল্প বয়স হ'তে বিষয় বৈরাগ তাঁতে
গৌররায় সদা সেবা করে ।
বিষয়রস ত্যেজিয়া ভক্তিলালসিতহিয়া
ভক্তিশাস্ত্র দিবারাত্র পড়ে ॥
শাস্ত্রসিন্ধু প্রবেশিয়া গভীর নীরে ডুবিয়া
জটিল সিদ্ধান্তরত্ন তুলে ।
ভক্তিগ্রন্থ সৃষ্টি করি জগৎসম্মুখে ধরি
তাপিত পরাণ জুড়াইলে ॥
পড়িয়া শ্রীগ্রন্থখানি সদ্‌জন জ্ঞানীগুণী
একবাক্যে কহিলেন তাঁরা ।
সামান্য এঁনর নয় গৌরকৃপাসিদ্ধ হয়
অনন্ত সদ্‌গুণের পারা ॥
কানুপ্রিয় দয়াময় দয়ার সাগর হয়
মিষ্টভাষী সর্বপ্রিয়জন ।
হরিকথা প্রচারিতে যান (প্রভু) দেশবিদেশেতে
বাগ্মিতায় হরে সব মন ॥
কিবা সে রূপ লাবণ্য হেরি সবে করে মান্য
গৌরবর্ণ হয় তাঁর অঙ্গ ।
অতি শিশুকাল হতে নিরজনে একমতে
গ্রন্থলেখে নাহি অন্য সঙ্গ ॥
পুত্রের দেখিয়া গুণ পিতা তাঁর কহিলেন
ভক্তিশাস্ত্রে হইবে পণ্ডিত ।
নিজস্বার্থ না দেখিয়া প্রচার করিবে ইহা
সবাকার হইবে বন্দিত ॥
শৈশবকাল হইতে চলে প্রভু ভক্তিপথে
সুচরিত্র তাঁহার জীবন ।
পৌগণ্ড বয়সকালে যান প্রভু নীলাচলে
তথায় হয় গৌরদরশন ॥
কৈশোরেতে একদিন স্বপনেতে দেখিলেন

সম্মুখে দাঁড়ায়ে সীতানাথ।
শ্রীচরণে প্রণমিলে মস্তকে শ্রীচরণ তুলে
শ্রীঅদ্বৈত করেন আশীর্বাদ ॥
'লাভ', 'পূজা', 'মান' ভয়ে থাকে প্রভু নিরালায়
আবিষ্ট রহেন ভজনেতে।
ইষ্ট গৌররায়হরি নিজহাতে সেবা করি
গ্রন্থ লেখেন বসিয়া ধামেতে ॥
জীবের স্বরূপ আর নামচিন্তামণি সার
শ্রীভক্তিরহস্য কণিকা।
শ্রীনামাপরাধ দর্পণ বৈজয়ন্তীমালা (কর) আস্বাদন
শ্রীরাগভক্তিরহস্য দীপিকা ॥
এই সব গ্রন্থ তাঁর ভক্তিসিদ্ধান্ত সার
ভজনের করে উদ্দীপন।
মগ্ন সদা ভজনেতে তত্ত্বচিন্তে মগ্নচিতে
শ্রীগৌররায়ে আত্মসমর্পণ ॥
বৎসরের প্রথমদিনে মহাপ্রভু দরশনে
যান তিনি ভাবাবিষ্ট হয়ে।
গৌরদরশন করি দেন তথা গড়াগড়ি
নেত্রজলে বস্ত্র ভিজি' যায়ে ॥
নবদ্বীপে দীর্ঘকাল ভজনে কাটান কাল
ধামনিষ্ঠ আদর্শ একজন।
একতত্ত্ব দুই ধাম ব্রজ নবদ্বীপ গ্রাম
ভক্তিব্রজে অবিচল মন ॥
তেরশ' বিরাশি সনে শ্রাবণের পনের দিনে
কৃষ্ণপক্ষ নবমী সে তিথি।
ভজন সমাপন করি শ্রীগৌরগোবিন্দ নাম স্মরি
নিত্যলীলায় হ'ল তাঁর গতি ॥
শ্রীনামের উচ্চনাদে ভকতমণ্ডলী কাঁদে
হাহাপ্রভু কেন দিলা ফাঁকি।
থাকিব কাহারে নিয়া কেবা জুড়াইবে হিয়া
কোন সুখে ভবমাঝে থাকি ॥

কেইবা শুনাবে আর নামের মহিমা সার
কেইবা দেখাবে নব আলো।
বৈষ্ণবের ভাগ্যাকাশে হয়েছিলে পরকাশে
আজি হায় অদর্শন হ'ল ॥
হে নামবিজ্ঞানাচার্য হা প্রভু বৈষ্ণবাচার্য
নিজগুণে দাও দরশন।
অধম পতিত আমি দয়ার ঠাকুর তুমি
কিশোর শিরে দাও শ্রীচরণ ॥

